Gift in memory of
"Haron" Kumar Sanyal
from Mira Sanyal
8 12 1978

পরিচয়

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বার্ষিক ৪৷৹

প্রতি সংখ্যা ১৲

পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৩৪২

বিষয়-সূচী

সম্পাদক:
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ভারতী ভ
কলিকা

৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩৪২

পরিচয়

সম্পাদকী

ত্রৈমাসিকে সম্পাদকীয় মন্তব্যের সুযোগ অত্যল্প। সাম্প্রতিক সংসারযাত্রা এমনি দ্রুত হয়ে উঠেছে যে দৈনিক পত্রও তার তালে চলতে অক্ষম; একটা খবর ছাপা হবার আগেই জনসাধারণের মন অন্য খবরে জড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া সংবাদসরবরাহ নারদশোভন বৃত্তি, এবং শুধু অর্থই অনর্থের মূল নয়, যাথার্থ্যও বিরোধবর্দ্ধক। কাজেই বার্ত্তা-সম্বন্ধে মতপ্রকাশে পরিচয়ের একটা স্বাভাবিক অনীহা আছে। কারণ নিরপেক্ষতার দাবি না-করলেও সে নির্ব্বিবাদ চায়; এবং মাঝে মাঝে তাকে যদিও হঠোক্তিতে পেয়ে বসে, তবু বঙ্গসাহিত্যের কলহকোলাহলে তার কণ্ঠস্বর আজ পর্য্যন্ত শোনা যায়নি ব'লেই আমার বিশ্বাস। তাহলেও শুচিবায়ু-নামক নারীসুলভ রোগকে পরিচয় ভয়ের চক্ষে দেখে, এবং সে জানে যে ঘটনা-সম্পর্কে উদাসীনতাও সেই সংক্রামক ব্যাধির দুর্লক্ষণ। কিন্তু সমাচারদর্পণই তার আদর্শ হলেও দেশ-কালের প্রতিবন্ধে সে-আদর্শকে সে আয়ত্তে আনতে পারে না। অতএব দুধের অভাব ঘোলে মিটিয়ে সে তার ঘটনাবোধ ব্যক্ত করে সাময়িক সাহিত্যের সবিস্তার সমালোচনায়। এই সম্পাদকী সেই সমালোচনা-বিভাগেরই অন্তর্ভুক্ত; যে-বিষয় সুশৃঙ্খল প্রবন্ধের অবাধ্য, যে-পুস্তকের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় অনাবশ্যক, এখানে উত্থাপিত হবে সেই সকল আশুক্লান্ত প্রসঙ্গ। কিন্তু সাহিত্যই পরিচয়ের অবলম্ব, এবং ত্রৈমাসিকের পক্ষে সময়োপযোগিতা অসাধ্য। সুতরাং এই মন্তব্যমুকুরে বর্ত্তমানের সর্ব্বাঙ্গীণ প্রতিচ্ছবি কখনোই ফুটে উঠবে না। এমন-কি সম্পাদকেরাও যেহেতু আত্ম-

সর্ব্বস্ব ব্যক্তি, তাই শেষ পর্য্যন্ত এই পৃষ্ঠা-কটায় যা মিলবে, সে হচ্ছে একজন সীমাবদ্ধ মানুষের মানস প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে পরিচয়গোষ্ঠীর ন্যূনাধিক সহানুভূতি থাকলেও এর সম্পূর্ণ দায় একা সম্পাদকের, এই কথা মনে রাখলে আমার অনুকম্পায়ীদের প্রতি হয়তো অবিচার ঘটবে না।

* * *

বাংলা পত্রিকার সম্পাদকী বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে বাক্যারম্ভ করবে, এইটাই হচ্ছে স্বভাবসঙ্গত। কিন্তু সে-পথ ঘটনাবিরল। বঙ্গসাহিত্যের সৌরমণ্ডলে উল্কাপাত অসম্ভব; এবং আমাদের গ্রহপতিদের গতিবিধির চর্চ্চা আমরা এত দিন ধ'রে করেছি যে তাঁদের প্রত্যেক বিকীরণ আমাদের নখদর্পণে, প্রত্যেক অপচার প্রত্যাশিত। উপরন্তু এ-বৈধতা শুধু প্রাচীন সাহিত্যের চিহ্ন নয়, আমাদের অর্ব্বাচীন সাহিত্যও নিয়মাধীন। এ-দেশের কবিযশঃপ্রার্থীরা যে-গুণের জোরে খ্যাতনামা হয়ে ওঠেন, তারই অভ্যাসে তাঁদের সারা জীবন কাটে; কাব্য যে রসবৈচিত্র্য ব্যতীত বাঁচে না, তা বোধহয় তাঁদের জানা নেই। অথচ বাঙালী নিজেকে কলালক্ষ্মীর বরপুত্র ব'লে মনে করে। সে ভাবে যে তার কাছে রূপ যেহেতু রৌপ্যের চেয়ে মহার্ঘ্য, তাই সরকারী পরীক্ষাগুলোয় মান্দ্রাজীর সাফল্য তাকে টলাতে পারেনা, স্বদেশী বাণিজ্যে মারোয়াড়ীর একাধিপত্য সে নীরবে সয়। কিন্তু আত্মপ্রসাদ প্রায় সর্ব্বত্রই অহৈতুকী, এবং বাংলা অভিধানে যদি বৈদগ্ধ্য আর ভাবালুতা সমার্থবাচক না-হয়, তবে আমাদের রসজ্ঞান নিশ্চয়ই কিংবদন্তীমাত্র। আমরা অন্তত পাঁচ শ বছর থেকে কবিতা লিখছি, কিন্তু জন তিন চার সর্ব্ববাদিসম্মত মহাকবির রচনা বাদ দিলে, আমাদের ভাণ্ডারে যা বাকি থাকে, তাতে সাহিত্যামোদীর লোভ ততটা নেই, যতটা লাভ মসলাবিক্রেতার। আধুনিক বাঙালীর কথা জানি না; কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত, শিবের গান, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি যাদের কলমে বেরিয়েছিলো, কল্পনা তাঁদের ছিলোই

না, উদ্ভাবনার চেষ্টাও তারা কোনোদিন করেনি;—পূর্ব্ববর্ত্তীর অনুলাপ পরবর্ত্তী পুনরুক্তির উপাদান জুগিয়ে এসেছে। ফলে আমাদের অধ্যাত্মকবিতায় আত্মসমর্পণ বা অমৃতপিপাসা নেই, আছে কেবল কুসংস্কার ও নির্ব্বন্ধাতিশয্য, আমাদের প্রেমগাথায় স্বর্গ-নরকের দ্বন্দ্ব নেই, আছে শুধু নির্লজ্জ নাগরালি, আমাদের নিসর্গকাব্যে প্রকৃতির পরিচয় নেই, আছে মাত্র বারমাস্যার বাগ্‌বাহুল্য। এই গেলো বাংলার কবিকাহিনী; এবং সাহিত্যে যদি ব্যাবসায়িক টান-জোগানের বিধান খাটে, তবে মানতেই হবে যে প্রতিধ্বনিপ্রীতি বাঙালী পাঠকেরও মজ্জাগত। হয়তো সেইজন্যেই আমাদের বাইরন্‌-বিলাসী পূর্ব্ব-পুরুষেরা নবীনচন্দ্রকে মহাকবি বলতে দ্বিধা করেন নি, এবং আমাদের রবীন্দ্র-প্রভাবিত সমসাময়িকেরা সাহিত্যের সীমা-সম্বন্ধে অতটা উন্মুখর।

সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রপ্রতিভার ঐকান্তিক মহত্ত্বে আধুনিক লেখকের আস্থা আধুনিক সমালোচকের চেয়ে বেশি; কারণ সাহিত্যের মাত্রা না-মানলেও, আত্মশক্তির পরিমিতি সকল স্রষ্টাই ভালো ক'রে জানেন। ফলে আমাদের কাব্যরচয়িতারা, কাব্যবিবেচকদের মতো, কালাতীতের উপাসক নন; তাঁদের যেহেতু ইতিহাস-জ্ঞান আছে, তাই তাঁরা সহজেই বোঝেন যে বাইরন্‌-এর মতো গৌণ কবির অনুকরণই যখন অত শক্ত, তখন রবীন্দ্রনাথের মতো মুখ্য কবির পদানুসরণ একেবারে নিষ্ফল। সেইজন্যেই সনাতনী বেতসীবৃত্তিকে তাঁরা যথাসাধ্য এড়িয়ে চলেন, সেইজন্যেই প্রচলিত ঠাটে মানসীমূর্ত্তির পুনর্নির্ম্মাণে তাঁরা নিরুৎসুক, সেইজন্যেই তাঁদের শ্রেষ্ঠ প্রয়াস আত্ম-বিজ্ঞাপনে প্রযুক্ত, আত্মনিবেদনে নয়। কিন্তু সাহিত্যের মাত্রা যদিও অনিশ্চিত, তবু তার ধর্ম্ম সুবিদিত; এবং স্বতঃসিদ্ধি গণিতের ভিত্তি হলেও শিল্পসৃষ্টির পটভূমি পরিণামী চিৎপ্রকর্ষ। অতএব কবির পক্ষে রোমন্থন যত-না গর্হিত, স্বয়ম্ভূতি ততোধিক অভাবনীয়; এবং মার্লো-র সঙ্গে শেক্‌স্‌পীয়র যেমন কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলে গ্রথিত, মাইকেলের পরে রবীন্দ্রনাথের জন্মও তেমনি আবশ্যিক। কিন্তু আমাদের তথাকথিত তরুণসম্প্রদায় এই আর্য্যসত্যটাকে কাজে স্বীকার করলেও

কথায় আমল দেন না; তাঁদের রচনারীতি যদিও রাবীন্দ্রিক রলরোলে অনুরণিত, তবু তাঁদের মনোভাবে অধমর্ণোচিত বিনয় নেই। অবশ্য এর জন্যে তাঁরা নিন্দনীয় নন; কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষা আজ সাধারণের সম্পত্তি, আমাদের মাতৃভাষার এখন আর কোনো পৃথক সত্তা নেই; এবং সেইজন্যেই হয়তো তাঁর সম্মোহ যদিও আমাদের অনভিপ্রেত, তবু তার থেকে উদ্ধারের উপায় আমরা জানি না। কিন্তু সামর্থ্য না-থাকলেও ইচ্ছার যে অন্ত নেই, এইটাই হচ্ছে বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য-সম্বন্ধে স্মরণীয় কথা; কেন-না ঐতিহ্য-ব্যতিরেকে সাহিত্যসেবা যদিচ অসম্ভব, তবু নির্ব্বিকার ঐতিহ্য শুধু চিরাচারের নামান্তর, যার পাষাণপুরীতে কারুকর্ম্মী সমাদৃত হলেও রূপকারের প্রবেশনিষেধ। সুতরাং সাম্প্রতিকদের বিদ্রোহ সর্ব্বত কাম্য; তার মধ্যে বিপ্লবের পরিমাণ নগণ্য বটে, কিন্তু তার বিশিষ্টতা নিশ্চয় উল্লেখযোগ্য। আধুনিকেরা সম্ভবত প্রায়ই ভুলে যান যে ব্যক্তিস্বরূপের অভাব কোনোদিনই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আস্ফালনে ঢাকা পড়ে না। তাহলেও উত্তররৈবিক ছায়ানুবর্ত্তিতায় কাকজ্যোৎস্না জাগিয়েছেন তাঁরাই; আমাদের নিবিন্দ্রিয় নিরুদ্দেশযাত্রা শেষ হয়েছে তাঁদেরি নির্দ্দেশে। তাই শুধু সাধনার বিচারে আমাদের নূতন লেখকদের আমি অত্যাধুনিক ইংরেজ কবি অডেন্ বা স্পেণ্ডর বা ডে ল্যুইস্-এর সমপাংক্তেয় মনে করি; এবং সিদ্ধিতে, অর্থাৎ লোকমতে, এই বিদেশীরা যদি আমাদের ছাড়িয়ে গিয়ে থাকেন, তবে তার জন্যে শুধু ভাগ্যবিধাতাই দোষী। হয়তো প্রতিষ্ঠা পশ্চিমে সুকর, হয়তো সেখানকার আত্মনিষ্ঠ সমাজ স্বকীয়তার মূল্য দিতে জানে, হয়তো ইংরেজী সাহিত্যের প্রাণপ্রবাহ কখনো ফল্গুর মতো প্রেততর্পণের মরুতীর্থ হয়ে ওঠেনি ব'লে উর্ব্বরতা সেখানে শুধু উৎসের চার পাশেই দেখা যায় না, নদীসংলগ্ন শ্মশানও সেদেশে শ্যামল।

সে যাই হোক, কেন্দ্রাপসারণ আর সংস্কারমুক্তি এক নয়; এবং প্রকৃত কবিমাত্রেই যদিও প্রথম প্রকরণে অভ্যস্ত, তবু দ্বিতীয় অবস্থায় অধিকারী শুধু তথাগতেরা। এ-কথা বাঙালী কবিরাও জানেন; তাই তাঁরা শুধু পুনর্ব্বাদেরই প্রতিকূল, অনাসৃষ্টির জন্যে উন্মুখ নন। উপরন্তু

সে-চেষ্টারও কোনো অর্থ নেই; কারণ ওয়াট্‌সনী মনোবিজ্ঞান যদিও ন্যায়ত ছিদ্রবহুল, তবু তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রায়ই অপ্রমাদ; এবং প্রথা-প্রবণ মানুষকে কলের পুতুল না-বললেও তার আচার-ব্যবহারে শিশু-শিক্ষার স্বাক্ষর একরকম অক্ষয়। তবে কবিরা সাধারণের চেয়ে আশু-চেতন; এবং নিজগুণে না হোক, আঠারো শতকের শেষ থেকে তাঁদের স্বকীয়তা-সম্বন্ধে যে-জনশ্রুতি চ'লে আসছে, অন্তত তার শাসনে তাঁরা অপেক্ষাকৃত আত্মস্থও। হয়তো সেইজন্যেই তাঁদের জাতিব্যবসায়ে আর সামবায়িক উদ্যোগের প্রাদুর্ভাব নেই, তাঁরাও আজকাল স্বাধীন প্রতিযোগিতার পক্ষপাতী। তবু কবিজীবন কাব্যের চেয়ে ব্যাপক, এবং আমাদের ভাবে যতই মৌলিকতা থাকুক না কেন, স্বভাবে আমরা নিতান্ত নির্বিশেষ। সুতরাং বাংলা কাব্যের নব্যতন্ত্রও আগাগোড়া নূতন নয়; এবং ইদানীকার কবিরা আনুপূর্ব্বিক দৃষ্টিভঙ্গীই কাটিয়ে উঠেছেন, পরিপ্রেক্ষিতের পরবশতা ঘোচান নি। কিন্তু এর মধ্যে লজ্জার কোনো কারণ নেই। কাব্য আর দর্শন বিভিন্ন বস্তু; এবং কবির সমগ্র শক্তি যেকালে রূপসন্ধানেই নিয়োজিত, তখন তত্ত্বের জন্যে তিনি অন্যের কাছে হাত পাততে বাধ্য। এ-নিয়ম দান্তে থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকলের সম্বন্ধেই খাটে; দান্তে যেমন সুমা-র রসানুবাদ ক'রে ক্রিশ্চান আখ্যা পেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি উপনিষদের অনুগত ব'লে হিন্দু-সংস্কৃতির কবি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরে লোকযাত্রার লক্ষ্য বদলেছে। আমাদের প্রাচীন বিদ্যাপীঠগুলোয় পরগাছাই আজ একমাত্র বোধিদ্রুমরূপে বিরাজমান, যান-বাহনের বাহুল্যে পৃথিবীর প্রসার সঙ্কুচিত, সার্ব্বভৌম অন্নাভাবে সকল মানুষের অবস্থাই সমান। কাজেই আমাদের আধুনিকেরাও বৈদান্তিক বীক্ষায় নির্ভর হারিয়েছেন, তাঁদের মতে ভূমার দিকে নজর রেখে মোটারধাবিত রাজপথে চলা বিপজ্জনক। ফলত বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য আর ভোরের কুয়াসায় আচ্ছন্ন নেই, তার পরিমণ্ডল এখন অস্ত-রাগে রঞ্জিত। কিন্তু এজন্যেও সাম্প্রতিকেরা চিন্তাশীল ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা-ভাজন, এবং তাঁদের বিরুদ্ধে প্রত্নতাত্ত্বিকের অভিযোগ অগ্রাহ্য। কারণ

এ-ক্ষেত্রে তাঁদের বৈদেশিকতা দোষাবহ বটে, কিন্তু তাঁদের মনুষ্যধর্ম্ম শ্রদ্ধেয়। তাছাড়া এই বর্ণসঙ্করতায় বাংলা সাহিত্য অভ্যস্ত। প্রাক্-মাইকেলী যুগেও কমঠবৃত্তির আদর ছিলো না; এবং ভারতচন্দ্রের সাধনা যদিও আর্য্যপন্থী, তবু তাঁর ভাবে ও ভাষায় মুসলমানী প্রভাব সুস্পষ্ট। অতএব হাল আমলের বনেট্পরা সরস্বতীও দেবতা, তিনিও বরদা এবং নমস্যা। দর্শন দূরের কথা, কাব্যে প্রতীক ও কবিপ্রসিদ্ধির প্রয়োজন যতদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে, ততদিন এফ্রোডাইটি উর্ব্বশীর প্রতিদ্বন্দ্বী।

কিন্তু শিল্প হেতুপ্রভব হলেও, তার ভূমিকার সমস্তটাই আনুষ্ঠানিক নয়, তাতে অতিদৈব সঙ্কল্পের স্থান আছে; এবং সাহিত্য-প্রসঙ্গে উপযোগবাদ যেহেতু অকাট্য, তাই তার উদ্দেশ্যে ও সার্থকতায় বিকল্প অচল। সুতরাং আমাদের সাগরলঙ্ঘনের কৈফিয়তে শুধু কালনিষ্ঠার নাম শুনেই আমার জিজ্ঞাসা বারণ মানে না, সিন্ধুপারের মায়াকাননে বন্দিনী সীতার কুশলপ্রশ্নও স্বতই মনে আসে। সত্যই যদি প্রাচ্য মায়াবাদে বাস্তব জগৎ উপেক্ষিত ব'লে বাংলা সাহিত্য আজ পাশ্চাত্য বস্তুতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে থাকে, তবে আমাদের উপরে ডি-এইচ্ লরেন্স্-এর আকর্ষণ দিন দিন এত বেড়ে চলেছে কেন? কারণ ইংলণ্ডে জন্মালেও লরেন্স্ য়ুরোপের প্রতিভূ নন; এ-কালের মানুষ হলেও তিনি প্রগতিবিদ্বেষী; যে-প্রতর্ক বর্ত্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য, সে-বৈনাশিকতায় তাঁর মন কখনো বিষিয়ে ওঠেনি, বিশ্বমানবের চিরকালীন সত্তাই তাঁকে পৃথিবীপ্রদক্ষিণে ডেকেছিলো। অর্থাৎ বুদ্ধির উপরে লরেন্স্-এর অভক্তি ছিলো বের্গস‍ঁ-র চেয়েও গভীর; মহাসমরে বিধ্বস্ত হয়েও প্রবৃত্তি-সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ জাগে নি; তিনি আমরণ বিশ্বাস করেছিলেন যে পরীক্ষার মধ্যস্থতায় সত্যের সন্ধান মিলে না, সেজন্যে স্বজ্ঞার অন্তঃপ্রেরণাই নান্যপন্থা। সেইজন্যেই তাঁর রচনায় কল্পনা পরিকল্পনাকে ছাপিয়ে গেছে, উপাখ্যান উপদেশের কাছে হার মেনেছে, তাঁর অসামান্য কবিপ্রতিভাও তাঁকে অসংযম ও লিপিশৈথিল্য থেকে বাঁচাতে পারেনি। অবশ্য তাঁর অকপটতা তর্কাতীত, তিনি যুগরোগের যে-নিদান করেছেন, তাও সম্ভবত নির্ভুল। কিন্তু তাহলেও, আমি যত

দূর জানি, লরেন্স্ বস্তুবাদের জন্যে বিখ্যাত নন, তাঁর অন্তর্দীপ্ত ভাবিকথন একদেশদর্শী ; এবং সেইজন্যে বর্ত্তমান য়ুরোপ তাঁর পদলালিত্যেই মুগ্ধ, তাঁর অর্থগৌরবের মর্য্যাদা বোঝেন একমাত্র মিড্‌ল্‌টন্ মারি। অতএব এ-দেশের বস্তুবিলাসীদের কাছে লরেন্স্-এর প্রতিপত্তি দুর্ব্বোধ্য। তবে কি জাতিগত চৈতন্য শুধু কথার কথা নয়? আমরা আসলে প্রকৃতি-পরাঙ্‌মুখ ও উচ্ছ্বাসপ্রবণ ব'লেই কি প্যাট্‌মোর-এর চেয়ে রসেটি আমাদের বেশি টানে, ওয়েন্-কে ছেড়ে আমরা ব্রুক্-এর তর্জ্জমা করি, ফর্ষ্টার বেঁচে থাকতে গল্‌স্‌ওয়ার্দি-র জন্যে শোকাশ্রু মুছি? যদি আত্মসমাহিতিই আমাদের কাম্য হয়, তবে বাংলা দেশে য়েট্‌স্-এর আলোচনা নেই কেন? যদি আমরা যাথার্থ্যই চাই, তবে জয়েস্-সম্বন্ধে নিরুৎসাহের কারণ কি? যন্ত্রসভ্যতার সাক্ষাৎ পরিচয়ে যদি আমাদের ভয় না-থাকে, তবে আমরা অল্‌ডাস্ হাক্‌স্‌লি-কে বাড়াই কোন্ অছিলায়? আমি যুগধর্ম্মকে সম্মান করি, প্রত্যেক সৎকবির রচনাই তাঁর পারিপার্শ্বিক দেশ ও কালের মুকুর, এই আমার বদ্ধ ধারণা ; তাই আমাদের নববিধানে বহ্বারম্ভ লঘু ক্রিয়ার পুনরভিনয় আমি দেখতে চাই না, আন্তরিক অনিবার্য্যতাই আমার অন্বিষ্ট।

* * * *

আমার মতে আধুনিক য়ুরোপীয় মনের প্রায় সকল গুণই ফ্রেড্‌রিক্ ম্যানিং-এর মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। সেইজন্যেই তাঁর অকাল মৃত্যু ইংলণ্ডের পক্ষে অত্যন্ত শোচনীয়। স্বাস্থ্যের অভাবে ম্যানিং-এর অধিকাংশ জীবন প্রবাসে কাটে। ফলে, যতখানি লিপিপ্রাচুর্য্য এবং যাদৃশ বন্ধুভাগ্য খ্যাতির জন্যে দরকার, তা তিনি কোনোদিন অর্জ্জন করেন নি। কিন্তু চিররুগ্নতাই তাঁর রচনাসঙ্কোচের একমাত্র কারণ নয়। এই সাংবাদিক যুগেও ম্যানিং আত্মজ্ঞানকে আত্মপ্রকাশে ভজাতে পারেন নি ; এবং তাঁর মনীষা সমসাময়িকদের ছিদ্রান্বেষণে কখনো এগোয় নি বটে, কিন্তু নিজের লেখাকে তিনি আজীবন নির্ম্মম দৃষ্টিতেই দেখেছেন। তাই তাঁর সর্ব্বজনপ্রশংসিত সামরিক উপন্যাস—"হার্ প্রাইভেট্‌স্ উই" যখন প্রকাশকের জবরদস্তিতে মুদ্রিত হয়, তখন ম্যানিং তাতে নিজের নাম

দিতে পারেন নি। কিন্তু অদ্ভুত সে-পুস্তকের নিরাসক্তি, আশ্চর্য্য তার মিতভাষণ, তার অনুসন্ধিৎসার ব্যাপকতা অনুপম; যে-হিষ্টিরিয়া, যে-হিতোপদেশ, যে-অতিরঞ্জন সামরিক সাহিত্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ, তার নামগন্ধও ম্যানিং-এর উপাখ্যানে নেই; অথচ তাঁর করুণা বিভীষিকা-বিলাসী রেমার্ক্-এর চেয়ে কম নয়, বরং সংযত ব'লে তাঁর নরকচিত্র আরো বেশি ভয়াবহ। মাত্র আর দুখানি বই "হার প্রাইভেট্স্ উই"-র পাশে স্থান পেতে পারে,—ব্লাণ্ডেন্-এর "আণ্ডার্টোন্স্ অফ দি ওয়র" এবং লুড্‌ভিক্ রেন্-এর "ক্রীগ্"। কিন্তু ব্লাণ্ডেন্-এর সুমিতিতে একটা পোষাকী ভাব আছে, চিত্তবিক্ষোভের বিকাশ ইংরেজী সৌজন্যের অননুমত ব'লেই তিনি বুঝি শিষ্টাচার বাঁচিয়ে চলতে বদ্ধপরিকর; এবং রেন্-এর নিরুদ্বেগ কেমন যেন আবেগবঞ্চিত। গ্রেভ্স্-এর "গুড্‌বাই টু অল্ ছাট্" এবং সিগ্‌ফ্রিড্ সস্সুন্-এর "মেময়েস্ঁ অফ্ এন্ ইন্‌ফ্যান্‌ট্রি অফিসার" বই-দুখানিতেও অসংযম নেই; কিন্তু উভয় পুস্তকের প্রেরণাই যেহেতু আত্মবিজ্ঞাপন, তাই আমার বিবেচনায় নৈর্ব্যক্তিক "হার প্রাইভেট্স্ উই" সামরিক সাহিত্যের পরাকাষ্ঠা। এ-ছাড়া ম্যানিং "সীন্স্ এণ্ড্ প্রোট্রেঁট্স্" নামে আর একটি গদ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন, এবং "হার প্রাইভেট্স্ উই" যেমন তাঁর পরিদর্শনের সাক্ষ্য, তেমনি "সীন্স্ এণ্ড্ প্রোট্রেঁট্স্" তাঁর পরিকল্পনার নিদর্শন। সে-নাট্যরচনার বিষয়বস্তু মানব-জীবনের সনাতন সমস্যাসমূহ, তার কলাকৌশল ল্যাণ্ডর্-এর "ইম্যাজি-নারি কন্‌ভার্সেঁশন্"-এর অনুরূপ, তার উৎকর্ষ তাকে ইতিমধ্যেই অমৃতের অধিকারী করেছে। "সীন্স্ এণ্ড্ পোট্রেঁট্স্"-এর সমতুল্য পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে কিনা বলতে পারি না, কিন্তু আমি যতদূর জানি ভালেরি-র "এয়পালিন্স্" ছাড়া তার আর নিকটাত্মীয় নেই। ম্যানিং-এর কবিতা আমার অপরিচিত; কিন্তু যে-দুখানি ক্ষীণকায় পুঁথি তাঁর কাব্যসম্ভার বহন ক'রে বহুপূর্ব্বে বেরোয়, তার ঝঙ্কারে মতান্ধ এজ্রা পাউণ্ড্-ও একদিন বেজে উঠেছিলেন। সেইজন্যেই ম্যানিং-এর অন্তর্দ্ধানে ইংরেজী সাহিত্যের জনসমাকুল সভাও আজ শূন্য; কারণ প্রতিভাশালী লেখকের সংখ্যা সে-দেশে অগণ্য হলেও নিষ্কাম সাধক সর্ব্বত্রই বিরল।

টি-ই লরেন্স্-এর অপঘাতেও ইংলণ্ডের বিস্তর ক্ষতি; কিন্তু সে-ক্ষতি ততটা ইংরেজী সাহিত্যের নয়, যতটা ইংরেজী রাষ্ট্রনীতির। কারণ "সেভ্ন্ পিলার্স্ অফ্ উইজ্ডাম্" লিখে লরেন্স যদিও তাঁর মাতৃভাষাকে উপকৃত ক'রেছেন, তবু তাঁর মাতৃভূমির কাছে সে-পুস্তক যে-কীর্ত্তির কাহিনী তার মূল্য খুব সম্ভব অনেক বেশী। অবশ্য তিনি না-জন্মালেও টার্কির পরাজয় বন্ধ থাকতো না। কিন্তু তাঁর দৌত্য ব্যতীত আরবদেশ বৃটিশ বৈজয়ন্তীর উপচ্ছায়ায় আসতো কিনা সন্দেহ। তাহলেও লরেন্স্-সম্বন্ধে যে সব কৌটিল্যোচিত রূপকথা চলে, সেগুলো প্রায়ই অবিশ্বাস্য। লরেন্স্ বোধহয় স্বভাবত সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন না, ঘটনাচক্রই তাঁকে দিগ্বিজয়ের উপলক্ষ্য ক'রে তোলে; এবং ভের্সাই-সভায় আরব-সম্বন্ধে ইংলণ্ডের দুরভিসন্ধি অবগত হয়ে তিনি কেবল তাঁর পদক ও পদবীগুলোই ফিরিয়ে দেন নি, সঙ্গে সঙ্গে এটাও কর্ত্তৃপক্ষদের জানিয়েছিলেন যে সে-অবিচারের প্রতিকারে তিনি স্বদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণেও প্রস্তুত। এই নাটকীয় হঠোক্তি শুনে লয়েড্ জর্জ্জ্-এর মন না-গল্লেও, এর অমায়িকতা সুনিশ্চিত। কারণ লরেন্স্-এর পরজীবনের অজ্ঞাতবাস, প্রসিদ্ধিভীতি ইত্যাদি উপসর্গগুলো যদিই বা কোনো কূট ষড়যন্ত্রের অঙ্গ হয়, তবু তাঁর আমরণ অর্থকষ্টের ব্যাখা না-পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁকে গুপ্তচর বলা অসার্থক ও অন্যায়। আসলে রাজনীতিকেরা তাঁকে বারম্বার দুঃখই দিয়েছে; এবং সন্ধিস্থাপনের অব্যবহিত পরে তিনি যখন আত্মধিক্কারের তাড়নে নিজের জীবনচরিত লিখতে সুরু করেন, তখন এক রেল্ওয়ে ষ্টেশনে তাঁর পাণ্ডুলিপি চুরি যায় রাজপুরুষদেরই চক্রান্তে। কিন্তু তাতে লরেন্স্-এর মুখ বন্ধ হয় নি, তাঁর পুনর্লিখিত জীবনী, "সেভ্ন্ পিলার্স্ অফ উইজ্ডাম্" স্বদেশী বিদেশী সকলের সম্বন্ধেই অপ্রিয় সত্যে পরিপূর্ণ। তবু রটনাকে লরেন্স্ এমনি ভয় পেতেন যে তিনি বইটিকে সাধারণের নাগালে আনতে চাননি, অল্প খানকতক দুর্ম্মূল্য কপি ছাপিয়ে বন্ধুদের মধ্যেই বেচেছিলেন। সে-পুস্তকের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে নি, তার ছাপার খরচ জোগানোর জন্যে "রিভোল্ট্ ইন্ দি ডেজার্ট্" নাম

দিয়ে আরব যুদ্ধের যে-সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লরেন্স্ প্রকাশ করেন, আমি শুধু তাই পড়েছি। কিন্তু নাতিদীর্ঘ হলেও "রিভোল্ট্ ইন্ দি ডেজার্ট্" অবিস্মরণীয় পুস্তক; লিখনভঙ্গীতে শত মুদ্রাদোষ থাকলেও লরেন্স্-এর কবিপ্রতিভা সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের বস্তু; গত পঞ্চাশ বৎসর ধ'রে যত অসামান্য ইংরেজ লেখক আরব মরুতে ডাউটি-র পদাঙ্কে চলেছেন, লরেন্স্ সম্ভবত তাঁদের সকলের অগ্রগণ্য। স্বয়ং ডাউটি-ই লরেন্স্-এর উপমান, এবং তাঁরই মতো আরবদেশে লরেন্স্-এর প্রথম পদার্পণ প্রত্নতত্ত্বের অন্বেষণে। আমার বিশ্বাস, এই পুরাবৃত্তের মোহ তাঁদের ক্ষেত্রে আপতিক খেয়াল মাত্র নয়; আশপাশের বালখিল্যদের সঙ্গে তাঁদের বৈষম্য মূলগত ছিলো ব'লেই তাঁরা হয়তো দুর্গম মরুতে অতীতের মরীচিকাকে খুঁজে বেড়িয়েছিলেন। অন্তত লরেন্স্-সম্বন্ধে এই অনুমান যে মিথ্যা নয়, তার প্রমাণ হোমার ও ম্যালোরি-র প্রতি তাঁর প্রবল পক্ষপাত। তাঁর রোমহর্ষক কর্ম্মজীবনেও তিনি এই কবিদের ছেড়ে কখনো এক পা নড়েন নি, এবং অডিসি-র গদ্যানুবাদই তাঁর সহিত্যসাধনার উপযুক্ত উপসংহার। আমার মতে তাঁর "অডিসি অফ্ হোমার" ইংরেজী প্রতিভাষিক সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয়, তার জোড়া আমাদের কালে মিলবে না, সে-জন্য যেতে হবে এলিজাবেথের আমলে। আমার চক্ষে লরেন্স্-এর সমকক্ষেরাও সেই উন্মার্গ যুগের মানুষ, তাঁর ওজস্বী ও অমিত ব্যক্তিস্বরূপ আমাদের হিতবাদী সমাজব্যবস্থায় নিতান্ত অসমঞ্জস।

মাত্র একান্ন বৎসর বয়সে পানাইৎ ইস্ত্রাতি-র তিরোধানও পরিতাপের বিষয়। আমাদের কানে তাঁর নাম যদিও অবিদিত, তবু য়ুরোপের বিচারে তিনি গর্কির প্রতিযোগী। ইস্ত্রাতি-র জন্ম বল্কান্ উপদ্বীপে; কিন্তু নিজেকে ফরাসী সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে কন্‌রাড্-এর মতোই তিনি দেখিয়ে গেছেন যে বক্তব্য থাকলে পরভাষার বাধাও অতিক্রমণীয়। বলাই বাহুল্য ফরাসীপ্রেমিক ইস্ত্রাতি জাতিস্মর ছিলেন না। কোনো এক দারুণ দুর্দ্দিনে তিনি যখন আত্মহত্যার চেষ্টায় ব্যর্থকাম হয়ে দাতব্য চিকিৎসালয়ে শয্যাগত, তখন রোম্যা রোলাঁ-র সেবা ও শুশ্রূষা, রোম্যা রোলাঁ-র সৌহার্দ্দ্য ও

আশ্বাসবাণী তাঁর বিষাক্ত মনে জিজীবিষা ফিরিয়ে আনে। তাই তাঁর নব জীবনের অভ্যুদয় রোলাঁ-সম্পাদিত এয়রোপ্-পত্রিকায়। কিন্তু সেই থেকে বারো বছর ধ'রে একটার পর একটা উপন্যাস লিখে গেলেও ইস্ত্রাতি কখনো সৌখিনী সাহিত্যে আশ্রয় নেন নি; তাঁর রচনায় অভিজ্ঞতা সর্ব্বদাই অভিব্যক্তিকে ছাপিয়ে উঠেছে; এবং তিনি যেহেতু সুখের চেয়ে স্বস্তিকে বড় ভাবেন নি, বরং সত্যের খাতিরে সুখের আশায় বারম্বার জলাঞ্জলি দিয়েছেন, তাই দিনে দিনে তাঁর পাঠকের দল বেড়েছে বটে, কিন্তু প্রিয়জনের সংখ্যা ক্রমাগতই কমেছে। অন্তঃকালে তিনি যদিও এক রোলাঁ ভিন্ন আর সকল বন্ধুকেই খুইয়েছিলেন, তবু তাঁর স্পষ্টভাষণ রোলাঁ-র ভাবালু উদারনীতিকেও ছেড়ে কথা কয় নি; এবং শেষ জীবনে সোভিয়েট্‌রাষ্ট্র-সম্বন্ধে তথ্যবহুল পরিবাদের ফলে তাঁর মতো জন্মবিদ্রোহীকেও ফরাসী বিপ্লববিলাসীদের শত্রুতা সইতে হয়েছে। কিন্তু সমষ্টিবাদীর ধমক খেয়েও ইস্ত্রাতি-র স্বভাব শোধরায়নি, এবং অত্যাচারবিদ্বেষ প্রলয়রতিরই নামান্তর, এই দার্শনিক উপদেশ জুলিয়্যাঁ বাঁদা-র মুখে শুনেও তিনি তাঁর ন্যায়নিষ্ঠাকে সজাগ রেখেছিলেন। তাহলেও ইস্ত্রাতি-কে আদর্শপ্রাণ বলা অনুচিত; অনাচার ও অত্যাচারের সংসর্গে বেড়ে উঠে অনাগত রামরাজ্যে তাঁর ভরসা ঘুচেছিলো; এবং অন্ন-বস্ত্রের অভাবে আশৈশব সমাজরক্ষীদের সংঘর্ষে এসে তিনি মানুষকে ভালোবাসার অবকাশ পান নি। ফলে তাঁর উপন্যাসগুলি বস্তুতই ধ্বংসপ্রধান, তাঁর নায়ক-নায়িকারা সকলেই সর্ব্বহারা, তাঁর কণ্ঠস্বর অনুচ্চ হলেও কেমন যেন কর্কশ ও ঘৃণাব্যঞ্জক। আরো কিছুদিন বাঁচলে ইস্ত্রাতি-র উগ্রতায় নিশ্চয়ই মন্দা পড়তো; অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি হয়তো তাঁর অসাধারণ জীবনবেদের অনবদ্য ছবি এঁকে যেতেন। কিন্তু দুর্দ্দৈবের দৌরাত্ম্যে আমরা যদিও তাঁর কথকালির চূড়ান্ত প্রকাশে ফাঁকি পড়লুম, তবু তাঁর বর্ত্তমান বইগুলিকে সত্যানুরাগী সহজে ভুলবে না। ইস্ত্রাতি হাইনে-প্রমুখ রোম্যান্টিক দুঃশাসনদের শেষ বংশধর; এই জগদ্ব্যাপী নিরীহনিগ্রহের দিনে তাঁর জন্যে শোক করার তাই কারণ আছে।

আইনষ্টাইন্

তিরিশ বৎসর আগে আইনষ্টাইন্ যে প্রবন্ধে আপেক্ষিকবাদের সূচনা করেন তাহা পদার্থবিজ্ঞানে নূতন যুগের অবতারণা করিয়াছে। জড়জগতের ঘটনা-সমূহের বিবৃতি ও উহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ নির্দ্ধারণের জন্য বৈজ্ঞানিক যে দেশ ও কাল রূপ প্রক্ষেপ-ভূমির পরিকল্পনা করেন, তাহা যে দর্শকনিরপেক্ষ নয়, দ্রষ্টার গতির সহিত তাঁহার পরিকল্পিত দেশ-কাল-ধর্ম্মের যে নিকট ও নিত্য সম্বন্ধ আছে, এইটিই এই নূতন মতবাদের প্রধান কথা। এই তত্ত্বটি দার্শনিকের কাছে খুব নূতন না ঠেকিলেও ইহাকে স্বীকার করিয়াও যে পদার্থ-বিজ্ঞান সম্ভব হইতে পারে, এই সত্য একেবারে অনায়াসবোধ্য কিংবা স্বতঃসিদ্ধ নয়। ফলতঃ আইনষ্টাইনের পূর্ব্বে কোনো বৈজ্ঞানিকই ইহা সম্ভব বলিয়া ভাবেন নাই। দ্রষ্টানির্ব্বিশেষে যে দেশকালের ব্যবধানের পরিমাণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে সম্ভব এবং ওই পরিমিতির উপর নির্ভর করিয়া গণিতের সাহায্যে জড়বস্তুর অবস্থান ও গতি কিংবা ঘটনার অবসম্পাতের বিষয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা যাইতে পারে, এই বিশ্বাসই বিজ্ঞানের মূলে বর্ত্তমান। কাজেই নিউটন প্রমুখ পূর্ব্বাচার্য্যেরা দেশ-কালের ধর্ম্ম ও মান ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও স্বতঃপ্রতিষ্ঠ, এই কথা স্বীকার করিয়াই পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা করিয়াছেন। দেশ-বোধের জন্য ইউক্লিডীয় জ্যামিতিই তাঁহাদের একমাত্র সম্বল ছিল। দূরত্বের মাপকাঠি যে সকল দ্রষ্টার পক্ষে একই, ইহা তাঁহারা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতেন। গতিভঙ্গে কিংবা স্থান-পরিবর্ত্তনে যে ওই মাপকাঠির কোনো রূপান্তর হইতে পারে, ইহা তাঁহাদের বুদ্ধির অগোচর ছিল।

কালমান যন্ত্রের ধ্রুবত্বের বিষয়ও তাঁহারা একই প্রকারে নিঃসন্দিহান ছিলেন। মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বে ও প্রিন্‌সিপিয়ার গতিবিজ্ঞানে দেশকালের ব্যক্তিনিরপেক্ষতা স্বতঃসিদ্ধভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। দ্রষ্টা বিভিন্ন হইলেও দেশকালের প্রক্ষেপ-ভূমি সকলের পক্ষে একই এবং

তাহার ধর্ম্ম দ্রষ্টার বিশেষত্বের অপেক্ষা রাখে না, এই মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত গণিতশাস্ত্র ও পদার্থবিজ্ঞান প্রায় দুই শত বৎসর সর্ব্বগ্রাহ্য ছিল। যান্ত্রিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রয়োগ-ভূমি বিস্তৃত হইল এবং সর্ব্বত্রই ঈক্ষণ ও গণনার মধ্যে নিত্য সামঞ্জস্য আছে কিনা তাহারই নিরন্তর পরীক্ষা চলিতে লাগিল। ফলে সূক্ষ্ম মানের ক্ষেত্রে পরীক্ষা ও গণনার মধ্যে যে অসঙ্গতি ধরা পড়িতে লাগিল, তাহার নিরাকরণ আর পুরাতন বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব হইল না।

ঊনবিংশতি শতাব্দীর শেষভাগে আলোকতরঙ্গের উপর দ্রষ্টার গতিবৈশিষ্ট্যের কোনো প্রভাব আছে কিনা, এই বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে ও তৎসম্বন্ধীয় নানা প্রকার পরীক্ষার ফলে পুরাতন বিজ্ঞানের সহিত চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার যে অসামঞ্জস্য সকলের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল তাহার নিরাকরণের জন্য আইনষ্টাইন আপেক্ষিক মতবাদের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। পূর্ব্বে আলোকতরঙ্গ-বাহক ঈথর ও তৎসম্ভূত তরঙ্গের স্পন্দনকালই বৈজ্ঞানিকের কাছে নিউটনীয় স্বতঃপ্রতিষ্ঠ দেশ-কালের মূর্ত্ত প্রতীক হিসাবে গণ্য হইত। এই ধারণা যে ভ্রমাত্মক ও উহা যে আলোকবিজ্ঞানের সমস্ত অসামঞ্জস্যের কারণ, ইহা আইন্‌ষ্টাইন্‌ খুব সহজ ও সুন্দরভাবে বুঝাইলেন। দেশকালের নিরপেক্ষবাদ ত্যাগ করিয়াও যে বিজ্ঞানশাস্ত্র সম্ভব, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আইন্‌ষ্টাইন্‌ প্রথম প্রবন্ধে যে বিভিন্নগামী দ্রষ্টাদের পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাদের পারস্পরিক আপেক্ষিক গতির হ্রাসবৃদ্ধি হইতেছে না, ইহা ধরিয়াই তিনি আপেক্ষিকবাদের বিচার আরম্ভ করেন। ওই সময়ে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবকে তিনি গণনার অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। আলোকবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মাধ্যাকর্ষণের কোনো প্রভাবই তদবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। ফলে আপেক্ষিকবাদের প্রয়োগক্ষেত্র উপরোক্তভাবে সীমাবদ্ধ হইলেও যে বিরোধভঞ্জনের প্রয়োজন ছিল তাহা সুসাধিত হইল। অধিকন্তু ওইরূপ নূতন মতবাদের উপর যে বিজ্ঞানশাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন সম্ভব, সে বিষয়েও অপক্ষপাতী বৈজ্ঞানিকের মনে কোনো সন্দেহ রহিল না। আইনষ্টাইন কিন্তু এই সাফল্যেই

সন্তুষ্ট রহিলেন না। আরও দশ বৎসর নিরন্তর পরিশ্রমের ফলে তিনি আপেক্ষিকবাদের প্রয়োগক্ষেত্র প্রভূতভাবে বিস্তৃত করিতে সক্ষম হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিউটনীয় মাধ্যাকর্ষণবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী এক নূতন গতিশাস্ত্রের ভিত্তি তিনি স্থাপনা করিলেন। আপেক্ষিকবাদ পূর্ব্বোক্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আর আবদ্ধ রইল না। সর্ব্বপ্রকার গতিবৈষম্যের ক্ষেত্রেও যে উহা প্রযোজ্য আইন্‌ষ্টাইন্‌ তাহা দেখাইতে সক্ষম হইলেন।

নূতন গতিশাস্ত্রের সহিত নিউটনীয় মতবাদের বিভিন্নতা বুঝিতে হইলে মাধ্যাকর্ষণবাদের কয়েকটি মূল কথা আমাদের স্মরণ করিতে হইবে। নিউটন জড়বস্তুর গতিবৈচিত্র্যের কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য মাধ্যাকর্ষণতত্ত্বের প্রচার করিয়াছিলেন। যে কোনো দুইটি জড়বস্তুর মধ্যে ব্যবধান যত বেশী হউক না কেন, নিউটনের মতে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণী শক্তি বর্ত্তমান। মাধ্যাকর্ষণ-ধর্ম্ম-সম্ভূত ওই শক্তির প্রভাব দূরত্বের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত বিপরীতবর্গ-নিয়মানুসারে বাড়ে ও কমে। তাঁহার বিজ্ঞানে কিন্তু এক বস্তু হইতে অন্যের উপর প্রভাব-প্রবর্ত্তনের জন্য কোনো অসীম বস্তুধর্ম্মী জড়ক্ষেত্রের পরিকল্পনার সুবিধা নাই। অর্থাৎ আলোকবিজ্ঞানের মত মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব তরঙ্গবাদের উপর অবস্থিত নয়। সর্ব্বপ্রকারে বিযুক্ত থাকিয়াও যে জড়বস্তুরা দূর হইতে পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, এই কল্পনা অনেকের কাছে দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যময় বলিয়া মনে হইয়াছিল। মনে হয় নিউটন নিজেও তাঁহার মতবাদকে এইদিক হইতে অসম্পূর্ণ ভাবিতেন। বিদ্যুদ্‌বাহী জড়কণার মধ্যেও এইরূপ আকর্ষণশক্তির কল্পনা নিউটনের পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকেরা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফ্যারাডে ও মাক্স্‌ওয়েল্‌ পরীক্ষা ও যুক্তির সাহায্যে প্রতিপন্ন করিলেন যে এই ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার তরঙ্গাকারে একবস্তু হইতে অন্য বস্তুতে পরিব্যাপ্ত হয়। মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বের এই দূর হইতে প্রভাব বিস্তারের কল্পনা অনেকের কাছে অসন্তোষজনক মনে হইলেও তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কোনো মতবাদ উত্থাপন করিতে আইন্‌ষ্টাইনের

পূর্ব্বে কোনো বৈজ্ঞানিকই সক্ষম হন নাই। এ দিকে গ্রহ উপগ্রহের কক্ষরেখার বৈশিষ্ট্য ও তাহাদের গতিবিধির বৈচিত্র্য এই মতানুসারে সহজ ও সুন্দরভাবে নির্দ্দেশিত হইল। এই তত্ত্বের অদ্ভুত সাফল্য জ্যোতিষ-শাস্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত করিল। কোপার্নিকাস্‌ টলেমিকে নির্ব্বাসিত করিলেন। আধুনিক জ্যোতির্বেত্তারা মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব যে সৌরমণ্ডল অতিক্রম করিয়া অতিদূরবর্ত্তী তারাজগতেও অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান, তাহার পক্ষে ভূরি ভূরি প্রমাণ উপস্থাপিত করিলেন।

মনে রাখিতে হইবে মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বানুমোদিত গতিশাস্ত্রের ভিত্তি ব্যক্তিনিরপেক্ষ দেশকালের পরিকল্পনার উপর নির্ভর করিতেছে। এই পরিকল্পনার পরিবর্ত্তে আপেক্ষিকবাদের প্রচার করিতে গিয়া আইন্‌ষ্টাইন্‌ দেখিলেন নিউটনীয় শক্তি-পরিকল্পনার স্থান তাঁহার প্রবর্ত্তিত নূতন বিজ্ঞানে নাই। কাজেই জড়ের, গ্রহের,তারকারাজির গতিবৈচিত্র্যের ভিন্ন হেতুনির্দ্দেশের প্রয়োজন হইল। দশবৎসরের সাধনার ফলে যে হেতু তিনি আবিষ্কার করিলেন, তাহা উচ্চগণিতের সাহায্য ব্যতিরেকে হৃদয়ঙ্গম করা একরূপ অসাধ্য। কিন্তু পুরাতন মাধ্যাকর্ষণের সাহায্যে যে সব প্রাকৃতিক ঘটনার হেতুনির্দ্দেশ সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটি এই মতবাদের সাহায্যে ভিন্নভাবে বুঝাইতে তিনি সক্ষম হইলেন। ইহার জন্য আইনষ্টাইন ইউক্লিডীয় জ্যামিতিকে বিসর্জ্জন দিয়া রীমান-কল্পিত দেশবোধতত্ত্বের আশ্রয় লইয়াছেন। গণিতের সাহায্যে ব্যক্ত করিতে গেলে বলিতে হইবে জড়ের গতিবৈচিত্র্যের কারণ দ্রষ্টার দেশকালরূপ প্রক্ষেপভূমির অসমতা ও বর্ত্তুলতা।

ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়ে পরিকল্পনা এই মতবাদে সম্পূর্ণ নূতন ও চমকপ্রদ। পুরাতন বিজ্ঞানে ইউক্লিডীয় জ্যামিতিই দেশবোধের একমাত্র অবলম্বন। উক্তমতে ব্রহ্মাণ্ডের প্রসার অসীম ও অবাধ। উহার পরিমাণের কল্পনাও অসম্ভব। আপেক্ষিক মতবাদে কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের প্রসার অবাধ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও উহাকে আর অসীম কিংবা অপরিমেয় বলা চলে না। দেশকালের বর্ত্তুলতা স্বীকার করিলে আইনষ্টাইনের মতানুযায়ী তাহার প্রসারের পরিমাণ করা আর অসম্ভব নয়।

জড়ের গতির ন্যায় আলোকের গতির উপর দেশকালের অসমতা ও বর্ত্তুলতার প্রভাব আছে। কাজেই আলোকরশ্মির উপর তথাকথিত মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব আইনষ্টাইনের মতবাদের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। এই বিষয়ে তিনি গণিতের সাহায্যে যে যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন তাহার প্রায় সব কয়টি আজ বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের মধ্যেই আইনষ্টাইন তাঁহার নূতন গণনার ফল প্রকাশিত করেন। সন্ধিস্থাপনের অব্যবহিত পরে ১৯১৯ সালের সূর্য্যগ্রহণের সময় ইংরাজ জ্যোতির্বেত্তারা এই সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করিয়া অভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করেন। আইনষ্টাইনের বিশ্ব-বিশ্রুত খ্যাতির আরম্ভ ওই সময় হইতেই। সাধারণ সংবাদপত্রে পর্য্যন্ত আইনষ্টাইনের মতের আলোচনার আরম্ভ হইল। অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের মধ্যেও তাঁহার আপেক্ষিকতত্ত্বের স্বরূপ আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি ও কৌতূহল জাগরূক হইল। ফলে আইনষ্টাইনের নাম আজ বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক সকলের কাছেই সুপরিচিত। তাঁহার জীবনী ও ব্যক্তিস্বরূপের বিষয় জানিবার কৌতূহলের আজ অবধি নাই।

সর্ব্বসাধারণের নিকট সুপরিচিত হইবার বহুপূর্ব্বেই তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা বিজ্ঞানবিলাসীদের চমৎকৃত করিয়াছিল। তাঁহার প্রখর ও অলোকসামান্য অন্তর্দৃষ্টির কল্যাণে বিজ্ঞানের অনেক জটিল রহস্যের মর্ম্ম আজ সকলের পক্ষে সহজবোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। আলোকের শক্তিকণা-বাদ—ব্রাউন আবিষ্কৃত অনুবীক্ষণীয় বস্তুকণার অবিরত আন্দোলনের বিজ্ঞানসম্মত হেতুনির্দ্দেশ—ইত্যাদি গবেষণার প্রত্যেকটি আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় ঘটনা। যে মহারথীরা বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার নেতৃত্ব করিতেছেন তাঁহাদের অতি পুরোভাগেই আইনষ্টাইনের স্থান আজ সর্ব্বজনস্বীকৃত।

এই অসামান্য বৈজ্ঞানিকের ব্যক্তিস্বরূপ বুঝিতে হইলে ইউরোপীয় মহাসমরের পর গত কয়েক বৎসরের জাতীয় ও অন্তর্জ্জাতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রের পরিস্থিতির কিছু আলোচনার প্রয়োজন। যাঁহারা মানব-সভ্যতার ভবিষ্যতে আস্থাবান, জাতিনির্ব্বিশেষে মনুষ্যজীবন যাঁহারা

অমূল্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক জাতিরই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার স্বতঃসিদ্ধ অধিকার স্বীকার করিতে যাঁহারা পরাঙ্মুখ নহেন, তাঁহারা বিগত মহাসমরের হিংস্র ও ভয়াবহ সর্ব্বগ্রাসী মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত ও শঙ্কিত হইয়াছিলেন। যে দাবানলে ইউরোপীয় সভ্যতা ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছিল, ভেরসাই-এর সন্ধিতে সে দাবানল নির্ব্বাপণের পর পুনর্ব্বার উহা যাহাতে দ্বিগুণ তেজে প্রজ্জ্বলিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য সকল দেশের প্রকৃত মানবপ্রেমিকেরা উৎসুক ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন। ওই মনোভাব হইতেই আন্তর্জ্জাতিক সমবায়ের উৎপত্তি। প্রত্যেক দেশের শিক্ষিত মানবপ্রেমিকের চেষ্টাতে যে রাজনৈতিক জগতে শান্তি চিরস্থায়ী হওয়া সম্ভব, রোগ, দৈন্য, অন্ধ জাতি-বিদ্বেষ, নৃশংস সামাজিক অত্যাচার ও কলুষতার বিরুদ্ধে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত মানুষের সমবেত চেষ্টা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিরন্তর নিয়োজিত থাকিবে, এই আশা ও ধারণা লইয়াই আইনষ্টাইন জেনীভার বৈঠকে যোগদান করেন। গত কয়েক বৎসরের কাহিনী কিন্তু বড়ই নিষ্করুণ। জাত্যাভিমান, বর্ব্বর সমর-মনোভাব, পরশ্রীকাতরতা, অত্যাচার ও সম্রাজ্যলোলুপতার আশু অবসানের স্বপ্ন দেখিয়া যাঁহারা জেনীভার আন্তর্জ্জাতিক বৈঠককে এক মহামানবীয় সভ্যযুগের সূচনা বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের আজ বড়ই তুর্দ্দিন। বহুবর্ষব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের পর হতাশ হইয়া আইনষ্টাইন ১৯৩২ খ্রীঃ জেনিভার বৈঠকে পুনর্ব্বার যোগদান করিতে অস্বীকার করেন। ১৯৩৩ খ্রীঃ হিট্‌লারের অভ্যুদয়ে জর্ম্মাণীতে ইহুদীবর্জ্জন নীতি প্রচলিত হইলে তিনি নিজের মানসম্ভ্রম সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করেন। স্বধর্ম্মাবলম্বী বহু ইহুদীর ন্যায় আজ তিনি স্বদেশত্যাগী। তাঁহার ন্যায় মন্ত্রদ্রষ্টা বিজ্ঞানসাধককেও আজ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণার ঘূর্ণিবায়ুর মধ্যে পড়িতে হইয়াছে।

আইনষ্টাইনের বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও পত্রাবলী হইতে

৩

সঙ্কলিত হইয়া ১৯৩৩ সালে জর্ম্মাণ ভাষায় Mein Welt-bild * বলিয়া যে পুস্তক প্রকাশিত হয়, The World as I see it তাহারই ইংরাজী অনুবাদ। বিষয়ানুসারে পুস্তকখানি পাঁচভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কীয় প্রবন্ধে প্রায় অর্দ্ধাংশ পূর্ণ। বাকী প্রবন্ধগুলি তাঁহার দার্শনিক মনোভাবের এবং আধুনিক আন্তর্জাতিক,জর্ম্মাণীর ও ইহুদী সমস্যার বিষয়ে মতামতের পরিচয় দিতেছে। প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত। কাজেই বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে মতামতের সুসঙ্গতি সর্ব্ব সময় সুস্পষ্ট না হইলেও সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত প্রত্যেক প্রবন্ধটির মধ্যে লেখককে ভুল বুঝিবার অবকাশ নাই। বর্ত্তমান রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য তিনি যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা সকলের কাছে যুক্তিযুক্ত, অমোঘ কিংবা বিচারসহ বলিয়া প্রতিপন্ন না হইতে পারে। কিন্তু মানবজাতির উপর যে শ্রদ্ধা তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সকলকেই স্পর্শ ও মুগ্ধ করিবে। সমস্ত পুস্তকের মধ্যে বিজ্ঞান-সম্পর্কীয় রচনাগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। ইহার মধ্যে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা, আপেক্ষিক মতবাদের ইতিহাস, বৈজ্ঞানিকের আদর্শ ও গবেষণা-পদ্ধতি ইত্যাদি অনেক বিষয়ের প্রবন্ধই গভীরচিত্ত পাঠকের বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

আপেক্ষিক মতবাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পদ্ধতির বিষয়ে আইনষ্টাইনের মতামতের কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সৃষ্টির অপার রহস্যের ভিতর আমাদের মন যে অনন্ত সৌন্দর্য্যের ও বিশুদ্ধ চৈতন্যের অত্যল্প ও ক্ষীণ সন্ধান পায় তাহার সমগ্র উপলব্ধি মানববুদ্ধির অতীত হইলেও নিরন্তর তাহারই সাধনাই তাঁহার মতে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচায়ক। ব্যক্তিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে সমস্ত জগৎকে বৈজ্ঞানিক অন্ততঃ আংশিকভাবে উপলব্ধি করিতে চায়। এইজন্যই নিজের বুদ্ধি-অনুযায়ী বহির্জগতের হেতুসূত্রে-যোজিত

* The World As I See It—By Albert Einstein (John Lane).

মনোমত প্রতিকৃতি গড়িয়া তুলিতে সে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। এইরূপে হেতুপ্রভব প্রতীকের সাহায্যেই ব্যক্তিত্বের দ্বারা রঞ্জিত ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে অতিক্রম করিয়া সে বহির্জগতের স্বরূপসত্তাকে ধরিতে চাহে। প্রকৃতির প্রত্যেক জটিল তত্ত্বের বিশ্লেষণ মানববুদ্ধির অতীত বলিয়াই ওই প্রতীকের রাজ্যে অপেক্ষাকৃত সরল ঘটনাসমূহের বিকলন ও পুনঃসংযোজনা লইয়াই বৈজ্ঞানিককে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। এই সংযোজন ও বিশ্লেষণ ন্যায়ানুগ ও নির্ভুল হওয়ার প্রয়োজন; এইজন্যই পদার্থবৈজ্ঞানিককে গণিতের রীতি ও পরিভাষার আশ্রয় লইতে হয়। কাজেই অপূর্ণ হইলেও বৈজ্ঞানিকের প্রতীকরাজ্যে অশুদ্ধতা অস্পষ্টতা বা অনিশ্চয়তার স্থান নাই। সমগ্র জাগতিক ঘটনার হেতুনির্দ্দেশ চিরকাল সসীম মানববুদ্ধির অতীত রহিলেও শুধু ন্যায়সঙ্গত বিকলন-প্রথায় প্রত্যেক বাস্তব বা জৈব ঘটনার হেতুনির্দ্দেশ যে সম্ভব, ইহা আইনষ্টাইন বিশ্বাস করেন। যে সামান্য ও চিরন্তন নিয়মাবলী হইতে ন্যায়ের বিকলনপদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক জগতের প্রতিকৃতি গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, তাহাদের আবিষ্কারের কোনো ন্যায়নির্দ্দিষ্ট পন্থা নাই। বহির্জগতের ঘটনাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে উহারা আপনা হইতে বৈজ্ঞানিকের মানস-পটে উদ্ভাসিত হয়। অবশ্য এই নিয়মাবলীর যুক্তিযুক্ততা ও যথার্থতা পরীক্ষা করিবার জন্য আমাদের তৎপ্রসূত ফলাফলকে অভিজ্ঞতার সহিত তুলনা করিতে হয়।

নিউটন প্রমুখ পুরাণ-পন্থী বৈজ্ঞানিকেরা আইনষ্টাইনের মতই কতকগুলি প্রাথমিক স্বতঃসিদ্ধ হইতে বিকলনপ্রথায় জগতের ঘটনাবলীর হেতুনির্দ্দেশ সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই এই ধারণা ছিল যে সঙ্কলন-ন্যায়ানুমোদিত প্রথাতেই প্রাকৃতিক বিশেষ অভিজ্ঞতা হইতে মানুষ ওই স্বতঃসিদ্ধ-গুলি নিষ্কর্ষিত করিয়া লইতে পারে। তাঁহারা অভিজ্ঞতার সহিত স্বতঃসিদ্ধগুলি ন্যায়সূত্রে গ্রথিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহারা আরও বিশ্বাস করিতেন যদৃচ্ছাক্রমে বিভিন্নপ্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ কল্পনা করিয়া বিশ্ব-জগতের হেতুনির্দ্দেশে সাফল্য লাভ করা অসম্ভব। এই মতের

স্বপক্ষে উদাহরণস্বরূপ তাঁহারা ইউক্লিডীয় জ্যামিতি ও নিউটনীয় গতিশাস্ত্রের উল্লেখ করিতেন। বৈজ্ঞানিকদের উক্ত ধারণাকে আপেক্ষিকবাদ ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। আপেক্ষিকবাদের স্বতঃসিদ্ধগুলি পুরাতন গতিশাস্ত্রের প্রত্যয়সমূহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হইলেও একই শ্রেণীর ঘটনার হেতুনির্দ্দেশ এই মতেও সন্তোষজনক ভাবে সম্ভব। কাজেই যে প্রাথমিক সংজ্ঞা ও প্রত্যয়গুলির উপর বিজ্ঞানশাস্ত্র গড়িয়া উঠে মানুষের অভিজ্ঞতার সহিত সেগুলির ন্যায়গত কোনো নিত্যসম্পর্ক নাই।

এই মত কিন্তু নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। যে প্রত্যয় ও সংজ্ঞার সংযোজনা হইতে বৈজ্ঞানিকের প্রতীকজগৎ গড়িয়া উঠে, তাহার সহিত মানব-অভিজ্ঞতার যদি ন্যায়সঙ্গত নিত্যযোগ না থাকে, প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে স্বাধীন কল্পনা করিবার অধিকার যদি স্বীকার করা যায়, তবে কি ভাবিতে হইবে বৈজ্ঞানিকের কল্পিত জগতের প্রতিকৃতির সহিত বাহ্য জগতের কোনো সম্পর্কই নাই। হেতু-প্রভব প্রতীকের সাহায্যে বহির্জগতের স্বরূপসত্তার উপলব্ধির চেষ্টা তবে কি মানবের ব্যর্থ-প্রয়াস মাত্র? লোকযাত্রার উপযোগিতাই কি তবে বিজ্ঞানের শেষ কথা?

আইনষ্টাইন উহা বিশ্বাস করেন না। ন্যায়ানুগত যোগসূত্র না থাকিলেও কোনো অজ্ঞেয় উপায়ে বহির্জগৎ আমাদের প্রতীকজগতের প্রত্যয় ও স্বতঃসিদ্ধগুলিকে অদ্বিতীয়ভাবে সুনির্দ্দিষ্ট করিতেছে, ইহাই আইনষ্টাইনের দৃঢ় বিশ্বাস। সেই অদ্বিতীয় নিয়মাবলীকে আবিষ্কার করা যে মানুষের পক্ষে সম্ভব তাহাও তিনি বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন যে বাহ্যপ্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ ও ঘটনার অন্তর্নিহিত নিত্যসম্পর্কসমূহকে আমরা গণিতের অপেক্ষাকৃত সরল প্রত্যয়ের অনুসারেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। কিন্তু সেই প্রত্যয়গুলিকে ন্যায়পথে পাওয়া যাইবে না। তাহাদের আবিষ্কারের জন্য আমাদিগকে আন্তরিক অনুপ্রেরণার উপর নির্ভর করিতে হইবে। অভিজ্ঞতার ফলে যে প্রত্যয়গুলির সম্ভাব্যতার কথা আমাদের মনোমধ্যে উদিত হইবে, তাহাদের সংযোজনার ফলাফলের সহিত বাহ্য জগতের প্রকৃতির তুলনা করিয়া বুঝিতে হইবে আমরা যথার্থ

প্রত্যয়গুলির সন্ধান পাইয়াছি কিনা। শুদ্ধ প্রত্যয় অবলম্বনে গাণিতিক উপায়ে যে বিজ্ঞান-শাস্ত্র আমরা রচনা করি তাহা শুদ্ধ ও অন্তর্বিরোধ-শূন্য। তাহাতে দ্ব্যর্থবোধের অবকাশ না থাকিলেও তাহার সহিত বহির্জগতের কোনো নিত্য সম্বন্ধ নাই। ফলতঃ উহা বস্তুসার-শূন্য সংযোজনা মাত্র। উহার প্রত্যয়গুলির সহিত বহির্জগতের বস্তুসত্তার যথাযথ সম্পর্ক আরোপ করিয়া আমাদিগকে দেখিতে হইবে ঐ বিজ্ঞানের অনুসারে বহির্জগতের ঘটনাবলীকে আমরা বুঝিতে পারি কিনা।

আপেক্ষিকবাদ-আবিষ্কার-ব্যপদেশে তাঁহার বিভিন্ন চেষ্টার উদাহরণ দিয়া আইনষ্টাইন বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে উপরোল্লিখিত উপায়ে বহির্জগতের স্বরূপ উপলব্ধি করার চেষ্টা নিষ্ফল ও আকাশকুসুম মাত্র নয়।

আইনষ্টাইন যে পূর্ব্বগামী আচার্য্যদের মতই বহির্জগতের নিরপেক্ষ অস্তিত্বে ও হেতুপ্রভব বিজ্ঞানের সম্ভাব্যতায় বিশ্বাসী, তাহা উপরের আলোচনা হইতে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। পদার্থ-বিজ্ঞানে নবতম সমষ্টিবাদের ফলে আজকাল অনেকেই হেতুবাদের উপরে বিশ্বাস হারাইয়াছেন। ফলে ঘটনার অবশ্যম্ভাবিতার পরিবর্ত্তে তাহার সম্ভাবনার আলোচনাই বিজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। এই নবমতবাদ অণুপরমাণুরাজ্যের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হইলেও ভবিষ্যতে বিজ্ঞানে যে হেতুবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইবে ইহাই আইনষ্টাইনের দৃঢ় বিশ্বাস। সেই প্রতিষ্ঠার আয়াসেই তাঁহার সাধনা ও পরিশ্রম সমগ্রভাবে নিয়োজিত।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে দুচারটি কথা

যাঁরা যন্ত্রসঙ্গীত ভিন্ন অন্য সব সঙ্গীত অশুদ্ধ, অতএব হেয় বিবেচনা করেন, তাঁদের জন্য এই প্রবন্ধ লিখ্‌ছিনা, যাঁরা মনে করেন যে হিন্দু সঙ্গীতের ইতিহাস অবনতির ইতিহাস তাঁরা আমার প্রচেষ্টাকে কৃপার চক্ষেই দেখবেন, অতএব প্রতিদানে তাঁদেরকে কোনো অনুরোধ পর্য্যন্ত করতে সাহস হয় না। যাঁরা বলেন, দেশে বাঙলা গানেরই ভবিষ্যৎ আছে, হিন্দুস্থানী ঢঙ্‌ অচল কিংবা হিন্দুস্থানী গানই চলবে, বাঙলা গানের আয়ু দুদিনেই শেষ হবে,—তাঁদের কোনো প্রবন্ধই আদ্যোপান্ত পড়ার প্রয়োজন হয় না। তাঁদের দিব্য চক্ষুতে সমগ্র ভবিষ্যতের আভাস সুস্পষ্ট।

আমি লিখছি তাঁদের জন্য যাঁদের ইতিহাসের যুক্তির ওপর বিশ্বাস আছে, সঙ্গীতে কথাকে সাপের বিষের মত নেই নেই করে উড়িয়ে দিতে চান না, এবং হিন্দুস্থানী সুরপদ্ধতিটাই বাঙ্‌লা অঞ্চলের ধ্রুবপদ্ধতির ভূমিকা মানেন, এবং তুলনামূলক বিচারে বুদ্ধি এবং ঘটনাকেই প্রধান করেন। মূল্যদান সম্বন্ধে আমি পাঠকবর্গকে শ্রীবৎস চিন্তার গল্পটি স্মরণ করাতে চাই। মূল্যদানের পূর্ব্বে মিল-গরমিল দুধারেই সমান নজর রাখতে হবে। তুলনার ক্ষেত্রটি যদি সমান না হয়, তবে তুলনাটি হবে সংস্কারকেরই সংস্কার। টাকাকে আনা দিয়ে ভাগ দেবার পূর্ব্বে তাকে আনাতে পরিণত করে পঞ্চম শ্রেণীর বালক, কিন্তু হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ভাল না বাঙলা গান ভাল আলোচনা করবার সময় এই বালকসুলভ ফন্দীটি বয়স্কেরাও ভুলে যান। তাঁদের দোষ নেই, কারণ, বড়-ছোট, আগে-পিছে, জয়-পরাজয় ইত্যাদির বিচারকেই শিক্ষা বলা হয়। প্রকৃতিগত পার্থক্য, পরিপ্রেক্ষিতের ভেদ, পরিণতির হারের বৈষম্য বোঝবার পক্ষে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি একটি প্রধান অন্তরায়। কিন্তু প্রকৃত তুলনা ও মূল্যবিচার আমাদের করতেই হবে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-সমালোচনার জন্য তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী সময়কার

বাঙলা দেশে উচ্চ সঙ্গীতের ইতিহাস জানা চাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে ইতিহাস কেউ লেখেননি। আমরা কেবল জানি যে বাঙলা দেশে ধ্রুপদের ও টপ্পার যতটা প্রচলন হয়েছিল, খেয়াল ঠুংরীর ততটা হয়নি। কৃষ্ণধন বাবু যন্ত্রকেই সেজন্য দায়ী করেছেন। তাঁর মত আংশিক ভাবে সত্য। কারণ, তারের যন্ত্রের প্রভাব সুবিস্তৃত থাকলে কণ্ঠসঙ্গীতে শ্রুতির প্রাধান্য ধরা পড়ত; এবং বাঙালী গায়কের কণ্ঠ শ্রুতিশুদ্ধ ছিল কেউ বলেননি, অন্ততঃ থাকলে অত সহজে হারমনিয়মের কৃপায় কণ্ঠের সর্ব্বনাশ হত না। কিন্তু উপযুক্ত সঙ্গতের জন্যই ধ্রুপদকে আমরা সহজে গ্রহণ করতে সমর্থ হই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে গোলাম আব্বাস নামে একজন বিখ্যাত পাখোয়াজী বাঙলা দেশে এসে বসবাস আরম্ভ করেন, তাঁর দু'জন বিখ্যাত শিষ্যের নাম নিতাই ও নিমাই চক্রবর্ত্তী। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের ভাই কেশব মিত্র এবং ঝামাপুকুরের মুরারি গুপ্ত মহাশয় তাঁদেরই ঘরোয়ানা। বিংশ শতাব্দীর প্রায় সব শ্রেষ্ঠ বাঙালী পাখোয়াজীই কেশব বাবু ও মুরারি বাবুর শিষ্য। নগেন বাবু, দুর্লভ বাবু, দীন হাজরা প্রভৃতি বাদক সেদিন পর্য্যন্ত বাঙলা দেশে ধ্রুপদের মর্য্যাদাদানে সহায়তা করেছেন।

এদেশে ধ্রুপদের প্রচলনের অন্য কারণ বোধ হয় লোক-সঙ্গীতের উন্নতি। অন্যান্য প্রদেশে লোকসঙ্গীত বরাবরই ছিল—কিন্তু আমাদের কীর্ত্তনের মতন উৎকর্ষ লাভ করেনি। কীর্ত্তনের সুর ও তালের বৈচিত্র্য হয়ত হিন্দুস্থানী পদ্ধতির সংঘাতেই সৃষ্ট। তবু ভজনের গায়কী অপেক্ষাকৃত একঘেয়ে লাগতে পারে, একথা প্রাদেশিক হিংসার যুগে ধ্রুবপদ্ধতির জন্মভূমিতে অ-বাঙালীরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। লোকসঙ্গীতের প্রভাবের সঙ্গে ধ্রুপদ-প্রচলনের যোগ আছে। সে যোগ আন্তরিক। লোকসঙ্গীতে তানের অভাব, ধ্রুপদে তান নেই; লোকসঙ্গীত অর্থমূলক, অর্থও আবার সাধারণতঃ আধ্যাত্মিক, রূপ তার কবিতার, রস তার অনুভূতির; অন্য ধারে পুরাতন ধ্রুপদের অর্থ তখনও উচ্চারণ বিভ্রাটে অস্পষ্ট হয়নি, রচনাগুলি ছিল সাধারণতঃ ধর্ম্মভাবাপন্ন, কাব্যাংশও তার হেয় ছিল না। তা ছাড়া, কথার গায়কী উচ্চারণ পদ্ধতিতে খেয়ালিয়ার অপেক্ষা

ধ্রুপদিয়ার সঙ্গে বাউল কীর্ত্তনিয়ার মিল নিবিড়তর। লোকসঙ্গীতে অন্তের স্বরবর্ণ টেনে এবং দম ছেড়ে গাওয়া হয়, তাই গানের পক্ষে বাঙলা ভাষার স্বাভাবিক অনুপযোগিতা শ্রোতা ততটা অনুভব করতে পারে না। খেয়ালে কথার যেখানে ফাঁক, সেইখানেই তান চলে, এবং তানের জন্য স্বরবর্ণের প্রয়োজন। উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদ ব্রজভাষায় রচিত হত, সে ভাষার সঙ্গে ব্রজবুলি কিংবা পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার গরমিল যথেষ্ট থাকলেও অন্ততঃ দুটি একটি বিষয়ে, যেমন যুক্তবর্ণের ও স্বরবর্ণের ব্যবহারে কিছু মিল পাওয়া যায়। এই মিলনই গায়কের অবলম্বন। পরে এই বিষয়ে আলোচনা করব। ভাষা বাদ দিলেও লোকসঙ্গীতের ঋজুতা, গাম্ভীর্য্য, ঐশ্বর্য্যহীনতা, সরলগতি, সংযম, অন্তর্মুখিনতা ধ্রুপদকে যতটা স্মরণ করায় খেয়ালকে ততটা করায় না। এই প্রকার মিলের জন্য বাঙলা দেশে ধ্রুবপদের প্রচলন খেয়াল অপেক্ষা সহজ হয়। বলা বাহুল্য, সব অঞ্চলের কীর্ত্তন সমান ভাবে সহজ নয়। এমন কীর্ত্তনও শুনেছি যার ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে চিত্তরঞ্জন এভিনিউএর স্থাপত্যেরই তুলনা চলে।

যাঁরা সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় আস্থা রাখেন না, তাঁরা নামের ভক্ত। অবশ্য নামগুলি ইতিহাসের রাস্তায় স্তম্ভের মতন। বিষ্ণুপুরে অনেকদিন পূর্ব্বেই হিন্দুস্থানী পদ্ধতি এসেছিল। কারণ ছিল ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক। বিষ্ণুপুরের স্বাধীন রাজা বৈষ্ণব হবার পরেই সেখানে সুকুমার শিল্পের একটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে। কিন্তু বেহার অঞ্চল থেকে উড়িষ্যা যাবার পথে বিষ্ণুপুর পড়ে, সেইজন্য বিষ্ণুপুরে কেবল কীর্ত্তনের চলন হল না, উত্তর প্রদেশের মুসলমানোচিত প্রকর্ষের প্রভাব সেখানে স্বীকৃত হল। কীর্ত্তন ছড়িয়ে পড়ল বাঁকুড়ায়, এবং বাহাদুর খাঁ বিষ্ণুপুরে ধ্রুবপদ্ধতি শেখাতে আরম্ভ করলেন। তানসেনের বংশধর জ্ঞান খাঁ, প্যার খাঁ ও জাফর খাঁর মত বিখ্যাত গায়কের ঘরোয়ানা বেহার-অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। বেথিয়া তখন বাঙলার অন্তর্গত ছিল বলা যায়। বাঙলা দেশে উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশের ধ্রুপদগান বেথিয়ায় দান। মহারাজ নওয়লকিশোর ও আনন্দকিশোর উৎকৃষ্ট

রচয়িতা ছিলেন। রাধিকাবাবুর গুরু গুরুপ্রসাদ মিশ্র এবং তাঁর ভাইএরা কাশীর লোক হলেও বেথিয়া থেকে কলকাতায় আসেন। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক জমিদারবর্গ ধ্রুপদিয়া পালন করতেন। গোবরডাঙ্গার গঙ্গানারায়ণ বাবুই সর্ব্বপ্রথম পশ্চিমাঞ্চল থেকে মুসলমান ওস্তাদের নিকট ধ্রুপদ ও খেয়াল শিক্ষা করে দেশে ফেরেন। এই সময় রাণাঘাট, শ্রীরামপুর ও পানিহাটী প্রভৃতি গঙ্গার উপকূলস্থ গণ্ডগ্রামে ধ্রুপদ গানের মর্য্যাদা ছিল। মৌলাবক্‌সও এই সময় কলকাতায় আসেন এবং বাঙলাদেশ পর্য্যটন করেন। পূর্ব্বোক্ত কারণে বাঙলা দেশে ধ্রুপদের প্রচলন হয়। রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে ও নিকটস্থ যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরদের বাড়িতে যে সব বিখ্যাত ধ্রুপদিয়ার সমাগম হত, তাঁদের মধ্যে মৌলা বক্‌স, যদুভট্ট, বিষ্ণুভট্টই সর্ব্বপ্রধান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উচ্চ-সঙ্গীতের একজন মনোযোগী ছাত্র ছিলেন। তিনি রাগ-রাগিণী পিয়ানোতে বাজাতেন এবং সুরের মিশ্রণ ও বিস্তার নিয়ে নানারকমের পরীক্ষা করতেন। পিয়ানোতে তান বিস্তার কিংবা আলাপ সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথকে বাল্যকাল থেকেই সেই সব পরীক্ষায় সহায়তা করতে হত, উপযুক্ত কথা জোগান দিয়ে। বলা বাহুল্য, বাড়ির আবহাওয়ায় ছিল সংযত স্বাধীনতা এবং সুগম্ভীর ধর্ম্মভাব, যেটি ধ্রুপদের অনুকূল। অতএব বলা চলে উচ্চসঙ্গীতের মধ্যে ধ্রুপদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ।

ধ্রুপদের চিহ্ন কি? প্রায় প্রত্যেক ধ্রুপদ গানেই চারটি তুক কিংবা পদ থাকে। অলঙ্কারের মধ্যে মীড়, গমক ও আশই ব্যবহৃত হয়। ধ্রুপদের রূপ নির্দ্দিষ্ট। আলাপের পর অস্থায়ী গেয়ে অন্তরা গাইতে হয়, বাকী দুইটি তুক বা পদ প্রায় অস্থায়ী ও অন্তরারই পুনরাবৃত্তি। তান চলে না ধ্রুপদে। তালের মধ্যে চৌতাল, আড়া চৌতাল, তেওরা, ঝাঁপ, সুরফাক্তা, পঞ্চমশোয়ারির ব্যবহারই প্রশস্ত। কিন্তু ধ্রুপদে তালের বাহাদুরী দেখান অন্যায়। গানের শেষে যৎসামান্য বাটোয়ারা, আড়ি, দেড়ি, কুয়াড়ি, বিসম, অনাঘাত দেখালেই যথেষ্ট হয়। ধ্রুপদের বিষয় হল ধর্ম্ম, প্রকৃতির বর্ণনা ও রাজার গুণগান। তার গতি গজের,

যেমন সর্পগতি হল ধামারের। ধ্রুপদের রস শান্ত ও গম্ভীর—বাহুল্য-বর্জ্জিত। তার ঐশ্বর্য্য অন্তরের। যাঁর কণ্ঠে তান অজস্র, স্বর কম্পমান, যাঁর স্বভাবে সংযম নেই তাঁর পক্ষে প্রকৃত ধ্রুপদী হওয়া অসম্ভব। ধ্রুপদের চার প্রকার বাণী আছে। তার মধ্যে ডাগুরবাণী ও গোবর বাণী বেশী চলে। খাণ্ডারবাণী কিংবা গহরবাণী গাওয়া অত্যন্ত শক্ত। যাঁদের এই কয়প্রকার বাণী শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরা জানেন যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে voice-production বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। কিন্তু ধ্রুপদ গানের বিষয়ে বৈচিত্র্য কম, তার রচনার ভাষায় কথা বেশী ও কথাগুলি চতুষ্কোণ কাষ্ঠখণ্ডের মতন, অতএব তার গায়কী রীতিতে স্বাধীনতাপ্রকাশের সুযোগ খেয়াল এবং ঠুংরী অপেক্ষা কম সকলেই স্বীকার করেন।

আজকাল অনেকের মুখে শোনা যায় যে খেয়াল ও ঠুংরীতে গায়কের নিজের কৃতিত্ব দেখাবার স্বাধীনতা আছে। বলা বাহুল্য, উচ্চ শ্রেণীর খেয়াল ও ঠুংরীর রচনায় সুরের বিকাশ অনিয়ন্ত্রিত নয়। কোন্ তানের পর কোন্‌টি আসা চাই তার নিয়ম আছে, সে কথা ভাল ঘরোয়ানার গান শুনলেই বোঝা যায়। তা ছাড়া খেয়ালের তান রাগিণীর আশ্রয়ে, তার মূল প্রকৃতির অবলম্বনেই তান ফুটতে পারে সব ভাল খেয়ালিরাই জানেন। ঠুংরীতে এই তানবিস্তারপদ্ধতির ওপর আছে নায়ক-নায়িকা ও তাঁদের মেজাজ। খেয়াল-ঠুংরীতে তানের স্বাধীনতা যে যথেচ্ছাচারিতা নয় বলাই বাহুল্য।

মোদ্দা কথা এই—রবীন্দ্রনাথ শিশুকাল থেকে সংযত সঙ্গীতেই পরিপুষ্ট। তাঁর প্রতিভা অল্প বয়সেই বিকশিত হয়। তাঁর মতন ব্যক্তির এই প্রকার শিক্ষাদীক্ষায় এবং ঐ প্রকার বেষ্টনীতে যা করা সম্ভব তাই তিনি করেছিলেন। তিনি ধ্রুপদের গুণগ্রহণ করলেন, গমকের হুঙ্কার ত্যাগ করলেন এবং বৈচিত্র্য আনলেন। আধার, বাঙলা ভাষা। তাঁর বৈচিত্র্যসাধনের উপায় একাধিক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষা-নবিশীর কাল তখন উত্তীর্ণ হয়েছে, তিনি আর সুরে কথা বসাচ্ছেন না। রাধিকাপ্রসাদ তখন আদিব্রাহ্ম সমাজের গায়ক। রবীন্দ্রনাথ কবিতার

উপযুক্ত সুর খুঁজতেন রাধিকাপ্রসাদের কণ্ঠে। তখন তিনি কবি এবং সুরের প্রযোজক মাত্র; অর্থাৎ কথায় সুর বসানোই ছিল তাঁর সমস্যা। এই যুগের তাঁর অনেক রচনা এখনও ওস্তাদের মুখে শোনা যায়। তাঁরা বলেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আজকাল পতন হয়েছে। তাঁদের মন্তব্য বিচার করলে হয়ত পূর্ব্ব-পরিচয়ের আনন্দটুকুই ধরা পড়বে। "সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি" শুদ্ধ ইমন্‌কল্যাণ, অতএব গানটি ভাল— এক্ষেত্রে শুদ্ধতার অর্থ পুনরাবৃত্তি, যথাযোগ্যতা গৌণ—যদিও স্বীকার করি এ যুগে বেশীর ভাগ গানেই সুর ছিল কবিতার উপযুক্ত। কিন্তু এ যুগের রচনা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—কথা ও ভাবের উপযোগী না হলেও সুরটা যদি সঙ্গীতজ্ঞ শ্রোতার মনে কোনো বিখ্যাত হিন্দুস্থানী গান স্মরণ করাতে সমর্থ হত, যদি সুরটা হুবহু তার নকল হত তা হলেই শ্রোতা সন্তুষ্ট হতেন। অতএব কেবল উপযোগিতা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই যুগের গানকে যাচাই করা যায় না। করলে পরে তাঁর ক্রম-বিকাশকে শ্রদ্ধা দেখানো হয় না। অথচ উপযোগিতাই সঙ্গীত-রচনা ও রচয়িতার মূল্য নির্দ্ধারণ করবে।

উপযোগিতার অর্থ হ'ল এই—কথা ও সুরের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তাকে স্বীকার করা, তার প্রকৃতি উদ্‌ঘাটিত করা এবং সেই প্রকৃতির রূপ দেওয়া। তদ্‌ভিন্ন কবিতার মূল ভাবটির সঙ্গে আমাদের সংস্কারগত রাগিণীর মূল ভাব কিংবা মূর্ত্তির মিলন-সাধনকেও উপযোগিতা বলা হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। কবিতাটি মেঘলা দিনের বর্ণনা, তার মধ্যে মেঘ, বিজলী, ময়ূর, হানা প্রভৃতি গুরুগম্ভীর কথা রয়েছে। আমাদের সংস্কারে মল্লারের সঙ্গে বর্ষার যোগ আছে। এমনও শুনতে পাই,—অমুক ওস্তাদ মল্লার গেয়ে শীতকালে বৃষ্টি আনলেন। অতএব কবিতাটির প্রকৃষ্ট মিলন হবে মল্লারের সঙ্গে। কিন্তু এই প্রকার মিলন-সাধনের কোনো সাঙ্গীতিক মূল্য নেই। কথা ও সুরের মধ্যে সম্বন্ধকে প্রকাশ করাই যদি সমস্যা হয় তবে তাদের মধ্যে গোটা কয়েক সন্ধিসর্ত্ত থাকা চাই। সন্ধির সর্ত্ত তৈরী করবার সময় মনে রাখতে হবে বাঙলা কবিতার ভাষা, অর্থ, ছন্দকে, বাঙলা দেশের প্রচলিত গায়কী-পদ্ধতিকে।

সন্ধি কখনও একতরফা ডিক্রী নয়, পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানই তার বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ, প্রত্যেককেই সন্ধির সময় কিছু না কিছু ছাড়তে হয়। ছাড়বার সময় পাবার প্রত্যাশা থাকেই থাকে। ঐ যুগের রবীন্দ্র-সঙ্গীতে পাওয়া গেল সুরের মিশ্রণ, বিষয়ের বৈঁচিত্র্য, এবং আশের আধিক্য। মীড় রয়েই গেল —বিদেশী সঙ্গীতের হারমনিক্‌স্‌ এবং যন্ত্রসঙ্গীতের অলঙ্কারের পরীক্ষা সফল হল না। ছাড়া হল, রাগ-রাগিণীরও ব্রজভাষার যতটা শুদ্ধতা তখন ছিল তাকে এবং সেই সঙ্গে তার পাশে যে সংস্কার গড়ে উঠেছিল তাকেও। সুরের মিশ্রণ সম্বন্ধে কেবল এইটুকু বললেই চলবে যে, তাঁর প্রদত্ত সুরে গুরুচণ্ডালী দোষ বর্ত্তায়নি। অনেক বড় ওস্তাদ্‌ এই বিষয়ে তাঁর চেয়ে অনেক বেশী পাপী। ইমন-বেলাওল, ভৈরোঁ-বাহারের গান অনেক বাঙালী যুবক আজকাল গেয়ে থাকেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুর-সৃষ্টির সম্বন্ধে কিছু লিখছিনা—অতএব সুর ও কথার সন্ধি-সর্ত্তে ফিরে যাওয়া যাক্‌।

বাঙলা ভাষায় স্বরবর্ণের যে বৈশিষ্ট্যগুলি সঙ্গীতালোচনার পক্ষে জানা প্রয়োজনীয় সেগুলিকে নিম্নলিখিত চারটি মন্তব্যে প্রকাশ করা যায়।

(১) অর্থ পরিবর্ত্তনে স্বরবর্ণের হ্রস্বতায় বা দৈর্ঘ্যে কোনো তারতম্য ঘটেনা—যেমন দিন, দিনকাল ও দীন-দুঃখী একই উপায়ে উচ্চারিত হয়।

(২) যে নিঃশ্বাসটুকু নিয়ে বাক্যারম্ভ করা যায় তার ঝোঁকে যত কথা উচ্চারিত হতে পারে তারাই একটি সমষ্টি হিসেবে বিবেচিত হয়।

(৩) বাঙলা উচ্চারণের ঝোঁক পড়ে সাধারণতঃ এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত বাক্যের বা বাক্যাংশের প্রথম শব্দে। এ ছাড়া অর্থভেদেও ঝোঁক পড়তে পারে। অন্য কোনো বাধা না থাকলে হসন্তবর্ণের পূর্ব্ব বর্ণও ঝোঁক দিয়ে উচ্চারিত হয়।

(৪) ক্রিয়াপদ বাদ দিলে বাংলা শব্দ স্বরান্ত নয়, হসন্তান্ত।

ব্রজ ভাষায়, যে ভাষায় ধ্রুপদ রচিত হত তার স্বরবর্ণের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন প্রকৃতির। তার স্বরোচ্চারণরীতিতে অর্থের পরিবর্ত্তনে তারতম্য

ঘটে। যেমন দিন ও দীনদয়াল। তার ঐক্য কথাগুচ্ছে আবদ্ধ, শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়মে নয়। তাতে উচ্চারণের জোর দেওয়া হয় উপান্ত স্বরবর্ণে।

দুটি ভাষার স্বরবর্ণের ব্যবহারে যদি মোটামুটি ঐ ধরণের পার্থক্য থাকে তবে রবীন্দ্রনাথের রচিত বাঙলা গানে স্বরবর্ণের বৈচিত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়েছিল স্বীকার করতে হবে। অন্ততঃ, আ-কারের বেলা ত বটেই। (ধরা যাক রাখাল, কিংবা মাতাল কথাটি। ব্রজভাষার নিয়মানুসারে প্রথম স্বরবর্ণ ছোট হয়ে এবং শেষেরটি দীর্ঘতর হয়ে রাখাল রাখোয়াল-এ, এবং মাতাল মাতোয়ালায় পরিণত হল।) বাংলা গানে স্বরবর্ণের স্বাভাবিক সঙ্কোচে ক্ষতি হল তানের, কারণ সাধারণতঃ খেয়ালে প্রথম স্বরবর্ণের আশ্রয়ে তান নেওয়া হয় না, শেষের ও উপান্ত স্বরবর্ণেই নেওয়া হয়। কিন্তু ধ্রুপদে সে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, কারণ তানের ব্যবহার নেই সেখানে, অতএব বাংলা ধ্রুপদ রচনা অপেক্ষাকৃত সচল—বাংলার স্বাভাবিক গাঢ় সম্বদ্ধতা ততটা মারাত্মক নয় ধ্রুপদে যতটা মারাত্মক বাঙলা খেয়ালে। স্বরবর্ণসঙ্কোচের জন্য যে ক্ষতি হয় বাঙালী গায়ক তার পূরণ করেন 'য়' দিয়ে, যেমন 'মা আমার' কথা-দুটির মধ্যকার অবকাশ অতিক্রান্ত হয় 'মা-য়-আমার' glide-এর দ্বারা।

বাঙলা ভাষার breath-group ধ্রুবপদী অলঙ্কারের নিতান্তই অনুকূল, কিন্তু খেয়ালের প্রতিকূল। মীড় ও গমক স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের বিরামের উপযোগী। বাঙলা ভাষা যে কালে আমাদের মাতৃ-ভাষা তখন আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথার অর্থ আমাদের মনে আসবেই আসবে। গান যখন কবিতাতেই লেখা হয়, তখন উচ্চারণ স্পষ্ট করতেই হবে। ব্রজভাষার অর্থ আমরা বুঝিনা, তাই তার শুদ্ধবাণীর দায়িত্ব বাঙলার অপেক্ষা কম। কম বলেই অবশ্য সুর উপভোগের সুবিধা। অতএব একধারে যেমন ক্ষতি অন্যধারে তেমন সুবিধা। সুতরাং দেখা গেল যে বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েই ধ্রুপদের আড়ষ্টতা কমে যায়, বৈচিত্র্যের অবসর পাওয়া যায়। কিন্তু ধ্রুপদাঙ্গের বাঙলা গান রচনা করে রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। নানা

বিষয়ে তিনি গান রচনা করতে লাগলেন, সবগুলি কিছু ধ্রুপদাঙ্গের হতে পারে না। তাঁর রচনায় নানা প্রকারের মনোভাবের, mood-এর প্রকাশ হতে লাগল। এখন সমস্যা উঠ্‌ল সেই সব বিচিত্র রচনার উপযুক্ত সুর দেওয়া নিয়ে।

এইখানে বাংলা ছন্দের আড়ষ্টতা ও একঘেয়েমি কি ভাবে রবীন্দ্রনাথ ভাঙলেন, আমাদের জান্‌তে হবে। পুরাতন ছড়া বাদ দিলে বলা চলে যে বাঙলায় পয়ারেরই রাজত্ব ছিল। পয়ার ভাঙলেন ভারতচন্দ্র মাত্রাবৃত্ত ছন্দ দিয়ে। তবু বাংলার ঠাস্‌বুনানি হাল্‌কা হল না, কারণ যুগ্মশব্দ গাঁটের মতন। রবীন্দ্রনাথ এসে যুগ্মবর্ণকে দু মাত্রায় ব্যবহার করলেন। এতদিনে বাঙলা ছন্দ স্বাধীন হল, কারণ শব্দের মধ্যকার অবসরটুকু ধ্বনিতে বিস্তারিত হয়ে মাত্রাগোণার দাসত্ব দিলে ঘুচিয়ে। এই অবসরটুকু দীর্ঘ নয়, অতএব তাকে দীর্ঘ তানকর্ত্তব দিয়ে ভরাট করা যায় না, জোর তার মধ্যে আশ ব্যবহার চলে। মীড় ও আশের সাহায্যে কবিতার রূপ অনেকটা ফুটে উঠতে পারে। যতটা পারে ততটাই এই যুগের রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সার্থকতা।

তবু কাব্যছন্দের দাসত্ব গেল না। পরের যুগে কথা ও সুর সমস্তরের। "তিমির অবগুণ্ঠনে" গানটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে কথা ও সুরের সন্ধি-সর্ত্তগুলি বিজেতা-পরাজিতের নয়, মিত্র-মণ্ডলীর। মিত্রও একাধিক, কারণ "কে তুমি"-তে বিস্ময়-ভাবটিও চমৎকার ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের সকল গানেই এই প্রকার সুর, কথা ও ভাবের অঙ্গাঙ্গি মিলন দেখা যায় বলছি না, কিন্তু বিস্তর রচনায় সম্পূর্ণ মিলনের সাক্ষাৎ পাই। সেই সব রচনাগুলি আমাদের সমস্যা-পূরণের সার্থকতার পরিমাণ দণ্ড হবে।

অতএব বোঝা গেল রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান কেন নেই। বাঙলা ভাষায় লেখা সঙ্গীতে তানের সুযোগ কম। লেখক আবার ধ্রুপদে অভ্যস্ত। ততটুকু তান সম্ভব যতটুকুর সুযোগ breath-groupএর শেষে, অর্থের ইঙ্গিতে এবং ছন্দ-বৈচিত্র্যে পাওয়া যায়। তার বেশী তান দিলে রাগিণীর বিকাশ হয়ত হবে, কিন্তু ভাষা, ছন্দ, অর্থ ও

সুরের ভারসাম্য নষ্ট হবে—অর্থাৎ সঙ্গীত হবে না। আমার বক্তব্য এই—তানের উদ্দেশ্য আর সঙ্গীতের উদ্দেশ্য এক নয়। তান সুরের একপ্রকার অভিব্যক্তি—সেটি রাগিণীর রূপ-উদ্‌ঘাটনের ইতিহাস; সঙ্গীত হল পরিপূর্ণ সামগ্রী, ইতিহাসের দিক্‌টা তার মুখ্য নয়। তান সুরের একপ্রকার অলঙ্কার, যেটি সুরের ওপর বসাচ্ছেন গায়ক স্বয়ং। সঙ্গীতের অলঙ্কার প্রধানতঃ শ্রোতার মনে। তানে চাই স্বরবর্ণের দীর্ঘ অবসর, সঙ্গীতের অবসর গাওয়ার পর, রেশে। তা ছাড়া, বাঙলা সঙ্গীতে বাঙলা ছন্দ ও ভাষার বৈশিষ্ট্যের জন্য এবং অর্থ ও ভাবকে অগ্রাহ্য করার অক্ষমতাহেতু তানকে নিতান্তই বশে রাখতে হয়। অর্থ-সম্ভার সর্ব্বদাই সুরকে চাপা দিতে যাচ্ছে। তাই সঙ্গীত-রচয়িতারা সেই গুরুভারকে লঘু করতেই সচেষ্ট হয়েছেন এতদিন। সঙ্গীতে সুরের মিশ্রণ এবং বৈচিত্র্যের সাহায্যে গুরুভাবকে লঘু না করে সহজে বহন করা—এই হল রবীন্দ্রনাথের একটি কৃতিত্ব।*

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

* রাজসাহী আষাঢ়ে ক্লাবের দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত।

আন্তর্জাতিক সঙ্কট

১

ষোল বছর আগে যখন মহাযুদ্ধের শেষে শান্তি স্থাপিত হ'ল তখন অনেকের আশা হয়েছিল যে এবার পৃথিবীতে নব যুগের সূত্রপাত হবে। প্রেসিডেন্ট্ উইল্‌সন্ ন্যায়ের যে আদর্শ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, বিজয়ী শক্তিবৃন্দ তার মর্য্যাদা রাখেনি বটে—ভের্সাইর সন্ধিপত্র ছত্রে ছত্রে পরাজিত রাষ্ট্রদের প্রতি অন্যায় ও অবিচার করেছিল এ কথাও সত্য। কিন্তু যুদ্ধের প্রতি যে একটা প্রবল বিতৃষ্ণা তখন সর্ব্বত্র প্রকাশ পেত তার থেকে এমন আশা পোষণ করা অমূলক মনে হয় নি যে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ এবার নূতন রূপ নেবে। জেনীভার রাষ্ট্রসঙ্ঘে এই ভরসাকে একটা বাহ্যিক মূর্ত্তি দেওয়া হয়, কিন্তু আসলে এই প্রত্যাশা আরও বেশী ব্যাপক ছিল—লীগের সভ্য না হয়েও এমেরিকার শান্তিরক্ষার চেষ্টা এর উদাহরণ। উত্তরসামরিক যুগে অনেকদিন পর্য্যন্ত যে-মনোভাব প্রবল ছিল তাকে বিশ্লেষণ করলে দু'টি ধারণা দেখা যায়। প্রথমতঃ, আধুনিক প্রথায় যুদ্ধের প্রলয়রূপ লোককে স্তম্ভিত করেছিল; ধ্বংসের নিত্য নূতন উপায় আবিষ্কৃত হচ্ছে ব'লে এ বিশ্বাসের প্রচার খুবই স্বাভাবিক যে আর একবার পৃথিবীর প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে সজ্ঘর্ষ উপস্থিত হ'লে সভ্যতার আর বিশেষ কিছু বাকী থাকবে না। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধ দিয়ে ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ইচ্ছা যে দুরাশা এই মত অনেকে গ্রহণ করেন—কেন না প্রতি জাতির পক্ষেই নিজের স্বার্থ ও ন্যায়বিচার অভিন্ন মনে হওয়া স্বাভাবিক এবং নিরপেক্ষভাবে দেখতে গেলে যুদ্ধে যারা দুর্ব্বলতর প্রতিপন্ন হবে তাদেরই যে অন্যায় হয়েছিল এ মনে করবার কোন হেতু নেই। যুদ্ধান্তের অবসাদ ও এই যুক্তি দু'টির ফলে একটা প্রচেষ্টা দেখা গেল যে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ থেকে যুদ্ধকে বর্জ্জন করতে হবে; বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মতান্তর অবশ্যম্ভাবী কিন্তু সে-সব সমস্যার

বিনাযুদ্ধে নিষ্পত্তি প্রয়োজন; অতএব সকল দেশের একত্রে পরামর্শ ও কাজ করার অভ্যাসই যুক্তিসঙ্গত।

সমসাময়িক ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে যুদ্ধশেষের পর এই নূতন প্রবৃত্তি ১৯১৯ থেকে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত অনেকাংশে প্রবল ছিল। এই যুগটির প্রথমার্দ্ধে অবশ্য অনেক অসদ্ভাব দেখা যায়—এই সময়ে অপমান ও অত্যাচারের ফলে জার্ম্মানিতে ফরাসীবিদ্বেষ আরও বদ্ধমূল হ'ল, রুষদেশ ও তুরস্কের উপর অযাচিত আক্রমণের তখনও শেষ হয় নি। কিন্তু তবুও শান্তি স্থাপন ও রক্ষার চেষ্টা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত—নূতন রাষ্ট্রসঙ্ঘের উপর অনেকের তখন আস্থা ছিল; প্রশান্ত মহাসাগরের অঞ্চলে যাদের স্বার্থ আছে, এমন নয়টি জাতি ১৯২২ সালে একটি বিশেষ সন্ধিপত্রে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব ও মৈত্রী স্থাপন করে; সেই বছরেই ওয়াশিংটন্-চুক্তির ফলে নৌবহরগুলির একটা সীমা নির্দ্দেশ করা হয়। গত যুগের দ্বিতীয়ার্দ্ধে শান্তিরক্ষার প্রতি এই ঝোঁক আরও বৃদ্ধি পায়। ফ্রান্স ও জার্ম্মানির বৈরীভাব তখন অনেকখানি হ্রাস পেয়েছিল; জার্ম্মানিকে পরাজয়ের পর থেকে যে-অর্থদণ্ডের ভার বইতে হচ্ছিল বহু পরিমাণে তাকে লঘু করে দেওয়া হয়; বিদেশী যে-সৈন্যদল জার্ম্মানিতে প্রহরীর কাজ করছিল তারাও সেই সঙ্গে অপসৃত হ'ল। লোকার্নো-সন্ধির ফলে পশ্চিম ইয়োরোপ প্রায় নিশ্চিন্ত বোধ করতে আরম্ভ করে। জার্ম্মানির রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগদান এবং জেনীভার প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে এমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট্ রাশিয়ার সহযোগিতাও এসময় উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছিল। সেই সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে পরামর্শ ও আলোচনারও অন্ত ছিল না। এমন কি ১৯২৯ সালে যে-আর্থিক সঙ্কট দেখা দিল তাতে করেও তখনকার মত আন্তর্জাতিক শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হ্রাসই পেয়েছিল।

এদিক থেকে দেখতে গেলে গত চার বছরে পৃথিবীর একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়েছে। মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার ঝোঁক শেষ পর্য্যন্ত বোধ হয় কেটে গেল। শুধু যে প্রতি দেশে এখন যুদ্ধের আয়োজন বিপুল উদ্যমে চলেছে তা' নয়, শান্তিরক্ষার আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাও শিথিল

হয়ে আসছে—যুদ্ধবিরোধী ভাবধারাও ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হচ্ছে। আজ তাই চারিদিকে একটা আশঙ্কার উদয় হয়েছে যে পৃথিবী বুঝি দ্রুতগতিতে আবার একটি মহা সমরের দিকে এগিয়ে চলেছে। ১৯১৪ সালের জগতে যে অবস্থা ও মনোভাব বিরাজ করত এখন তাই আবার ফিরে এসেছে বলে' মনে হয়।

আজকের দিনে সব মহাদেশ মিলে স্বতন্ত্র রাজ্যের সংখ্যা পঞ্চাশ ষাটটি হবে—কিন্তু সমস্ত মানবজাতির শুভাশুভ প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে সাতটি বিশাল রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্বন্ধের উপর। এই জন্য—ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, এমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স্, ইটালি, সোভিয়েট্ রাশিয়া, জাপান ও জার্ম্মানিকে মহাশক্তি আখ্যা দেওয়া হয়। এদের ঘাত-প্রতিঘাত পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে বল্‌লে অত্যুক্তি হবে না। তাই বর্ত্তমান সঙ্কটের গুরুত্ব প্রকাশ পাচ্ছে প্রধানতঃ তিনটি ব্যাপারে—জাপানের ব্যবহারে অন্য জাতিদের মধ্যে ভয়ের উদ্রেকে, নাৎসি জার্ম্মানির আস্ফালনে ইয়োরোপে আতঙ্ক সৃষ্টিতে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র-গুলিকে একতার সূত্রে বাঁধবার যে একটা প্রচেষ্টা চল্‌ছিল তার অবসানে।

২

১৯৩১ সাল থেকে জাপানের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক শক্তিদের সম্বন্ধে পারস্পরিক অবিশ্বাসের মাত্রা বেড়ে চলেছে। আজকের দিনের আশঙ্কার এটাই হ'ল প্রথম কারণ। এক বছরে জাপানের বৈদেশিক নীতির পাঁচটা দিক অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

জাপানের প্রথম উদ্দেশ্য চীন অঞ্চলে পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব স্থাপন ও জাপানী প্রভাব বিস্তার। এ লক্ষ্য বহুদিনের কিন্তু ১৯২২ খৃষ্টাব্দের চুক্তির পরে অনেকদিন জাপানের এ সংকল্প মন্দীভূত হয়েছিল। হঠাৎ ১৯৩১ সালে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল ও শাঙ্ঘাই নগরীর উপর বিনাযুদ্ধে গোলা-বর্ষণ করে' চীনকে দমন করে। তারপর হ'ল মাঞ্চুকুয়ো নামে তথা-কথিত স্বাধীন রাজ্যের স্থাপনা ও চীনের কাছ থেকে জেহোল প্রদেশ

জয়। সেই সঙ্গে মঙ্গোলিয়ার অভ্যন্তরে জাপানী প্রভাব দ্রুত বিস্তার লাভ করছে এবং উত্তর চীনের অন্যান্য প্রদেশগুলিতেও জাপানী কর্তৃত্ব-স্থাপন বিষয়ে বন্দোবস্তের গুজবও সম্ভবতঃ অমূলক নয়।

গতবছর এপ্রিল্ মাসে জাপানী গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করলেন যে চীন অঞ্চলে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব একমাত্র জাপানেরই—অতএব পূর্ব্ব এশিয়ায় জাপানের বিনা অনুমতিতে বিদেশী শক্তিদের প্রভাব বিস্তার করতে দেওয়া হবে না। ইংরাজ ও এমেরিকান্‌দের প্রতিবাদের ফলে অবশ্য জাপানের শাসকেরা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে এতে চিন্তিত হবার কিছু নেই কিন্তু এরূপ দাবী নিশ্চয়ই নূতন। এমেরিকার মন্‌রো-নীতির সঙ্গে এর তুলনা চলে কিন্তু সে নীতি একশ' বছরের উপর সকলে স্বীকার করে' এসেছে। জাপানের অভিনব চেষ্টা অন্যায় না হ'তে পারে কিন্তু এতে করে' শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনাই বাড়বে মনে হয়।

তৃতীয়তঃ, জাপানের আচরণ অন্ততঃ তিনটি অতি আধুনিক সন্ধিপত্রের সর্ত্ত লঙ্ঘন করেছে—চীনে জাপান যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তা' লীগ কভেনাণ্ট্ (১৯১৯), নয়টি রাষ্ট্রের চুক্তি (১৯২২) এবং কেলগ্ প্যাক্ট (১৯২৮)—এই তিনেরই বিরোধী। মাঞ্চুরিয়া ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্দ্দেশ ও লীগ কর্ত্তৃক নিযুক্ত লিট্‌ন্ সমিতির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে জাপান দ্বিধা করে' নি যদিও সঙ্ঘের আর একটি সভ্যও প্রকাশ্যে জাপানের সমর্থন করতে সাহস পায় নি। এর ফলে জাপান রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিত্যাগ করেছে এবং এইভাবে প্রতিষ্ঠানটির যে সমূহ ক্ষতি হয়েছে তা'ও নিঃসন্দেহ। তারপর সম্প্রতি জাপানী বাণিজ্যের অতি দ্রুত বিস্তার বণিকজাতিদের ভাবিয়ে তুলেছে। বাণিজ্যের প্রসার অবশ্য স্বাভাবিক ও নিন্দনীয় নয়। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে যেভাবে জাপানী পণ্যদ্রব্য দক্ষিণ এমেরিকা, ভারতবর্ষ, এমন কি আফগানিস্থান কিম্বা আবিসিনিয়ার বাজার পর্য্যন্ত, ছেয়ে ফেলেছে তাতে অন্য জাতিদের ঈর্ষা হ'তেই পারে। জাপানীদের মতে তাদের জিনিষের স্বল্পমূল্যতার কারণ যন্ত্রের উৎকর্ষ, উৎপাদনে নৈপুণ্য এবং জাপানী শ্রমিকদের নিরাড়ম্বর জীবন-যাত্রার জন্য তাদের অল্প অভাব। অন্যেরা মনে করে যে আসলে

অন্যদেশে শ্রমিকদের মঙ্গলের জন্য ফ্যাক্টরী বা মিলে যে সব নানারূপ নিষেধাজ্ঞা আছে, প্রতিযোগিতার খাতিরে জাপানে সে-সব বিধিব্যবস্থা অন্যায় ভাবে অগ্রাহ্য করা হয়। কারণ যা'ই হোক্ না কেন, বাণিজ্যে রেষারেষির ফলে আন্তর্জাতিক অশান্তির বৃদ্ধি সম্প্রতি উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে। গুজব বিশ্বাস করলে একথাও বলতে হয় যে,জাপানীরা এখন শ্যামদেশে ও মালয় উপদ্বীপে নানাভাবে ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টায় নিযুক্ত।

অল্পদিন হ'ল জাপান আর একটি নূতন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ওয়াশিংটন্-চুক্তি অনুসারে ব্রিটেন ও এমেরিকার যেখানে পাঁচটি করে' বড় যুদ্ধের জাহাজ আছে, জাপানের সেখানে তিনটি সেরূপ জাহাজ রাখার কথা। এই অনুপাতের ব্যবস্থায় তখন জাপানের আপত্তি হয় নি কারণ লোকসংখ্যা, অর্থসম্পদ কিম্বা সাম্রাজ্যের বিস্তার কোন দিক দিয়েই জাপান অন্য দুটি রাজ্যের ঠিক সমকক্ষ নয়। তাছাড়া জাপানের যাতে কোন ভয়ের কারণ না থাকে এই জন্য স্থির হয়েছিল যে চীন অঞ্চলে ইংল্যাণ্ড বা যুক্তরাষ্ট্র বহু রণতরী রাখবার উপযুক্ত কোন সুরক্ষিত বন্দর নির্ম্মাণ করবে না। বহুশত মাইল দূরস্থিত সিঙ্গাপুর কিম্বা হাওয়াই দ্বীপ থেকে জাপানের উপর জলপথে আক্রমণের আশঙ্কা নিতান্তই কম। কিন্তু জাপানী গভর্ণমেণ্ট ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে জানিয়েছেন যে দু'বছর পর থেকে তাঁরা আর ওয়াশিংটন্-সন্ধির নির্দ্দেশ মানবেন না। তাঁরা এখন চান ব্রিটেন ও এমেরিকার সঙ্গে ঠিক সমান নৌবহর। তা নয়ত জাপানের মর্য্যাদা থাকে না আর জাপানের নাকি এর অভাবে সমূহ বিপদ্।

শক্তি, রাজ্য এবং প্রভাব বিস্তারের এই বিপুল উদ্যমের মূল কারণ অবশ্য জাপানে দ্রুত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা। ক্ষুদ্রায়তন জাপানের পক্ষে বিশাল জনসমষ্টির অন্নসংস্থান বিশেষ চিন্তার কথা। জাপানীদের বিশ্বাস যে উদীয়মান জাতির পক্ষে জন্মনিরোধ লজ্জার কারণ। যুক্তরাষ্ট্র বা ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলিতে অনেক প্রদেশে জাপানী উপনিবেশ গঠন সম্ভব কিন্তু সেখানে তাদের প্রবেশ নিষেধ। এ বিষয়ে কোন বন্দো-বস্তের অভাব সমস্যাকে জটিলতর করেছে এবং এর জন্য প্রধানতঃ শ্বেত

জাতিরাই দায়ী। জাপানের দখলে যে-সব জায়গা আছে সেখানে আবহাওয়ার জন্য জাপানীদের বহুল বসবাস সম্ভব নয়। সুতরাং জাপানীদের অনেকটা বাধ্য হয়েই নূতন অগ্রসর-নীতি অবলম্বন করতে হয়েছে। মূলতঃ এই কারণ সত্য হ'লেও জাপানের বর্ত্তমান আচরণের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করবার সময় অন্য কথাও মনে রাখতে হবে। শোনা যায় যে জাপানে শ্রমিকদের অসন্তোষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাম্যবাদের বিস্তার হচ্ছে; তাই শাসকদের মতে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখবার জন্য দেশ-ভক্তির উচ্ছ্বাস বাড়াবার প্রয়োজন হয়েছে। তাছাড়া মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপার থেকে জাপানীদের বিশ্বাস হয়েছে যে কেউ সহজে জাপানকে বাধা দিতে এখন রাজি না। ফলে জাপানের বৈদেশিক নীতি উত্তরোত্তর বেশী সাহসিক হয়ে উঠছে। এই ভাবেই বারবার যুদ্ধের পত্তন হয়।

চারটি রাষ্ট্রের স্বার্থ জাপানের প্রসারে আহত হ'তে পারে—চীন, সোভিয়েট্ রাশিয়া, এমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। প্রশান্ত মহাসাগরের অঞ্চলে কোন দেশেই বোধ হয় আপাততঃ যুদ্ধ চায় না কিন্তু অসন্তোষ ও অশান্তি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে ব'লে ভবিষ্যতের জন্য ভয় হওয়া স্বাভাবিক।

চীনে বোধ হয় সম্প্রতি জাপানী-বিদ্বেষ কিছু কমেছে। জাপানের এখন চেষ্টা চীনকে নিজের আয়ত্তে এনে তার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করা—এই মিলনের মূল মন্ত্র হবে যে এশিয়াতে এশিয়াবাসীদেরই প্রভুত্ব থাকা উচিত। চীনের অভ্যন্তরে কমিউনিষ্ট-বিদ্রোহ এখনও প্রশমিত হয় নি, চীনের সঙ্গে সোভিয়েট্-শক্তিরও এখন বিশেষ সদ্ভাব নেই। চিয়াং-কাই-শেক্ হয়ত তাই শেষ পর্য্যন্ত জাপানের আশ্রয় নিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে চীন ও জাপানের সহযোগিতা দীর্ঘস্থায়ী হওয়া শক্ত। অবশ্য চীন একেবারে জাপানের রক্ষিত রাজ্য হয়ে পড়তে পারে কিন্তু কুয়ো-মিন্-টাংএর এই শোচনীয় পরিণামে প্রাচ্যদেশে শান্তিভঙ্গেরই সম্ভাবনা বাড়বে।

চীন অবশ্য দুর্ব্বল কিন্তু অপর রাষ্ট্র তিনটি ক্ষমতাশালী বলে' তাদের অসন্তোষ বিপজ্জনক। সোভিয়েট্ রাশিয়া এখন নূতন

পঞ্চবার্ষিক সংকল্প নিয়ে ব্যস্ত, তার নেতারা স্বদেশের মঙ্গল ও সমৃদ্ধির জন্যই যুদ্ধের বিরোধী। কিন্তু সুদূর প্রাচ্যে জাপানের অভিসন্ধি সম্বন্ধে রাশিয়ার ভয় ও সন্দেহে বিস্মিত হবার কিছু নেই—মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে জাপানের নূতন নূতন রেলপথ নির্ম্মাণের একটি প্রধান লক্ষ্যই বোধ হয় যুদ্ধের আয়োজন। অনেকেই মনে করেন, যে ভ্লাডিভষ্টক্ বন্দর ও পূর্ব্ব সাইবেরিয়া থেকে রুষদের বৈকাল হ্রদের নিকটস্থ পর্ব্বত-মালার পশ্চাৎ পর্য্যন্ত বিতাড়িত করাই জাপানের উদ্দেশ্য।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জাপানের বাণিজ্য সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব এখনও প্রবল হয় নি কেন না তাদের উৎপন্ন পণ্যের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। এমেরিকা তা'ছাড়া সাধারণতঃ শান্তিভক্ত বলেই খ্যাত। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা যুক্তরাষ্ট্রের নিকট উপেক্ষার বস্তু হতে পারে না—যে-নিরপেক্ষ নীতির অনুসরণ ইয়োরোপীয় ব্যাপারে এমেরিকার পক্ষে স্বাভাবিক এক্ষেত্রে তা' সম্ভব নয়। চীন অঞ্চলে ব্যবসাবাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্র চিরদিনই মুক্তদ্বার বা সব জাতির সমান অধিকারের পক্ষপাতী। এদিকে জাপানের আয়ত্ত মাঞ্চুকুয়োতে বিদেশী বণিকদের নানাভাবে বাধা দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে যদিও ১৯২২ খৃষ্টাব্দের সন্ধিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে মুক্তদ্বার প্রথা সমর্থিত হয়েছিল।

কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত জাপানের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের বিশেষ সদ্ভাব ছিল বলা যায়—কিন্তু সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হচ্ছে বলেই এখন মনে হয়। ইংরাজ ও এমেরিকান্দের মধ্যে যুদ্ধ কষ্টকল্পনা কিন্তু জাপান ও বিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব বাড়ছে বই কমছে না। বাণিজ্যের রেষারেষি ছাড়াও অষ্ট্রেলিয়া এবং কেনাডা, মালয় এবং হংকং রক্ষার ভাবনা আছে। জাপানের নৌবহর বৃদ্ধির সংকল্পও গ্রেট্‌ব্রিটেনের পক্ষে সুসংবাদ নয়; চারিদিকে থেকেই প্রশান্ত মহাসাগরের অঞ্চলে বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

৩

বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক অসদ্ভাব ও সঙ্কটের দ্বিতীয় কেন্দ্র জার্ম্মানি। ভের্সাইর সন্ধিতে জার্ম্মানির প্রতি অবিচার ও অপমান সকল সীমা

অতিক্রম করেছিল এ কথা সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু পাঁচ বছর আগে তা সত্বেও প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে জার্ম্মানির বৈরিতা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছিল। জার্ম্মানদের প্রতি ইয়োরোপের আজকের দিনে বিরূপ ভাব অনেকখানি বেড়েছে হিট্‌লারের অভ্যুদয়ের পর থেকে। মহাযুদ্ধ ও ভের্সাই-সন্ধির পর জার্ম্মানির প্রতি সহানুভূতি প্রতি দেশেই দেখা যেত—উত্তর সামরিক যুগে উদার মতবাদের একটা লক্ষণই হয়েছিল ফ্রান্সের নিন্দা। নাৎসি-প্রাধান্যের পর থেকে এই মনোভাবের পরিবর্ত্তন সর্ব্বত্রই উল্লেখযোগ্য। আজকাল অনেকেই মনে করেন যে ফরাসীদের জার্ম্মান-আতঙ্ক নিতান্ত অযৌক্তিক নয়—এবং অত্যাচারিতের ভূমিকা-অভিনয়ে জার্ম্মানি খানিকটা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। এই মত পরিবর্ত্তনের কারণ শুধু জার্ম্মানির মধ্যে নাৎসি অত্যাচার নয়। রাশিয়াতেও যথেষ্ট নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু সোভিয়েট-শক্তির বৈদেশিক নীতি অপর জাতির শঙ্কার কারণ বলে কখনও গণ্য হয় নি। পক্ষান্তরে নাৎসি-প্রভুত্ব সহজেই ইয়োরোপকে যুদ্ধের পথে টেনে নিতে পারে।

নাৎসি-আন্দোলনের ফলে জার্ম্মানিতে যে সামরিক মনোভাব দ্রুতবিস্তার লাভ করছে তা' নিতান্ত আশার কথা নয়। বিস্‌মার্কের যুগের পর থেকে জার্ম্মানিতে অস্ত্রশক্তির উপাসনা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছিল, গত যুদ্ধের পর কিছুদিন হয়ত সে-ধারার বদল হয়, আজ আবার পূর্ব্বাবস্থা ফিরে আসছে। নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে অবশ্য জার্ম্মানির প্রস্তাব ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত ছিল। সে প্রস্তাবের প্রধান কথা ছিল এই যে হয় সকল রাষ্ট্রেরই সমান সমান পরিমাণে যুদ্ধসজ্জা সংক্ষিপ্ত করা উচিত, নয়ত ১৯১৯ সালের সন্ধিতে জার্ম্মানিকে যে একতরফা নিরস্ত্র করা হয়েছিল সে ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে হবে। প্রস্তাবে কোন ফল না হওয়াতে জার্ম্মানি প্রতিবাদ স্বরূপ বৈঠক ত্যাগ করে। কিন্তু জার্ম্মান গভর্ণমেণ্টের এর পরবর্ত্তী আচরণ স্বাভাবিক হ'লেও সমর্থন করা শক্ত। এর জন্য একেবারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভ্যপদত্যাগ করার অর্থ দাঁড়ায় এই যে নিজের মত না গ্রাহ্য হওয়া মাত্র আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে

সরে' দাঁড়াবার অধিকার সকল দেশের আছে। এ দাবী স্বীকার করলে সমবেত প্রচেষ্টার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। অন্য মহাশক্তিগুলিও সম্ভবতঃ এ অবস্থায় অনুরূপ কাজ করত—কিন্তু ঘটনাচক্রে জার্ম্মানি ও জাপান লীগ্ ত্যাগ করেছে বলেই তাদের সমালোচনা এখন অবশ্যম্ভাবী। এর পরে জার্ম্মানির ব্যবহার আরও আশঙ্কাজনক। ভের্সাই-সন্ধির যে সব সর্ত্ত অনুসারে জার্ম্মানির অস্ত্রসজ্জা স্বল্প-সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল হিট্‌লার সেগুলি অগ্রাহ্য করে' সামরিক সরঞ্জাম বৃদ্ধির আদেশ দিয়েছেন। জার্ম্মানির সমর্থকেরা বলেন যে ভের্সাই-সন্ধির কোন মূল্য থাকতে পারে না কেননা বিজিত জার্ম্মানিকে বাধ্য হয়ে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করতে হয়েছিল। এই চমৎকার যুক্তির উত্তর অত্যন্ত সহজ—আজ পর্য্যন্ত কোন যুদ্ধের পরই পরাজিত পক্ষ স্বেচ্ছায় সন্ধিসর্ত্ত গ্রহণ করে নি, কাজেই জার্ম্মানির এক্ষেত্রে সন্ধিভঙ্গের কোন বিশেষ দাবী থাকতে পারে না। জার্ম্মানির পক্ষে দ্বিতীয় যুক্তি এই যে ভের্সাইর বিধি ব্যবস্থা অতি অন্যায় ও অসহনীয়—অনেকেই একথা নিশ্চয় এখনও স্বীকার করেন। কিন্তু সে-অন্যায়ের সংশোধন কি এমন আচরণ যার ফলে মহাযুদ্ধের সূচনা হ'তে পারে? যুদ্ধের ফলে যে অন্যায়ের উচ্ছেদ হয় এ বিশ্বাসকে অন্যভাবে প্রকাশ করতে গেলে বলতে হবে যে যার শক্তি বেশী, ন্যায়ধর্ম্ম তারই দিকে। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ন্যায় অন্যায় আসলে শুধু বিভিন্ন স্বার্থের সঙ্ঘাত। জার্ম্মানির কাছে যা' অসহ্য অন্যায় চেকোশ্লোভাকিয়া কিম্বা পোল্যাণ্ডের পক্ষে ঠিক তা'ই সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত মনে হওয়া বিচিত্র নয়। কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ছাড়া তাই বিভিন্ন জাতির মধ্যে মতান্তরের সমাধান-চেষ্টায় যুদ্ধের সম্ভাবনা বাড়ে যার ফলে এক অন্যায়ের স্থান নেবে অন্য অন্যায়।

এছাড়াও নাৎসিদলের ব্যবহারে ভয়ের কারণ রয়েছে। হিট্‌লার একদা প্রচার করেছিলেন যে পূর্ব্ব-ইয়োরোপকে সভ্য ও জার্ম্মান-ভাবাপন্ন করাই হ'ল ইতিহাসে জার্ম্মানির বিশেষ কাজ। জার্ম্মানিতে প্রবল আন্দোলন চলেছে যাতে অষ্ট্রীয়া, ডান্‌সিগ ও মেমেল্ জার্ম্মানির

হাতে আসে। এখন আবার মধ্য-ইয়োরোপকে জার্মান নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ করার বিশেষ চেষ্টা চলেছে—গত মহাযুদ্ধের আগেও জার্মানির এ একটা প্রধান লক্ষ্য ছিল। হিটলারের পিছনে যে ধনিকেরা আত্ম-গোপন করছে তাদের আবার উপনিবেশগুলি ফিরে পাবার সংকল্প রয়েছে। হিট্‌লার ত' এখন প্রকাশ্যে ফ্রান্সকে দোষ দিচ্ছেন যে রাশিয়ার সঙ্গে সখ্য করে' ফরাসীরা ইউরোপে বল্‌শেভিক্‌-বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

ফ্রান্স জার্মানির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে এখন ইয়োরোপে দলবৃদ্ধির চেষ্টায় নিযুক্ত। রাষ্ট্রসঙ্ঘ এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে যে ফ্রান্স আবার আগের মতন সন্ধিসূত্রে দৃঢ় আবদ্ধ মিত্রশক্তিদলের গঠনকার্য্যে ব্যস্ত। এদিকে প্রধান সাফল্য লাভ হয়েছে রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের সন্ধির মধ্য দিয়ে। কুড়ি বছর আগের মতন ফ্রান্স ও রাশিয়া এখন আবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পোল্যাণ্ড্‌কে দলে টানবার জন্য আজ ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে কাড়াকাড়ি চলেছে। চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, যুগোশ্লোভিয়া—এই তিন রাজ্য পরস্পরের বিশেষ মিত্র; গত যুদ্ধশেষে ব্যবস্থার সময়ে তাদের প্রভূত লাভ হয়েছিল বলে' তারা ফ্রান্সের পক্ষপাতী যদিও ফরাসী বন্দরে যুগোশ্লোভিয়াব রাজা আলেকজাণ্ডার নিহত হবার পর থেকে এই রাজ্যটি এখন ফ্রান্সের উপব কিছু বিরক্ত। এ-ভাবে দলাদলির থেকে ইয়োরোপে শান্তির সম্ভাবনা ক্রমশঃ কমছে। এ সম্বন্ধে গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী চল্লিশ বৎসরের ইতিহাস বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

আপাতদৃষ্টিতে ইটালির সঙ্গে জার্মানি ও জাপানের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। অন্য দেশ দুটির মতন ইটালিও বঞ্চিত—ইংল্যাণ্ড্‌, ফ্রান্স বা এমেরিকার বিশেষ কিছু চাইবার নেই কিন্তু এদের অবস্থা স্বতন্ত্র। ইটালি ভের্সাইর ব্যবস্থার সংশোধন চায়, মুসোলীনির রাষ্ট্রসঙ্ঘের উপর কোন শ্রদ্ধা নেই, ফাসিষ্ট্‌ রাষ্ট্রীয় আদর্শ জার্ম্মানি ও এমন কি জাপান পর্য্যন্ত অনেকখানি গ্রহণ করেছে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও এখন ইটালি যে ফ্রান্সের দিক নিচ্ছে তার প্রধান কারণ এই আশঙ্কা যে জার্মানি প্রথমে অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গারি এবং পরে সমস্ত মধ্য-ইয়োরোপ গ্রাস করতে

পারে। এতে ইটালির সমূহ সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা। এইজন্য ইটালির সঙ্গে ফ্রান্স সম্প্রতি একটা মিটমাট করে' নিতে পেরেছে—যদিও উভয়ের মধ্যে স্বার্থের অমিল বিস্তর আছে। ফ্রান্স ও ইটালির মধ্যে নূতন বন্ধুত্বের একটা নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে 'আফ্রিকাতে। ফ্রান্স এতকাল আবিসিনিয়াকে রক্ষা করে এসেছে কিন্তু ইয়োরোপে সাহায্যের তুলনায় আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা তুচ্ছ। ইটালি যে আবিসিনিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে তাতে ফ্রান্সের কোন বিশেষ অমত অন্ততঃ এখন পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

মহাযুদ্ধের পর রাপালোর সন্ধির পর থেকে রাশিয়ার সঙ্গে জার্ম্মানির বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় কিন্তু সে-সখ্য নাৎসি-বিপ্লবের পর আর বিদ্যমান থাকা অস্বাভাবিক, সুতরাং সোভিয়েট-শক্তিকে ফ্রান্সের শরণাপন্ন হ'তে হয়েছে। রাশিয়ার তাই লীগে যোগদান অকস্মাৎ বুর্জোয়া-প্রীতির লক্ষণ নয়, একদিকে জার্ম্মানি অপরদিকে জাপান এই দুই সঙ্কটের মধ্যে পড়ে রুষ নেতাদের আত্মরক্ষার জন্য গত্যন্তর নেই।

ব্রিটেনের সঙ্গেও জার্ম্মানির আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হ'ল। জার্ম্মানদের নৌবল ও ইংরাজদের আকাশযান বৃদ্ধি এর অধুনাতম দৃষ্টান্ত। বাণিজ্যে প্রতিযোগিতাও এখানে নিতান্ত অল্প নয়। নাৎসিদের সম্বন্ধে ইংরাজদের মনোভাব যে প্রসন্ন নয় সংবাদপত্র ইত্যাদি থেকেই তা' বোঝা যায়। ভের্সাই-সন্ধির পর ইংল্যাণ্ডে জার্ম্মানদের প্রতি সহানুভূতি নানাদিকে প্রকাশ পেয়েছিল কিন্তু এখন ফ্রান্সের সঙ্গে সখ্যভাব পুনর্গঠনের পালা চলেছে। এ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংল্যাণ্ড ও জার্ম্মানির মধ্যে যে-একটা বৈরীভাব ছিল এর পর তারই পুনরভিনয় হওয়া কিছু বিচিত্র না। এইভাবে ইয়োরোপের সমস্যাও চারদিক থেকে জটিলতর হচ্ছে।

৪

আধুনিক কালে কোনও বিশেষ জাতি বোধ হয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে একটা মহাযুদ্ধের সন্ধান করে না। পারস্পরিক সন্দেহ ও ভয় থেকেই সশস্ত্র সঙ্ঘর্ষের উৎপত্তি। দল গঠন কিংবা আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র বৃদ্ধি

করে' শান্তি বজায় থাকে না, অতীত থেকে এ অভিজ্ঞতা সহজেই লাভ করা যায়। অথচ মহাযুদ্ধের পর একত্র পরামর্শ ও মিলিত প্রচেষ্টার যে একটা ইচ্ছা দেখা গিয়েছিল তাও আজ লুপ্তপ্রায়।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের দোষ অনেক ছিল কিন্তু যারা সত্যই শান্তি চায় তাদের পক্ষে এর বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দুঃখের কথা। মাঞ্চুরিয়া ব্যাপারে অনেকেই বলেছিলেন যে লীগের তৎকালীন দুর্ব্বলতার ফল বিষময় হবে। রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সত্যই এখন আর বিশেষ মূল্য নেই। এর জন্য ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড্ অনেকাংশে দায়ী। লীগের অন্তর্গত মহাশক্তিগুলি জাপানকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলে রাশিয়া ও এমেরিকার সমর্থন নিশ্চয়ই পাওয়া যেত। ছোট রাজ্যগুলির প্রথম থেকে সঙ্ঘ সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহ ছিল কিন্তু জেনীভার বাধাবন্ধন বড রাষ্ট্রগুলির মনঃপূত নয়। একশ' বছরের কিছু আগে ক্যানিং বলেছিলেন যে সকল দেশের শুধু নিজ নিজ স্বার্থের সন্ধানই সব চেয়ে স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা। বিশ্বব্যাপী মহাসমরের অভিজ্ঞতার পরও এখন আবার সেই আদর্শের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে সকল আলোচনার নিষ্ফলতাও এর আর একটি দৃষ্টান্ত। সমরসজ্জা সীমাবদ্ধ করার কোন উপায়ই এখনও পর্য্যন্ত স্থির হ'ল না। প্রথমে কথা হয়েছিল যে সকল দেশের সামরিক শক্তি সমান পরিমাণে হ্রাস করা হবে; কিন্তু তখন সেই শক্তি মাপবার কোন পদ্ধতি আবিষ্কার অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। তারপর প্রস্তাব উঠল যে কোন কোন বিশেষ অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ হবে। যে-অস্ত্র শুধু আক্রমণের জন্য তাকেই বর্জ্জন করা যুক্তিসঙ্গত কিন্তু বিচারের সময় দেখা গেল যে সকল অস্ত্রকেই কোন না কোন দেশ আত্মরক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে দাবী করছে। ফ্রান্সের মত ছিল যে শান্তিরক্ষার জন্য রাষ্টসঙ্ঘের অধীনে আন্তর্জাতিক বাহিনীর সৃষ্টি করা প্রয়োজন—অন্য রাষ্ট্রদের অনেকেই এতে কিন্তু সম্মত হ'ল না। সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে রাশিয়ার প্রস্তাব আলোচনার উপযুক্ত বলেই বিবেচ্য হয় নি। ইতিমধ্যে জার্ম্মানি সমান অধিকারের দাবী উপস্থিত করায় বৈঠক ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

ব্রিটেন, এমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স ও ইটালি এই পাঁচটি দেশের

নৌবাহিনীই আজকাল উল্লেখযোগ্য; এখন আবার জার্ম্মানিও এই তালিকার অন্তর্গত হতে পারবে বোধ হয়। এ বৎসর নৌবলের সীমানির্দ্দেশের আলোচনা হবার জন্য একটি বৈঠক ডাকার কথা আছে। কিন্তু এখানেও কোন সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা কম। জাপান ইংল্যাণ্ড্ ও এমেরিকার সঙ্গে সমকক্ষতার দাবী করেছে, ইটালি চায়, ফ্রান্সের সমান হ'তে। জার্ম্মানিও হয়ত চাইবে ফ্রান্সের সমান নৌবহর। ফলে ইংরাজ, এমেরিকান্ ও ফরাসীদের মনে হ'তে পারে যে তাদের অবস্থা এখন আগের চেয়ে কম নিরাপদ হয়ে পড়বে। এছাড়া অন্য গোলযোগেরও অভাব নেই। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র সাব্‌মেরিন্ তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী ফ্রান্স ও জাপানের তাতে ঘোর অমত। ইংলণ্ডের ইচ্ছা যে বড় রণতরীর আয়তন হ্রাস করে' ব্যয়সঙ্কোচ করা হোক; কামানের আকার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই জাহাজের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেড়েছে, অতএব তার একটা সীমা নির্দ্দেশ করলেই গোলযোগ মেটে। এমেরিকানেরা কিন্তু বড় যুদ্ধজাহাজ রাখতে চায়। অন্যদিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর রণতরীর সংখ্যা কমাতে যুক্তরাষ্ট্রের কোন অসুবিধা ও অমত নেই কিন্তু ইংরাজদের তাতে ঘোর আপত্তি। স্বার্থের উপর এ-সব মতের প্রতিষ্ঠা—কাজেই সমস্যার সমাধান সুদূরপরাহত।

এদিকে যুদ্ধের আয়োজনের ত্রুটি নেই। এ প্রসঙ্গে আমি শুধু একটি কথার উল্লেখ করব। আজকাল জল, স্থল ও আকাশ সর্ব্বত্রই যুদ্ধের একটি প্রধান অবলম্বন হচ্ছে পেট্রলিয়াম্। এই খনিজ তৈল সকল স্থানে পাওয়া যায় না, এখন তাই এরজন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। এমেরিকার ও রাশিয়ার এবিষয়ে বিশেষ অভাব নেই; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও অ্যাংলো-পারসিক অয়েল কোম্পানীর প্রধান অংশীদার। অন্য শক্তিদের এ সম্বন্ধে অসুবিধা আছে তাই সকল দেশে এখন পেট্রোলিয়াম সঞ্চয় করে মজুত রাখবার চেষ্টা চলছে। সম্প্রতি জাপান মাঞ্চুরিয়ার পেট্রল ব্যবসা একচেটিয়া করে নিয়েছে এবং জার্ম্মানিতে বিপুল উদ্যমে ডক্টর বার্গিয়াস ও ডক্টর ফিশারের আবিষ্কৃত প্রণালীর দ্বারা কয়লা থেকে পেট্রল উৎপাদন করানো হচ্ছে।

৫

শান্তিরক্ষার উপায় কি এ প্রশ্ন আজকে অনেকের মনে উঠেছে। এখনকার যুদ্ধে দেশের সকল অধিবাসীকেই অল্পবিস্তর যোগ দিতে হয়, অতীতের মতন এককোণে থাকা আর সম্ভব না। তাছাড়া পৃথিবীর এক প্রান্তে সংগ্রাম আরম্ভ হলে তার জালে সারাজগৎ জড়িয়ে পড়াই আজকাল স্বাভাবিক। যে শোভিয়েট্ রাশিয়ার লোকদের সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক এত কম সেই দেশকেও তাই আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের বেলায় নির্লিপ্ততা পরিহার করতে হয়েছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের পুনর্গঠনে বিপদ কমতে পারে কিন্তু সে সংস্কারের সম্ভাবনা খুব বেশী নয়। জার্ম্মানি ও জাপান ফিরে এলে এবং যুক্তরাষ্ট্র যোগ দিলে পৃথিবীর শান্তি সুদৃঢ় হবে নিশ্চয় কিন্তু সে আশা যখন করা যাবে তার আগেই যুদ্ধের আশঙ্কা নিশ্চয় কাটবে। তাছাড়া যে দৃষ্টান্ত দেখানো হয়েছে বারবার তার অনুকরণে লীগ্‌কে পরিত্যাগ করার লোভ এখন থেকে রয়েই গেল।

জার্ম্মানি ও জাপানের মতিপরিবর্ত্তন হ'লে ঠিক আজকের দিনের সঙ্কট কাটতে পারে। কিন্তু প্রথমতঃ সে আশা নিতান্ত কম এবং দ্বিতীয়তঃ আংশিক বদলে সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয় না। আন্তর্জাতিক বিপত্তির প্রধান কারণ মহাশক্তিদের স্বার্থানুসন্ধান। মহাযুদ্ধের পর যে একতার বন্ধন দিয়ে এদের বাঁধবার চেষ্টা হয়েছিল সে যোগ একবার ছিন্ন হয়ে গেলে আবার সহজে তার পুনঃস্থাপন হবে না। তাই মনে হয় যে যুদ্ধ এবং যুদ্ধাতঙ্কের যুগ বোধ হয় আবার ফিরে এল।

শান্তি রক্ষার একটি উপায় সহজে মনে আসে—যে-সব রাষ্ট্র এখন বর্ত্তমান অবস্থাতে তৃপ্ত, তারা দলবদ্ধ হ'লে অন্যদের তুলনায় তাদের শক্তি বেশী। কিন্তু সে একতাও অনেকখানি বাহ্যিক। ইংল্যাণ্ডের চিন্তা ইউরোপে শান্তিরক্ষা কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য প্রশান্ত মহাসাগর। ফ্রান্স ও ইটালির সদ্ভাব মৌখিক—আফ্রিকায়, ভূমধ্যসাগরে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে এ দুই দেশের স্বার্থ ঠিক এক নয়। এমেরিকা

ও রাশিয়ার মধ্যে সহযোগিতা সহজসাধ্য না। ইটালির ভবিষ্যৎ বৈদেশিক নীতি নিতান্তই অনির্দ্দিষ্ট।

ফ্রান্স ও জার্ম্মানি এবং এমেরিকা ও জাপানের মধ্যে বিশেষ বিশেষ সন্ধির দ্বারা যুদ্ধের সম্ভাবনা হ্রাস করা যায়। কিন্তু যেখানে স্বার্থের সঙ্ঘাত প্রচণ্ড সেখানে এরূপ বন্দোবস্ত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। এরূপ ক্ষণিক ব্যবস্থার অবশ্য যথেষ্ট মূল্য আছে, যুদ্ধ স্থগিত রাখতে পারলে তখনকার মত নিশ্চয়ই মঙ্গল। কিন্তু শান্তিরক্ষার এ উপায় কিছু নূতন নয় আর বিশেষ সঙ্কটের সময় এতে যুদ্ধ আটকায় না। অথচ আপাততঃ এ ছাড়া অন্য কিছু উপায়ও নিষ্ফল বলেই মনে হয়।

অনেকে নিশ্চয় বলবেন যে যুদ্ধ সনাতন প্রথা, অতএব এ চিরকাল মানুষের সাথী থাকবে, এর জন্য আক্ষেপ নিরর্থক। ক্ষোভের কারণ আর কিছুই নয়, সে শুধু এই যে বৈজ্ঞানিকদের কৃপায় যুদ্ধের রূপ এ শতাব্দীতে এমন পরিবর্ত্তিত হয়েছে যে আগেকার সঙ্ঘর্ষগুলির সঙ্গে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের আর তুলনা চলে না। ঐতিহাসিকেরা তাছাড়া স্বীকার করবেন যে গত মহাযুদ্ধের পর দশ বছর মানুষের ইতিহাসকে মোড় ফেরাবার একটা চেষ্টা হয়েছিল, সেই প্রয়াসেরই হয়ত অবশ্যম্ভাবী পরাজয় আজ পরিস্ফুট হয়ে উঠছে।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই যে আবার মহাযুদ্ধ বাধবে এমন ভবিষ্যদ্বাণী জোর করে করা দুঃসাহসিক। দুটি কারণ এখনও সমরোন্মুখী প্রবৃত্তিকে বাধা দিচ্ছে। আর্থিক সঙ্কটে অনেক দেশ এখনও অবশ, হঠাৎ বিশেষ লাভের আশা না থাকলে যুদ্ধ ঘোষণা করতে এখনও তাই অনেক রাষ্ট্র ইতস্ততঃ করবে। দ্বিতীয়তঃ ধ্বংসের নব-উদ্ভাবিত অস্ত্রগুলি এখনও অপরীক্ষিত, কাজেকাজেই তাদের প্রয়োগ ও প্রকোপ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাব শান্তিরক্ষার সহায়ক; এ বিষয়ে এতখানি অনিশ্চিত ভাব আগে ছিল বলে' মনে হয় না। কিন্তু এরূপ বাধা সাময়িক মাত্র। সমস্ত জগৎ আবার যে পথে চলেছে সে পথ সঙ্ঘর্ষ ও সংগ্রামের পথ।

৬

আন্তর্জ্জাতিক সমস্যার বিশ্লেষণ সম্বন্ধে সকলে একমত হ'তে পারে না। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সজ্মাত ও যুদ্ধবিগ্রহের রূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী আছে, তার কিছু পরিচয় দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করব।

যুদ্ধবিরোধী মনোভাব আগের চেয়ে আজকাল অনেক বেশী বিস্তার লাভ করেছে। গত মহাসমরের অভিজ্ঞতা ও সমসাময়িক সভ্যতার ধ্বংসের ভয় এর মূলে আছে অবশ্য। এ মত অনুসারে যুদ্ধ নিবারণ করাই আজকের দিনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কেউ বল্‌বে না যে বর্ত্তমান জগতের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত, এমন কি এও সত্য যে কয়েকটি মহাশক্তির অন্যায় আধিপত্য জগতকে সহ্য করতে হচ্ছে। কিন্তু সে বিষয়ে সেই পুরাতন প্রশ্ন ওঠে—যুদ্ধের ফলে এক রাষ্ট্রের জায়গায় অন্যের বিশেষ লাভ সিদ্ধ হ'তে পারে, কিন্তু নূতন ব্যবস্থা যে অধিক ন্যায়সঙ্গত বা সকলের মনঃপূত হ'বে তার স্থিরতা কোথায়? আর পরিণাম অনিশ্চিত হ'লে এত ধ্বংস এত ক্ষতি বরণ করে নেবার সদর্থ থাকে কি? আগুন নিয়ে খেলাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

কিন্তু এর থেকেও প্রবল মনোভাব আছে, আজ সর্ব্বত্র তারই জোর বেড়ে চলেছে। শেষ পর্য্যন্ত এই ধারণাই দাঁড়ায় যে প্রতি জাতির কর্ত্তব্য তার স্বার্থানুসন্ধান এবং সেই জাতিগত স্বার্থ সর্ব্বদাই ন্যায্য। এক হিসাবে এ বিশ্বাস যথার্থ কেন না আন্তর্জাতিক ব্যাপারে নিরপেক্ষ ন্যায়ের স্থান বা সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু জাতিদের স্বার্থের সজ্ঘাত যদি ইতিহাসের শেষ কথা হয় তবে এর থেকে কখনও উদ্ধারের আশা নেই—কারণ এমন শক্তিশালী রাজ্য আজকাল কল্পনা করা যায় না যা সারা জগৎকে পদানত রাখতে পারবে। সম্প্রতি এ জাতীয় মনোভাব সবিশেষ প্রকাশ পেয়েছে ফাসিষ্ট্‌ মতবাদে। ফাসিষ্ট্‌রা বিশ্বাস করে যুদ্ধ মঙ্গলজনক, সংগ্রামের প্রবৃত্তি জাতির স্বাস্থ্যের লক্ষণ, যোগ্যতমের প্রাধান্য আন্তর্জাতিক জগতেও সব চেয়ে কল্যাণপ্রদ আদর্শ। সেই সঙ্গে প্রতি দেশের ফাসিষ্ট্‌দের মনে হয় যে তাদের জাতিই বিধাতা'র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

তৃতীয় প্রকার মনোভাব সাম্যবাদের রূপ মাত্র। এ মত অনুসারে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব চিরকালের নিয়ম নয়, অন্ততঃ এর ভয়াবহ প্রকাশ ধনতন্ত্রের অঙ্গ মাত্র। বর্ত্তমান অশান্তি ধনিক-সমাজের অপরিহার্য্য ব্যাধি—রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রভৃতি উপায় দিয়ে এ জাতীয় সমস্যার সমাধান অসম্ভব। কিন্তু নূতন সমাজ গঠিত হ'লে আজকের দিনের বিপদ আর থাকবে না। লেনিনের মতে ধনতন্ত্রের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তিনটি সঙ্ঘর্ষ প্রবলতর হবে—প্রতিদেশে ধনিক ও শ্রমিকদের বিরোধ, ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সাম্রাজ্যগুলির সঙ্গে অধীন জাতিদের বৈরিতা। এইভাবে ধনতন্ত্রের অবসান হবে।

চতুর্থ ধরণের লোকের সংখ্যাই বোধ হয় সব চেয়ে বেশী। তারা হয় মনে করে যে এ সম্বন্ধে ভাববার কোন প্রয়োজন নেই, কোনক্রমে মানুষের কাজ ঠিক চলে যাবে; নয়ত তাদের বিশ্বাস যে মানুষের চেষ্টার বিশেষ কোন ফল নেই, যা হবার তা আপনিই হবে। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে এরূপ মনের ভাবই হয়ত সব চেয়ে বুদ্ধিমানের পরিচয়। অন্ততঃ আজকের দিনে তাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে।

শ্রীসুশোভন সরকার

পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আগে ছাপ্পান্ন সংবতের ভীষণ দুর্ভিক্ষের কথা বলেছি। কিন্তু দুর্ভিক্ষের জের ত একবছরেই মেটে না! সাতান্ন সংবতেও বৃষ্টি পুরোপুরি হল না। যেটুকু বা হল তাও সকলে কাজে লাগাতে পারলেনা বলদ ও বীজের অভাবে। সরকার যতই পয়সা বিতরণ করুন তার একটা সীমা ত আছে। কিন্তু একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটল। এক বছর সব জমি খালি পড়ে থাকার দরুনই হোক কিম্বা অন্য কারণে হোক, সেবার সারা গুজরাতময় যেখানে সেখানে 'সামো' বলে এক রকম বুনো শস্য এত জন্মাল যে লোকে খেয়ে শেষ করতে পারে না। তবু সে-বছর সরকার তরফ থেকে রিলিফের কাজ চালু রইল। তবে সাতান্ন সংবতের রিলিফ একটু অন্য রকমের। কর্ত্তারা স্থির করলেন যে লোক যাতে গাঁয়ে বসেই মজুরী পায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে, কেন না লোকে আবার এক বৎসর ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ালে গ্রামের জীবন একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে।

এই রিলিফ-কাজের ভার পড়ল আমাদের ওপর। ইঞ্জিনীয়ার সাহেবরা অবজ্ঞার হাসি হেসে দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু যতটা পারেন আমাদের কাজে বাগরা দিতেও কসুর করেন নেই। সরকার থেকে হুকুম বার করালেন যে আমরা যেন কোনও প্রকার ঈরিগেশান খাল-বাঁধের কাজে হাত না দেই, যেন গ্রামের মধ্যে খুচরো রাস্তা মেরামত কিম্বা গরুবাছুরের জল খাবার ডোবা সংস্কার এই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকি। বলা বাহুল্য আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম না। আমি ত আমার প্রান্তে যে কটা কাজ করিয়েছিলাম সবই ঈরিগেশান সংক্রান্ত। আমার কালেক্টর ও কমিশনর সাহেব কথা দিয়েছিলেন যে তাঁরা দেখেও দেখবেন না। কিন্তু প্রায় ধরা পড়ে গেছলাম আর কি।

গোটা তিনেক ছোটখাট ঈরিগেশানের (জল-সেচনের) বাঁধ ও পুকুর যথাসময়ে শেষ হল, কিন্তু বাঁধে পয়নালী না বসালে চাষারা ত বাঁধ ভেঙ্গে জল নেবে, ফলে বছর দুয়েকের মধ্যে সব কাজটা পণ্ড হয়ে যাবে। নল পাই কোথায়! কর্ত্তাদিকে লিখলাম যে আমাকে শ'দুই নল আনিয়ে দেওয়া হোক। কমিশনর সাহেব বড় ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে তলব করলেন সেই নলের জন্যে। সেই সাহেব কিন্তু শুনেই গাঁক করে উঠলেন, নল ত দিলেনই না উপরন্তু কইফিয়ৎ চাইলেন যে অমুক তারিখের সরকারী মন্তব্য অগ্রাহ্য করে ঈরিগেশান কাজে হাত দেওয়া হয়েছে কেন? কালেকটর আমার কইফিয়ৎ চেয়ে পাঠালেন, সঙ্গে সঙ্গে একখানা confidential পত্রও লিখলেন— গোলযোগে পড়েছ যেমন করে পার নিজেকে বাঁচাও। আমি উত্তরে রিপোর্ট করলাম যে আমার লেখার ভুল হয়েছিল, নলের কোনও প্রয়োজন নেই। আমার প্রবীণ কর্ম্মচারীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলাম কি করা যায়। তাঁদের মধ্যে একজন খুব সাহসী ও কর্ম্মঠ লোক ছিলেন। তিনি বললেন, আপনি কিছু চিন্তা করবেন না, আমাদের বাঁধগুলো নিখুঁত করতেই হবে। আমি আমার এলাকার সমস্ত কুমোরদের ডেকে পাঠাইগে। এক হপ্তা পরে আপনাকে জানাব কি ফল হয়। এক হপ্তাও লাগল না, কুমোররা মহা উৎসাহে কাজে হাত দিলে। একটা সুবিধামত জায়গা ঠিক করে নিয়ে কুড়ি তিরিশ জন কুমোর লেগে গেল পয়নালী গড়তে আর সেগুলোকে ভাটিতে পোড়াতে। কয়েক সপ্তাহ তারা সেখানেই ক্যাম্প করে রইল। অনেক নল ভাঙ্গল অনেক ফুটল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমার দরকারের বেশী নল হাতে এল। বাঁধগুলো সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হল, একটা বাঁধ কমিশনর নিজে দেখে খুব খুসী হয়ে গেছলেন। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে কাগজপত্রে এ কাজগুলোকে সমস্তই দেখানো হয়েছিল গরু মহিষের জলখাবার ব্যবস্থা বলে। বৃদ্ধ লীলী সাহেব খুব হেসে আমায় জিজ্ঞেস করলেন—ওহে! তোমার গরুগুলো ওই নলে মুখ লাগিয়ে জল খায় না জলটা বাইরে এলে খায়? আমাদের গুজ-

রাতের বড় ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন এক White সাহেব ; তিনিও আমাকে একদিন এ বিষয় নিয়ে ঠাট্টামস্করা করেছিলেন। মুখে হাসিঠাট্টা চলে, সরকারী চিঠিপত্রে ত আর চলে না। আমার অকর্ম্মের কইফিয়ত দিতে গেলে বিপদেই পড়তাম। তবে, তখনও আমীর ওমরাদের দিন একেবারে যায় নেই। প্রাণে ভরসা ছিল যে লীলীসাহেবের মত মুরুব্বী শেষ পর্য্যন্ত তাঁবেদারকে কোনও রকমে বাঁচিয়ে দেবেন, লালফিতের খপ্পরে পড়তে হবে না।

এই সাতান্ন সংবতে গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে সাহায্য করবার জন্য Special Relief Officer বলে কয়েকজন জীব নানাস্থান থেকে আমদানী করেছিলেন। আমার ভাগ্যে তাঁদের তুটী পড়েছিল, একটী সেই Smith সাহেব যার প্রেতাত্মার তাণ্ডবের কথা আগেই আপনাদের কাছে বর্ণনা করেছি। এ ভদ্রলোক ছিলেন উত্তর ভারতের একজন পেনশনপ্রাপ্ত পুলিস ইনস্‌পেক্টার, নিরীহ ভাল মানুষ, সাতেও থাকতেন না, পাঁচেও থাকতেন না, নিজের ব্যসনের কোনও রকম ব্যাঘাত না হলেই হল। তাঁর সঙ্গে সহজেই একটা রফা করে ফেলেছিলাম। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন না, আমার কথা মত তালুক আর সদরে বসে কিছু দপ্তরের কাজ করে দিতেন। অন্যজন কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের মানুষ ছিলেন ; বয়সে তরুণ, জাতে পার্সী, হৃদয়ে উচ্চ আশা। তিনি সমস্ত মহকুমার নানারকম গুপ্ততথ্য সংগ্রহ করে আমার কানে বর্ষণ করতেন। তাতে কিছু ক্ষতি হয় নেই, কেননা, তুর্ম্মুখজাতের ওপর কোনও বিশ্বাস আমার কোনও দিনই ছিলনা ; কিন্তু পরে জানলাম সে লোকটী খোদ কমিশনার সাহেবের কাছে তুই সপ্তাহ অন্তর গুপ্ত রিপোর্ট পাঠাত। আর সে গুপ্ত রিপোর্টএর সঙ্গে ফেমিন-রিলিফের কোনও বিশেষ সম্পর্কও ছিল না। অবশ্য ভদ্রলোকের গোয়েন্দাবৃত্তির খবর পাওয়ার পর তাকে সরাতে আমার বেশী দিন লাগলনা। তবে তার তুষ্কর্ম্মের ফল থেকে আমার কর্ম্মচারীদের বাঁচাতে আমায় অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। এই ভদ্রলোক সম্বন্ধে একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না। উত্তরকালে এঁর যথেষ্ট পদোন্নতি হয়েছিল, আরেকটা

মজার কথা বারদৌলীতে বাজেয়াপ্ত-করা জমী যখন নিলামে চড়ানো হয় ইনিই তার অধিকাংশ ডেকে নিয়েছিলেন।

কোনও দেশের জমীর মালিক কে, রাজা না প্রজা, এ সম্বন্ধে চিরদিনই মতভেদ আছে। কখনও বা রাজা নিজেকে বিশাংপতি, নৃপতি বলেছেন, কখনও বা ভূপতি বলেছেন। গুজরাতের পাটিদার প্রজাঁরা কিন্তু চিরদিনই নিজেদিকে তাদের ক্ষেতের মালিক বলে জানে; কেননা তাদের জমী তারা দান করতে পারে, আর যতদিন খাজনা উসুল দেয় ততদিন তাদের হাত থেকে জমী ফিরিয়ে নেওয়ার হাত রাজারও নেই। আমি অনেকবার তাদের মুখে শুনেছি যে তারা খাজনা দেয় রাজ্য-চালনার খরচখরচার দরুন। তাই বলে তারা কারও গোলাম নয়। তাদের মনে এই বিশ্বাসটা এত বদ্ধমূল থাকার দরুনই বোধ হয় গান্ধিজীর খেডা-বারদৌলী আন্দোলন এতটা কৃতকার্য্য হয়েছিল। আমি আহমেদাবাদ ছাড়বার আগে সরকার Land Revenue Code-এ এক নতুন ধারা প্রবর্ত্তন করতে চাইলেন যাতে ক'রে মুকরারী প্রজারও জমী বিক্রী করার বা বন্ধক দেওয়ার কোন হক্ থাকবে না। এই প্রস্তাব শুনে গুজরাতের পাটিদাররা ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠল। গ্রামে গ্রামে সভা-সমিতি করে তারা প্রতিবাদ করতে লাগল। আমাদের কাছে সর্ব্বদা পাটেলদের ভীড় লেগে থাকত, তারা কাতর হয়ে বারবার বলত— "সাহেব, যেমন করে পার এ আইন রদ করাও। সালিয়ানা রায়তের সঙ্গে আর আমাদের কি তফাৎ রইল! এরকম ব্যবস্থা যদি হয় ত আমাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে; মজুরী করে ত যেখানে খুসী পেট ভরাতে পারি।"

কে একজন কালেক্টর এই রকম সভাসমিতিতে যোগ দেবার জন্যে কয়েকজন পাটেলকে বরতরফ করেন। তারা কমিশনারের কাছে আপীল করে। লীলা সাহেব এ হুকুম ত রদ করলেনই, উপরন্তু গুজরাতের ছোট বড় সকল হাকিমকে একত্র করে বুঝিয়ে দিলেন যে গ্রামের পাটেল শুধু সরকারী লোক নয়, সে তার গ্রামের লোকের প্রতিনিধি।' গ্রামের ভাল মন্দের জন্য সে সভাসমিতি করতে পারে। প্রতিবাদ সত্ত্বেও নতুন

আইন যথাসময়ে পাস হল। ভোট দেওয়ার আগে ফেরোজশাহ প্রমুখ লোকনেতারা সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। সভা থেকে বেরিয়ে যাওয়াটা অনেকের চোখে একটা নাটুকে ঢঙ্গ বই কিছু না, কিন্তু বিলেতী খেলা খেলতে গেলে বিলেতী ঢঙ্গ ত আর ছাড়া যায় না। এই সময়ে আমাদের জেলায় A বলে এক সাহেব ছিলেন। এই ঢঙ্গের খবর আমরা যখন পেলাম তখন আমরা কয়েকজন একত্র চায়ের টেবিলে বসে, সবাই জাত সাহেব আমি ছাড়া, A খুব রসিকতা করে বলে উঠল—"The monkeys are learning tricks (বাঁদর খেল শিখছে)"। আমার সামনে কথাটা বলায় বড়সাহেব একটু অপ্রস্তুত হলেন, বোধ হয় আমাকে একটু আশ্বস্ত করার জন্যেই কানে কানে বললেন "Fancy A calling anybody a monkey !"

A সত্যই কতকটা কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত ছিল। একবার কি কীর্ত্তি করেছিল আপনারা শুনুন—আহমেদাবাদ জেলার উত্তরভাগে সরকারী Salt Range আছে, সেই Rangeএর সীমান্তে কড়া পাহারা। দুটো বেড়ার মাঝখান দিয়ে লম্বা রাস্তা চলে গেছে, মাঝে মাঝে সিপাহীদের ঘাটি, বিনা অনুমতিতে সে রাস্তায় কারও চলার হুকুম নেই; বিশেষতঃ রাত্রে। একদিন A অন্য এক সাহেবের তাম্বুতে খানা খেয়ে ফেরবার পথে গভীর রাত্রে সেই রাস্তায় ঢুকে পড়েছিল। সে নিজে হাকিম, নিয়মকানুনের কদর তার জানা উচিত ছিল। ঘাটির সিপাহী যখন "হল্ট, হুকুমদার" বলে হাঁকল তখন তার থামা উচিত ছিল। তা না করে সে 'চুপ রও' বলে ঘোড়া আরও ছুটিয়ে দিলে; সেপাইদের বাঁশী বেজে উঠল, চারিদিক থেকে পাহারাওয়ালা এসে Aকে হেঁচড়ে ঘোড়া থেকে টেনে পাড়লে, তারপর ধাক্কা মারতে মারতে গারদে নিয়ে গেল। তখনও A নিজের পরিচয় দিলে না; ভোরবেলা ইন্‌স্পেক্টারের কাছে খবর গেল যে এক গোরা নিমক-চোর ধরা পড়েছে, তাকে গারদে পুরে রাখা হয়েছে। ইন্‌স্পেক্টার তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখে A রাগে ফুলছে। একটা মিটমাট হয়ে গেল। সকাল বেলা A তার ক্যাম্পে ফিরে চাকরবাকরদের চিন্তা

দূর করলে। এ হেন লোকের ফেরোজশাহকে বাঁদর বলা একটু হাস্যাস্পদ বই কি!

উপরে এইমাত্র বল্লাম যে লীলীসাহেব পাটেলকে গ্রামের প্রতিনিধি বলে মনে করতেন। শুধু লীলীসাহেব কেন, বোম্বাই সরকারেরও এই বিশ্বাস ছিল। আমাদের ক্যাম্প প্রবাসের সময় যে সমস্ত কাজ করতে হত তার মধ্যে জমাবন্দি একটা খুব বড় কাজ ছিল। একটা কোনও সুগম দেখে স্থান বেছে নিয়ে সেইখানে জমাবন্দি ক্যাম্প হত। এক একদিন পঞ্চাশ ষাটটা গ্রামের প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রান্ত-সাহেব দেখা করতেন, আর প্রত্যেক গ্রামের দেয় খাজনা কি সেইটে সরকার তরফ থেকে জানাতেন। অবশ্য একবার জরীপ ও ব্যবস্থা হয়ে গেলে দেয় খাজনা বাঁধা হয়ে যেত; তবু এই প্রাচীন প্রথাটা আমার সময়ে কায়েম ছিল। নদীর চরে তরমুজ কি খরমুজার চাষের দরুন সরকারের যেটা প্রাপ্য সেটা প্রতিনিধিদের শুনিয়ে দেওয়া হত, কারণ এই প্রাপ্যটা বছর বছর বদলাত। যাহোক মোট কথাটা এই যে সাহেব দরবার করে বসে প্রত্যেক গ্রামের পাটেল তলাটি ও দুএকজন মাতব্বরকে জানিয়ে দিতেন যে গ্রামের দেয় কর মোট কত; যেন এই প্রতিনিধিরাই সারা গ্রামের তরফ থেকে এই দেয় করটা মেনে নিতেন। এর পেছনে আমি ত দেখি একটা পরিষ্কার village community-র ধারা, অর্থাৎ সমস্ত গ্রাম মিলে যেন সরকারের কাছে খাজনার জন্য দায়ী। জমাবন্দিতে কোনও প্রজার স্বতন্ত্র উল্লেখ হত না। গ্রামের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে পান আতর দিয়ে এক এক দল মাতব্বর বিদায় করতে পাঁচ মিনিটের বেশী লাগত না। Red Tape-এর দিক থেকে দেখতে গেলে এই জমা-বন্দি ক্যাম্পকে সহজেই হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এর একটা মহত্ত্ব ছিল তখনকার দিনে, হয়ত আজও আছে।

এই গুজরাতের পাটিদারদের কথা বারবার এত করে বলছি তাদের আমি বড় ভালবাসতাম বলে। বেশ solid (সারবান) মানুষ, —যে রকম লোককে বিলেতী ভাষায় hearts of oak ইত্যাদি কত

কথাই বলা হয়েছে। গ্রামের ভার, গ্রামের স্বাধীনতা এদের হাতে সঁপে দিয়ে একদিন গুজরাতের লোকে নিশ্চিন্ত থাকতে পারত। এক Village Hampden-এর গল্প করি শুনুন—আমরা দুটী প্রাণী, একটী কাল ও একটী সাদা সাহেব শীকার করে বেড়াচ্ছি। স্থানটা গ্রামের কাছে না হলেও, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মনসাবেড়া দিয়ে ঘেরা পাটেলদের ক্ষেতের মাঝখানে ; হঠাৎ একটা বড় ঝাঁক পাখী মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। বন্ধু হাঁকলেন, mark! অমনি দুটো বন্দুক একসঙ্গে ছুটল, গোটা কুড়িক নিরীহ পাখী (নিরীহ কিন্তু অতি সুস্বাদু) চারিদিকে টপটপ করে পড়ল। অধিকাংশ পড়ল সরকারী পোড়ো জমিতে কিন্তু গোটা কয়েক পড়ল এক পাটেলের ক্ষেতের বেড়ার মধ্যে। পাখী আনতে সেপাই পাঠানো হল। সেপাই এসে রিপোর্ট করলে হারামখোর পাটেল কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। ছ'ছটা পাখী ছেড়েও ত দেওয়া যায় না! অগত্যা দুই সশস্ত্র হাকীম হানা দিলে পাটেলের ক্ষেতে। পাটেল এসে বেড়ার ফাঁকে দাঁড়াল। মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী, হাতে প্রকাণ্ড হুঁকো, কিন্তু নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদের মত, একেবারে নিরস্ত্র। গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করলে আমার ক্ষেতে তোমরা কি হকে ঢোক সাহেব? সত্যিকারের সাহেবটী—অর্থাৎ Hampden-এর দেশের লোক ভাঙ্গা গুজরাতিতে উত্তর দিলে আমাদের পাখী পড়েছে তোর ক্ষেতে, আমি নিশ্চয় নিয়ে যাব, জোর করে। পাটেল পা ফাঁক করে গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বল্লে—নিয়ে যাবে, নিয়ে যাও ; কিন্তু আমার সাধ্য যতক্ষণ আছে আমি আটকাব। গল্পটা সামান্য কিন্তু যথার্থ peasent proprietor কি প্রকার লোক হয় তা চোখে দেখলাম। পাখী কটা রণক্ষেত্রে ফেলে দিয়েই শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করলাম।

আহমেদাবাদ জেলার পাটিদারেরা কুঁদুলে মানুষ নয়, কতকটা গম্ভীর প্রকৃতির। কিন্তু পাশের জেলাতে (খেড়ায়) তাদের প্রতিপত্তি অন্যরকম ; সেখানে দাঙ্গাহাঙ্গামা খুনখারাবী সবেতেই পাটেলেরা অগ্রণী। অবশ্য ব্রোচ জেলার পাটিদার বোহ্‌রারা এদিক দিয়ে আরও খ্যাতি অর্জ্জন করেছিল। তবে তারা পাটিদার হলেও মুসলমান ; তাদের

কথা স্বতন্ত্র ; অস্ত্রের ব্যবহার তারা এখনও ভোলে নাই। খেড়া জেলার একটা গল্প বলি শুনুন। একটা বেশ বড় গ্রামে দুই পাটেলে অনেকদিন থেকে মামলা মোকর্দ্দমা ঝগড়া কাজিয়া চলছিল। সেই গ্রামের লাগা নদীর কিনারায় এক মস্ত সরকারী বাবলাবন ছিল। এদের একজন সরকারে দরখাস্ত করে খবর দিলে যে অন্য একজন অনেকগুলো বাবলাগাছ কেটে চুরী করে নিয়ে গেছে। সদর থেকে একজন কর্ম্মচারী খোঁজ করতে এল, সঙ্গে চাপরাসী চৌকীদার, গ্রামের পাটেল তলাটি, গ্রামের লোকও সবাই জমা হল, তার মধ্যে ফরিয়াদী ও আসামী। স্থানটা নির্জ্জন, গ্রাম থেকে বহুদূরে, কাছে চাষবাসও নেই। সরকারী লোক চলেছে আর তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ফরিয়াদী কাটা গাছগুলো দেখাতে, "রাও সাহেব, এই পয়লা, এই দোসরা, এই তেসরা"। আসামী আর "এই চৌঠা" বলে হাঁক মেরে এক চৌকীদারের হাত থেকে টাঙ্গি ছিনিয়ে নিয়ে এককোপে ফরিয়াদীর মাথা উড়িয়ে দিলে। দিন দুপুরে এতগুলো লোকের সাক্ষাতে এরকম ব্যাপার শোনা যায় সীমান্ত প্রদেশেই হয়। যে যেখানে ছিল সবাই পালাল। যখন পুলিশ বিকেলবেলা বাবলাবনে গেল তখন সেখানে লাশের কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না। সত্যি, মানুষের লাশ পাওয়াই যায় নেই, এক চটের থলিতে সেলাই করা দু'দশটা হাড় নদীগর্ভে পাওয়া গেছে বলে পুলিশ হাজির করে। কিন্তু ডাক্তার সাহেবদের মন ভোলাতে পারে নেই। ঘটনাটা আমি চোখে দেখি নেই, মোকর্দ্দমা আমার এজলাসে হয়েছিল, আর আশ্চর্য্য এই, justice is blind। লোকটাকে আমি ছেড়েও দিয়েছিলুম।

পাটিদারদের সম্বন্ধে আমি অনেক কথাই বল্লাম, দোষেগুণে তারা একটা বড় জাত। গুজরাতের ভবিষ্যৎ পলিটিকাল উন্নতির ধারা তাদের উপর অনেকটা নির্ভর করছে।

কিন্তু এই পাটিদারদের চেয়েও আরেকটা জাতের সঙ্গে আহমেদাবাদ জেলায় আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল। তারা গিরাসিয়া রাজপুত। প্রাচীন কালে যোদ্ধা ছিলেন, এখন আর যুদ্ধও

করেন না। আভিজাত্যের সকল গুণই তাঁদের মধ্যে আছে, কেবল পয়সা নেই। আমার প্রান্তে অনেকগুলো গ্রাম তালুকদারী-গ্রাম ছিল, অর্থাৎ সেখানকার ভূস্বামী প্রজাদের কাছে খাজনা সংগ্রহ করতেন আর গ্রামের দেয় কর সরকারকে দিতেন। কিন্তু এই ভদ্রলোকেরা আয় ব্যয়ের ওজন কিছুতেই ঠিক করতে পারতেন না। আমার সময়ে অধিকাংশ তালুকদারী গ্রামের ভার সরকার নিজের হাতে নিয়েছিলেন, আর তালুকদার মশাইকে পেনশন স্বরূপ কিছু দিতেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু অধিকাংশই অতীব গরীব। কোনও রকমে ঘরদোরের বাইরের চাকচিক্য বজায় রাখতেন। কিন্তু গরীব হলে কি হয়, কি আশ্চর্য্য খানদানী এঁদের চাল, কথাবার্ত্তা কইতেন কি সুন্দর ভাষায়। যে গুজরাতি একটা নিতান্ত আটপৌড়ে বড়বাজারের বুলি তাই এদের মুখে শোনাত যেন মোগল দিল্লীর কি বুরবঁ প্যারিসের চোস্ত জবান। কাজ উপলক্ষে গ্রামে গেলেই তালুকদার মহাশয়ের বইঠকখানায় অন্তত আধঘণ্টার জন্যে বসতে হত। একটা ছোটখাট দরবার গোছের হত। কোথা থেকে বেরত এক রূপার আতরদান, কোথা থেকে আসত এক জীর্ণ কাশ্মীরী শাল অতিথির আসনের জন্যে। আমি সব সময়ে কথার মাত্রা ঠিক রাখতে পারতাম না। ভাবের আতিশয্যে দুচারটে নিতান্ত অর্থহীন সমবেদনার কথা বলে ফেলতাম। অথচ তাদের সত্যি উপকার করবার কোনও ক্ষমতাই আমার ছিল না। একবাব হোলির সময়ে আমার ক্যাম্প পড়েছিল কতকগুলি রাজপুত গ্রামের মাঝে; কদিন ধরে গ্রামের মেয়েরা দলে দলে গান করতে করতে আবির কুঙ্কুমের থালা হাতে আমার ক্যাম্পে আসতে লাগল। আমার করণীয় কি তা ঠিক জানতাম না, গ্রামের লোকের সঙ্গে হোলিখেলায় মেতে ওঠা ঠিক যুক্তিসঙ্গত নয় এটাও বুঝলাম, অথচ এ বেচারারা সাধ্যের অতীত খরচ করে আবির কুঙ্কুমের ভেট নিয়ে এসেছে। শেষে ভেবে চিন্তে অনেকগুলো টাকা নানারকমে ওই কয় গ্রামে খরচ করে ঋণমুক্ত হলাম। একবার করলাম কি উদয়পুর থেকে একজন ভাল চারণ আনালাম।

সন্ধ্যাবেলায় প্রায়ই ক্যাম্পে গানের মজলিস করে আশেপাশের গিরাসিয়া তালুকদার ও অন্য সাধারণ রাজপুতদের নিমন্ত্রণ করলাম। তাঁরা সবাই মহা আগ্রহে গান শুনতে এলেন, আর আমি যে তাঁদেরই জন্য উদয়পুর থেকে বারোটজীকে নিমন্ত্রণ করে আনিয়েছিলাম এতে তাঁরা সত্যই বড় খুসী হয়েছিলেন। অনেক গিরাসিয়া বৃদ্ধ আমাকে বলেছিলেন যে আমি তাঁদের একজন দরদী বন্ধু।

গুজরাতের আরেকটা কথা বলেই এবারকার প্রসঙ্গ শেষ করব। একদিন আমি মীড্ বলে এক সাহেবের সঙ্গে এক ক্যাম্পে রয়েছি, সন্ধ্যা-বেলায় খাওয়াদাওয়ার পর চারপাইএ শুয়ে শুয়ে দুজনে গল্প করছি, হটাৎ মীড্ চেঁচিয়ে উঠল দেখ—ডাট্ আমি কেম্ব্রিজে এক আশ্চর্য্য বাঙ্গালীকে চিনতাম। নানা রকমে আশ্চর্য্য মানুষ, তার খবর তুমি কিছু জান? নাম ঘোষ। আমাদের সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ হয়েছিল কিন্তু চাকরী পায় নেই। আমি বল্লাম, "আমি তাকে চিনি না, কিন্তু সে নিশ্চয়ই অরবিন্দ ঘোষ, বড়োদা কলেজের প্রিন্সিপাল।" মীড্ বল্লে, "তুমি চেননা? চেষ্টা করে আলাপ কোরো, জানবার মতন মানুষ।" আমি মনে মনে স্থির করলাম যে যত শীঘ্র পারি অরবিন্দবাবুর সঙ্গে আলাপ করব। ঘটনাক্রমে এর মাস দুই পরেই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হল। বোম্বাই যাচ্ছি, বড়োদা ষ্টেশনে দেখি চিত্রকর শশিকুমার হেশ। তাঁকে গাড়ীতে তুলে দিতে এসেছেন তিনচারজন ভদ্রলোক। হেশ তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। প্রথমজন একজন কৃশকায় বাঙ্গালী চোগা-চাপকান পরা, মাথায় বাউরিকাটা চুল, তার ওপরে পিরিলী পাগড়ী, স্বল্পভাষী, মুখে মিষ্টি হাসি। চোস্ত ইংরাজীতে ভদ্রলোক বল্লেন, "এত কাছাকাছি আমরা দুজন বাঙ্গালী থাকি তবু আজও আমাদের আলাপ হয়নি, আশ্চর্য্য! আমি আসব আপনার কাছে।" অরবিন্দের আত্মীয়-স্বজন অনেককেই জানতাম, তাঁর কথা সবই শুনেছিলাম, চিনতে একটুও দেরী হ'ল না। আমি সাদরে নিমন্ত্রণ করলাম। কিন্তু দুজনার সত্য পরিচয় হতে আরও

বছর চারেক দেরী হয়েছিল। দ্বিতীয়জন একজন মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোক, সৌম্যমূর্ত্তি, নাম দেশপাণ্ডে, অরবিন্দের পরম বন্ধু। পরে এঁর সঙ্গেও খুব ভাল করে জানাজানি হয়েছিল। তৃতীয়জনের নাম যতীন্দ্রনাথ, জাতে কনৌজিয়া, ধর্ম্মে হিন্দু, পেশা বড়োদা পলটনে সিপাহীগিরি, দীর্ঘকায়, বিরাটবক্ষ, দেখলে কারও মনে সন্দেহ থাকে না যে সিপাহী হবার জন্যই তাঁর জন্ম; কিন্তু সিপাহী বেশী দিন থাকতে হল না। কর্ত্তৃপক্ষ খবর পেলেন সে ভদ্রলোক জাতে ঠিক কনৌজিয়া নহেন, বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। তাঁকে বড়োদা ত্যাগ করতে হল। যতীন্দ্রনাথকে নিরালম্ব স্বামীরূপেও অনেকে দেখেছেন। বড়োদা ষ্টেশানের ঘটনাটা উল্লেখ করে রাখলাম যদিচ আমার কাছে ছাড়া অন্যের কাছে এর কোনও মূল্য নেই।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাভূমি ও দর্শন

সংস্কৃতির ক্রমবিবর্ত্তনে ওগুস্ত্ কঁত্ তিনটি স্তর নির্ণয় করেছেন— পৌরাণিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। ভূতলের নিম্ন ও ক্লিন্ন স্তরগুলি অতিক্রম করে মানবচিত্তের উর্দ্ধগগনপ্রয়াসী অভিযান আজ হিমাদ্রির সর্ব্বোচ্চ বিজ্ঞানজোতিঃস্নাত শিখরে জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেছে ব'লে তাঁর বিশ্বাস। পারলৌকিক তত্ত্ব ও ধর্ম্মানুষ্ঠানিক আচরণও পূর্ব্বোক্ত পৌরাণিক শব্দের অন্তঃপাতী, এই অর্থে পৌরাণিক যুগ আজো সমাপ্ত কিনা, এবং তার বিবিধ প্রভাব লক্ষ্যত অলক্ষ্যত বর্ত্তমানের চিন্তায় কল্পনায় ও কাজে কতখানি অনুপ্রবিষ্ট, তা' অবশ্য তর্কাধীন। কিন্তু দার্শনিক তত্ত্বালোচনার প্রয়োজন যে আজ নিঃশেষ হয়ে যায় নি, বরঞ্চ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অপরিহার্য্য ও অনিবার্য্য হয়ে পড়েছে, তাতে প্রতর্কের অবকাশ নেই। স্বীকার করতেই হবে যে পণ্ডিত অপণ্ডিত নির্ব্বিশেষে অনেকের ধারণা, শতাব্দীর পর শতাব্দী দর্শনের মন্ত্রমুখরিত বাক্যের বকযন্ত্র-পরম্পরায় পরিশোধিত হয়ে যে সারবস্তুটি বেরিয়ে এসেছে তা'তে অর্থের চেয়ে অনর্থের মাত্রাই অধিক। এ-কথাও স্বীকার করতে হবে যে এই অখ্যাতিটি নিতান্ত অগ্রাহ্য নয়, এর দায়িত্বের ভার বহন করতে হবে দার্শনিকদেরই শূন্যসঞ্চরণপ্রিয় কল্পনাবৃত্তিকে। এই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল পরিদৃশ্যমান জগৎকে প্রতিভাসমাত্র জ্ঞান ক'রে যাঁরা কোনো এক ঊর্দ্ধ অতীন্দ্রিয় লোকে নিত্য নিরালম্ব পরম সত্তার সন্ধানে দর্শনকে নিযুক্ত করেছেন, তাঁদের বাস্তব-বিমুখতাই আজ তাঁদের অবচ্ছিন্ন তত্ত্বসম্ভারকে প্রগতির রাজপথ থেকে ঝেঁটিয়ে ফেলা আবর্জ্জনাস্তূপে পরিণত করেছে। এঁদের বিশ্বাস ছিল যে ধ্রুব অবিসংবাদিত সত্যের অবতারণা কেবল বিশুদ্ধ বুদ্ধির ক্ষেত্রেই সম্ভবপর, তাই এঁরা ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে পরাবিদ্যার অযোগ্য মনে করলেন। ভাবলেন যে অবিমিশ্র বুদ্ধিজাত কোনো একটি মূল প্রত্যয়ের (concept) মধ্যেই বিশ্বজগতের সমস্ত রহস্য নিহিত। সেই প্রত্যয়টির বিশ্লেষণ ও

অপাবরণেই পরমাণু থেকে নীহারিকা পর্য্যন্ত, জীবকোষ থেকে মানবাত্মা পর্য্যন্ত, যাবতীয় বিশ্বব্যাপারের চরম ব্যাখ্যা মিলবে। ভগবান যেন মহাগাণিতিকরূপে জগৎটাকে জ্যামিতির আঁটবাঁধা যুক্তির ছকে ফেলে গড়েছেন, কেবল গোড়ার সূত্রটি ধরতে পারলেই আর ভাবনা নেই।

অদৃশ্যলোকের জ্যোতিচ্ছটায় যে-দার্শনিকদের ধ্যানদৃষ্টি নিবদ্ধ, প্লেটো তাঁদের অন্যতম। তাঁর মতবাদ অনুসারে প্রত্যেক বস্তু এক-একটি শ্রেণীভুক্ত, এবং প্রত্যেক শ্রেণীর মূলে রয়েছে একটি সামান্যরূপ (eidos, form)। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষ বস্তুগুলির কোনো পারমার্থিক সত্তা নেই, সে-দাবী কেবল বুদ্ধিগম্য সামান্যরূপের। অবশ্য প্রত্যক্ষ বস্তুকে প্লেটো একেবারে অস্বীকারও করেন নি; তিনি এক আদি অবিশেষ অগুণ জড়পদার্থের কল্পনা করেছেন যার উপর সামান্যরূপ-গুলির ছাপ দিয়ে দিয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ জগতের বিভিন্ন বস্তুনিচয় গঠিত,—ঠিক যেমন ট্যাকশালে রূপায় বিভিন্ন মুদ্রার ছাপ মেরে টাকা আধুলি প্রভৃতি গড়া হয়। এই সামান্যরূপগুলি যে কেবল আমাদের খামখেয়ালী মনের ধারণা বা কল্পনা তা' নয়। অবশ্য এই ধূলির ধরণীতে তাদের সাক্ষাৎ মেলা অসম্ভব, কিন্তু প্লেটোর অবিচলিত বিশ্বাস যে তারা আমাদের দেশকাল-পরিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়কলুষিত জগতের পরপারে কোনো এক প্রজ্ঞাপ্রদীপ্ত দ্যুলোকে বাস্তব ও স্বতন্ত্র রূপে বিদ্যমান। আমরাও ভূতলে নামবার পূর্ব্বে সেই দ্যুলোকবাসী ছিলাম, এবং সেখানকার ক্ষীণায়মান স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে জন্মেছি। সে স্মৃতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই জ্ঞানীর সাধনা। সামান্যরূপগুলির মধ্যে আবার সত্তার তারতম্য বর্ত্তমান এবং প্লেটো তাদের পর্য্যায়ানুক্রমে সাজাবার চেষ্টা করেছেন। এই বিন্যাসের ফলে তিনি শ্রেয়সের সামান্যরূপকে সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বপ্রধান সত্তা নির্দ্ধারিত করেন। শ্রেয়সই হল বিশ্বের আদি কারণ ও অন্তিম পরিণতি, তারই দিব্যকিরণসম্পাতে সমগ্র বিশ্বজগৎ উদ্‌ভাসিত। তার অতীন্দ্রিয় পরম স্বরূপটি একবার যদি বিশুদ্ধ বুদ্ধির পরিচর্য্যায় উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায় তা' হলে সেই প্রখর দীপ্তিচ্ছটায় আমরা নিখিল

ভুবনের রহস্য-কুহেলিকা ভেদ করে তা'র অন্তর্নিগূঢ় সত্য অবলোকন করতে পারব—এমনতর উদ্দাম কল্পনা-বিলাসের বিরুদ্ধে কোনো-রূপ ন্যায়সঙ্গত যুক্তিতর্কের অবতারণাও বৃথা। প্লেটো তাঁর রামরাজ্যের পরিকল্পনা থেকে কবিদের নির্ম্মমভাবে বিতাড়িত করেছেন, কিন্তু তাঁর নিজের বিষয় নির্ব্বাচন ও রচনাভঙ্গিতে কাব্যের যে অকৃপণ আমেজ পাওয়া যায় তা' তাঁর সহধুরীদের সম্মিলিত অবদানকেও হার মানাতে পারে। উক্ত মতবাদের কাব্যসমৃদ্ধি হয়ত যথেষ্ট আছে, কিন্তু দার্শনিক বিচারক্ষেত্রে আমরা যে অটুট যুক্তিসূত্র প্রত্যাশা ক'রে থাকি তার অভাব শোচনীয়। শ্রেয়সকে বিশ্বের মূল উৎস ও চরম পরিপূর্ত্তি নির্দ্ধারিত করায় প্লেটো যতখানি ন্যায়তৎপরতার পরিচয় দিয়েছেন ততখানি যুক্তিনির্ভরতার আভাস দেন নি, তবে এ-ক্ষেত্রে তাঁর চরিত্র-নীতিগ্রস্ত স্বর্গীয় গুরুদেবের অশরীরী অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ তাঁকে কতদূর চালনা করেছে বলা শক্ত।

স্পিনোজার দর্শনের একদিকে রয়েছে গণিতপ্রীতি এবং অপর দিকে ভগবদ্‌ভক্তি, মাঝখানকার পথটা এতই শীর্ণ যে তাতে ক'রে গন্তব্যে পৌঁছানো তাঁর মত মহারথীর পক্ষেও সম্ভব হয় নি। এই দার্শনিক মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে তাঁর দর্শন-সাধনার অনুপ্রেরণা কোনো বুদ্ধিগত তত্ত্বানুসন্ধান নয়, এমন একটি সম্পূর্ণ সমাহিত সত্তার অন্বেষণ যার ধ্যানে মানবচিত্ত পেতে পারে অক্ষয় শান্তি। সে পরম সত্তা থেকে অন্য সমস্ত গৌণ সত্তাকে ইনি অনুমানসূত্রে টেনে বের করতে চান জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাগুলির মত অবিচ্ছিন্ন পৌর্ব্বাপর্য্যে, এবং সেই উদ্দেশ্যে এঁর রচনারীতি য়ুক্লিডের রচনার হুবহু নকল। এই বহ্বারম্ভের ব্যর্থতায় আমরা সমবেদনা বোধ করতে পারি কিন্তু বিস্মিত হতে পারি না, কারণ ভগবানের অনন্ত অভিপ্রায় আমাদের অজ্ঞাত থাকলেও এটা অনুমান করা শক্ত নয় যে বিশ্বরচনার কালে য়ুক্লিডের বিশুদ্ধ জ্যামিতিক আদর্শ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত ছিল না।

এ-দু'টো উদাহরণ থেকেই বোঝা যাবে যে প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন কোনো কোনো দার্শনিক দর্শনকে বস্তুবিশ্বের সকল সংস্পর্শ বাঁচিয়ে

কোন্ সুদূর কল্পলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এঁদের দর্শন অনেকটা পুরাণের কোল-ঘেঁষা, দুটোই প্রত্যক্ষ জগৎকে অগ্রাহ্য ক'রে চ'লে যায় কল্পনার মায়াপুরীতে। তফাৎ এই যে পুরাণ হল সমষ্টি-মনের সৃষ্টি, এবং দর্শনের উৎপত্তি ব্যক্তিবিশেষের চিত্তস্বাতন্ত্র্যে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে পুরাণ ও ধর্ম্মের সঙ্গে দর্শনের যে চিরন্তন বিরোধ তাকে সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টির বিরোধ মনে করা অসঙ্গত নয়। মানুষ জন্মজন্মান্তর যে সমাজপ্রতিষ্ঠিত চিন্তা ও বিশ্বাসের শাসন মেনে চলতে অভ্যস্ত, তার প্রতি বিদ্রোহ-ঘোষণাতেই দর্শনের উপক্রমণিকা। দেকার্ত যে তাঁর দর্শনচর্চ্চার পূর্ব্বে একবার সংশয়ের মুক্ত প্রাঙ্গণে ঘু'রে নেওয়া আবশ্যক মনে করেছিলেন তা' খুবই স্বাভাবিক। সে যুগের মন চার্চ্চের মানসিক ও আনুষ্ঠানিক বিধিনিষেধের নিঃশ্বাসরোধকারী কবলে এমনই মুমূর্ষু হয়ে পড়েছিল যে সংশয়ের খোলা হাওয়া না পেলে তার পুনরজীবন সম্ভব ছিল না।

দর্শনের শূন্যপ্রয়াণকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে যদি তার মোড় ফেরানো যায়, তা' হলে বাস্তব সত্তার কোন্ অংশ বা রূপ বিশেষভাবে তার অবধানের যোগ্য সেটার আলোচনা দরকার। প্রকৃত পক্ষে দর্শনের সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞেয় জগতের যে-সম্বন্ধ তা প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানই সে-সম্বন্ধের প্রধান বাহন। নৈমিত্তিক জীবনের আশু প্রয়োজনে আমরা অনেক প্রত্যয় গড়ে তুলি, তাদের সম্বন্ধে কোনো খুঁটিনাটি প্রশ্ন করার অবকাশও ঘটে না, আবশ্যকও দেখি না। কালক্রমে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি-নির্ম্মাণের কাজে যখন এদের ডাক পড়ে তখনো এরা অনেক সময়ে বিচার-বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, হয়তো বা আপন অতিপরিচিতির জন্যই।

সাধারণ জীবনের স্থূল কাজকর্ম্ম ও চিন্তার এতে বিশেষ ক্ষতি হবার কথা নয়, এমন কি বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতর তথ্যসঙ্কলন ও তত্ত্বসংগঠনও অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে চলে বিনা বিপত্তিতে। তবে এমনও প্রায়ই ঘটে যে যে-গলদগুলিকে গোড়ায় অগ্রাহ্য করা হয়েছিল তারাই কালে কালে কণ্টকিত হয়ে উঠে প্রগতির মসৃণ পথকে দুর্গম ক'রে

তোলে, যেমন আজ ঘটেছে পদার্থবিজ্ঞানে। এই মূলপ্রত্যয়গুলির অর্থবিভ্রাট ঘোচানো এবং তাদের সঠিক সংজ্ঞাবধারণের ভার কোনো বৈজ্ঞানিক নিতে রাজি ন'ন, তা' ছাড়া যে-শিক্ষা ও সাধনার ভিতর দিয়ে তাঁদের মনঃপ্রকৃতি সাধারণত গড়ে ওঠে, তা' এর সম্যক অনুকূলও নয়। এই কাজের দায়িত্ব আজ নিতে হয়েছে দার্শনিককে। উদাহরণ স্বরূপ স্থান প্রত্যয়টির কথা ধরা যাক। আমার হাতে যে পেন্‌সিলটি রয়েছে তার স্থান নির্দ্দেশ করা শক্ত নয়, কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করি যে সামনের আরশিতে তার যে-প্রতিবিম্ব পড়েছে তার অবস্থিতি কোথায়, তা' হলে ব্যাপারটা তত সহজ ঠেকবে না। জ্যামিতিক আলোবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে পদার্থবৈজ্ঞানিক বলতে পারেন যে প্রতিবিম্বের স্থান আরশির পিছনে, এবং ঠিক ততখানি পিছনে, পেন্‌সিলটা তার যতখানি সামনে। কিন্তু সে-জায়গা সম্ভবত দেওয়াল দরজা কিম্বা কোনো আসবাবপত্রে ভর্ত্তি,—সে-ভর্ত্তি স্থানটিতে প্রতিবিম্ব অবস্থিত বলবার মানে কি? প্রতিবিম্ব কি কোনো জায়গা দখল করে না, যদি না ক'রে থাকে তা' হলে তার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় কিসে? তার পরে মানস চিত্রের অবস্থিত সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠলে তো অবস্থা আরো সঙ্গীন।

তাজমহলের যে ছায়ামূর্ত্তি এখন আমার কল্পনাপটে উদ্ভাসিত তার স্থান কোথায়? সত্যকার তাজমহল যেখানে? আমার মাথার মধ্যে মস্তিষ্কের কোনো অংশে? না চোখ থেকে দু তিন হাত সামনে, কাল্পনিক মূর্ত্তিগুলি যেখানে অবস্থিত ব'লে প্রতীতি হয়? না কি যে দেশে তার অবস্থান তা' আমাদের সার্ব্বজনীন পদার্থবৈজ্ঞানিক দেশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক অন্য একটা দেশ? সে মানসচিত্রের কালও কি তা' হলে পদার্থবৈজ্ঞানিক কাল থেকে বিচ্ছিন্ন?—প্রশ্নের অন্ত নেই, এবং সে সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া পরীক্ষাগারের সুদক্ষ, স্নায়ুবিদ্যায় সুপণ্ডিত মনোবৈজ্ঞানিকের কাজ নয়। অগত্যা ডাক পড়ে দার্শনিকের।

প্রত্যেক সুগঠিত ও পরিণত বিজ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে নিয়মের সূত্রে গ্রথিত করা, এবং সে নিয়মকে আরো

ব্যাপক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা ; একেই বলা হয় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা-পরম্পরায় আমরা শেষকালে এমন কতকগুলো প্রাথমিক নিয়মে গিয়ে পৌঁছুই যাদের আর কোনোরূপ ব্যাখ্যা উক্ত বিজ্ঞানের পরিধিতে সম্ভব নয়, স্বতঃসিদ্ধ ব'লে তাদের চোখ বুজে মেনে নেওয়াই নিরাপদ। বিজ্ঞানের এই মৌল স্বীকৃতিগুলি (assumptions) অনেক ক্ষেত্রে আদিম মানবের সহজ বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত, অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের শৈশবাবস্থায় সাময়িক প্রয়োজন-মত নির্ব্বিচারে তাদের চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার পর থেকে বৈজ্ঞানিক মহারথিগণ এগিয়ে চলতে এতই ব্যস্ত যে পিছনের দিকে ফিরে তাকাবার তাঁদের সময়ই নেই। তা ছাড়া সে স্বীকৃতিগুলি আপাতদৃষ্টিতে এমনই সুস্পষ্ট ও সুবিশ্বাস্য ব'লে বোধ হয় যে তাদের নিয়ে অকারণে নাড়াচাড়া করাকে কালক্ষেপ ভাবা অস্বাভাবিক নয়। অথচ সুস্পষ্টতা ও সত্যতায় যে কোনো আত্মীয়-সম্বন্ধ নেই তা বৈজ্ঞানিক গবেষণার কল্যাণেই বারে বারে প্রতিপন্ন হয়ে গেছে। পৃথিবী যে সমতল এবং স্থিতিশীল, মাত্র কয়েক শ' বছর আগে এর চেয়ে সুস্পষ্ট কী ছিল। কিন্তু কোপর্নিকস্ যখন একে মিথ্যা ব'লে ঘোষণা করলেন, তখন সুস্পষ্টতার দোহাই আর টিকল কই। কাজেই বৈজ্ঞানিক মূলসূত্রগুলি যতই সুস্পষ্ট হোক, তাদের বিশ্লেষণ ও বিচারের প্রয়োজন আছে, এ-কথা মানতে হবে। বিশেষ করে মানতে হবে আজকের দিনে যখন পদার্থবিজ্ঞান আপন উধাও রথচক্রের ধূলায় আপনি অন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। এই কাজটা প্রধানত দার্শনিকের বিভাগভুক্ত হলেও বৈজ্ঞানিকরা যে এতে পরাঙ্মুখ বা পশ্চাৎপদ নন, তা' আইনষ্টাইন্ পোঁয়াকারে প্রভৃতির নাম স্মরণ করলেই বোঝা যাবে। উক্ত বিজ্ঞান-মনীষীদের গবেষণার সঙ্গে রাসেল, হোয়াইট্‌হেড্, ব্রড্ প্রভৃতির তত্ত্বালোচনার বড় একটা বর্ণভেদ নেই, তফাৎ এই যে, প্রথমত তাঁরা এ ক্ষেত্রেও ভাষার চেয়ে গাণিতিক সঙ্কেতের উপর বেশী নির্ভর করেছেন ; এবং দ্বিতীয়ত, তাঁরা আগাগোড়া কেবল আপন বিভাগভুক্ত পদার্থবিজ্ঞানের দিকেই নজর রেখেছেন, কিন্তু দার্শনিককে মনে রাখতে হয় সমস্ত বিজ্ঞানের বিচিত্র এবং কোনো

কোনো সময়ে বিরোধী অভাব-অভিযোগের কথা। উপরের মন্তব্যটাকে আরো পরিস্ফুট করবার জন্য কার্য্যকারণ নিয়মের দৃষ্টান্ত আলোচনা করা যেতে পারে। নিয়মটা মোটামুটি এই :—যে কোনো ঘটনা ক-এর সঙ্গে অন্য কতগুলো পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা চ, ছ, জ-এর এমন সম্বন্ধ যে সেগুলির সন্নিপাতে ক সর্ব্বদা ঘটেছে এবং সর্ব্বদা ঘটতে বাধ্য। "সর্ব্বদা ঘটেছে" এটা তথ্যগত সংবাদ হতে পারে, কিন্তু "সর্ব্বদা ঘটতে বাধ্য" অভিজ্ঞেয় তথ্য নয়, অনুমেয় সত্যও নয়, সেটা হল বিজ্ঞানের প্রাথমিক স্বীকৃতি। এর কোনো প্রমাণ নেই, তবে এটা মেনে নিলে আমরা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কার্য্যকারণ-সূত্র আবিষ্কার করতে পারি। এই স্বীকৃতিটা নানা দিক দিয়ে বিবেচনার যোগ্য। প্রথমত, অন্বীক্ষাশাস্ত্রে একটি সুবিদিত পদ্ধতি রয়েছে যাতে ক'রে কতকগুলো পূর্ব্বাবয়বের (premiss) সংযোজনে একটি সিদ্ধান্ত নিত্য ও আবশ্যিক রূপে পাওয়া যায়। এর সঙ্গে কি কার্য্যকারণ-নীতির কোনো সম্বন্ধ কল্পনা করা যায় না? হেগেলপন্থীরা বলেন যে কার্য্য-কারণ-নিয়ম হেতুসিদ্ধান্ত-সম্বন্ধেরই একটা বিশেষ রূপ। তা' যদি হয় তবে তো সে-নিয়মের ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়, অন্বীক্ষাশাস্ত্রের সুদৃঢ় ভূমির উপর তার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, কার্য্যকারণ-ব্যাপ্তির পরিধি নির্ণয় করা খুবই দরকার। এর প্রয়োগ কি শুধু জড়জগতে, না জীবজগৎ ও মনোজগৎও তার আজ্ঞাবহ? জীবজগতে বোধ হয় তার রাজ্য-বিস্তারকে আর ঠেকানো যাবে না, কিন্তু মনোরাজ্য এখনো বিদ্রোহী। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে আজো একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, এবং মানবচরিত্রের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য-বিবর্জ্জিত (non-teleological) ব্যাখ্যা হয়ত কোনো কালে সম্ভব হবে না। তৃতীয়ত, জড়জগৎ আজ তার শিষ্টাচার ভুলেছে, হাইসেন্‌বের্গের অনিশ্চয়বিধির কল্যাণে সেখানকার আইনকানুনেও শৈথিল্য ঢুকেছে, তার ক্রিয়াকর্ম্ম যে-নিয়ম মেনে চলে তা আর সার্ব্বিক নয়, সামষ্টিক মাত্র। চ, ছ, জ ঘটলে ক ঘটবেই এমন কথা এখন বলা চলে না; এদের সন্নিপাতে ক সম্ভব এইটুকু ব'লে, এবং সে সম্ভাবনার মাত্রা নির্দ্দেশ ক'রেই পদার্থ-

বিজ্ঞান ক্ষান্ত হবে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে সম্ভাবনা কথাটার অর্থ আজো কুহেলিকাচ্ছন্ন, গাণিতিক ও পদার্থবৈজ্ঞানিকদের কৌতূহল সেদিকে নিদ্রালু। "ক-এর উপস্থিতি সম্ভব"—এই উক্তিটা নিশ্চয়ই বস্তু-জগতের কোনো তথ্যের বিবরণ নয়, কারণ সেখানে হয় ক উপস্থিত নয় অনুপস্থিত, তৃতীয় অবস্থা অভাবনীয়। ক-এর ঘটনাঘটন সম্বন্ধে বক্তার মনের সংশয় বা অজ্ঞতার অভিব্যক্তিও এ নয়,—ব্যক্তিগত মনোভাব জ্ঞাপন করা পদার্থবিজ্ঞানে অপ্রাসঙ্গিক। এর একমাত্র অর্থ এই হতে পারে যে ক-এর উপস্থিতির জন্য চ, ছ, জ ছাড়া আরও conditions আবশ্যক; সে কারণ-সামগ্রীর (totality of conditionsএর) যদি মাত্র কয়েকটা, অর্থাৎ শুধু চ, ছ, জ, বর্ত্তমান থাকে, তবে ক-এর সংঘটন আবশ্যক নয়, সম্ভব। এ-দিক থেকে সম্ভাবনার গাণিতিক পরিমাণ করাও শক্ত নয়; ক-এর সম্ভাবনার অনুপাত $= \frac{\text{ক-এর যেসব conditions বর্ত্তমান তাদের সংখ্যা}}{\text{ক-এর সমস্ত আবশ্যক conditions-এর সংখ্যা}}$ তবে মুস্কিল এই যে সম্ভাবনার এমন অর্থ করতে গেলে সে হয়ে দাঁড়ায় আবশ্যিকতার ছদ্মবেশ মাত্র। উপরের কয়েক ছত্রে পুনরায় দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যাবে যে আমরা কথা-প্রসঙ্গে স্বীকার ক'রে নিয়েছি, চ, ছ, জ-এর সঙ্গে অবশিষ্ট conditionsও উপস্থিত থাকলে ক ঘটতে বাধ্য। অর্থাৎ কারণ-সামগ্রীর সঙ্গে কার্য্যের সম্বন্ধ রইল পূর্ব্ববৎ, আবশ্যিক ও নিশ্চিত; সে সামগ্রীর শুধু গোটাকতক condition যদি দেওয়া থাকে, বাদ বাকী থাকে অনির্দ্দিষ্ট, তা হলেই আসে সম্ভাব্যতা ও অনিশ্চয়তা। কিন্তু এমন কথা তো অন্বীক্ষাশাস্ত্রের কলেজ-পাঠ্য বইতেও দুর্লভ নয়, একে নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে আজ এত লম্ফ ঝম্ফ কিসের?

দর্শনকে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাভূমির পরীক্ষা ও পর্য্যালোচনায় নিযুক্ত করেন সর্ব্বপ্রথম ব্রিটিশ প্রত্যক্ষবাদীরা, কিন্তু কান্টের নামই এদিক দিয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সুবিখ্যাত Critique of Pure Reasonএর মুখ্য বিষয় গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের মূলনীতিগুলির প্রামাণ্যতা-বিচার। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে ঐ দুই বিদ্যার গোড়ায় এমন কতকগুলো সূত্র পাওয়া যায় যার সার্ব্বিকতা ও আবশ্যিকতা

সর্ব্ববাদিস্বীকৃত। অথচ যুক্তিবাদীদের বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে কিম্বা প্রত্যক্ষ-বাদীদের অমিশ্র ইন্দ্রিয়জ্ঞানে, কোথাও এর উপযুক্ত কৈফিয়ৎ খুঁজে পাওয়া যায় নি। কাণ্ট্ এই অনুসন্ধানের পথে এগিয়ে যে অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা' দর্শনের ইতিহাসে প্রাতঃস্মরণীয়। অবশ্য তাঁর একান্ত তত্ত্বানুসন্ধিৎসু সঙ্কল্প ও প্রয়াসকে চিরকালের মত পঙ্গু করে রেখেছে তাঁর অত্যধিক ধর্ম্ম ও নীতি-প্রবণতা। পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানঘটিত সমস্যা তাঁর দর্শনের একমাত্র প্রেরণা নয়। দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধে তিনি জানিয়েছেন যে, বুদ্ধিপ্রসূত যাবতীয় বিদ্যার পরিধি প্রতীয়মান জগৎ পর্য্যন্তই, পরমার্থতত্ত্বলোকে তাদের প্রবেশাধিকার অনিবার্য্যরূপে ব্যাহত—তাঁর এই মতবাদ কেবল নঙর্থক নয়, এর সর্ব্বপ্রধান সদর্থক মূল্য তাঁর কাছে এই যে এতে ক'রে ঈশ্বর ও আত্মা-সম্পর্কিত ধর্ম্ম-বিশ্বাসগুলিকে চিরকালের মত বুদ্ধির কবল থেকে রক্ষা করা হয়েছে। বুদ্ধিকে বিতাড়িত ক'রে নীতিবিশারদ কাণ্ট বিবেকের সদর রাস্তায় যে পাহারাওয়ালা ভগবানকে এনে খাড়া করেছেন তার কবল থেকে আমাদের রক্ষা করবে কে? তিনি বিবেকের অমোঘ বাণী শুনতে পেয়েছেন যে মানবাত্মার পাপপুণ্যের সঙ্গে তার দুঃখসুখের মাত্রা কাঁটায় কাঁটায় ঠিক রাখা অত্যাবশ্যক। কাজেই পাপিষ্ঠকে তাড়া করবার জন্য একজন পরম পাহারাওয়ালা না হ'লে চলবে কেন? শঙ্করাচার্য্য না কি ঐহিক সুখসম্ভোগের মায়া ত্যাগ করা তাঁর শিষ্যদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক জ্ঞান করতেন। পারলৌকিক মায়াবর্জ্জনের কথা হয়ত তিনি উল্লেখ করেন নি, কিন্তু মায়াজালে বিজড়িত যাঁদের চিন্তা, বিপন্ন যাঁদের বুদ্ধি, তত্ত্বজ্ঞানের অধিকার থেকে তাঁরাও বঞ্চিত!

বিজ্ঞানের ভিত্তির চেয়ে তার সিদ্ধান্তই দার্শনিকদের চিন্তা ও সাধনাকে উদ্রিক্ত করে এসেছে বহুকাল। সমস্ত বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকে সম্মিলিত ক'রে একটি মহাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা যদি আজো সম্ভব না হয়ে থাকে সেজন্যে এই দার্শনিকদের চেষ্টার ত্রুটি দায়ী নয়। এবং শুধু জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রদেশে সেতু-বন্ধনের প্রয়াসেই তাঁরা ক্ষান্ত হয়ে যান নি, তাঁরা চেয়েছিলেন মানবজীবনের সমস্ত ধারার শুভসঙ্গম।

তাঁরা চেয়েছিলেন এমন একটি বিশ্বালোচনের (weltanschauung) সৃষ্টি করতে যেখানে আমাদের সমস্ত দাবী, বুদ্ধিগত হৃদ্‌বৃত্তিগত ও চরিত্র-শক্তিগত সমস্ত অভিলাষ, নির্ব্বিরোধে আপন আপন তৃপ্তি খুঁজে পাবে। অর্থাৎ দর্শন হবে এমন একটি মহীরুহ যার বিশাল স্নিগ্ধ ছায়াতলে শিল্পী ও সাধক, জ্ঞানী ও কর্ম্মী আপন বিচিত্র বন্ধুর পথের ক্লান্তি ভুলে এক শষ্পশয্যায় বিশ্রাম লাভ করবে। এ হেন দর্শনের স্বরূপ বুঝতে গেলে জানা দরকার যে তার অভিপ্রেত বিশ্বালোচন কি যুক্তি ও অন্বীক্ষার অটল ভিত্তিতে শিকড় বিস্তার ক'রে থাকবে, না শিল্পীর স্বপ্নের মত হবে বন্ধন-মুক্ত, তারায় তারায় বাজবে তার অবাধ পক্ষধ্বনি। দার্শনিকরা সাধারণতঃ তার সংগঠনের ভার বুদ্ধির হাতেই অর্পণ করতে চান, কিন্তু তা' হলে একটি চিত্তবৃত্তিকে অন্যান্য বৃত্তির উপর অযথা প্রাধান্য দেওয়া হয়। শিল্পীর কল্পনাকে, যোগীর সাধনাকে যুক্তির শৃঙ্খলে বাঁধবার চেষ্টা কি তাঁরা জ্ঞানীর স্পর্দ্ধা ব'লে গণ্য করবেন না? পক্ষান্তরে, যদি বলা হয় যে দার্শনিক বিশ্বালোচন কেবল যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে না, সেখানে কল্পনা ও নিষ্ঠারও অব্যাহত প্রবেশ থাকবে, তা' হলে এমন অভিষ্টসিদ্ধির আর সমস্ত অন্তরায়ের কথা বাদ দিলেও কেবলমাত্র বাহনের অভাবেই মর্ত্ত্যভূমিতে তার অবতারণা অসম্ভব। বুদ্ধি-প্রসূত ও বুদ্ধিরই ছাঁচে ঢালাই করা ভাষার অন্তত তাকে বহন করবার শক্তি নেই। যা বুদ্ধির অতিক্রান্ত তা' ভাষারও অতীত। অবশ্য অনুভূতি প্রকাশের জন্য অন্য প্রণালী রয়েছে—ছন্দ, সুর ও নৃত্য, এবং চরিত্রশক্তি বিকাশের ক্ষেত্র কর্ম্মজীবনের কঠিন সাধনায়। কিন্তু দার্শনিকের বাঞ্ছিত বিশ্বালোচন যদি শুধু তত্ত্বপ্রসূত না হয়, সমস্ত চিত্তবৃত্তির অপক্ষপাত সন্নিবেশে গঠিত হয়, তবে তার পরিব্যাপ্তির নিঃসীমতা ছাপিয়ে যাবে সকল প্রকাশভঙ্গির ক্ষুদ্র পরিসরকে।

আসলে এমন কোনো সমন্বয় মানব জীবনে আনা যায়ই না যাতে তার সমস্ত বৃত্তির স্বাতন্ত্র্য ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। টি, এস্, এলিয়ট্ প্রভৃতি কোনো কোনো মনীষী বর্ত্তমান কালের বিক্ষিপ্ততায় অতিষ্ট হয়ে ফিরে যেতে চান মধ্য যুগের সমাহিত সংহত শান্তির মধ্যে। স্বীকার

করতে হবে যে মধ্য যুগ সংস্কৃতির বিচিত্র ধারাকে একটি সমন্বয়ের প্রবাহে মিলিত করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু সে সমন্বয় ছিল ধর্ম্মকে কেন্দ্র ক'রে। তখনকার আর্ট ও বিজ্ঞান এত সরল এত প্রাথমিক ছিল যে ধর্ম্ম সহজেই তাদের আত্মসাৎ করতে পারলে, চার্চ্চের অতিপ্রাবল্যের আওতায় চিন্তানুশীলনের অন্য সকল ক্ষেত্র রইল অনুর্ব্বর হয়ে। বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের জয়নির্ঘোষে মুখরিত, আজ যদি আমরা জীবনের পূর্ব্বতন সংহতি ফিরে আনতে চাই তা' হলে তার মূলসূত্র বৈজ্ঞানিক হতে বাধ্য। সেখানে আর্টের ধর্ম্মের কর্ম্মের স্থানসঙ্কোচ ঘটা স্বাভাবিক। সমন্বয়ের মরীচিকা আমাদের দার্শনিক নয়নে এমন মোহ লাগিয়ে দিয়েছে যে স্বাতন্ত্র্যের মর্য্যাদা আমরা ভুলতে বসেছি। বিরোধ অবশ্য পীড়াদায়ক, কিন্তু বিরোধ বাধে তখনই যখন একই মন্দিরে একাধিক দেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। যদি কর্ম্মের যজ্ঞশালায় শ্রেয়োবোধই একমাত্র ইষ্ট হয়, যদি শিল্পের শিলাবেদিমূলে অর্ঘ্য দানের সময়ে মন কলালক্ষ্মীর ধ্যানেই সমাহিত থাকে, যদি বিজ্ঞানের সাম্রাজ্যাধিকারে বুদ্ধির প্রতাপ থাকে অপ্রতিহত,—তাতে আমাদের কৃষ্টির শস্যগরিমা বাড়বে বই কমবে না। মানব মনের অসমধর্ম্মী অসমগামী বৃত্তিসমূহকে এককক্ষবর্ত্তী করায় যে শান্তি তা' রিক্তের শান্তি, বিশ্বের অনন্তভাণ্ডারদ্বারে প্রবেশকুণ্ঠচিত্তের শান্তি। সে-শান্তি ছিল মধ্য যুগের,—আমাদের জন্য থাক বৈচিত্র্য ও বিক্ষেপ, থাক অসংহত চিত্তের অনির্ব্বাণ জিজ্ঞাসা।

আবু সয়ীদ আইয়ুব

ভাব ও ভাষা

মিউনিকে থাকার সময় একদিন অভ্যাসমত একটি ছুটির দিন দেখিয়া আমরা কয়েকজনে দক্ষিণ ব্যাভেরিয়ার মনোরম গ্রামগুলির মধ্য দিয়া পদব্রজে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। মধ্যাহ্নে একটি গণ্ডগ্রামে পৌঁছিয়া একটি মেয়েকে সম্মুখে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম গ্রামের মধ্যে কোন Gaststatte আছে কি না যেখানে আহারাদি করা যাইতে পারে। মেয়েটি তৎসম্বন্ধে সংবাদাদি দিয়া উৎসুক নেত্রে জিজ্ঞাসা করিল আমাদের বাড়ী কোথায়। এই বাঁধা প্রশ্নের এক বাঁধা উত্তর আমার ছিল, গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলাম, "নিকারাগুয়া"। "কলিকাতা" বলিলেও কোন ক্ষতি হইত না, কারণ মেয়েটির নিকট নিকোরাগুয়া ও কলিকাতা দুইই সমান। উত্তরে কিন্তু মেয়েটি যাহা বলিল তাহাতে সেই যে একটি চিন্তাধারার সূত্রপাত হইল আজও তাহার সম্পূর্ণ মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি নাই। মেয়েটি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "তবে তুমি জার্ম্মান বল কিরূপে?" তাহার কথায় স্পষ্টই মনে হইল যে জার্ম্মান হইয়া না জন্মিয়াও যে কেহ জার্ম্মান ভাষা বলিতে পারে এই ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাই আমার মুখে জার্ম্মান শুনিয়া তাহার এত বিস্ময়। জার্ম্মান ভাষাটা যে অ-জার্ম্মান যে কোন লোকই ইচ্ছা করিলেই শিখিয়া লইতে পারে এ কথা সে যেন কল্পনাও করিতে পারে না, তাহার যেন ধারণা যে জার্ম্মান জাতির দৈহিক বিশেষত্বগুলির মত জার্ম্মান ভাষাটিও জার্ম্মানরা জন্মগত অধিকার-সূত্রেই লাভ করিয়া থাকে।

ভাষা সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা প্রথম আরম্ভ হয় গ্রীসে এবং সেখানে অতি প্রাচীন:কাল হইতেই ঠিক এই কথা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক চলিয়াছিল। এক দল বলিত ভাষা phusis, অর্থাৎ মনুষ্য-চেষ্টানিরপেক্ষ সম্পূর্ণ একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার মাত্র। আর এক দল বলিত ভাষা আসলে energeia, অর্থাৎ মনুষ্যের প্রত্যক্ষ চেষ্টার ফলেই

ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। প্রথম পক্ষ বলিত, যে প্রাকৃতিক নিয়মের বলে মানুষের কোন চেষ্টা ব্যতীতও বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে ও মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, ঠিক সেই নিয়মের বলেই মানুষ কথাও বলিতে শিখে, তাহাতে তাহার আপন কৃতিত্ব কিছুই নাই। যে জার্ম্মান মেয়েটির কথা বলিয়া প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি তাহারও নিশ্চয়ই এই ধারণা ছিল, নতুবা আমার মুখে জার্ম্মান শুনিয়া সে এত বিস্মিত হইত না। অপর পক্ষের মত ছিল, মানুষ যেমন সম্পূর্ণ আপন ইচ্ছামত সৌধোদ্যানাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, ঠিক সেই রূপেই সে তাহার ভাষাও সৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহাতে প্রকৃতির অমোঘ বিধান পরিলক্ষিত হয় না। দ্বিতীয় পক্ষের মতটিকে অবশ্য ঠিক এই আকারে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না, কারণ সৌধোদ্যানাদি মানুষের energeiaর ফল হইলেও তদুদ্বোধক প্রচেষ্টার মূলে আছে phusis। অর্থাৎ বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্‌গম যদি প্রথম স্তরের phusis হয় তবে মানুষের সৌধোদ্যানাদি নির্ম্মাণ দ্বিতীয় স্তরের phusis। এই অর্থে সকল প্রকার energeiaকেই দ্বিতীয় স্তরের phusis বলা যাইতে পারে। এখন ভাষাকে phusis বলিব না energeia বলিব ইহাই প্রশ্ন। জীব না থাকিলে জীবের ভাষা সম্ভব হইত না, মানবের ভাষাও মনুষ্য নামক জীবের অস্তিত্বের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে। এই অর্থেই স্বীকার করিতেই হইবে যে ভাষা phusis নহে, energeia। কিন্তু সংজ্ঞামূলক এই পার্থক্য লইয়াই সন্তুষ্ট না থাকিয়া যদি মূল ও ফলানুসন্ধান করা যায় তবে phusis ও energeiaর মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজিয়া পাওয়াই অনেক সময় দুরূহ হইয়া পড়িবে, দেখা যাইবে energeia বাস্তবিকই বহুক্ষেত্রে মানবজীবনে phusisএ পরিণত হইয়াছে। শিল্প ও সাহিত্যালোচনার Gothic, Barok, Rococo বলিতে যাহা বুঝায় তাহা energeia না phusis ?

ভাষা সম্বন্ধে যে কোন আলোচনার পূর্ব্বে এই কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে যে কেবলমাত্র শব্দসমষ্টি (sound-complex) কখনই ভাষা হয়না। তোতাপাখী ও গ্রামোফোন যত কথাই বলুক আর যত শব্দই (word)

উচ্চারণ করুক কিছুতেই তাহাতে ভাষা সৃষ্টি হইবে না। শব্দের পিছনে সর্ব্বত্র একটি সচেতন চিন্তা বর্ত্তমান আছে কি না সর্ব্বাগ্রে তাহাই অনুসন্ধেয়। এই সচেতন চিন্তা বর্ত্তমান থাকায় মূকের শব্দহীন ইঙ্গিত-কেও ভাষা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে, কিন্তু পাগলের অর্থহীন প্রলাপ কখনও ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইবে না। আরও মনে রাখা দরকার যে এই সচেতন চিন্তা বক্তার মনে বর্ত্তমান থাকাই প্রথমতঃ প্রয়োজন, তাহা কেবল শ্রোতার মনে বর্ত্তমান থাকাই যথেষ্ট নহে, নহিলে গ্রামোফোনের শব্দসমষ্টিকেও ভাষা আখ্যা না দিবার কোন কারণ থাকে না। শ্রোতার অভাবে ভাষার ভাষাত্ব নষ্ট হয় কিনা সে আলোচনা এখানে অবান্তর।

এখন আলোচ্য, ভাষার মূলে যে সচেতন চিন্তার ধারা বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক তাহার মূলই বা কোথায় এবং তাহা গঠিত বা নির্দ্ধারিত হয় কিসের দ্বারা? এবং যে কোন উপায়ে ভাষার গতি একবার নির্দ্ধারিত হইয়া গেলে তদ্দ্বারা মানুষের চিন্তার ধারাও প্রভাবান্বিত হয় কি না।

Bergson পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে চিন্তার রূপ ভাষার দ্বারা অন্ততঃ আংশিক ভাবে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। Bergson বহু ভাষা শিক্ষা করার পক্ষপাতী। কারণস্বরূপ তিনি বলেন যে এক ভাষাভাষী লোকের চিন্তা-প্রণালী তাহার প্রোক্ত ভাষাটিরই দাসস্বরূপ হইয়া পড়ে। কিন্তু মানুষ যদি বহুভাষাবিৎ হয়, অর্থাৎ বহুভাষায় চিন্তা করিতে শিখে, তবে সকল ভাষার দাসত্ব হইতেই সে মুক্ত হইতে পারে, তাহার চিন্তা তখন ভাষার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন পথে অগ্রসর হইবার সামর্থ্য লাভ করে। Bergsonর এই কথা সকলকেই মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু একথা মানিয়া লইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে এক একটি ভাষা মানুষের চিন্তাধারাকে এক একটি নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিয়া থাকে অথবা আবদ্ধ করিয়া রাখে। ভাষার এই গুণটি স্বীকার করিলে—ইহা অস্বীকার করিবারও উপায় নাই—ভাষাকে আর কেবল মাত্র energeia মনে করা চলে না; কারণ যে ভাষা ভাষকের

ভাষণপ্রণালী পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেছে তাহাতে যে phusisএর ধর্ম্ম অন্ততঃ আংশিকভাবে বর্ত্তমান তাহা না মানিয়া উপায় নাই।

ইহা কিরূপে সম্ভব? ভাষা কর্ম্মমাত্র হইয়াও কর্ত্তৃপদবাচ্য হইয়া উঠিল কিরূপে? এ প্রশ্নের উত্তর একটি কথায় দেওয়া যাইতে পারে—ভাষকের কর্ম্মেই ভাষার উৎপত্তি কিন্তু নির্লিপ্ত কর্ম্মে নহে। ভাষা ভাষকের ধর্ম্ম, কর্ম্মমাত্র নহে। এখানে কর্ত্তার ব্যক্তিত্ব-দ্বারা অনুপ্রাণিত কর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিতেছি। ভাষক ভাষণকালে বক্ষ্যমাণ বিষয়টি আপন ব্যক্তিত্বের রঙে অনুরঞ্জিত করিয়া তুলে, কাজেই ভাষার মধ্যে ভাষকের ব্যক্তিত্ব সর্ব্বত্রই সুপরিস্ফুট, এবং ভাষকের ব্যক্তিত্বের অংশভাক্ হওয়াতেই ভাষার কর্ত্তৃপদবাচ্যত্ব সম্ভব। এ স্থলে ভাষণ-প্রণালীর সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ প্রয়োজন, নতুবা বুঝা যাইবে না ভাষকের ব্যক্তিত্বের অংশ কিরূপে তাহার ভাষার মধ্যে বর্ত্তমান থাকে।

একথা সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধ অনুভূতিগুলির শব্দময় বাহ্য অভিব্যক্তির নাম ভাষা। ইহাই Croceএর প্রদত্ত ভাষার সংজ্ঞা। অল্পকথায় ভাষার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সংজ্ঞা দেওয়া বোধ হয় সম্ভবপর নয়। অবশ্য এই সংজ্ঞার অন্তর্গত অনুভূতি, উপলব্ধি ও অভিব্যক্তি এই তিনটি শব্দের প্রত্যেকটিরই অর্থ ও গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন না থাকিলে সংজ্ঞাটির পূর্ণ অর্থ প্রতিভাত হইবে না। যে কোন বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে ব্যক্তির অনুভূতি (passive) সর্ব্বত্র অনুরূপ হইতে পারে, কিন্তু তাহার উপলব্ধি (active) ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন হইবেই, কারণ কর্ত্তার ব্যক্তিত্বের সহিত বাহ্য অনুভূতিটির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যেরই নাম উপলব্ধি। অতএব অনুভূতির মূলে সর্ব্বত্র একই বস্তু বর্ত্তমান থাকিলেও ব্যক্তিভেদে তাহার উপলব্ধি বিভিন্ন হইবেই। এই উপলব্ধিরই শব্দময় অভিব্যক্তির নাম ভাষা, কাজেই তাহাও ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন হইতে বাধ্য। কার্য্যতঃ তাহা সকল সময় হয় না, তাহার কারণ ভাষার শব্দসংখ্যা ব্যক্তির উপলব্ধ অনুভূতির সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অল্প। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, Bergson কেন বলিয়া থাকেন যে এক

একটি শব্দ এক একটি মাত্র অর্থের দ্যোতক নহে, প্রত্যেক শব্দ সমজাতীয় অনন্ত অর্থের দ্যোতক এবং Bergsonর এই কথাটি স্মরণ রাখিলে ইহাও বুঝা যাইবে যে ভাষার দ্বারা মানুষের চিন্তাপ্রণালী প্রভাবান্বিত না হইয়া পারে না।

উপলব্ধ অনুভূতির সংখ্যা অনন্ত অথচ মানুষের ব্যবহৃত শব্দের সংখ্যা পরিমিত। অতএব এক একটি শব্দ-দ্বারা দ্যোতিত উপলব্ধ অনুভূতির সংখ্যাও অনন্ত। এখন কল্পনা করিয়া লওয়া যাউক যে দুইটি নির্দ্দিষ্ট ভাষায় সমসংখ্যক শব্দ আছে। প্রত্যেক ভাষাতেই অনন্ত উপলব্ধ অনুভূতি সমসংখ্যক শব্দদ্বারা দ্যোতিত হইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে কখনও আশা করা যায় কি যে একটি ভাষায় একটি বিশেষ শব্দ যে সংখ্যাতীত উপলব্ধ অনুভূতিগুলির দ্যোতক, অপর ভাষাতেও এমন একটি শব্দ পাওয়া যাইবে যেটি ঠিক সেই সংখ্যাতীত উপলব্ধ অনুভূতিগুলির দ্যোতক হইবে ? এস্থলে probability অনন্তের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ শূন্য।

ভাষা-দ্বারা কোন একটি সম্পূর্ণ চিন্তা-প্রণালীর প্রতি অংশ যে দ্যোতিত হয় না তাহা বলাই বাহুল্য। বাক্যস্থ এক একটি শব্দ একটি নির্দ্দিষ্ট চিন্তাধারার প্রধান প্রধান স্থানগুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেয় মাত্র। সিনেমার চিত্রাবলীর সহিত বাক্যের শব্দাবলীর তুলনা করা যাইতে পারে। সিনেমায় যেমন পরস্পর-সম্বন্ধবিহীন কতকগুলি চিত্র কেবল পারম্পর্য্য-বশতঃ একটি অখণ্ড কার্য্যের দ্যোতনা করিয়া থাকে, ভাষাতেও সেইরূপ একটি মাত্র অখণ্ড চিন্তা পরস্পরাবদ্ধ কতকগুলি বিচ্ছিন্ন শব্দ-দ্বারা সূচিত হয়। সিনেমায় যেরূপ একই কার্য্য দেখাইবার জন্য বিভিন্ন চিত্রাবলীর আশ্রয় লওয়া সম্ভব, ভাষাতেও সেইরূপ একই চিন্তাধারা প্রকাশের জন্য বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার সম্ভব। মনে করা যাউক সিনেমায় একটি সম্পূর্ণ কার্য্য দেখাইবার জন্য, a b c d e f g h এই কয়টি চিত্রের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু প্রদর্শন কালে সকল চিত্রই দেখানোর প্রয়োজন হয় না। দ্রুত পরম্পরায় a c e g দেখাইলে যে চিত্র পাওয়া যাইবে b d f h তাহা হইতে বিশেষ পৃথক হইবে না। এখন কল্পনা,

করা যাউক যে পৃথিবীর সমস্ত ভাষার সমস্ত শব্দের যোগে ভাবানুযায়ী একটি অতি দীর্ঘ শব্দশ্রেণী রচনা করা হইয়াছে। সম্পূর্ণরূপে একার্থক দুইটি শব্দ এক বা বহু ভাষার মধ্যে কখনও পাওয়া যায় না, কাজেই কল্পিত শব্দ-শ্রেণীটির একই স্থানে একাধিক শব্দ পুঞ্জীভূত হইবার আশঙ্কা নাই। এখন একটি নির্দ্দিষ্ট চিন্তাধারা প্রকাশের জন্য এই পরিকল্পিত শব্দশ্রেণীর তদনুজ্ঞাপক অংশের সকল শব্দই ব্যবহার করা প্রয়োজন হইবে না, সিনেমার চিত্রগুলির মত তাহার কয়েকটি মাত্র ব্যবহার করিলেই সমস্ত চিন্তাধারাটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। এমন কি এই কল্পিত শব্দশ্রেণীটির ঐ অংশে একটি মাত্র ভাষার যে যে শব্দ গৃহীত হইয়াছিল কেবল সেই শব্দ কয়টির দ্বারাও চিন্তাটি প্রকাশিত হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে এ ক্ষেত্রে একটি নির্দ্দিষ্ট চিন্তাধারা প্রকাশের জন্য প্রত্যেক ভাষায় বিভিন্নার্থবাচক শব্দ ব্যবহার করা হইতেছে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে একই চিন্তাধারা বিভিন্নার্থবাচক শব্দদ্বারা সূচিত হইতে পারে, এবং বাস্তবিক পক্ষেও একই চিন্তাধারা যখন বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয় তখন প্রতিভাষায় তাহা ভিন্নার্থবাচক শব্দদ্বারাই সূচিত হইয়া থাকে। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই, কারণ মনে রাখিতে হইবে যে প্রকাশ্যমান চিন্তা মূলতঃ সর্ব্বত্র অখণ্ড। ভাষার শব্দগুলি এই অখণ্ড চিন্তাধারার কয়েকটি মাত্র স্থানে আঘাত করিয়া তাহার গতিপথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয় মাত্র।

চিন্তার অখণ্ডত্ব ও ভাষার এই সাঙ্কেতিকতা স্বীকার করিলে ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না যে প্রতি চিন্তাধারার ভাষায় প্রকাশিত রূপটি ভাবভেদে বিভিন্ন হইবেই। কারণ উপরোক্ত প্রণালীতে একই চিন্তাধারা বিভিন্ন শব্দসমষ্টিদ্বারা প্রকাশিত হওয়া সম্ভব হইলেও প্রতিভাষা প্রকাশ্যমান চিন্তাধারাটির কয়েকটি বিশিষ্ট স্থানে আঘাত করিয়া তাহাতে কিছু নূতনত্ব আনিয়া দিবে। একই বাক্য বিভিন্নরূপে উচ্চারিত হইলে তাহাতে যেমন বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জনা আসিয়া পড়ে সেইরূপ একই চিন্তা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হইলেও তাহা বিভিন্ন অর্থের দ্যোতক হইয়া পড়িবে। অতএব স্বীকার করিতে

হইবে যে মূল ভাবটি না হউক ভাবের প্রকাশ্যমান রূপটি ভাষার দ্বারা সর্ব্বত্র প্রভাবান্বিত হয়।

এ পর্য্যন্ত দেখানো হইল ভাষার আভ্যন্তরিক বৈশিষ্ট্যবশতঃ কিরূপে ভাবও প্রভাবান্বিত হইতে পারে ও হইয়া থাকে; কিন্তু এতদ্ভিন্নও ভাষার বাহ্য রূপের দ্বারা ভাববস্তু প্রভাবান্বিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ এস্থলে সমধ্বনি বা assonanceএর সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে। Aldous Huxley কোথায় একস্থলে বলিয়াছেন যে ফরাসী, ইটালিয়ান ও জার্ম্মান সাহিত্যে যে ভাবপ্রবণতার এত বাহুল্য দেখা যায় তাহার একটি প্রধান কারণ ঐ ভাষা-গুলির অন্তর্গত কতকগুলি আকস্মিক সমধ্বনি। ইটালিয়ান ভাষায় amore ও dolore, ফরাসী ভাষায় amour ও douleur এবং জার্ম্মান ভাষায় Schmerz ও Herz-এর সমধ্বনি এই সকল ভাষার সাহিত্যে ভাবপ্রবণতার সূচনা করিয়াছে। ইংরাজি সাহিত্যের সৌভাগ্যবশতঃ ইংরাজি love-এর সহিত এক glove ছাড়া আর কোন শব্দের তাল মিল হয় না, তাই ইংরাজি সাহিত্য continental সাহিত্যের এই বিষময় ভাবপ্রবণতার হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছে। Huxley অবশ্য পরিহাসচ্ছলেই এই কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কথা একেবারেই হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না; কারণ অধ্যাপক Sutherland তাঁহার Medium of Poetry নামক পুস্তকে সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন কিরূপে এই বাহ্য সমধ্বনি-দ্বারা কবিতার শুধু ভাষা নয় ভাব পর্য্যন্ত প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে।

কাজেই বাহ্য ও অন্তরঙ্গ উভয়বিধ ক্ষেত্রেই ভাষা মূলতঃ ভাবের প্রতিবিম্ব হইয়াও তাহাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। দার্শনিক ও সাহিত্যিকগণ এবিষয়ে একমত। আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদগণও যে এই মতের পূর্ণ পরিপোষকতা করিয়া থাকেন তাহা McDougall-এর এই দীর্ঘ উক্তিটি হইতেই প্রতীয়মান হইবে:—

"মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিতে চিরাচরিত শিক্ষাদীক্ষা ও রীতিনীতি কি ভাবে

সংক্রামিত হয়, তাহার নির্দ্দেশ করা যদিও কঠিন, তবু মনের পরিপুষ্টি সাধনে তাহার প্রাধান্য অবিসংবাদিত। এই সত্য আমাদের কাছে তখনই স্পষ্ট হইয়া উঠে, যখন মানুষের চরিত্রগঠনে ভাষার প্রভাব আমরা উপলব্ধি করি। শিশু যে কথাগুলি বুঝিতে ও প্রয়োগ করিতে শেখে, তাহার প্রত্যেকটিই সুদীর্ঘ সমাজ-ব্যবহারের ফল, তাহার প্রত্যেকটির মধ্যে মানুষী অভিজ্ঞতা যেন পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। বস্তুবাচক বিশেষ্যগুলি ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রবহমাণ স্রোত হইতে গুটিকয়েক সুসীম রূপকে বিচ্ছিন্ন করিয়া শিশুর সম্মুখে আনে, এবং এই আকারগুলি ধ্রুব বস্তুসমূহের, অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধি যে বস্তুগুলিকে মানুষের নিত্য ব্যবহার্য্য বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাহার প্রতীক ও সঙ্কেত হইয়া উঠে। জাতিবাচক শব্দসমষ্টি সমশ্রেণীর বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কারের এবং ভিন্নধর্ম্মী বস্তুর বৈষম্য নির্দ্ধারণের সহায় হয়। ক্রিয়াপদগুলি কর্ম্মের সাধনপদ্ধতির বিবিধ প্রতিমানকে জ্ঞানগোচরে আনে; এবং দ্রব্য ও কার্য্যাবলীর তন্মাত্রকে নিষ্কর্ষিত করে বিশেষণ। প্রিপজিশন্ বা উপসর্গ দেশ ও কালের, কার্য্যকারণ ও পৌর্ব্বাপর্য্যের, সহযোগ ও বিয়োগের লোকসম্মত সম্বন্ধ ধার্য্য করে। এই সকল কৃত্রিম উপায়ে শিশুর নিরূপণ ও নিরীক্ষণ সুকর ও প্রখর হয়; এবং বাক্যের মধ্যে কন্‌জাংশন বা সংযোজক শব্দ তাহাকে যে জ্ঞানসম্ভারে অধিকারী করে, তাহা শিশুর স্বকীয় চেষ্টায় কোনমতেই আহৃত হইতে পারিত না।

উপরন্তু শব্দই যেহেতু তাহার কাছে বস্তু ও ঘটনার অবস্থা ও গুণের প্রতিরূপ, তাই শব্দের দ্বারাই বিচারকার্য্য সহজ হয় এবং বিচার-প্রসূত প্রতিজ্ঞা স্মৃতিপটে প্রকট ও সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠে। কাজেই ভাষা ব্যতীত যুক্তিপ্রকরণ অসম্ভব, কারণ যুক্তি আর কিছুই নহে, শুধু সুপ্রতিষ্ঠ প্রতিজ্ঞার সাহায্যে স্থির সিদ্ধান্তে পঁহুছিবার বহুলাঙ্গ পদ্ধতি।" (McDougall—Energies of Men, p. 110.)

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

সঙ্গম ও বিরহ

'সঙ্গম বিরহ বিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গম স্তস্যাঃ'—কবি বলিলেন, সঙ্গম ও বিরহের তুলনায় বিরহই 'বরং', সঙ্গম নয়। উভয়ের মূলেই প্রেম—কিন্তু সঙ্গমে সম্ভোগ, বিরহে বিপ্রলম্ভ; তথাপি কবি কেন বলিলেন বিরহ শ্রেষ্ঠ? কবিরা 'ক্রান্তদর্শী'—প্রেমতত্ত্বজ্ঞ—রসিক—'রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ'। জগতে রসিক সুদুর্লভ। রসিক কবি চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে, কোটিতে গোটিক হয়।

সঙ্গম-বিরহ রসতত্ত্বের কথা—অতএব রসিকের নির্দ্ধারণ অবহেলার নয়। আর এক রসিক (কালিদাস) অমর তুলিকায় দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার সঙ্গম ও বিরহের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সে চিত্রেও প্রণিধান করিলে সঙ্গমের অপেক্ষা বিরহের শ্রেষ্ঠতাই প্রতিপন্ন হয়।

হিমালয়ের উপকণ্ঠে মালিনীতীরস্থ বেতসকুঞ্জে শীলপট্টের উপর কিশলয় শয্যোপান্তে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার সঙ্গম হইয়াছে। তৃষিত দুষ্যন্তের আকাঙ্ক্ষা—

অপরিক্ষত-কোমলস্য তাবৎ কুসুমস্য নবস্য ষট্‌পদেন।
অধরস্য পিপাসতা ময়া তে সদয়ং সুন্দরি! গৃহ্যতে রসোঽস্য॥

অক্ষত কোমল তব সরস অধর
নবপুষ্প-রস যথা তৃষিত ভ্রমর—
মধুর উহার রস মৃদু করি পান
যাবৎ জুড়াই সখি! পিপাসিত প্রাণ।

ইহার পর উভয়ের গান্ধর্ব্ব-বিবাহ এবং অচিরস্থায়ী দাম্পত্য জীবনের সম্ভোগ।

অক্লিষ্টবালতরু পল্লব লোভনীয়ং
পীতং ময়া সদয়মেব রতোৎসবেষু।

প্রেয়সীর সেই বিম্বাধর
অম্লান তরুণতরুপল্লব-সমান
লোভনীয়—অহো! বারবার
রতোৎসবে করিলাম সন্তর্পণে পান।

তারপর? দুর্ব্বাসার শাপে স্মৃতিভ্রষ্ট দুষ্যন্ত কর্ত্তৃক শকুন্তলার নির্ম্মম প্রত্যাখ্যান এবং পরে অভিজ্ঞান দর্শনে লব্ধস্মৃতি দুষ্যন্তের তীব্র শকুন্তলা-বিরহ-বেদন।

স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু
ক্লিষ্টং নু তাবৎ ফলমেব পুণ্যম্।
অসন্নিবৃত্ত্যৈ তদ্ অতীতমেতে
মনোরথানাম্ অতট-প্রপাতাঃ॥

স্বপ্ন সে কি? মায়া সে কি? সে কি মতিভ্রম?
কিম্বা সুকৃতির মম অবসান ক্রম?
অতীত মিলন এবে দুরাশা কেবল
তুঙ্গ, হায়! মনোরথ-প্রপাতের স্থল!

বিরহতাপদগ্ধ দুষ্যন্ত—

রম্যং দ্বেষ্টি যথা পুরা প্রকৃতিভির্ন প্রত্যহং সেব্যতে
শয্যাপ্রান্তবিবর্ত্তনৈর্বিগময়ত্যুন্নিদ্র এব ক্ষপাঃ।

রমণীয়ে দ্বেষ, পূর্ব্বমত প্রতিদিন
মন্ত্রিবর্গে না করে সম্ভাষ, শয্যাপ্রান্তে
বিবর্ত্তন করি যাপে বিনিদ্র রজনী—ইত্যাদি

আর শকুন্তলা? মারীচ ঋষির হেমকূট পর্ব্বতস্থ পুণ্যাশ্রমে নীতা বিরহিনী শকুন্তলার কি অবস্থা?

বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণী
অতি নিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি।

পরিধানে ধূসর বসন, ব্রতাচারে শুষ্কমুখী
এক বেণী করিয়া ধারণ
শুদ্ধশীলা বণিতা আমার—সুদীর্ঘ বিরহ ব্রত,
(নিষ্কারুণ আমি)—মোর তরে করেন পালন।

এ সেই আশ্রম 'যাহার বৃহৎ শূন্যতাকে (বিরহিনী) শকুন্তলা আপনার বৃহৎ দুঃখের দ্বারা পূর্ণ করিয়া' বাস করিতেছেন, 'সেখানে সমস্তই আমাদের নিকট' স্তব্ধ নীরব—কেবল বিশ্ববিরহিতা শকুন্তলার নিয়ম-সংযত, ধৈর্য্য-গম্ভীর, অপরিমেয় দুঃখ আমাদের মানস নেত্রের সম্মুখে ধ্যানাসনে বিরাজমান'—(রবীন্দ্রনাথ)। ইহার উপর কবির মন্তব্য এই—পূর্ব্বাপরবিরোধী অপূর্ব্বঃ এষ বিরহ-মার্গঃ। ইহাকেই বলে বিরহ-রঙ্গের বিচিত্র তরঙ্গ।

প্রেমিক-প্রেমিকার এই সঙ্গম ও বিরহের একটা আধ্যাত্মিক দিক্ আছে। শুধু তাই নয়—এই প্রেম ভক্ত কর্ত্তৃক ভগবানে অর্পিত হইতে পারে। 'মিষ্টিক'দিগের অনুভূতির আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, সেই উপনিষদের প্রাচীন যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত তাঁহারা ভগবানকে প্রেমাস্পদ বলিয়া অনুভব করিয়াছেন—তাঁহাদের কাছে তিনি দয়িত, বনিত, বামনী, পিতম্, মাশুক্। তিনি 'রসোবৈ সঃ—এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধ্যঃ'।

> সুন্দর হৃদি-রঞ্জন তুমি নন্দন ফুল হার
> তুমি অনন্ত চির বসন্ত, অন্তরে আমার! (রবীন্দ্রনাথ)

তাঁহাতে সঙ্গত হইলে ভক্ত পরানন্দ উপভোগ করে—রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি। সে আনন্দ নন্দনাতীত—অকথ্য, অবর্ণ্য। সেই জন্য সখীর প্রশ্নোত্তরে শ্রীরাধা বলেন—সখিরে কি পুছসি অনুভব মোয়?

> কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু
> না বুঝনু কৈছন কেল।
> লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
> তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥

জীবাত্মার পরমাত্মার প্রতি এই যে প্রসক্তি—সুফিরা যাহাকে এসক্ বা আসনাই বলেন—এ দেশের রসিক ও য়ুরোপের মিষ্টিকদিগের পরিভাষায় যাহার নাম প্রেম বা Love—ঐ প্রেমের বিষয় ও আশ্রয় লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে প্রযোজ্য প্রতীক (Symbol)—প্রেয়স'

ও প্রেয়সী, পিতম্ ও প্রিয়তমা, নাগর ও নাগরী, মাশুক ও আশেক, Bridegroom ও Bride।

প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ঃঅন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ * * স যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্ এবমেব—বৃহদারণ্যক, ৪।৩।২১

I will draw near to Thee in silence, and will uncover Thy feet, that it may please Thee to unite me to Thyself, making my soul Thy *bride*; I will rejoice in nothing till I am in Thine arms.—St John of the Cross

বংশীর আহ্বানে অভিসারিণী শ্রীরাধা 'পন্থবিজন ঘোর' অতিক্রম করিয়া সিক্ত বসনে কুঞ্জদ্বারে উপনীত হইলেন—যে কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ—

রচয়তি শয়নম্ সচকিতনয়নম্
পশ্যতি তব পন্থানম্ (জয়দেব)

তখন শ্রীকৃষ্ণ—

আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি
জানু উপরে পুন রাখি।
নিজ করকমলে চরণ যুগ মোছই
হেরইতে চির থির আঁখি॥

ইহার পর সঙ্গম—খৃষ্টানেরা যাহাকে 'Copula' বলেন।

অনুমানে বুঝহ রঙ্গ
যৈছন গোকুল নায়ক কোরই
নায়রী শয়ন বিভঙ্গ।
বামচরণ ভুজ আগোরহি পুন পুন
যাতই দক্ষিণ পাশ
তৈছন বচন কহই পুনঃ আঁখি মুদি
বচন রসায়ন হাস॥

Old Testamentএর Song of Solomonএ ভক্ত ও ভগবানের 'Copula' এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

Let Him kiss me with the kisses of his mouth
For thy love is better than wine.
Behold thou art fair, my beloved, yea, pleasant.

Also our bed is green ; * *
His left hand is under my head,
And His right hand doth embrace me.
By night on my bed—I sought him
Whom my soul loveth :
I sought him, but I found Him not.
His left hand should be under my head,
And his right hand should embrace me.
I charge you, O daughters of Jerusalem,
That ye stir not up, nor awake
My love, until He please.

এই সঙ্গমকে খৃষ্টীয় মিষ্টিকেরা "the lovely dalliance of private conference" বলেন এবং তৎসম্পর্কে প্রেমিক-প্রেমিকার মানবীয় সম্ভোগের ভাষা ব্যবহার করেন।

In connection with it, the phrases of mutual love, of wooing and combat, awe and delight—the fevers of desire, the ecstasy of surrender are drawn upon.—Underhill's Mysticism. p. 161.

একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে—

All things I then forgot,
My cheek on Him who for my wooing came
All ceased, and I was not,
Leaving my cares and shame
Among the lilies, and forgetting them.

—Enuna Noche Escura

সঙ্গম কি ? 'It is the rapturous encounter with Love and supreme self-loss in the Naked Abyss !' সঙ্গমে সম্মিলন এবং মিলনের রভস (ecstasy)। কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখিলে এই সঙ্গমের পর বিরহ অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য বৈষ্ণব পদাবলীতে গুপ্তবৃন্দাবনের পর মাথুর। খৃষ্টীয় মিষ্টিকেরা এই বিরহকে 'Dark night of the Soul' বলেন। তখন প্রেয়সীর ~~মনে হয়~~ প্রিয়তম

তাহাকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়াছেন—the anguish of the lover who has suddenly lost the Beloved। এইজন্য বিরহের নাম—'Divine Absence—the ecstasy of deprivation—Teressa যাহাকে 'pain of God' বলিয়াছেন। তখন ভক্ত প্রাণের মধ্যে একটা বিরাট রিক্ততা অনুভব করে—'a profound emptiness, a period of destitution'। সে অবস্থায় ক্রুশবিদ্ধ ক্রাইষ্টের কাতরোক্তির সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম হয়—'Father! Father! Why hast Thou forsaken me?' বসন্তপূর্ণিমার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ উপভোগের পর অমানিশার ঘনান্ধকারের অনুভূতির ন্যায় সঙ্গমের পর বিরহ।

Thou didst begin, Oh my God, to withdraw Thyself from me; and the pain of Thy absence was the more bitter to me, because Thy presence had been so sweet to me, Thy love so strong in me.—Madame Guyon.

ভক্ত মিলনের প্রথমোচ্ছ্বাসে মনে করে চিরদিন বুঝি এই ভাবেই যাইবে, কিন্তু সে মরীচিকার অচিরেই অবসান হয়।

The soul believes that this temporary (fleeting) union will prove a perdurable consciousness of the Divine. Blind fool! The 'night of the Soul' is yet to come.—Underhill—p. 457

(In সঙ্গম), when 'basking in the sunbeams of the Uncreated Light' he forgets that he has not yet reached the 'Perfect Land'—is yet far removed from the true end of Being. So the Light withdraws Itself and the 'Dark Night of the Soul' sets in.—Ibid, p. 287.

মনোবিজ্ঞানের আলোকে দেখিলে সঙ্গমের পর বিরহ (the great swing back into darkness) কেন যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা বুঝা যায়। কারণ, 'affirmation has to be paid for by negation'। অতএব সঙ্গমের pleasure-affirmation স্বতঃই বিলুপ্ত হয় এবং বিরহের pain-negation তাহার স্থান অধিকার করে। This

'Divine Negation' the self must probe, combat and resolve। সেইজন্য খৃষ্টান মিষ্টিকেরা বলেন 'it (বিরহ) comes between the first mystic life or illuminative way and the second mystic life—the unitive way। অবশ্য বিরহের পরও মিলন আছে—সে মিলন মহামিলন। কিন্তু বিরহীর দৃষ্টিতে সে মহামিলন তখন সুদূরপরাহত। সে মহামিলনের কথা বর্ত্তমানে আলোচ্য নয়।

বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক Pascal দৃশ্যতঃ শুষ্ক জ্ঞানবাদী ছিলেন—কিন্তু তাঁহার অন্তস্তলে একটি ভক্তিনির্ঝরিণী প্রবাহিত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কোর্ত্তার সহিত সীবিত এক খণ্ড parchment পাওয়া যায় (a scrap of parchment was found sewn up in his doublet at his death)। ইহাকে প্যাস্কেলের 'মেমোরিয়াল' বলে। অতি স্বল্পাক্ষরে প্যাস্কেলের নিজের অন্তরে অনুভূত এই সঙ্গম ও বিরহের মর্ম্মচ্ছেদী বিবৃতি এইরূপ ঃ—

'Joie ! Joie ! Joie ! pleurs de Joie'—(Joy ! Joy ! Joy ! tears and Joy), showing all-surpassing Joy, which accompanied his ecstatic apprehension of God. Then ? Mon Dieu, me quitterez vous ? He says again "Que je n'en sois pas séparé eternellement ! "Are You going to leave me ? Oh, let me not be separated from You for ever !"

বিরহে এইরূপই মনে হয় বটে। মনে হয় এ কাল রাত্রির বোধ হয় আর অবসান হইবে না। বুঝি নষ্টচন্দ্র আর হৃদয়াকাশে সমুদিত হইবেন না।

'The greatest affliction of the sorrowful soul in this state' says St. John of the Cross is the thought that God has abandoned it, of which it has no doubt,—the sense of being without God.'

বিরহে ভক্ত ভগবানকে অন্বেষণ করে কিন্তু তাঁহার পদচিহ্ন খুঁজিয়া পায় না—

—She seeks God and cannot find the least marks or footsteps of His presence.

God having shewn Himself has now deliberately withdrawn His Presence, never perhaps to manifest Himself again. 'He acts,'

says Eckhart, 'as if there were a wall erected between Himself and us ?

তখন কি মনে হয় ?

With Thee, a prison would be a rose garden, oh Thou, Ravisher of Hearts : With Thee Hell would be paradise, oh Thou Cheerer of souls'.——মৌলানা রুমি

তখন শ্রীচৈতন্যের সহিত ভক্ত এক সুরে বলে—

হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন। হা হা পদ্মলোচন!
হা হা দিব্য সদ্‌গুণ সাগর!
হা হা শ্যামসুন্দর! হা হা পীতাম্বরধর!
হা হা রাসবিলাস নাগর!
কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাঁহা যাই।

খৃষ্টীয় মিষ্টিকদিগের বিরহ-দশার লক্ষণ বিবৃত করিয়া Underhill লিখিয়াছেন,—

All these types of 'darkness' with their aacompanying and overwhelming sensation of impotence and distress are common in the lives of the mystics. We have seen them exhibited at length in Madame Guyon's writings.

Amongst innumerable examples, Suso and Rulman Merswin also experienced them : Tauler constantly refers to them : Angela of Foligno speaks of a "privation worse than hell." It is clear that even Mechthild of Magdeburg, that sunshiny saint, knew the sufferings of the loss and absence of God. "Lord, "she says in one place, "since Thou hast taken from me all that I had of Thee, yet of Thy grace leave me the gift which every dog has by nature : that of being true to Thee in my distress, when I am deprived of all consolation. This I desire more fervently, than Thy heavenly kingdom !"

খৃষ্টীয় মিষ্টিকদিগের অনুভূতি নিবিষ্টভাবে পাঠ করিলে, বিরহের অনেক কথাই জানা যায়, কিন্তু তথাপি আমি বলিতে বাধ্য যে, বৈষ্ণব ভাবুকেরা শ্রীরাধাকে উপলক্ষ্য করিয়া বিরহের যে নিবিড় ও নিগূঢ় তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন, ইউরোপীয় Myticism এখনও তাহার সীমায়

পৌঁছিতে পারে নাই। বৈষ্ণব মহাজনেরা বলেন বিরহের দশ দশা। যথা,

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যু দশা দশ ॥—উজ্জ্বলনীলমণি

অর্থাৎ চিন্তা, উন্নিদ্রতা, উদ্বেগ, বিশীর্ণতা, মালিন্য, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু—বিরহের এই দশ দশা। বৈষ্ণব পদাবলীতে শ্রীরাধার এই দশ দশারই নিপুণ বর্ণনা আছে। পদকর্ত্তারা 'মহাজন'—ভগবানের চারণ—'Troubadours of God, minnie-singers of the Absolute'। তাঁহারা অনুভূতির চক্ষে যাহা দেখিতেন, তাহাই রচনা করিতেন। ঐ সকল পদের দুই একটি মাত্র এস্থানে উদ্ধৃত করিব।

শ্রীরাধা নবমী দশায় প্রায় উপনীত—ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা—মুখে সদাই প্রলাপ—

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমা ক্ব শিখিচন্দ্রিকালংকৃতিঃ
ক্ব মন্দমুরলীরবঃ ক্ব সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি! জীবরক্ষৌষধিঃ
নিধির্ম্ম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হা ধিক্ বিধিম্॥

ধনী ভেল মুরছিত, হরিল গেয়ান
দশনে দশন লাগি মুদল নয়ান।

সখীরা কৃষ্ণ নাম শুনাইতে লাগিলেন :—

শ্যাম নামে চেতন পাই চারিদিকে চায়,
সম্মুখে তমাল বৃক্ষ দেখিবারে পায়
তমালে দেখিয়া ধনী হইলা বিভোর
হা কৃষ্ণ! বলিয়ে তমালে দিল কোর।

আর একটি পদ—যখন শ্রীরাধা দশম দশায় উপনীত—

মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।
না পোড়াইও রাধা-অঙ্গ না ভাসাঁও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে।
কেন? কবহু সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে
পরাণ পায়ব আমি পিয়া-দরশনে।

শ্রীরাধা হয়ত' ঐতিহাসিক নন—তিনি 'মহাভাবময়ী', সম্ভবতঃ ভাবুকের কল্পলোকের মানস-প্রতিমা। কিন্তু শ্রীচৈতন্য? ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই বাংলার রঙ্গভূমে তাঁহার সজীব বিরহনাটক ত' সর্ব্বজন সমক্ষে অভিনীত হইয়াছিল—তাঁহার ঐতিহাসিকতার বিষয়ে ত' সন্দেহ হইতে পারে না।

তাঁহার চরিতকার কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা শুনুন—

কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয়।
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয়॥
এই দশ দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রিদিনে!
কভু কোন্ দশা উঠে, স্থির নহে মনে॥

* *

অষ্ট সাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল।
হর্ষাদি ব্যভিচারী সব উথলিল॥
ভাবোদয় ভাবসন্ধি ভাবশাবল্য।
ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ সবার প্রাবল্য॥

* *

ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত।
জীব ছার কাঁহা তার পাইবেক অন্ত॥

* *

কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল।
কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল॥
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা-জ্ঞান

* *

অতঃপর মহাপ্রভুর বিষণ্ণ অন্তর
কৃষ্ণের বিয়োগ-দশা স্ফুরে নিরন্তর॥
"হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজের নন্দন।
কাঁহা যাও কাঁহা পাও মুরলীবদন॥

অতএব বিরহের দশ দশা কবিকল্পনা নয়।

আমরা দেখিয়াছি, মৃত্যুই বিরহের দশম বা চরম দশা। খৃষ্টান মিষ্টিকেরা ইহাকে 'mystic' death বলেন।

মাদাম্ গাইয়ন নিজের অবস্থা বর্ণন করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন,—

The nearer the soul drew to the state of death, the more her desolations were long and weary, her weaknesses increased, and also her joys became shorter, but purer and more intimate, until the time in which she fell into total privation.

আরাধিকা সেণ্ট টেরেসা এইরূপে আত্মবিরহের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন,—

The pain grows to such a degree of intensity that inspite of oneself one cries aloud. Moreover, the intense and painful concentration upon the Divine Absence, which takes place in this 'dark rapture', induces all the psycho-physical marks of ecstasy. Although this ecstasy last but a short time, the bones of the body seem to be disjointed by it. The pulse is as feeble as if one were at the point of death * * she is no longer the mistress of reason * * she burns with a consuming thirst and connot drink at the well which she desires.

এ বর্ণনা যে অতিরঞ্জিত নহে, চৈতন্যদেবের বিরহ দশার বর্ণনা পাঠ করিলে তাহা প্রতীত হয়।

প্রভু পড়ি মূর্চ্ছা যায়, শ্বাস নাহি আর।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া হুঙ্কার॥
সঘনে পুলক যেন শিমুলের তরু।
কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ, কভু হয় সরু॥
প্রতিরোমে হয় প্রস্বেদ রক্তোদগম।
'জজ গগ মম পরি' গদ্গদ বচন॥
এক এক দন্ত সব পৃথক পৃথক নড়ে।
ঐছে নড়ে দন্ত, যেন ভূমে খসি পড়ে॥

* * *

পড়িয়াছে প্রভু দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ নাসায় শ্বাস নাহি বয়॥
এক এক হস্তপদ দীর্ঘ তিন তিন হাত।
অস্থিগ্রন্থি ভিন্ন, চর্ম্ম মাত্র আছে তাত॥
হস্ত, পাদ, গ্রীবা কটি অস্থিসন্ধি যত।
এক এক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত॥
চর্ম্মমাত্র উপরে সন্ধির, আছে দীর্ঘ হঞা।
দুঃখিত হইলা সবে প্রভুকে দেখিয়া॥
প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপর রোমোদ্গম কদম্ব প্রকার॥
প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠ ঘর্ঘর—নাহি বর্ণের উচ্চার॥
দুই নেত্র ভরি অশ্রু বয়হে অপার।
সমুদ্রে মিলয়ে যেন গঙ্গাযমুনাধার॥
বৈবর্ণ্য, শঙ্খের প্রায় শ্বেত হইল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র তরঙ্গ॥
প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার।
আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দেখি হইল চমৎকার॥

এই সাত্ত্বিক অষ্ট বিকার কি কি?

স্তম্ভঃ স্বেদোথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোথ বেপথুঃ
বৈবর্ণ্যম্ অশ্রুঃপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ—সাহিত্যদর্পণ ১১৬

অর্থাৎ স্তম্ভ (stupor), স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু (tremor) বৈবর্ণ্য (pallor), অশ্রু (tears) এবং প্রলয় (মূর্চ্ছা, swooning)।

বিরহের উপযোগিতা (utility) কি? কেন ভগবান্ ভক্তকে বিরহানলে দগ্ধ করেন? বিরহের তাপে স্বর্ণের শ্যামিকা ক্ষালিত হইয়া বিশুদ্ধি উজ্জ্বল হইবে বলিয়া। তত্ত্বদর্শী কবির ঠিক্ই বলিয়াছেন—

বিরহ-অগিন অন্দর জারে
তব পাওয়ে পদ পূরে।

In the dark night of the Soul comes Krishna to Radha.

—Vaswani

উদ্‌ঘূর্ণা'বিরহ চেষ্টা 'দিব্যোন্মাদ' নাম
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান। —চরিতামৃত

খৃষ্টীয় মিষ্টিকদেরও ঐ কথা।

'In the midst of a psychic storm (বিরহ), mercenary love is for ever disestablished and the new state of Pure Love (অকৈতব প্রেম) is abruptly established in its place.

এ সম্পর্কে আরাধিকা সেণ্ট ক্যাথেরিনের সাক্ষ্য উপেক্ষণীয় নহে।

'In order to raise the soul from imperfection' said the Voice of God to St. Catherine, 'I withdraw myself from her sentiment—which I do in order to humiliate her, and to cause her to seek me in truth. * * Though she perceives that I have withdrawn myself, she awaits with lovely faith the coming of the Holy Spirit, that is of Me, Who am the Fire of Love.

—ভগবদ্‌ বিরহ এমনই চমৎকারী। ভক্তের বিরহ (যাহার ভিত্তি প্রেম)—তাহার কথা ছাড়িয়া যদি মানব-মানবীর বিরহ (যাহার মূলে মুখ্যতঃ কাম) তৎপ্রতি চাহিয়া দেখি, তবে সেখানেও ঐ 'শোধন'-প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিব। দুষ্যন্ত প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার বিরহানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। অহরহ অন্তরে দারুণ দাবদাহ এবং অশ্রুবর্ষণে তাহা নির্ব্বাপিত করিবার ব্যর্থপ্রয়াস। ফলে? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—

'লাভ করিবার প্রকৃষ্ট প্রণালী সাধনা, তপস্যা। * * সেইজন্য কবি পরস্পরকে যথার্থভাবে, চিরন্তনভাবে লাভের জন্য দুষ্যন্ত-শকুন্তলাকে দীর্ঘ দুঃসহ তপস্যায় প্রবৃত্ত করিলেন। * * অহরহ পরম বেদনার উত্তাপে শকুন্তলা রাজার হৃদয়ের সহিত মিশ্রিত হইতে লাগিল। তিনি পূর্ব্বে কখনও যথার্থ প্রেমের উপায় ও অবসর পান নাই। * * এবারে বিধাতা কঠিন দুঃখের মধ্যে ফেলিয়া রাজাকে প্রকৃত প্রেমের অধিকারী করিলেন।

সে যাহা হ'ক, আমরা মিষ্টিকদিগের কথায় ফিরিয়া যাই।

With mystics, the Dark Night is all directed towards the essential mystic act of utter self-surrender, that 'fiat voluntas tua' which marks the death of selfhood, in the interests of a new and deeper life — a complete self-naughting, an utter acquiescence in the large and hidden purposes of the Divine Will—what Madame Guyon called 'holy indifference', —Underhill's Mysticism.

বিরহ ভাল না সঙ্গম ভাল? এ সম্পর্কে এখনও কাহারও সংশয় আছে কি? 'বরমিহ বিরহঃ'—নিশ্চয়, সুনিশ্চয়! সেইজন্য সুফিরা বলেন সঙ্গম চাই না—চিরবিরহ দাও—

May I seek and ever seek
But may I never find!

The Sufis do not desire to be united to the Beloved. Why? Because they believe such a consummation would rob them of the ecstasy of endeavour and of constant questing.

ইহাকেই আর একজন মিষ্টিক 'Divine Discontent' বলিয়াছেন—'It keeps one alert and active,'—ইহাই বৈষ্ণব ভাবুকের 'ব্রজ'—সেখানে সঙ্গমের স্থিতি নয়—বিরহের অবিরাম গতি—'ব্রজ ব্রজ ব্রজ, চল চল চল'।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

অভিসার

(ফরাসী থেকে)

সেবারে শীত চললো এপ্রিলের শেষ পর্য্যন্ত, হিম-বরফের যেন আর ইয়ত্তা ছিলো না। তার পর হঠাৎ একদিন ভাঙন ধরলো। হপ্তাভোর দেখা গেলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেঘ উত্তরের দিকে ছুটে চলেছে। বায়ুর গর্জ্জন প্রচণ্ড হয়ে উঠলো, কিন্তু সে-হাওয়াকে লাগলো ঈষদুষ্ণ; মাটি গলতে আরম্ভ করলে, নিজেকে যেন এলিয়ে দিলে, কেমন একটা চিকণ সজলতা সারা পৃথিবীকে ছেয়ে ফেললে। একদিন রাত্রে রগ টনটন ক'রে আমার ঘুম ভেঙে গেলো; বুঝলুম ঘরখানা একটা সূক্ষ্ম অথচ প্রগাঢ় গন্ধে পরিপ্লুত। ভোরবেলায় জানলা দিয়ে ঝুঁকে দেখলুম দেওয়ালের গোড়ায় গোড়ায় গুচ্ছ গুচ্ছ ভায়োলেট্ অন্ধকারের ডিম ফাটিয়ে ফুটে উঠেছে। কয়েক দিনের মধ্যেই আশ-পাশের ফুলগাছে সাদা গোলাপী, নানা রকমের রং ধরলো। মাঝে মাঝে আকাশ খালি ক'রে এমন গুমোট নামে যে নিঃশ্বাস নেবার উপায় থাকে না, আবার কখনো কখনো আকাশ ভরাট হয়ে আসে, বাগান থেকে বাড়ীতে ছুটে পালাবার সময় মেলে না, হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যায়।

একদিন গ্রামের নিচের পাহাড়তলী দিয়ে আসতে আসতে এই রকম একটা আচম্‌কা দুর্য্যোগে পড়লুম। কাছেই একটা পোড়ো যাঁতাকল ছিলো, তাতেই আমি আশ্রয় নিলুম। সে-বাড়িখানায় আগেও অনেক বার ঢুকেছি; তার আঁচড়কাটা দেওয়ালগুলোকে আমি ভালো ক'রেই চিনতুম, সেই কাঠ্‌কয়লায় লেখা মন্তব্য আর ছবিই ছিলো আশ-পাশের খবরের কাগজ। গ্রীষ্মকালে সেখানে বুনো পায়রার বকম্‌বকম্ আর বাবুই পাখীর কাঁচির মতো ডাক নদীর কলরবের সঙ্গে মিশে যেতো; এবং কাছাকাছি মাঠে গরু চরাতে এসে রাখালবধূরা তারি দেউড়িতে ব'সে করতো সেলাই।

সেদিনে নিচে না-থেকে, হাতের উপরে ভর দিয়ে আমি একেবারে চিলের ঘরে হাজির হলুম। দেখলুম ঘরটা প্রকাণ্ড হলেও ঝুপসি, মেঝের কাঠ জায়গায় জায়গায় হাঁ হয়ে আছে। তবু কোনোকষ্টে দেওয়াল ধ'রে গিয়ে একটা শস্যাধারের উপরে বসলুম। পাশেই একটা জানলা বুনো গোলাপলতায় প্রায় ঢাকা প'ড়ে গিয়েছে; কয়েক পা দূরে একটা মস্ত গর্ত্ত, তার মধ্যে দিয়ে নিচের ঘরটা নজরে আসে। সঙ্গে যে বইখানা এনেছিলুম, সেটা খুললুম। টালির উপরে বৃষ্টির দাপট চলেছে, ভিতরে ছাদ চুঁয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে—চমৎকার লাগতে লাগল; মনে হলো বর্ষণ যদি প্লাবনে পরিণত হয়, তাহলেও আপত্তি করবো না।

হঠাৎ নিচের থেকে একটা মৃদু আওয়াজ কানে এসে পৌঁছলো। গর্ত্তের উপর ঝুঁকে দেখলুম একটি লম্বা, ছিপছিপে মেয়ে ঘরে ঢুকে হাতের বাইসিকিলটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখলে, এবং আবার দরজা পর্য্যন্ত ফিরে গিয়ে একবার আড়চোখে আট-ঘাট দেখে নিলে। তারপর হাতখানাকে চোখের সামনে তুলে একদৃষ্টে কব্জির ঘড়িটার পানে চেয়ে রইলো। দমকা হাওয়া এসে তাকে যেন চাপড় মেরে গেলো, তবু প্রথমটা সে মুখ ঘোরালে না। তার পর হঠাৎ শিউরে উঠে সে তার থালি থেকে একখানা আরসি বার ক'রে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে এলোমেলো চুলের উপরে হাত বুলতে লাগলো। একটু বাদে সে স্কন্ধ-ভঙ্গি ক'রে ঘরের মধ্যে কয়েক পা এগিয়ে গেলো, এবং অবশেষে একটা কাঠের স্তূপের উপরে ওভারকোটটা পেতে হাঁটুর উপরে কনুই রেখে মাথায় হাত দিয়ে বসলো।

তার মুখখানি সুন্দর, কোমল অথচ গম্ভীর, চাঁচাছোলা, পরিষ্কার চোখ দুটি ডাগর কিন্তু সলজ্জ; ঠোঁট লম্বা হলেও পাৎলা। মুখ দেখে আন্দাজ করলুম তার বয়স হবে ত্রিশের কাছে। তার প্রতীক্ষার মধ্যে কেমন একটা আত্মসমাহিত ভাব ছিলো, তবু বোধ হলো অতি ছোটো-খাটো শব্দ ও সে কান পেতে শুনছে। দেখলুম তার শরীর কাঁপছে। সে দরজার দিকে যে-দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে, তাতে লোভ যতখানি, সঙ্কোচ

ততোধিক। আবার আরসি বার ক'রে সেখানাকে সে তার মুখের সামনে নাড়তে লাগলো। তার অঙ্গভঙ্গির মধ্যে কেমন একটা আড়ষ্টতা ছিলো, মনে হলো উৎকণ্ঠার তাড়নে সে যেন বিষিয়ে উঠছে। আলো যেন তার সইছিলো না, ক্রমশই সে ছায়ার দিকে স'রে যাচ্ছিলো, তার ঈষদ্ দীর্ঘ হাত পা, ঈষদ্ লম্বা মুখ, ঈষদ্ শুষ্ক চোখের পাতা ইত্যাদিকে সে যেন লুকতে চায়। কয়েক মিনিট এমনি ক'রেই কাটলো, তবু সে নিশ্চল, তবু সে ভিতর দিকেই তাকিয়ে রইলো, যেন তার প্রতীক্ষার ব্যাকুলতা প্রকাশে সে ভয় পাচ্ছে, তেমন করলে হয়তো হতাশার সম্ভাবনা বাড়বে।

—যদি না ঘুমিয়ে পড়ে থাকে, তো কি বলেছি! কথাগুলো যে-গলা থেকে বেরুলো, সে-গলা বেশ খনখনে, কিন্তু কেমন যেন বেহায়া, কেমন যেন একঘেয়ে।……মেয়েটি চমকে উঠে ফিরে চাইলে, তার মুখে হাসি দেখা দিলে, সে মাথা নেড়ে বল্‌লে—না। তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল একজন দারোগা। দস্তানা খুলে হাতে হাত ঘষতে ঘষতে সে বললে :

—বলবে তো ঘুমোওনি? কিন্তু এখনো সারা শরীরে ঘোর রয়েছে।

সত্যিই তার পানে একদৃষ্টে চেয়ে মেয়েটি নিশ্চল হয়ে বসেছিলো। দারোগাসাহেব তার দিকে ঝুঁকে বললে—আদর করবে না?

মেয়েটির হাত কাঁপতে লাগলো, তার দেহ এল নিবদ্ধ হয়ে। লোকটি তার সামনে বসলো।

—নিশ্চয়ই ভেবেছিলে, আমি আসবো না, অ্যাঁ? কি করি বলো! একেই বলে চাকরী, শেষ মুহূর্তে একখানা থান ইঁট এসে পড়লো: একটা চুরির তদন্ত। আমি ভেবেছিলুম আজ আর কোনোমতেই আসতে পারবো না। তাহলে চটতে তো?

মেয়েটি হেসে নিজের হাত বাড়িয়ে দিতে গেলো, কিন্তু কি ভেবে আবার গুটিয়ে নিলে।

—কিন্তু, বর্থা, আজকে তোমার জিভ জমে গেছে, দেখছি! বলো, অন্ততঃ একটা কিছু বলো। নাকি, আমি আসাতে একটুও খুসি

হওনি ? খুসি হওনি তো ? জবাব দাও, দোহাই জবাব দাও।

বর্থা মাথা নত ক'রে আস্তে আস্তে বললে :

—হাঁ, হয়েছি বৈকি।

—"হাঁ, হয়েছি বৈকি।" দেখো একবার "হাঁ, হয়েছি বৈকি" বলার রকম দেখো। মেয়ের মুখে যেন মাখম গলেনা। যাক, ঠাকরুণ আর একটু কাছে স'রে এসে বসুন। না ? হাঁ ? তবে আমাকেই কষ্ট করতে হবে ? বেশ, আমি লোক খুব ভালো, আমিই কষ্ট করছি।

দারোগা সাহেব তার কাছে ঘেঁসে বসে তাকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলে। কিন্তু মেয়েটি যেই তার সাথীর কাঁধে মাথা রাখতে গেলো, সে অমনি চেঁচিয়ে উঠল :

—আরে না, সাবধান। এইটাই আমার সেরা পোষাক। ওর ফলে কি হবে তা জানি ; একটি ঘণ্টা লাগবে পাউডার ঝাড়তে।

—কিন্তু, আমি তো পাউডার মাখিনি !

—না, না। আজকালকার সব মেয়ে পাউডার মাখে। আমাকে কি গাড়ল পেয়েছো ?

যেখানে বর্থা গাল রেখেছিলো, সে জায়গাটাকে দারোগা সাহেব বাদামী রঙের দস্তানা দিয়ে ঝাড়তে লাগলো।

—আমাদের আজকালকার উর্দ্দি যে আগের চেয়ে অনেক ভালো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ময়লাও হয় বড় তাড়াতাড়ি। আর আমাদের গরমের পোষাক দেখেছো ? হাল্‌কা, পাৎলা, ফিকে রঙের কাপড়ে তৈরি। কিন্তু আমি নিজে যে জিনিষটাকে বেশি পছন্দ করি সে হচ্ছে আমাদের চামড়ার পটি। আমি বলি একজোড়া ঝকঝকে পটির চেয়ে চমৎকার আর কিছুই নেই। তোমার তা মনে হয় না ? জানো, অনেকে পুলিশে কাজ নেয় কেবল এই উর্দ্দির লোভে ?

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে ;

—আর এটা ? এটাকে কি বলে ?

—ওটা ? ওটা হচ্ছে কাঁধবন্ধ। ওইটেই তো হলো ওপরওয়ালার তক্‌মা, বুঝলেনা ? দেখছো ওটা পেটির সঙ্গে আঁটা থাকে, আবার পেছনে

গিয়ে পেটিতেই আটকায়।

—অস্বস্তি লাগেনা?

—অস্বস্তি? হাসালে। অস্বস্তি লাগবে কোন দুঃখে? কি অদ্ভুত ধারণা! আমি যদি জিজ্ঞেস করি, তোমার কষ্ট হয় কিনা ওই···আচ্ছা, আচ্ছা, বুঝেছি। বাপ্‌রে, স্পষ্ট কথা কখনো কইতে আছে, তাহলে যে রাংতা উঠে যাবে। একেই বলে স্ত্রীরত্ন। তাঁরা প্রশ্ন করে যাবেন, কিন্তু যদি জবাব দিলে, ওরে, বাস্‌রে! আহা, আমার লজ্জাবতী লতা!

—কিন্তু, চার্লস্‌, আমি তো একটি কথাও বলিনি।

—আমি তাহলে উজবুক? জানো, যদিও আমার বয়স বেশি নয়, তবু তালিম নেওয়ার পালা ফুরিয়েছে।

—কিন্তু, চার্লস···

—কী চার্লস্‌ চার্লস্‌ করছো? আমি ঠাণ্ডা মানুষ, তবু একটা সীমা আছে তো? আমি এলুম মুখে রা নেই, যখন কথা ফুটলো, তখন মাথামুণ্ডু কি ব'কে গেলে, তা ভগবানই জানেন। চাও কি আমি বিদেয় হই? তা ছাড়া...

দারোগা সাহেব ঘড়ি দেখলে।

—তাছাড়া, আর দেরি করা চলবে না।

—যাক, যাক! দেখো, একবার কাণ্ডখানা দেখো, আবার কাঁদতে বসলো! কি, হলো কি? চুমু খাবে? বেশ খাও। না?

আমি দেখতে পেলুম মেয়েটি সজোরে হাত মুঠো ক'রে আছে নিঃশ্বাস ফেলে সে বললেঃ

—ও, চার্লস্‌ এসেছি ব'লে, তোমায় দেখতে পেয়েছি ব'লে আমার এত আনন্দ হয়েছিলো।

—খুব ভালো! এখনো তো আমায় দেখতে পাচ্ছো, কিন্তু এ দেখাকে কাজে লাগাতে পারছো কই? সত্যি বলছি, একটু দমে যেতে হচ্ছে। যাক, এসো ভাব ক'রে ফেলি। আমায় আদর করো, এইখানটিতে আর অনুগ্রহ করে পাউডার সম্বন্ধে সাবধান হও। এখন যে ভারি হাসি? ধন্যি বুদ্ধি!······আচ্ছা, বলো দিকি, সেই সেদিন থেকে

আজ অবধি কি ক'রে সময় কাটিয়েছো। সাবধান! সাবধান! একখানা গাড়ি আসছে!

তারা দুজনেই ছায়ার মধ্যে মিশিয়ে গেলো। ভিজে চাকার শব্দ কমলে পরে সে আবার বললেঃ

—সাবধানের বিনাশ নেই। আমার মতো লোকের নামে গুজব রটা মারাত্মক। কি যেন বলছিলুম? ও, হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করছিলুম, সেদিন থেকে কি করেছো... ..সেই যে সেদিন,—মনে আছে? যবে আমার ওখানে এসেছিলে? বল্‌বে না?

—তোমায় ভেবেছি।

—এইটে শোনার জন্যেই অপেক্ষা করেছিলুম। আমায়, শুধু আমায়, তাকে ভাবোনি?

—চার্ল্‌স্‌, তুমি কথা দিয়েছিলে......

মনে হলো মেয়েটির গলার আওয়াজ অনুচ্চ এবং মিনতিময়।

—বেশ, বেশ। আমি চুপ করছি। মনে কোরোনা আমি হিংসুটে। মরার ওপর আবার হিংসে? অমন নীচ নই।

—আর তুমি, চার্ল্‌স্‌?

—আমি?

—হ্যাঁ, তুমি কি করেছো?

—ও! জানোই তো, টহল, খানাতল্লাসি, রিপোর্ট, এক কথায় চাকরি। মরার অবসর নেই।

—আমার কথা ভাবতেও একটু সময় পাওনা?

—ও! এই বলবার জন্যে এত ঘোরপ্যাঁচ। কিন্তু তোমার কথা নিশ্চয়ই ভেবেছি।

মনে হলো মেয়েটি যেন একটু ইতস্তত করছে। তারপর চোখ না-তুলেই সে ধীরে ধীরে বললেঃ

—আর সেই যে কড়ার করেছিলে, তার বিষয়ে কিছু ভাবতে পেরেছো?

—কি আবার কড়ার করলুম?

মেয়েটি লাল হয়ে গেলো।

—ও! চার্লস্‌, সে তো জানোই। তুমি যে বলেছিলে শীগ্‌গিরই, ছু-এক দিনের মধ্যে বাবার কাছে কথা পাড়বে।

—বলছি কি পাড়বো না? কিন্তু বুঝছোই তো আমার মরবার সময় নেই। আর তাছাড়া দিনটা আমাকেই ধার্য্য করতে দাও। এ হচ্ছে মরদের কাজ, বুঝলে না?

বর্থা মাথা নেড়ে বললে—অবশ্য, অবশ্য।

দারোগা সাহেব উঠে ঘরের দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে গেলো। তখনো বৃষ্টি অবিশ্রামে প'ড়ে যাচ্ছে।

—কী জঘন্য দিন।

মেয়েটি বললে:

—কটু কথা বলা অন্যায়, কেননা শীগ্‌গিরই গ্রীষ্মকাল সুরু হবে, মাঠে মাঠে আর লোক ধরবে না। তখন কি আব আমরা এখানে এমন ক'রে আসতে পারবো?

—বাঃ! কী দূরদৃষ্টি! কিন্তু তাহলেও দিনটা জঘন্যই।

দারোগা সাহেব একটা সিগারেট ধরিয়ে মেয়েটির পাশে ফিরে এলো।

—আচ্ছা, বর্থা, বলো তো, আমায় যেদিন প্রথম দেখলে, সেদিন তোমার কি মনে হয়েছিলো? কিছু বলতে চাওনা? আমি কিন্তু স্পষ্টই দেখেছিলুম তোমার চাউনিতে কেমন একটা রসের ভাব রয়েছে।

—আর তুমি চার্লস্‌?

—ও! আমি, তোমায় দেখবামাত্রই আমি মনে মনে বললুম, "মেয়েটি সাধ্বী হলেও, সদাচারের জ্বালায় তিতিবিরক্ত হয়ে গিয়েছে।" সত্যি নয়? তাহলেও আমি কিন্তু এ-কথা ভাবিনি যে...। এতবার শুনেছিলুম যে তুমি জনমানবের সামনে আসোনা বাড়ির বার হও না, মুখে ওলপ দিয়ে থাকো। একেবারে যেন সতী সাবিত্রী। তাছাড়া সেই বাক্‌দানের গল্পটা। বারো বছর হলো মরে গেছে একজন লোকের সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়েছিলো ব'লে অবিবাহিত থাকা, বিবাগী হয়ে যাওয়া, সে আবার কেমন? তাই মনে মনে বললুম, "এ-ভাব কখনো স্থায়ী

হতে পারে না। বেচারার নিশ্চয়ই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে”। ঠাট্টা নয়, বর্থা, সত্যি তুমি তাকে এখনো ভালোবাসো নাকি? মরা মানুষকে কিছুতেই ভালোবাসা যায় না। জবাব দাও।

দারোগা সাহেব ঝুঁকে প'ড়ে বর্থার হাত ধরলে।

—জবাব দাও, বলছি! লোকে বলে···

মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অতি আস্তে আস্তে বললে ঃ

—সে তো তোমায় আগেই বলেছি। আমি শপথ করেছিলুম যে তাকে কখনও ভুলবো না।

—শপথ করেছিলে; তার কোনো মানে নেই। কোন্ জিনিষটা ভুলতে চাওনি? তোমাদের বিয়ের ঠিক হয়ে গিয়েছিলো ব'লেই তো আর তোমরা···বুঝেছো তো কি বলছি? সে তো তুমি নিজেই আমায় বলেছো; আর তা না বললেও, আমি তো আর কচি খোকা নই। তবে? তবে তুমি কী আঁকড়ে ছিলে?

রুদ্ধ স্বরে, কম্পিত কণ্ঠে মেয়েটি জবাব দিলে ঃ

—দোহাই চার্লস্, তোমার পায়ে পড়ছি আর কিছু বোলো না।

—না, তা হতে পারে না, আমাদের যদি বিয়ে হয়, তাহলে জানবার অধিকার আমার আছে। তুমি কিসে বাঁধা পড়েছিলে? তোমাদের মধ্যে যে আদর-টাদর চলেছিলো, তা স্বাভাবিক। তারপর চাঁদের আলো, রোমাঞ্চ, ইত্যাদি সে সমস্তও ছিলো। কিন্তু সে সব যার সঙ্গেই ঘটুক, তাতে কি আসে যায়···। আচ্ছা, সে ছেলে ভালো ছিলো, কি বলো? আমার চেয়েও ভালো? দেখো, জবাব দাও।

—চার্লস্!

—আমি জানতে চাই সে আমার চেয়ে ভালো ছিলো কি না।

আমি উত্তরটা শুনতে পেলুম না। কিন্তু দারোগা সাহেব হেসে বললে ঃ

—সত্যি বলছি, আমার ভয় হচ্ছে। ও সমস্তই হচ্ছে খোকাখুকুর পুতুল খেলা। তোমার তা মনে হয় না? হ্যাঁ? অতি অবশ্য। কিন্তু আজো তাকে তুমি ভাবো?

—আর ভাবতে চাই না।

—আর ভাবতে চাও না। তার মানেই এখনো ভাবো?

—না।

—ও-না-এর পিছনে কোনো তাকৎ নেই। সত্যি বলো তুমি এখনো তার কথা ভাবো, হ্যাঁ কি না?

—খুব ভালো ক'রেই জানো যে না।

—আচ্ছা, আমায় যতটা ভালোবাসো, তাকেও ততখানি বাসতে?

—কিন্তু এ-দুটো যে এক জিনিষ নয়।

দারোগা সাহেব উঠে দাঁড়ালো; এবং কিছুক্ষণ ধ'রে তার চাপা দাঁতের মধ্যে দিয়ে শিস দেওয়ার আওয়াজ শোনা গেলো। তাকে আঘাত করেছে ব'লে কি মেয়েটি ভয় পেলে? সেও উঠে দাঁড়ালো, তার পর হঠাৎ অশ্রুবিগলিত হয়ে দারোগার বুকে লুটিয়ে পড়লো।

—চার্লস্, চার্লস্, তুমিই আমার সব।

দারোগা সাহেব বিব্রত হয়ে, তার চুলে হাত বুলোতে লাগলো।

—যাক, যাক, আর ছেলেমানুষী করোনা। আর কেঁদোনা। কিন্তু মেয়েটি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললে:

—আমায় ছেড়ে যেও না, দোহাই তোমার, আমায় ছেড়ে যেও না।

আমি শুনতে পেলুম মেয়েটির নিঃশ্বাসে ঘন ঘন যতি পড়ছে, দেখলুম তার দীর্ঘ দেহের কাঁপন থামছে না। লোকটি থেকে থেকে শুধু বলতে লাগলো:

—দেখো, দেখো, অমন অবুঝ হয়ো না।

বর্থা ক্রমশ শান্ত হলো এবং মাথা ফিরিয়ে অন্ধকারে চোখ মুছে নিলে। অব্যাহতি পেয়ে লোকটি বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। বৃষ্টি থেমে গিয়েছিলো, কিন্তু তখনো শোনা যাচ্ছিলো, নর্দ্দমা দিয়ে জল বয়ে চলেছে। নির্ম্মুক্ত আকাশ থেকে উত্তপ্ত সূর্য্যরশ্মি এসে বাড়িখানাকে স্পর্শ করলে; আমার নাকে ভেসে এলো বুনো ঘাসের সৌগন্ধ। দূরে গাই ডাকতে লাগলো।

দারোগা সাহেব বললেন,—এবারে যেতেই হবে।

মেয়েটি এগিয়ে গেলো; তার সমস্ত অঙ্গভঙ্গিতে কেমন যেন আড়ষ্টতা, নিঃশ্বাসে অসংযম; তবু সে হাসলে চেষ্টা ক'রে, হাত ধ'রে নম্র স্বরে বললে—তোমার ক্ষমা চাইছি।

—বিলক্ষণ সে-সব আর ভেবো না। কিন্তু দেখো একবার, কাদা দেখো। কী জঘন্য দেশ!

—এ-দেশ তোমার ভালো লাগে না?

—এই দেশ? মোটেই না। তাড়াতাড়ি বদলি হলে বাঁচি। যদি আমায় বেজার্স বা গ্রেনোব্ল্-এ পাঠায়! হ্যাঁ, দেশের মতো দেশ বটে; আশপাশের দৃশ্য যেন ছবি। আসল সহর তাকেই বলে, তার হালচাল এখানকার থেকে একদম আলাদা, বুঝলে না। সেখানে এই রকম কাদা ভেঙে চলতে হয় না, চারিদিকে শান বাঁধানো, আর তাছাড়া ট্রামও আছে। জংলীদের মতো বনবাস করতে হয় না সেখানে।

বর্থা বললে—গ্রেনোব্ল্-এর কথা অনেক শুনেছি। আমার এক দূর সম্পর্কের বোন সেখানে থাকে, সে বলে সহরটি সত্যিই ভারি সুন্দর—আল্‌প্‌স্ পাহাড় আর প্রকাণ্ড নদী, বোধহয় আইসার। সেখানে থাকতে আমার খুব ভালো লাগবে।

লোকটি হাসতে হাসতে বললে:

—আর আমি ভেবেছিলুম তুমি নেহাৎ কুণো; কিন্তু নতুন জায়গার নামে তো খুব মুখ ছুটেছে দেখছি।

মেয়েটি মাথা নীচু করে বললে:

—একলা যেতে চাইনা!

লোকটি আবার হেসে উঠলো, এবং কিছুক্ষণের জন্যে বর্থা তার দিকে চাইতে সাহস করলেনা।

—এবার কিন্তু আমায় সত্যিই যেতে হবে, বর্থা। আদর করবে? এইখানে। আচ্ছা, আবার শীগ্‌গিরই দেখা হবে।

—কবে?

—তোমায় জানাবো, ভয় পেয়োনা।

বর্ষা দারোগার কাঁধবন্ধের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে তার ঘোর রঙের উর্দির উপরে আঙুল চালাতে চালাতে বল্‌লে :

—চার্লস্, ভুলে যাবেনা তো ?

—কি ?

—সে তো জানোই। বাবাকে বলা।

দারোগা সাহেব তুড়ি দিয়ে বললে :

—আঃ! আমার উপরে তোমার বিশ্বাস আছে না নেই? জিনিষটা ক্রমশ বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সে চলতে আরম্ভ করলে। মেয়েটিও তার সঙ্গে ছুটতে ছুটতে বললে :

—চার্ল্‌স্।

—অ্যাঁ ?

—আমার কথা একটু ভাববে ?

—দিব্যি করছি। আর তুমি ?

বর্ষা একগাল হেসে বললে :

—ও! আমি···

জোড়া হাত বুকের উপরে রেখে, বর্ষা অনেকক্ষণ পর্যান্ত চোখ দিয়ে তার অনুসরণ করলে; এবং রাস্তার মোড়ে এসে দারোগা যখন অদৃশ্য হয়ে গেলো, তখনো, মনে হলো, মেয়েটি যেন তাকে দেখতে পাচ্ছে, তার সঙ্গে চলেছে।

তারপর সে ঘরের ভিতর ঢুকে, অসংযত পদবিক্ষেপে গিয়ে তার পরিত্যক্ত আসনটিতে বসলো। তার সামনের দেওয়ালে একখানা অশ্লীল ছবি আঁকা ছিলো; সেটাকে দেখে শিউরে উঠে সে হাত দিয়ে মুখ ঢাকলে। আমার মনে হলো তার ক্ষীণকণ্ঠে যেন কিসের নালিশ রয়েছে। অবশেষে সে বেরিয়ে গেলো।

গোলাপলতার আড়াল থেকে জানলা দিয়ে আমি দেখলুম, সে রাস্তায় এসে পড়লো। একটা নালার উপরে পথটা যেখানে কুঁজের মতো বেঁকে চলে গিয়েছিলো, সেখানে কতকগুলো পাথর জড় ক'রে একটা

প্রাচীর বানানো ছিলো। মেয়েটি সেইদিকে এগিয়ে সেই প্রাচীরের ধারে কিছুক্ষণ ঝুঁকে দাঁড়ালো। তারপর হঠাৎ একটা চিৎকার শুনতে পেলুম; এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সারা দেহ ভয়ে কেমন সিটিয়ে গেলো। তার মুখ দেখতে পাচ্ছিলুম না বটে, কিন্তু তার হাত দুখানি যে সঙ্কুচিত হয়ে গেছে, তা স্পষ্টই দেখলুম। খানিক পরে সে আবার আস্তে আস্তে এগিয়ে কিছু কাল ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রইলো। মনে হলো তার মুখের' উপরে সূর্য্যের স্পর্শ তাকে যেন অবসন্ন করে দিচ্ছে।

একটু বাদে মেয়েটি চলে গেলে পরে আমিও বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেই পুলের দিকে চল্‌লুম। জলের কাছে একটা পাথরের উপরে গোটা-কয়েক সাপ জড়াজড়ি ক'রে নিঃস্পন্দ অবস্থায় রোদ পোয়াচ্ছিলো। হঠাৎ কোথা থেকে মৃগনাভীর সৌরভ এসে ভিজে ঘাসের গন্ধের সঙ্গে মিশে গেলো; এবং গাছ, মাঠ, এমন-কি সেই রাস্তা থেকেও ধীরে ধীরে উঠতে লাগলো একটা হাল্‌কা উচ্ছ্বাস।

মার্সে'ল্ আরলাঁ

কবিতাগুচ্ছ

মিষ্টান্বিতা

"যে মিষ্টান্ন সাজিয়ে দিলে
হাঁড়ির মধ্যে,
শুধুই কেবল ছিল কি তায় শিষ্টতা ?
যত্ন করে নিলেম তুলে
গাড়ির মধ্যে,
দূরের থেকেই বুঝেছি তার মিষ্টতা।
সে মিষ্টতা নয়তো কেবল
চিনির সৃষ্টি,
রহস্য তার প্রকাশ পায় যে অন্তরে ;
তাহার সঙ্গে অদৃশ্য কার
মধুর দৃষ্টি
মিশিয়ে গেছে অশ্রুত কোন্ মন্তরে।
বাকি কিছুই রইল না তার
ভোজন অন্তে,
বহুৎ তবু রইল বাকি মনটাতে,
এমনি করেই দেবতা পাঠান
ভাগ্যবন্তে
অসীম প্রসাদ সসীম ঘরের কোণটাতে।
সে বর তাঁহার বহন করল
যাদের হস্ত
হঠাৎ তাদের দর্শন পাই সুক্ষণেই।
রঙীন করে তাহার প্রাণের
উদয় অস্ত
দুঃখ যদি দেয় তবুও দুঃখ নেই।"

হেন গুমর নেইকো আমার,—
স্তুতির বাক্যে
ভোলাব মন ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় ;
জানিনে তো কোন্ খেয়ালের
ক্রূর কটাক্ষে
কখন বজ্র হান্‌তে পারো অত্যাশায়।
দ্বিতীয় বার মিষ্ট হাতের
মিষ্ট অন্নে
ভাগ্য আমার হয় যদি হোক্ বঞ্চিত,
নিরতিশয় করব না শোক
তাহার জন্যে
ধ্যানের মধ্যে রইল যে ধন সঞ্চিত।
আজ বাদে কাল আদর যত্ন
না হয় কম্‌ল,
গাছ ম'রে যায়, থাকে তাহার টবটাতো।
জোয়ার বেলায় কানায় কানায়
যে জল জম্‌ল
ভাঁটার বেলায় শুকোয় না তার সবটাতো।
অনেক হারাই তবু যা পাই,
জীবন যাত্রা
তাই নিয়ে তো পেরোয় হাজার বিস্মৃতি ;
রইলো আশা, থাকবে ভরা
খুসির মাত্রা
যখন হবে চরম শ্বাসের নিঃসৃতি।
বল্‌বে তুমি, "বাঁলাই, কেন'
বকৃচ মিথ্যে,
প্রাণ গেলেও যত্নে রবে অকুণ্ঠা।"

বুঝি সেটা, সংশয় মোর
নেইক চিত্তে,
মিথ্যে খোঁটায় খোঁচাই তবু আগুনটা।
অকল্যাণের কথা কিছু
লিখনু অত্র,
বানিয়ে লেখা ওটা মিথ্যে দুষ্টুমি।
তদুত্তরে তুমিও যখন
লিখবে পত্র
বানিয়ে তখন কোরো মিথ্যে রুষ্টুমি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাত্রি

ধরণী ঘুমায়ে গেছে, ঘুমায়েছে বন উপবন,
ঘুমায়েছে নদ নদী, ঘুমায়েছে মরুভূপ্রান্তর,
অলস নিদ্রার মোহে স্তব্ধ হ'য়ে আছে চরাচর;
চঞ্চলিত তরুশাখে কাঁদি মরে উতলা পবন।
এমন নিবিড় রাত্রি তারা ভরা নিঃসীম গগন,
এমন নিঃসঙ্গ ঘর অন্ধকার নিষ্কম্প নিথর,
একাকী জাগিয়া আছি কানে বাজে কানন-মর্ম্মর,
সাথে মোর জাগি আছে এ দেহের চঞ্চল যৌবন।
আমার বুকের স্বপ্নে রাঙায়েছি পৃথিবী আকাশ—
চোখের সম্মুখে মোর খুলে দেছি মন-বাতায়ন,
অজস্র কুসুম আনে বুকে মোর ফুলেলা প্লাবন,
আজি এ নিঃসঙ্গ রাতে কল্পনার ক্ষণ অবকাশ।
যামিনী ফুরায়ে গেলে ভেঙ্গে যাবে অলীক স্বপন,
সহস্র কর্ম্মের মাঝে জাগি রবে ব্যথার নিঃশ্বাস।

সুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত

রাত্রির কবিতা

আজ আমি ডুবে যাবো, আজ আমি উবে যাবো,
আজ আমি তলাবো অতলে,
নিস্পন্দ রাত্রির তলে, নিঃসাড় বাঁধের জলে,
পাণ্ডুর বিমর্ষ জ্যোছনায় !
আমার অন্তিম ক্ষণ তুমি জানিবে না—
হয়ত এখন আছো শুভ্র লঘু দেহখানি
এলাইয়া বাতায়ন-পাশে,
আলুল অলক ব্যেপে, আরক্ত অধর ব্যেপে,
ব'য়ে যায় জ্যোৎস্নার শিহর,
বিলোল বাহুর ডোরে, গহন ঘুমের ঘোরে,
সোহাগ-আবেগে অচেতন !
হেথা এক ফোঁটা প্রাণ, ক্ষীণ প্রাণ-পরমাণু,
আলোড়িত অভিমান বেগে,
ফাটিয়া টুটিয়া পড়ে, দিগন্তে ছড়ায়ে পড়ে,
মহাশূন্যে নিঃশব্দে মিলায় ;
মুমূর্ষু তারার মতো, নিষ্প্রভ ফুলের মতো,
তোমার আঁখির অগোচরে !
নিয়েছি পেয়ালাখানি, মরণ পেয়ালাখানি,
তুলে নেছি ঠোঁটের কিনারে ;
একটি চুমুক শুধু, একটি শঙ্কিত চুমা—
একটি মুহূর্ত্ত শুধু বাকী !
কারো পরে রোষ নাই, কারো কোনো দোষ নাই,
আছে যাহা শুধু সে আমারি—
আপনার অনুরাগে, আপনারে ক্ষয় ক'রে,
নিজে আমি হ'য়েছি নিঃশেষ !
কোথা দূর বন হ'তে খ্যাপা বায়ু ব'য়ে আনে
অতর্ক সুরভি-সঙ্কেত ;

কোথা পাখী ওঠে ডেকে, থেকে থেকে 'ওকে' 'ওকে',
ঘুমে ভরা পাতার আড়ালে—
ঝিল্ মিল্ করে জল, অগাধ অথৈ জল,
ঝিম্ ঝিম্ করে দেহ-মন,
আজ আমি ডুঁবে যাবো, আজ আমি উবে যাবো,
আজ আমি তলাবো অতলে।

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

মায়াবিনী

আমি ছিলুম ফাউষ্ট-এর মতো ; জ্ঞানার্জ্জনের প্রখরতাপে চিত্ত ছিল শুষ্ক
রুক্ষ তীব্র, যেন চৈত্রশেষের মরুভূমি।
তাতে আমার অতৃপ্তি ছিল না, এগিয়ে চলার রুদ্রবেগেই পেয়েছিলুম
আপন স্থিতি।
মধুর রসের আস্বাদ? তাও পেয়েছি তির্য্যক্‌ভাবে, বুদ্ধি দিয়ে;
কেন-না সে-মাধুর্য্যের
উৎসমূলে ছিল না কোনো শরীরিণী নারী ; ছিল একটা অ্যাবষ্ট্রাক্‌ট্
আইডিয়া, ইনটেলেকটুয়াল বিউটি, যাকে আমি ভজনা করেছি শেলীর
মতো, শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে জীবনের হাটে মরণের সমাধিতে।
মনে পড়ে কত ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাত অতন্দ্রিত কেটে গেছে তারি অতর্কিত
আবির্ভাবের অধীর প্রতীক্ষায়।
কতদিন পথ চলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে গাড়ী মোটরের তোড়-কে আবর্ত্তিত
করেছি, তারি ক্ষণিক আভাসে বিমুগ্ধ হয়ে।
সহরের জন-স্রোত মনে হয়েছে ছায়াবাজী, কোন মায়াবিনী ভানুমতীর
খেয়াল, লুকোচুরি খেলায় আমায় বিপর্য্যস্ত করায় যার কুটিল আনন্দ।
তাকে আয়ত্ত করার ছিল না আমার কোন প্রয়োজন, তার অস্তিত্বের
বিশ্বাসেই ছিল আমার অস্তিত্বের তাৎপর্য্য॥

টি'কলো না এ স্থিতি ; উঠলো ঝড়, কাল বৈশাখী, সুরু হোল প্রবৃত্তির
তাণ্ডব নর্ত্তন, এতদিনকার মূঢ় বঞ্চনার প্রতিরুদ্ধ প্রতিঘাত।
উবে গেল জ্ঞানস্পৃহা, আকাশমুখী অভীপ্‌সা ; মাটি, স্থূল কালো
মাটি, তখন আমার পায়ের তলার একমাত্র নির্ভর'—দি ওনলি রিয়্যালিটি।
মিশে গেলুম মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে ; ক্লেদাক্ত কর্দ্দমই'
তখন পরমান্নের প্রতিভূ ॥

এমন সময় তুমি এলে—বর্ষার শ্যামল মেঘ।
জানি না কোন্ ডিপ্রেশনে তোমার জন্ম, কোন্ মনসুন তোমার সারথি,
কোন্ তুহিন রাজ্যে তোমার দেশ।
তুমি নুয়ে পড়লে আমার বুকের ওপর তোমার ভারাক্রান্ত বুক নিয়ে।
দেখতে পেলুম তোমার অন্তরের বিদ্যুৎ-দীপ্তি, তোমার চোখের
স্নেহ-সজলতা।
আমার সামীপ্যেই যেন তোমার গতি-অবসান ; তোমার আবেগবৈচিত্র্যের
নর্ম্ম-বিলাস চলবে আমাকে ঘিরেই।
এ মমত্ব-বোধ আমার জীবনে এই প্রথম, আমি মুগ্ধ হলুম।
বিশ্বাস জাগলো আমি বৃথা নই ; তোমার ধারা বর্ষণে আমার মাটিত্ব
পাবে উর্ব্বরতা, পাবে সৃষ্টিশক্তি, ফিরিয়ে দেবে বিধাতাকে তার
জন্মকালের ঋণ ॥

তখন ত বুঝতে পারিনি তুমি আমার সেই মায়াবিনী ছলতে
এসেছ নতুনরূপে।
মিটলো তোমার খেয়াল, থামলো তোমার দানের ধারা, কমলো
তোমার ভার, তোমার রং গেল বদলে, তোমার টানও গেল ভিন্নমুখে।
তুমি চলে গেলে যেন শরতের মেঘ, শ্বেতলঘুপক্ষ শূন্যচারী বলাকা,
উড়ে গেলে কে জানে কোন্ দিগন্তের পরপারে ॥

তবু ব্যর্থ হয়নি তোমার সংযোগ।
তুমি আমায় দিয়ে গিয়েছ প্রাণশক্তি, আর ঐকান্তিক সঙ্গমের প্রচ্ছন্ন
মাধুর্য্যের প্রসন্নতা, যার প্রকাশ—ক্ষেতের হলুদে, 'নদীর স্ফটিকে,
আকাশের নীলে।

তোমার অদর্শনে বিধাতার ঋণ শোধ করা সৃষ্টি-প্রেরণা আমি হারালুম ;
পেলুম কর্ম্মপ্রেরণা।
আমার জীবনে আর একটি মানুষ পেয়েছে পূর্ণ আশ্রয় ; তার ক্ষুধার
অন্ন তৃষ্ণার জল দুঃখের সান্ত্বনা ; তুলে নিয়েছি এই একটি অসহায়ের
সমস্ত ভার ; তাকে গড়ে তোলা আমার কামনার শেষ লক্ষ্য ; বিশ্বব্যাপ্ত
মানবার্ত্তির রহস্য-ঘন ট্র্যাজেডির বিরুদ্ধে আমার সক্রিয় প্রতিবাদ।
আমার বিশ্বাস পূর্ণ বিকশিত একটি মানুষ, সুগঠিত চাবীর মতো,
খুলে দিতে পারে সর্ব্বমানবের মুক্তিপথের রুদ্ধদ্বার।
তাই এর পূর্ণ বিকাশই আমার জীবনব্রত, এ সাধনায় আত্মবিলোপেই
আমার আত্মপ্রতিষ্ঠা॥
কিন্তু মায়াবিনী, এ আত্মবিলোপ যে ক্রমে আত্মহত্যা হয়ে উঠছে,
তোমার সংশ্লেষের অভাবে।
তোমার স্মৃতি যে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে, তোমার অদৃশ্য দূরত্ব যে আমার
সহ্য সীমার বাইরে যাচ্ছে।
ভাবছি বসে, আবার তোমার দেখা পাবো কবে।
তুমি কি আসবে না আমার জীবনোপান্তে, রাখবে না তোমার ইচ্ছাগতি
চরণদুটি আমার লুপ্তস্রোত প্রাণ-প্রবাহের শীতল-কোমল তুষার পুঞ্জে ?
না, আমায় খুঁজতে হবে তোমার মায়ার কাঠি, মৃত্যুর সূর্য্যচন্দ্র তারকাহীন
অন্ধতমসা পার হয়ে, জন্মান্তরের বসন্তাগমে নূতন কল্পলীলার সূচনায়॥

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

বিয়োগান্ত

১

মেরু-শৈত্যের আবেশ লেগেছে প্রাণে
তোমার তনুর ছায়ে।
নির্ব্বান্ধব দিনের কণিকা
ভেসে যায় মেঘ পানে।

আহ্বান নেই,
নেই কোন মদিরতা,
তোমার তনুর ছায়ে।
মনে হয় মুছে ফেলি
প্রতি নিমিষের পরাজয়গুলি
জীবনের লিপি হতে।
একটি দিনের একটি না শোনা কথা,
মৃদু পরশের নেশা,
থাকুক অসীম নির্মেঘ নভ হয়ে
আমার কামনা-নীলে।
শুধু যেন মুছে ফেলি,
প্রতি নিমিষের মৃত্যু-কাহিনী
জীবনের লিপি হ'তে।

২

জীবনের চক্রপিষ্ট পথে,
কোলাহলের উন্নত শিখরে,
রইলে তুমি বসে।
নাম্‌লে না বিবর্ণ দিনের মাঝে
প্রতিদিনের অখ্যাত যাত্রায়,
রতিহীন রাত্রের নীরব আড়ালে
তোমার অভাবটা শীত-ঋতু,
দুরাশার কুয়াশায় ঢাকা।
তুমি-হাঁরা ভাপাতুর জীবন আমার
নিভে গেল, নিভে গেল আজ
কম্পমান হৃদয়ের শীতল দ্বিধায়।

তোমারই ত অকরুণ নির্ব্বাক দৃষ্টির নীচে
সোনালী নিমেষগুলি
মৃত্যু পেলো তিলে তিলে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র

কাণ্ট্

স্থিতপ্রজ্ঞ হে মহাসন্ন্যাসী,
প্রতীচ্যের বিরূপাক্ষ সম
আপনার তপস্যার কেন্দ্রীভূত জ্ঞানাগ্নিশিখায়
শতাব্দীর পুঞ্জীকৃত আবর্জ্জনা ভস্মশেষ করি,
রচিয়াছ যোগের বিভূতি ॥
চিত্তমানমন্দিরের সিদ্ধা সনে বসি
প্রসারিয়া অন্তর্দৃষ্টি তন্মাত্রিক আকাশের তলে,
দেখিয়াছ কুণ্ডলিত ঘূর্ণাবর্ত্ত স্রোতে
নীহারিকা-পুঞ্জ-মাঝে
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহমণ্ডলীর জন্মক্ষণ-রাশিচক্র ;
অঙ্কিত তাহাতে
সৃষ্টির অদৃষ্টলিপি সূক্ষ্মসমীকরণরেখায় ॥
তার পরে অগ্রগতি প্রাণের যাত্রায়
প্রত্যন্তজীবের সনে
মানব-দেহের
অস্থির সংস্থানসাম্যে
একসূত্র ধারাবাহিকতা
নৈরাত্মশারীররাজ্যে প্রথম জানিয়াছিলে তুমি ॥
প্রস্তরিত পঞ্জরের সুগোপন তলে
বক্ষোমাঝে অনির্ব্বাণ চিতাবহ্নি জ্বালি,

আচম্বিতে বসুন্ধরা ধৈর্য্যহীন অসহ্য উচ্ছ্বাসে
জ্বালামুখী-রক্তধারা পান করে ছিন্নমস্তারূপে ;
তার সেই অন্তর্গূঢ় প্রলয়ের গুপ্ত অগ্নিলেখা
দেখিয়াছ ঈশাননয়নে ॥
তুষার-আসন হতে স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে
উচ্চারিলে আশীর্ব্বাণী তুমি,
সাম্যমৈত্রী-স্বাধীনতা-গুপ্তবীজমন্ত্রবলে
যেই ক্ষণে অকস্মাৎ
লুপ্ত হলো পৃথ্বী হতে গর্ব্বোদ্ধত রাজসিংহাসন,
বিপ্লবের পাঞ্চজন্য দিকে দিকে উঠিল ধ্বনিয়া,
লোকায়ত রক্তলেখা দেশ হতে দেশান্তরে
মুক্তিরূপে উঠিল ফুটিয়া,
সূর্য্যের উদয় হতে প্রতীচীর অস্তাচলে
চিতাগ্নির রক্তিম সন্ধ্যায় ॥
ত্রিবর্ণ রঞ্জিত করি হে বিদ্রোহী
স্বতন্ত্র চিত্তের জয়ধ্বজা উড়াইলে তুমি ;
বিশুদ্ধ বুদ্ধির রথে বিজ্ঞানের ছায়াপথ বাহি
ত্রিদিবের সিংহদ্বারে হলে উপনীত ;
অন্বীক্ষাসায়কস্পর্শে রেণু রেণু হ'য়ে
নিরালম্ব শূন্যে মিলাইল
অলীক কল্পনাসৃষ্ট সোপাধিক ঈশ্বরের
নতশির মূঢ়প্রণতির অশ্রুসিক্ত লজ্জাপাদপীঠ ॥
আত্মার অমর প্রেত
মানবের আবর্জ্জিত চিত্তের মুকুরে
রচিয়াছে যুগে যুগে অশরীরী ছায়াময় রহস্যগুণ্ঠন,
অন্তরাল হতে তার অতীন্দ্রিয় মিথ্যা মায়াবিনী
অজানিত আকর্ষণে কতবার কৌতুক ইঙ্গিতে
ঘটায়েছে পথভ্রান্তি সুদূরের তীর্থযাত্রী যোগভ্রষ্ট মানব আত্মার ;

অবশেষে প্রমাজ্ঞানখড়্গাঘাতে তব
প্রেতলীলা চিরতরে সাঙ্গ হল তার ॥
তার পরে জগতের সমগ্র সত্ত্বারে
দূর হতে দূরান্তরে অন্বেষণ করি
ক্রান্তানাকরথধর্ম্ম উত্তরিলে ধ্রুবজ্যোতির্লোকে ;
দিব্যদৃষ্টিতলে তব শূন্যে মিলাইল
অনন্ত-সান্তের ভিন্নবর্ণ আলো-ছায়া-মরীচিকা-রেখা ;
সংশয়ের অন্ধকারে নির্দ্দেশিলে নখচন্দ্র-আলোক-ইঙ্গিতে
বিশ্বের পরম তত্ত্ব নিরর্থক ভ্রান্তিমাত্র দেশকাল-প্রত্যয়-নেমিতে ॥
অন্তঃসংজ্ঞা প্রকৃতির তন্দ্রাবিষ্ট অন্ধকার হতে
মানবের শ্রেয়োবোধদ্বিজন্মসংস্কার
করিয়াছ প্রজ্ঞানের বোধিদ্রুমমূলে ;
সর্ব্বরাষ্ট্রস্বরাজ্যসিদ্ধির মহামন্ত্র উচ্চারিলে তুমি
শাশ্বতী শান্তির বাণী বাল্মীকির মুক্তি-অনুষ্টুপে ;
কিন্তু এ ক্ষণিকা পৃথ্বী আবর্ত্তিছে অস্থির সর্ব্বদা বিরোধের অক্ষদণ্ড পরে ;
তাই তুমি স্থাপিয়াছ ধ্যানযোগচিত্রকল্প তপস্যার মানস সন্তানে
শূন্যাকাশে নবসৃষ্ট অপ্রপঞ্চ সপ্তর্ষিমণ্ডলে ॥
তাই বুঝি প্রতিষ্ঠার ধ্রুবলোক হতে
মুক্তির অমোঘ দণ্ডে করিয়াছ কক্ষচ্যুত ভূতাবিষ্ট মূঢ় প্রকৃতিরে
শৃঙ্খলিত অভ্যাসের অচেতন বৃত্তরেখা হ'তে ;
আপন গতির বেগে মগ্নশৈলবাধাপথ বাহি
ছুটিয়াছে কালস্রোত ঘূর্ণাবর্ত্তে, মাধ্যাকর্ষণের সীমা অতিক্রম করি
উত্তর প্রপঞ্চ তব মহাধ্যানরাজ্যের সন্ধানে ॥
হে নবীন মন্ত্রদ্রষ্টা, বিশ্বমাঝে অদ্বিতীয় তুমি,
ছিন্ন করি ধ্যানযোগে প্রবৃত্তির অন্ধ যবনিকা
লভিয়াছ সুদুর্জ্ঞেয় রহস্যের অব্যর্থ সন্ধান
অতীন্দ্রিয় তৃতীয় নয়নে।
তব মন্ত্রে নবজন্ম লভি, হেরিলাম নূতন জগতে

দূরে আরো বহুদূরে
মনোবুদ্ধিঅস্মিতার দৃষ্টিসীমা যেথায় মিলায়ে যায় মহাশূন্যতলে
মুক্তিতীর্থযাত্রাপথে,
অর্দ্ধ পরিচিত ধরিত্রীর বিদেহ আত্মার আলোকিত ঊর্দ্ধগতিরেখা ;
পশিল শ্রবণে স্বপ্নে যেন স্তব্ধ অন্ধকারে,
তৃণাঙ্কিত পৃথিবীর ধূলিকণা, বনস্পতি, গন্ধাঞ্চল অরণ্যশ্রী,
সপ্তসিন্ধু, মানবের জন্মজন্মান্তর
গাহিতেছে সমস্বরে নিখিলের মধুচ্ছন্দা মুক্তির সঙ্গীত ॥
তাহাদের নৃত্যচ্ছন্দে ঊর্দ্ধলোক হতে
চমকিত জ্যোতিঃপদরেণু বিচ্ছুরিত তারকার রূপে
অকস্মাৎ পড়িল ঝরিয়া ;
সুন্দর নয়নপাতে আনন্দিত মহান শ্রদ্ধায়
শাশ্বত তারকাধূলি শুভাশিস নতশিরে করিল গ্রহণ,
নিঃশব্দ চরণপাতে চলিয়াছে যবে
স্থিরলক্ষ্য যাত্রাপথে রাত্রিবধূ টানি তার কৃষ্ণাবগুণ্ঠন,
আদিহীন বিসৃষ্টির আত্মজিজ্ঞাসার অতীত স্মরণ-রেখা
নিরুত্তরে ফেলিয়া পশ্চাতে,
জানাইতে যাত্রাশেষে শিশিরচন্দনস্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় প্রণতি তাহার
ধ্রুবলোক-ধ্যানবেদীমূলে ।
মহামৌন আশীর্ব্বাদে সুনমিতা শর্ব্বরীর শিরে
নক্ষত্রখচিত মুক্তির মুকুটদীপ্তি ঝল্‌মল্‌ করিল আকাশে ;
সেই দৃশ্যে কণ্টকিত পৃথিবীর অপলক দৃষ্টিপাতক্ষণ
চিরন্তন রূপ নিল যুগে যুগে মানবের অম্লান বিস্ময়ে ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

পুস্তক পরিচয়

শেষ সপ্তক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়)

শেষ সপ্তক রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতম কবিতার বই এবং তাঁর গদ্য কবিতা পর্য্যায়ের এটি তৃতীয় বই। প্রথম দু'খানি বইয়ে কবি যে আদর্শ নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ ক'রেছিলেন, বর্ত্তমান বইয়ে তা পূর্ণতা লাভ ক'রেছে মনে করাই সঙ্গত। কিন্তু প্রচলিত ছন্দোবন্ধ ও মিলকে পরিহার ক'রে গদ্যে কবিতা লেখার হেতু কি তা নিয়ে অনেক পাঠকের মনেই হয়ত প্রশ্ন আছে—রবীন্দ্রনাথ নিজে চিঠিপত্রে এবং প্রবন্ধে সাধারণকে মোটামুটি ভাবে এ বিষয়ে কতকটা অবহিত ক'রেছেন। তিনি নিজে প্রেসিডেন্সী কলেজে এবং সাহিত্য পরিষদে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি ক'রেও দেখিয়েছেন যে তথাকথিত ছন্দ এবং মিল না থাকলেও, এই গদ্য কবিতাগুলির মধ্যে একটা সমাহিত অথচ মুক্ত সুরের আমেজ আছে, যা একটু তৈরি কান থাকলেই ধ'রতে পারা যায়। এ কথা সত্য হ'লেও অবশ্য ছন্দচাতুর্য্য কাব্যের পক্ষে অনাবশ্যক হ'য়ে পড়ে না—আবার গদ্যে কবিতা লেখার বিরুদ্ধেও কোন যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না তা থেকে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে আমেরিকার প্রসিদ্ধ কবি ওয়াল্‌ট হুইটম্যান্ তাঁর Leaves of Grass কাব্যে ছন্দকে পরিহার ক'রে সোজা গদ্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন। হুইট্‌ম্যানের কাব্যে লালিত্য, মাধুর্য্য বা সৌকুমার্য্য সৃষ্টির কোন আবশ্যক হয় নি—তিনি রসশিল্পী নন্—সংসার সম্বন্ধে, মানুষ সম্বন্ধে, অন্যায় অসত্য প্রভৃতির সঙ্ঘাত সম্বন্ধে তাঁর মনে যে সব সুতীব্র অনুভূতি জেগেছিল, যে সমস্ত মতবাদ জন্ম লাভ ক'রেছিল, তাই তিনি লিপিবদ্ধ ক'রেছেন—শিল্পের দৃষ্টিতে তাদের রূপায়িত বা রসায়িত করেন নি। কাজেই তাঁর পক্ষে এই টেক্‌নিক্ খুব উপযোগীই হ'য়েছিল। তাঁর সমসাময়িক রুষ কথা-সাহিত্যিক টুর্গেনিভ Poems in Prose নামক বই লেখেন। এই বইয়ের কবিতাগুলিও একটু নূতন ধরণের—একটি কুকুর, কি একটি রিক্সাওয়ালা, কি দুটি বোন বা এই শ্রেণীর ছোট ছোট ছবি ও তাদের আনুষঙ্গিক ছোট ছোট সুখ দুঃখ, প্রীতি প্রেমের ইঙ্গিতকে কেন্দ্র ক'রে এই কবিতাগুলির সৃষ্টি। এরা যেন এক একটি ছোট গল্পের চালচিত্র। এ রকম কবিতার পক্ষেও গদ্যই প্রশস্ত টেক্‌নিক্।

কিন্তু হুইট্‌ম্যান্ বা টুর্গেনিভের ধারা রসাত্মক লিরিকের পক্ষে কতটা উপযোগী তা বলা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের ধারা কিন্তু এদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অনেক দিন পূর্ব্বে ইংরাজী গীতাঞ্জলিতে তিনি যে রীতি অবলম্বন ক'রেছিলেন, এত কাল পরে বাংলাতে তিনি কতকটা সেই রীতিরই অনুসরণ ক'রেছেন মনে করা যেতে পারে। ইংরাজী গীতাঞ্জলির ধরণটা আবার Book of Psalms থেকে নেয়া কি না, সে গবেষণা বর্ত্তমান আলোচকের

পক্ষে অনাবশ্যক। কারণ এ বিষয়ে টম্‌সন্ সাহেবের সঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই মতদ্বৈধ আছে শুনেছি।

ছন্দ ও তান লয়ের ওজন বাঁচিয়ে, অনুপ্রাস ও অলঙ্কারের জড়োয়া গহনার ভারে, কবিতা যে সহজ ভাবে চ'লতে পারে না, তার স্বাভাবিক গতি যে কতকটা পঙ্গু হয় এবং অন্তরের স্বতঃ উৎসরিত আনন্দটি যে অনেকটা কৃত্রিম হ'য়ে পড়ে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কাজেই এই লৌকিক সুরের সুলভ কল-গুঞ্জনকে পরিত্যাগ ক'রে কবিতার মধ্যে যদি বলিষ্ঠতর, নূতনতর গতির বেগ সঞ্চারিত করা যায়, তা হ'লে যে এই শব্দগত music-এর পরিবর্ত্তে প্রাণগত বৃহত্তর music-এর স্ফূর্ত্তি হবার সুযোগ হয়—এ কথাও পরীক্ষিত হ'য়েছে কার্ল স্যাণ্ড্‌বার্গ ও ডি এইচ্ লরেন্সের হাতে। কবিচিত্তের অত্যুগ্র ভাবাবেশকে সৌখীন শব্দ-লালিত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ক'রে তাকে তাল মাত্রার বাঁধাপথে হাঁটাতে গেলে কাব্যের প্রাণ-বস্তু ক্ষুণ্ণ হয় ব'লেই বিংশ শতাব্দীর কবি কাব্যের অপরূপ দেহসৌষ্ঠব চাইলেন না, তিনি চাইলেন তার প্রাণ-সম্পদের প্রাচুর্য্য। তাই বন্ধাহীন গদ্য কবিতাই হ'ল বিশেষ ক'রে এ যুগের কবিতা।

ধরা যাক্ শেষ সপ্তকের এই অংশটি—

বিপুল ঔৎসুক্য আমাকে বহন করে নিয়ে যায় সুদূরে ;
বর্ত্তমান মুহূর্ত্তগুলি
অবলুপ্ত করে কালহীনতায়।
যেন কোন্ লোকান্তরগত চক্ষু
জন্মান্তর থেকে চেয়ে থাকে
আমার মুখের দিকে,—
চেতনাকে নিষ্কারণ বেদনায়
সকল সীমার পরপারে দেয় পাঠিয়ে। (পৃঃ ৮৬)

এই কবিতাকে যদি ছন্দোবন্ধে বাঁধা হ'ত (সে বলাকার ছন্দই হ'ক্ না কেন) তা হ'লে ঔৎসুক্য, মুহূর্ত্ত, অবলুপ্ত, লোকান্তর, চক্ষু, নিষ্কারণ প্রভৃতি যুক্তাক্ষর বহুল এবং আপাতদৃষ্টিতে রূঢ় শব্দগুলিকে (পুনঃ পুনঃ ব্যবহার ক'র্‌তে হ'লে) হয় যথা সম্ভব মোলায়েম ক'রতে হ'ত, না হয় এদের ভারসাম্য রক্ষা ক'র্‌তে প্রত্যেকটি চরণ ওজন ক'রতে হ'ত। তা ছাড়া প্রাণের কথাগুলিরও এমন স্বচ্ছন্দ প্রকাশ হ'ত কি না সন্দেহ। এই যে কৃত্রিমতা এর বিরুদ্ধেই কবির প্রধান আপত্তি।

ইংরাজী থেকেও একটা দৃষ্টান্ত নেয়া যাক্—

Then must I not talk? Must I remain silent, with lips sealed in your burning kisses and look vacantly at the eyes that betray no passion, no yearning—but a dull desire floating drearily, like clouds hanging along a projecting precipice?—

এর সঙ্গে সুইন্‌বার্ণের Why should you not let me speak, Oh the longing for a word প্রভৃতি লাইনগুলির তুলনা ক'রলেই তফাৎটা কোথায় তা ধরা প'ড়বে।

বিংশশতাব্দীর কবিরা বলছেন এই তফাৎ থাকবার কোন অর্থ হয় না। এ ছাড়া কাব্যের যে একটা বিশেষ ভাষা আছে, কতকগুলি বিশেষ ম্যানারিজ্‌ম্ আছে, সেগুলিরই বা কি সার্থকতা? আমরা যে ভাষায় কথা বলি, ভাবি চিন্তায়, কাব্যের ভাষা তা থেকে পৃথক হবে কেন? তা যেখানেই হয়, সেখানেই রচনা হ'য়ে পড়ে আড়ষ্ট, কাব্যের এলাকা হয় সীমাবদ্ধ। এই কথা আরো বেশী ক'রে খাটে বাংলা কাব্য সম্বন্ধে—বাংলা কাব্যে প্রচলিত অসংখ্য নাম ধাতু, অব্যয় ও সর্ব্বনামের ছড়াছড়ি র'য়েছে, যা গদ্যে কদাচ চলে না; এ ছাড়া কাব্যের গঠনে এমন একটা বিশেষ ধরণ আছে, যার ফলে কেবল কান্তপদাবলীই বাংলা ভাষায় বাগিয়ে লেখা চলে। কিন্তু এই যুক্তির পেছুনে যে কথাটা আছে সেটা আগে প্রণিধান করার যোগ্য। কাব্যের পক্ষে বিষয়-বস্তুটা চিরদিনই উপলক্ষ ব'লে গণ্য হ'য়েছে, অথচ প্রচ্ছন্নভাবে তার ভেতর কাজ ক'রেছে সৌন্দর্য্য ও শিষ্টতার আভিজাত্য—কাজেই তার প্রকাশ-ভঙ্গীও হ'য়েছে তার অনুরূপ। এখন যদি প্রকাশ-ভঙ্গীর মধ্যে গদ্যাত্মকতা প্রবেশ করানো হয় (সে গদ্য যতই সুরেলা হ'ক্) তা হ'লে তার বিষয়-বস্তু বা দৃষ্টি-ভঙ্গীরও পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য—নচেৎ কাব্যের দেহে ও প্রাণে সামঞ্জস্যের অভাব ঘটবে। ছন্দোবদ্ধ কাব্যে যা বলা যায় না বা যায় নি তাই বলার উদ্দেশ্যেই ছন্দ-মুক্ত কবিতা লেখার সূত্রপাত হ'ল। এবং এদিক থেকেই এর সার্থকতা।

কিন্তু শেষ সপ্তকের কবিচিত্তধারা রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত চিত্তধারা থেকে স্বতন্ত্র নয়। শুধু ছন্দের মিল ও ধ্বনিসাম্য বর্জ্জন ছাড়া আর সব দিক দিয়েই এ কবিতাগুলি কবির পরিণত জীবনের কাব্যগুলির (পূরবী, মহুয়া, বনবাণী) সমগোত্রীয়। যেমন—

> তারা কোন্ প্রথম প্রত্যূষের আলোকে
> কোন্ গুহা থেকে বেরোলো,
> অসংখ্য পাখা মেলে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো চক্রপথে
> আকাশ থেকে আকাশে। (পৃঃ ১৭)

এই শ্রেণীর কবিতার মিল জুগিয়ে দেওয়া কত সহজ। যতি-সংস্থান এবং মাত্রা-বিভাগ ত প্রায় তৈরিই আছে। আর প্রাণ-বস্তুর দিক থেকেও এরা খাঁটি রবীন্দ্র-পন্থী। তাই শেষ সপ্তকের কোন কোন স্থলে টেক্‌নিক্ যেন তার বিশিষ্টতা হারিয়ে ফেলেছে মনে হয়। হুইট্‌ম্যানের কাব্যে আমরা মতবাদের তূর্য্যধ্বনি ও শানিত উক্তির অসি-সঞ্চালন দেখেই সন্তুষ্ট। কিন্তু শেষ সপ্তক যে কলালক্ষ্মীর নৃত্যের আসর—এখানে নূপুরনিক্কণ ত বাহুল্য মনে হবার কোন কারণ নেই। তবে এখানেই হয়ত রবীন্দ্রনাথের নিজস্বতা, কারণ তিনি নিজেই ব'লেছেন—

> তারপর দাও আমাকে ছুটি
> জীবনের কালো সাদা সূত্রে গাঁথা
> সকল পরিচয়ের অন্তরালে;
> নির্জ্জন নামহীন নিভৃতে;
> নানা সুরের নানা তারের যন্ত্রে
> সুর মিলিয়ে নিতে দাও
> এক চরম সঙ্গীতের গভীরতায়। (পৃঃ ১৫৯)

এবং এও বরাবরই দেখা গেছে তিনি যে ধারার প্রবর্ত্তন করেন, তিনি নিজেই তার সর্ব্বাঙ্গীণ সার্থকতা সাধন করেন, অপরে করে তার অনুকরণ।

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

Anti-Duhring—By Friedrich Engels; Translated by Emile Burns. (Martin Lawrence).

সাম্যবাদী বলে যাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন, তাঁদের মধ্যে মতবৈচিত্র্যের অভাব নেই, কিন্তু যে আন্দোলন ১৮৪৮ সাল হ'তে একদিকে আশা ও অন্যদিকে আশঙ্কার সৃষ্টি করে' আস্ছে, তার সঙ্গে সর্ব্বোপরি দুই মহারথীর নাম সংশ্লিষ্ট আছে, মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্। উভয়ে প্রায় একই সময়ে, একই ভাব-স্রোতের মধ্য দিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছিলেন; উভয়ে প্রথম হেগেল্ ও পরে ফয়েরবাখের (Feuerbach) প্রভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়েছিলেন; পরে উভয়েই স্বাধীনভাবে সাধারণস্বত্ববাদ (Communism) গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের পরস্পর সাক্ষাৎ হয় ১৮৪৪ সালে; ও ত'ার পর হ'তে তাঁদের মধ্যে যে আজীবন সাহচর্য্য ও সহকারিতা সংস্থাপিত হয়, তা অনবদ্য। পিতার ব্যবসাব্যপদেশে এঙ্গেল্স্কে বহুদিন ম্যাঞ্চেষ্টারে থাক্‌তে হ'য়েছিল; সুতরাং তৎকালীন যান্ত্রিক সভ্যতার যেখানে পরাকাষ্ঠা, সেখানকার অবস্থা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন। বাস্তব জীবনের অকুণ্ঠিত বর্ণনা দিয়ে মার্ক্স্ যে তাঁর সিদ্ধান্তকে এত শক্তিমান্ করেছেন, দৃঢ় ভিত্তির ওপর বসাতে পেরেছেন, সেজন্য তিনি বিশেষ ঋণী ছিলেন এঙ্গেল্সের কাছে। যে ধরণের সাধারণ তথ্য, জীবনের প্রকৃত ঘটনার যেরূপ বিশ্লেষণ, মার্ক্সের মতবাদকে বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের মূলমন্ত্র করেছে, সেদিকে এঙ্গেল্সই তাঁর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন। তাঁদের সহযোগিতার প্রকৃষ্ট ফল হ'চ্ছে 'সাধারণ স্বত্ববাদীর ইস্তাহার' (Communist Manifesto); ভাষার ভঙ্গীতে, তেজস্বিতায়, স্বল্পপরিসরে যুগান্তরকারী মতবাদ প্রকাশের ক্ষমতায়, এই ইস্তাহার অতুলনীয়। এঙ্গেল্স্ মার্ক্সের বিরাট প্রতিভার প্রতি এমনই শ্রদ্ধা পোষণ করতেন যে তাঁদের দু'জনের সহকারিতায় নিজের অংশীদারী সম্বন্ধে ঘুর্ণাক্ষরে সামান্য মাত্র গর্ব্ব করেন নি। আমরা এখন জানি যে তিনি শুধু অর্থ ও স্নেহ দিয়ে প্রবাসী মার্ক্স্কে আজীবন সাহায্য করেন নি; চিন্তা দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে, অভিজ্ঞতা দিয়ে, প্রতিভা দিয়ে গুরুর অবদানকে সমৃদ্ধতর করেছিলেন।

মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্ সাম্যবাদকে বিজ্ঞানসম্মত রূপ দিলেন, প্রাকৃত ভিত্তির ওপর স্থাপনা করলেন। তাঁদের আগে সাম্যবাদের যে প্রচলন ছিল, তাতে ছিল করুণার, সহানুভূতির, পরোপচিকীর্ষার, ন্যায়রাজ্য কল্পনার বাহুল্য। জীবনের বাস্তব ঘটনার সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল অতি অল্প। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অকলঙ্ক জীবনের কাল্পনিক চিত্র এঁকে', স্বয়ংসিদ্ধ প্রাকৃতিক বিধির (Natural Law) আলোচনা করে', আদিম খ্রীষ্টানদের সমাজশাসন, মানুষের স্বভাবজ অনুকম্পা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান ইত্যাদির কথা বলে' সাম্যবাদের প্রচারচেষ্টা হ'ত। মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্ আকাশকুসুম রচনাকে

কবর দিলেন; সাম্যবাদকে কল্পনার রাজ্য থেকে নামিয়ে মানবজীবনের সাধারণ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক'রে দিলেন। তা'র ফলে দেখা গেল, সাম্যবাদ এই পৃথিবীর মাটির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশে আন্দোলনের নক্সা করা যাবে, সাফল্যের নিশ্চিততা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকবে না।* তাই যে proletariat আগে ছিল সকলের করুণার পাত্র, রাজনীতিক্ষেত্রে Cinderella, সে এখন রাজশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রাচীন সমাজ ভেঙে নূতনের প্রতিষ্ঠায় অনলস উদ্যোগী। পূর্ব্বে যে মতবাদ ছিল নির্দেশক (dogmatic), সর্ব্বদাই নিজেকে চিরন্তন অবিসংবাদী সত্য বলে প্রচার করত, তাকে আজ স্বতন্ত্রাধিকার হ'তে সমানাধিকার যুগ প্রবর্ত্তনের প্রকৃষ্টতম শক্তি বলা হ'চ্ছে। সে শক্তি যে শ্রেণীর মধ্যে মূর্ত্ত হ'বে, সেই শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে পূর্ব্বতন সাম্যবাদের কোন অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ ছিল না। মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌স্ শ্রমিকশ্রেণী ও সাম্যবাদকে দেহ ও আত্মার মত একত্র ক'রে দিয়েছেন।

সাম্যবাদের সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় কম, তাঁদের কাছে আলোচ্য বইখানার নাম অদ্ভুত ঠেক্‌বে। ড্যুরিঙের লেখা আজ প্রায় অপরিজ্ঞাত; এঙ্গেল্‌স্ তাঁর মত খণ্ডন না করলে বড় কেউ তাঁর নাম মনে রাখ্‌ত না। আত্মার অবিনশ্বরত্বে যাঁদের বিশ্বাস, তাঁরা বল্‌বেন যে স্বর্গে গিয়েও (ড্যুরিং স্বর্গেই গেছেন, ধরে নেওয়া উচিত), ড্যুরিঙের সুখ নেই; তাঁর বহুযত্নগঠিত চিন্তাপ্রণালী অবজ্ঞেয় অবস্থায় র'য়ে গেল। ড্যুরিঙের অহমিকা ছিল বিপুল; নিজেকে একমাত্র যথার্থ দার্শনিক বলে প্রচার করতে তাঁর দ্বিধা হয়নি—তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে তো বটেই, ভবিষ্যতে যতদূর দেখা যায় ("foreseeable future"), তার মধ্যেও নিজের তুলনা তিনি নিজেই ছিলেন। এঙ্গেল্‌স্ তাঁর তিনখানা বই সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন—"Course of Philosophy", "Course of Political and Social Economy", আর "Critical History of Political Economy and Socialism"। এই বই-গুলোতে তিনি প্রচার করেছেন যে তাঁর মতই শেষ, চরম সত্য। পৃথিবীর ইতিহাসে অবশ্য অনেকেই ভেবেছেন যে তাঁদের সঙ্গে মতভেদের অর্থ সত্য হ'তে বিচ্যুতি; কিন্তু 'খোশ্ মেজাজে, বহাল তবিয়তে' আত্মোৎকর্ষ সম্বন্ধে এরূপ খোলাখুলি বক্তৃতার উদাহরণ অতি অল্পই মিল্‌বে।

ড্যুরিং ১৮৭৫ সালে হঠাৎ তাঁর সাম্যবাদ গ্রহণের সংবাদ যথাসম্ভব আড়ম্বর করে' জানিয়েছিলেন। তখন তিনি বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। পূর্ব্বাচার্য্যদের নিন্দায় তিনি হ'লেন শতমুখ—লাইব্‌নিৎস্, কাণ্ট্, শেলিং, হেগেল্, কেউই বাদ গেলেন না। ফুরিয়ে, স্যাঁ-সিম, ওয়েন প্রভৃতি সাম্যবাদীকে তিনি গ্রাহ্যই করতে রাজী হ'লেন না; লাসাল ও বিশেষ করে মার্ক্‌সের জ্ঞানবুদ্ধিকে বিদ্রূপ করতে তাঁর লেখনী অসম্বৃত হ'য়ে পড়েছিল। জার্ম্মাণীতে তখন সাম্যবাদীদের দুই দলে মিলন ঘটেছে, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধোদ্যোগ পুরো মাত্রায় চলেছে। এমন সময় ড্যুরিঙের সাম্যবাদী নাম নিয়ে একটা বিশেষ মতের প্রচলন আর স্বতন্ত্র এক দলসৃষ্টির চেষ্টা জার্ম্মাণীর শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হ'বে বলে এঙ্গেল্‌স্ লেখনীধারণ করলেন। প্রথমে তাঁর লেখা সাম্যবাদীদের মুখপত্র Vorwartsএ বেরিয়েছিল; পরে তা পুস্তকাকারে প্রকাশ হয়।

ড্যুরিং দাবী করলেন যে তিনি যে দর্শনের পত্তন করলেন, তার ভিত্তি হ'চ্ছে

বাস্তবতা (Reality)। সর্ব্বপ্রকার গূঢ়ার্থবাদ (mysticism)—যা প্রকৃতত্ত্বকে গোপন ক'রে রাখে—তা'র বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়ালেন। ধর্ম্মবিশ্বাস বিশ্বের সৃষ্টিরহস্যকে জ্ঞানচক্ষুর সাম্‌নে থেকে দূরে সরিয়ে রাখে বলে তিনি তা'র প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করতে পশ্চাৎপদ হ'ন নি। কিন্তু 'ধর্ম্মের প্রতিভূ' ("substitute for religion") বলে তিনি যা খাড়া করলেন, তা হচ্ছে কঁৎ আর ফয়েরবাখের মতের একটা ভাব-প্রধান সংস্করণ। জড়বাদীদের চোখে ব্যাপারটা এই দাঁড়াল যে তিনি ঈশ্বরকে সদর দরজা দিয়ে সরানোর পর খিড়্‌কী দিয়ে ঢোকালেন্। আবার যে সাম্যবাদ তিনি প্রচার করলেন, তার গোড়ার কথা হ'ল নীতিশাস্ত্র (ethics); "সত্যের" চিরন্তনত্বে তাঁর বিশ্বাস, dialectics একেবারেই তাঁর মনঃপূত হ'ল না; সমাজতত্ত্বের ওপর ডারউইনের আবিষ্কারের যে ছায়া পড়্‌ল, তা তিনি উড়িয়ে দিতে চাইলেন। অর্থনীতিক্ষেত্রে তিনি চেষ্টা করলেন, আমেরিকান লেখক H. C. Carey-র মত প্রতিষ্ঠা করতে; ধনিক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের মূলগত দ্বন্দ্ব নেই, সন্ধিস্থাপন সম্ভব ও উচিত, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। তিনি আরও বলে গেলেন যে অর্থনীতির দিক্ থেকে প্রত্যেক জাতি আত্মনির্ভর হ'তে পারলেই, তার কৃষ্টি, তার চরিত্র উৎকর্ষ লাভ করবে। ফ্রেড্‌রিক দি গ্রেটের তিনি ছিলেন অন্ধ ভক্ত; প্রাচীন যুগের গ্রীক, সর্ব্ব-যুগের ইহুদি, আর জগন্মিত্র গ্যেটের ওপর তাঁর ছিল জাতক্রোধ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে তাঁর সাম্যবাদ হচ্ছে একরমক মতিভ্রম। Dialectic Materialism তিনি মান্‌লেন না; শ্রেণীবিরোধ (class struggle) তাঁর কাছে অবোধ্য, 'অতিরিক্ত কদরের' (Surplus Value) মার্ক্‌স্‌ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার অবধারণার তিনি চেষ্টা করলেন না, বা সে চেষ্টা বিফল হ'ল। তবে এঙ্গেল্‌সের "Anti-Duhring"এ শুধু যে অধ্যাপকের মতখণ্ডন আছে, তা নয়। তাঁর বিদ্যাভিমানকে এঙ্গেল্‌স্‌ যেমন বিদ্রূপ করেছেন, তেমনি নিজের জ্ঞানবল দিয়ে সে বিদ্যার ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করে' দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, তিনি সাম্যবাদের গোড়ার কথা আমাদের বুঝিয়েছেন। ভাষাসৌষ্ঠবে বইটি সুখপাঠ্য; সাম্যবাদী সাহিত্যে এর মূল্য খুব বেশী।

মার্ক্‌স্‌-এঙ্গেল্‌স্‌-লেনিনের চিন্তাধারার উৎস হচ্ছেন হেগেল্; কিন্তু সে উৎসের গতিকে তাঁরা ভিন্নমুখী ক'রে দিয়েছেন। তাঁদের বিচারের বর্গ (Categories of thought) নিয়োগ করা হ'য়েছে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের আলোচনায়, কোন কাল্পনিক নিরুপাধিক সত্তার (absolute spirit) চিন্তায় নয়। আমাদের প্রত্যেক ভাবরূপের একটি প্রতিকূল রূপ আছে; আমরা অবশ্য সহজে তা লক্ষ্য করি না। আমরা জানি যে অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব, শীতোষ্ণ, আলো-অন্ধকার, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, বিজ্ঞানবাদ-জড়বাদ, ধ্রুপদ-খেয়াল—এ সবের মধ্যে একটা পরস্পর অসঙ্গতি রয়েছে। কিন্তু এই আখ্যান প্রত্যাখ্যানের লীলা যে সর্ব্বত্র, তা আমরা বিনা আয়াসে বুঝি না; কেবল নিবিড় চিৎশক্তি প্রয়োগের ফলে বিশ্বের বৈচিত্র্যকে এই লীলারূপে দেখা যায়। প্রতিকূলতার সংগ্রাম যখন বাধে, তারই সিদ্ধান্ত হয় এক উচ্চতর অবস্থার সৃষ্টিতে। সময়ের সঙ্গে ন্যায় অন্যায় বলে পরিচিত হয়, যা প্রয়োজন তা নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে, প্রাচীন বিধিসংস্কারাদি অর্ব্বাচীন অবস্থার দ্বারা পর্য্যুদস্ত হয়। বিধিসংস্কারকে জীবনে নূতন পরিবেষ্টনের সঙ্গে খাপখাওয়ানোর চেষ্টা সামাজিক

বিরোধের রূপ নেয়; তার উদ্দেশ্য উচ্চতর সমাজস্তরে অধিরোহন। একেই হেগেল্ বলেছেন "negation of the negation"; thesis, anti-thesis-এর দ্বন্দ্ব হ'ল synthesisএর জনক।

ব্যাপারটা পরিষ্কার ক'রে বুঝ্‌তে হ'লে একটা দৃষ্টান্ত দরকার। ধরা যা'ক্ একটা ডিম। এটা হচ্ছে এমন একটা জিনিষ যা নির্ণীত (positive) কিন্তু এর মধ্যে এমন বীজ রয়েছে যা জন্ম নিচ্ছে ডিমের আধেয়কে নষ্ট করে' (negatives)। কিন্তু এর ফলে ধ্বংস হ'ল না; বীজটি জীবন্ত আকার ধারণ করল। যখন negation সম্পূর্ণ হ'ল তখন ডিমের খোলা ভেদ করে' কুক্কুটশাবকের জন্ম, তা'র স্থান ডিমের চেয়ে উচ্চস্তরে।

প্রাক্-মার্ক্‌স্ যুগের সাম্যবাদীরা স্বতন্ত্রাধিকার উচিত কি অনুচিত, এই নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। তাঁদের মতে যা মানবধর্ম্মের বিরোধী, তা অন্যায়; স্বতন্ত্রাধিকার মানবধর্ম্ম-বিরোধী, সুতরাং তা লোপ পা'ক্। ব্যাপারটা কিন্তু অত সহজ নয়। মার্ক্‌স এঙ্গেল্‌স বললেন যে মানবধর্ম্ম বলে স্থির, অচঞ্চল কিছু নেই, ইতিহাস ক্রমাগতই মানবধর্ম্মের বহু পরিবর্ত্তন প্রদর্শন করছে। যে যুগে ধনোৎপাদনের যে পদ্ধতি, তার সঙ্গে সেই যুগের সম্পত্তিবিধান, "মানবধর্ম্ম" পর্য্যন্ত, খাপ খেয়ে' যাবে। কোন চরম মীমাংসা বিশ্বধর্ম্মের বিরোধী; প্রবহমাণ স্রোতের মধ্যে আমরা রয়েছি, পরিবর্ত্তনই জীবন, স্থিতির অর্থ মৃত্যু। হেগেল্‌কে অনুসরণ করে মার্ক্‌স্-এঙ্গেল্‌স্ ক্রমবিবর্ত্তনের যে বিবরণ দিয়েছেন, তা হ'চ্ছে লেনিনের ভাষায় "A development, so to speak, in spirals, not in a straight line; a development in leaps and bounds, catastrophes, revolutions; intervals of gradualness; transformation of quantity into quality......"

মার্ক্‌স্-এঙ্গেল্‌সেব মতে proletariat হ'চ্ছে বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধার্থী; তাদের সাম্যবাদ-প্রচেষ্টার ফলে সমাজ-জীবনের এক উচ্চতর স্তরে আমরা আরোহণ করতে পারব। প্রাক্তন সমাজের রক্ষাকর্ত্তাদের সঙ্গে জায়মান সমাজের যোদ্ধাদের যে বৈরিতা, তা'র শান্তি নেই। জরাগ্রস্ত সমাজের মরণ অবশ্যম্ভাবী; তবে যথার্থ সাম্যবাদপক্ষীয়েরা যে ব্যক্তিগতভাবে শ্রেষ্ঠ, বা কেবল নীতি বা ধর্ম্মপ্রবুদ্ধ হ'য়ে সর্ব্বহারাদের দলে যোগ দিয়েছে, তা নয়, তা'রা হ'চ্ছে বিশেষ অর্থনৈতিক কারণে একত্রীকৃত শ্রেণী।

হেগেল্ dialectic ব্যবহার ক'রে মনের প্রাচীরে ঘেরা এক পৃথিবীর সৃষ্টি করলেন। মার্ক্‌স্ সেই প্রাচীর ভেদ করে যে পৃথিবীতে নরনারীর নিবাস, সেখানে স্থান নিলেন; বাইরের জগৎ ও মানুষের জীবন নানাদিক থেকে সারাজীবন অনুশীলনের ফলে চিন্তা বা ক্রিয়ার পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করলেন। মানুষের ভাবধারা—ধর্ম্ম, ব্যবহার, বিধি, তত্ত্ববিজ্ঞান—সমস্তই তৎকালীন সামাজিক পরিবেষ্টনের পরিচয় বলে প্রচার করলেন।

মার্ক্‌সের মতামত যাঁরা জান্‌তে চান্, তাঁরা "Anti-Duhring"এর মত বই কমই পাবেন। দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি সর্ব্ব বিষয়ের আলোচনাই বইয়ে আছে; আর মার্ক্‌স্ যা বলেছিলেন তা জান্‌তে চাইলে এখনকার কোন কোন

অধ্যাপকের স্বকপোলকল্পিত লেখা বাদ দিয়ে সোজাসুজি মার্ক্‌স্ এঙ্গেল্‌স্ বা লেনিনের লেখা পড়া উচিত। এঙ্গেল্‌সের ভাষার প্রসাদগুণ অনুসন্ধিৎসুকে সাহায্য করবে; 'Capital" দেখে আমরা অনেকেই ভয় পাই, "Anti-Duhring"এ ভয়ের কোন কারণ নেই।

অনুবাদ প্রাঞ্জল, সুপাঠ্য হ'য়েছে। আমাদের ভাষায় এরূপ বইয়ের অনুবাদ হ'বে কবে? কোন পরিভাষাপ্রাজ্ঞ সুলেখক এর ভার নেবেন, কি? আশা করতে ভরসা বিশেষ হয় না, কারণ দেখি তো যে আমরা কীর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা, অন্ধ বাউলের অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে মুগ্ধ, সমাজের জীবন্ত সমস্যা নিয়ে মস্তিষ্ক চালনাকে বুদ্ধিভ্রংশ বলে মনে করি।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

Coleridge on Imagination—By I.A. Richards (Kegan Paul).
Poetic Experience—By Thomas Gilby O. P. (Sheed and Ward).

সম্প্রতি এজ্‌রা পাউণ্ডের প্রবন্ধ সংগ্রহে তাঁর কাব্যাদর্শের কথা পড়ছিলুম। তারপরে বায়োগ্রাফিয়া লিটেরারিয়া পড়ে' আশ্চর্য্য হলুম উভয়ের কাব্যাদর্শের অনগভীর মিলে। তাই বেন্থামী রিচার্ড্‌স্‌ও যে নভশ্চারী কোলরিজে পাবেন তাঁর শ্রুতি, তাতে আর কি আশ্চর্য্য। রিচার্ডসের গভীর পাণ্ডিত্য, বিজ্ঞাননিষ্ঠা ও থিসিস্-জাতীয় পরিশ্রমকে ধন্যবাদ। বইটি কোল্‌রিজ-ভাষ্য শুধু নয়, কোল্‌রিজসংস্কারও বটে। কোল্‌রিজ্‌ কাব্য বল্‌তে শুধু কবিতা বুঝতেন না; কাব্য মানবজীবনে পরম প্রয়োজন ও মূল্যবান্ এ বিশ্বাস তাঁর ছিলো; রিচার্ডসেরও আছে। কাব্য সমগ্র মানবের সম্পূর্ণ প্রকাশ, অর্থাৎ ব্যক্তির অখণ্ড চৈতন্যের ঘনীভূত মূর্ত্তি, এ কথাও রিচার্ডস্ মানেন। কিন্তু এই মূর্ত্তিলাভ ও তার প্রক্রিয়া পারলৌকিক লীলা, কোলরিজের এ কথা মানতে তাঁর বাধে। রিচার্ডস্ বলেন, ঈশ্বর আমাদের কাছে আজ মৃত হলে'ও আমাদের মুক্তির প্রয়োজন উগ্রই আছে এবং কাব্য সে মুক্তির ফোয়ারা বহন করবে, ঈশ্বর মানার মতো অবৈজ্ঞানিক দাবী জারি না ক'রে। পৃথিবী ভারসাম্য হারিয়েছে, সভ্যতা দিশাহারা, মানুষ আজ ভ্রান্তির জীবনশোষক গোলকধাঁধায়। ধর্ম্মপ্রেমআদি সব বিশ্বাসের আশ্রয় আজ ভেঙেছে, এখন অন্ধজনে আলো কে দেবে? না, এই শিশুতীর্থের নবশিশু, কাব্য। অথচ কাব্য প্রাণ পেয়েছে বিজ্ঞানপূর্ব্বজ ঐ সব বাতিল বিশ্বাসের আশ্রয়েই। অবশ্য এ বৈজ্ঞানিকমন্য নাটকীয় ভাব রিচার্ডসের এ বইটিতে কমেছে।

এবং রিচার্ডস্ পাঠকের কাছে প্রায় সর্ব্বদা যে বুদ্ধির জাগ্রত অবস্থা দাবী করেন, এ বইয়ে তা না কমে' বরং বৃদ্ধিই পেয়েছে। তাঁর তীক্ষ্ণসতর্কতা ও রুচিমণ্ডিত পাণ্ডিত্য স্বাস্থ্যকর। বহুকষ্টসাধ্য স্পষ্টতা বর্ত্তমান বলে'ই তাঁর কথায় মতান্তর ঘটা সহজ, যদিও তাঁর সুবিন্যস্ত বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া শক্ত। অবশ্য

কেম্ব্রিজের কূটবুদ্ধি পণ্ডিতের সঙ্গে কোলরিজের অনেক বিষয়ে মতৈক্য। কোল্‌রিজের সঙ্গে রিচার্ডস্ বিশ্বাস করেন যে বিশেষ অবস্থায় মানুষের চেতনা হয়ে ওঠে বিষয় ও বিষয়ীর ভেদাতীত মিলনে স্বচ্ছ। দুজনেরই মতে এই অসাধারণ অপিচ ক্ষণস্থায়ী দিব্যজ্ঞান অতিশয় মূল্যবান। সেণ্ট টমাস করেছিলেন এই অন্তর্জ্ঞানকে যোগ-সাধনার যাত্রাপথ। কোলরিজ্‌ও এর মধ্যে পেয়েছেন পরমার্থের ইঙ্গিত। এবং তিনজনেই—সেণ্ট্ টমাস অবশ্য কথাটা ব্যবহার করেন নি—এর সঙ্গে দেখেছেন শুদ্ধ কল্পনার সম্বন্ধ। এই শুদ্ধ কল্পনা কোলরিজের মতে ব্যাবহারিক ও নৈতিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। সেইজন্যেই নাকি শেক্‌স্‌পিয়র gentle। গিলবি কিন্তু কবিদের জীবনে গোলযোগই দেখেন। তবে আধুনিক কবি-জীবনী লেখার রীতি ত কোলরিজ দেখেন নি, আর ভের্‌লেন্, বদ্‌লেয়র্ প্রভৃতিও তখন জন্মান্ নি। প্রসঙ্গত বলে' রাখা ভালো যে কবি দার্শনিক সঙ্গীতকার প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের নিয়ে মনোবিজ্ঞানে কাজ চলছে এবং কেন যে দিব্যজ্ঞানবান কবিতার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে জীবন মানিয়ে নিতে পারে না, সে মানস-জাগতিক প্রশ্ন হয়তো একদা উত্তর পাবে। বিজ্ঞানের এ সিদ্ধি সম্বন্ধে রিচার্ডসের বিশ্বাস প্রচণ্ড।

কোল্‌রিজ্ শুধু এই বিজ্ঞানের বর্ণনায় ক্ষান্ত হন নি। এই জ্ঞানের মাত্রা যে সামাজিক সভ্যতার ওপর নির্ভর করে, সে সত্যও গত শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁর চোখে পড়েছিলো। এবং এই আত্মজ্ঞানের ফলই শুধু বুদ্ধিগত নয়, এ জ্ঞান একটা ক্রিয়া ও একটা নির্মাণ, আর এ জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় সঙ্গে সঙ্গে নবমূর্ত্তি লাভে, নব আত্মপ্রকাশে! তার ফলে আসে শুদ্ধকল্পনা। রিচার্ডসের আয়াসসাধ্য পুনর্ভাষ্যে বুঝলুম যে, কোলরিজের মতে এই সঞ্জীবনী কল্পনার শ্রেষ্ঠ রূপ কাব্য হলেও এ অক্ষয় বটের শুভফল অন্যত্রও ফলে। যা কিছু অভ্যাসজর্জ্জর জীবযাত্রার একান্ত প্রয়োজন-সাধনের বাইরে, যা কিছু সুকুমার মানসক্রিয়া, তারই মধ্যে এ শুভের লীলা। সেণ্ট্ টমাসের মতে এই লীলার চরম ও শুদ্ধতম রূপ ঈশ্বরের প্রেমে। কুয়াসাচ্ছন্ন কোলরিজেরও এরকম একটা ধারণা ছিলো। এ বিজ্ঞান ছাড়া কথা রিচার্ডসের কাছে অসম্বন্ধ। তিন জনের মিল জীবন-যাত্রায় কাব্যের উচ্চস্থান সম্বন্ধে। কোলরিজ্ ও রিচার্ডস্ তো স্পষ্টতঃ কাব্যকে জীবন-যাত্রার প্রধান সহায় বলেছেন। এবং বিকল্পনা বা কল্পনাবিলাসের মূল্য যে কম ও তার স্থান নিচে, এর কারণ বিকল্পনা আর শুদ্ধ-কল্পনার তফাৎ প্রায় ততখানি, জীবন-যাত্রার ক্ষেত্রে সজ্ঞান স্বেচ্ছাকৃত ক্রিয়া ও জড় অভ্যাসজাত ক্রিয়ার মধ্যে যতটা। এইখানেই হার্ট্‌লিকে ছেড়ে কোল্‌রিজের কাণ্টের অনুগমন। এইখানেই ক্ষমতাবান্ প্রতিভাশালীর ভেদ। এ-প্রসঙ্গে ইচ্ছার স্বাধীনতায় কোল্‌রিজের বিশ্বাস নিয়ে বস্তুতান্ত্রিক রিচার্ডস্ একটু অসুবিধায় পড়ে' একটা যাহোক্ তাহোক্ প্রাক্-নিয়ন্ত্রী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এ ছাড়া অবশ্য উপায়ও নেই। এখানে রিচার্ডস্ সততা-সহকারে মেনেছেন যে ব্যক্তি ও বহির্জগতের সম্বন্ধ-সমস্যা শুধু ব্যক্তিবাদীকে বিচলিত নয়, বস্তুতান্ত্রিককেও ভাবিত করে।

পুঙ্খানুপুঙ্খ ও উদ্ধৃতিবহুল এ আলোচনার আরেক কথা হচ্ছে কল্পনা-বিকল্পনার সঙ্গে বিকার বা dilirium ও mania বা উন্মত্ততার তুলনা। চলিত কথায় যে কবিকে পাগলের জাতে না হোক্, মাথায় ছিট্‌ওয়ালার দলে

ফেলে, সে ভুল অবশ্য এ তুলনায় নেই। কারণ বিকল্পনা বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির মানসিক অবস্থা হলেও কল্পনার স্পষ্ট তিলক হচ্ছে তার চিন্তাক্রিয়া ও সঞ্চয়ী স্মৃতির ঐশ্বর্য্য। বিকল্পনা এ-কল্পনারই জের, তবে তাতে কল্পনার সন্ত-চেতন অবৈকল্য নেই। সেইজন্যেই কল্পনাবিলাস ,আমাদের অভিভূত করে না, করে চমৎকৃত। তার উৎকৃষ্ট আলোচনা কোল্‌রিজ্‌ করে গেছেন গ্রে ও কুলির কবিতা নিয়ে ও ভিনাস এণ্ড অ্যাডনিস্‌ থেকে দুই জাতীয় কয়েকটি লাইন নিয়ে। সে উপলক্ষে রিচার্ডস্‌ উৎকৃষ্ট টীকা করেছেন। এ টীকা বিচারবুদ্ধির সাধারণ প্রয়োগেও সার্থক। যথা, ডিটেকটিভ নভেলকে রিচার্ডস্‌ বিকল্পনার পর্য্যায়ে ফেলেন, "টু দি লাইট্‌ হাউস্‌" বা "টম্‌ জোনস্‌"-কে কল্পনার। অথবা হার্ডির নভেলে তিনি পান খণ্ডে খণ্ডে কল্পনা কিন্তু সমগ্রে শুধু বিকল্পনা। অবশ্য এ ভেদজ্ঞান সহজ নয়। কারণ মানবমনে ঘটনা সব যে এক জাতের নয়, সে বোধের উপর এ ভেদ-জ্ঞানের ভিত্তি এবং এই ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে জানলেই হবে না, জানতে হবে সমস্ত মনের হিসাবে। এবং তাও শুধু ব্যক্তিবিশেষের মনেই শেষ নয়, তার মধ্যে মেরুদণ্ডরূপে থাকবে সর্ব্ব মানবের বিশেষত্ব। অর্থাৎ আমরা এসেছি ভ্যালিউস্‌ বা তুলামূল্যের জগতে। এ মূল্যের ঐতিহাসিক ও ব্যক্তিক আপেক্ষিকতার গোলমালে রিচার্ডস্‌ নামেন নি। বলেছেন কল্পনাবিচারে সৌভাগ্যবশতঃ মূল্য-মানদণ্ড না নিয়ে কথা বলা যায়। কারণ সাধারণ সভ্যমানুষ মাত্রেরই কখনো না কখনো কল্পনার সঙ্গে দেখা শোনা হয়েছে। কিন্তু এ মুখচেনা জ্ঞানকে বিচারের ভিত্তি করলে যে ব্যক্তিনির্ব্বিশেষ বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তা হয় না, সে কথা বৈজ্ঞানিক রিচার্ডস্‌ চেপে গেছেন—মনোবিজ্ঞানের শৈশবের জন্যে বাধ্য হয়ে'। অথচ সুধী কাব্যজ্ঞদের মধ্যেই মতভেদ আছে। গ্রে এবং কুলি সম্বন্ধে কোল্‌রিজের কল্পনা-বিকল্পনা বিচার রিচার্ডস্‌ মানতে পারেন না।

অতঃপর শব্দার্থতাত্ত্বিক আলোচনা। শব্দার্থতত্ত্ব যে গভীর মেধায় চর্চ্চনীয় বিজ্ঞান সে বলাই বাহুল্য। রিচার্ডস্‌ পূর্ব্বে এ বিষয়ে অন্যতম অগ্রদূত দুটি বই লিখে আমাদের কৃতজ্ঞ করে রেখেছেন। কোলরিজের প্রাগাধুনিক আশ্চর্য্য দূরপ্রসারী অন্তর্দৃষ্টিও সেমাসিওলজির বিপ্লববহ মাহাত্ম্য দেখেছিলো। কোলরিজের সেই নানা কারণে অসম্পূর্ণ তবুও মহান চেষ্টা থেকে রিচার্ডস্‌ শব্দার্থের রহস্য ধরিবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু হায় যদিচ মোটা ব্যাপারে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি পেয়েছে, একটু ভেতরে গেলেই আমরা পড়ি আবার অন্ধকারে। অবশ্য শব্দার্থের রহস্যেতিহাস না জানলেও আমরা রিচাডস্‌ গ্রেভ্‌স্‌ এম্‌প্‌সনাদির সাহায্যে পূর্ণতর পাঠরীতি শিখছি। তাছাড়া সাধারণ ভাবে রিচার্ডসের আলোচনা যদিও অসম্পূর্ণ, তবু উপকারেই লাগবে। যথা, সব চেয়ে মোটা কথাই ধরা যাক, কথা বা শব্দ সর্ব্বদা অর্থৈকক বা স্বসম্পূর্ণ অর্থপিণ্ড নয়। এ জ্ঞান যে অনেকের নেই, তার প্রমাণ সুধী পণ্ডিত হার্বার্ট্‌ রীডের একটি বচন: কাব্য একটি কবিতায় বা একটি লাইনে বা একটি দুটি কথায় থাকতে পারে—উদাহরণ, শেক্‌স্‌পিয়ারের incarnadine, কীটসের shady sadness, কোলরিজের Mount Abora ইত্যাদি। অথচ ওষ্ঠরঞ্জনের বিজ্ঞাপনে incarnadine দিলে multitudinous waves লাল হয়ে ওঠে না।

এ সম্পর্কে কল্পনা-বিকল্পনার প্রয়োগ শিরোধার্য্য। যেখানে ঐ মানসক্রিয়ায় উক্ত কথাগুলি সার্থক-সংযোগে কাব্য হয়েছে, সেখানে পাই শুদ্ধকল্পনা। বিপরীতে অর্থাৎ কথার একক অর্থের, আভিধানিক অর্থের প্রাধান্য যেখানে, সেখানে বিকল্পনা। যথা এই শ্লোকে কথাগুলির অর্থ অল্পবিস্তর স্বতন্ত্র :—

Through wood and dale the sacred river ran,
Then reached the caverns measureless to man,
And sank in tumult to a lifeless ocean

কিন্তু এ শ্লোকে কথার অর্থ অভিধান ফেলে সমগ্র কাব্যে ছড়িয়ে গেছে :—

She looks like sleep—
As she would catch another Antony
In her strong toil of grace.

তারপরে কোল্‌রিজের "শুভবুদ্ধির" বিচার হলো রিচার্ড্‌সের আলোচ্য। এ শুভবুদ্ধির অস্তিত্ববিনা কল্পনা হয়ে ওঠে প্রলাপী বিকার, বিকল্পনা হয় মহাব্যসন। মুস্কিল হচ্ছে এই শুভবুদ্ধির মাত্রা নির্ণয়ে। কোল্‌রিজ্ বিকল্পনাবিহারী কৃলির যে পিণ্ডারীয় ওড-এ শুভবুদ্ধির অত্যন্ত অভাব দেখেছেন, রিচার্ড্‌স্ তাতে বিকল্পনাই পেয়েছেন—যদিও নিচুদরের বিকল্পনা। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে এক্‌সচেঞ্জের দর রিচার্ড্‌স্ আজও বাঁধতে পারেন নি, কাজেই নিচু দর উঁচু দর অস্পষ্ট কথাই রইলো। কোল্‌রিজের মতে এ শুভবুদ্ধি আসে ব্যাকরণ, ন্যায় ও মনোবিজ্ঞানের সহজ বা জাত জ্ঞানে। এবং জ্ঞান হচ্ছে তাই যা কালে হয়ে' উঠতে পারে ক্ষমতা, পাওয়ার। এ বিষয়ে অবশ্য আমাদের জ্ঞান অদ্যাবধি পরিমিত। রিচার্ডস্ তাই ভাবীকালের দিকে দীর্ঘশ্বাস ছুঁড়ে' বলেছেন যে একদা বিজ্ঞানের নিশ্চিত নিকষে কবিতার ভালোমন্দের নির্ব্বিশেষ বিচার করা যাবে। ইতিমধ্যে তিনি মনেছেন কোল্‌রিজকৃত Reason-এর জয়গানের জটিল সার্থকতা।

কোল্‌রিজের কবিতায় 'বায়ু-বীণা'র রূপক সবার পরিচিত। বায়ুবীণা নামে পরের অধ্যায়ে রিচার্ডসের সূক্ষ্ম বিচারের বিষয় হচ্ছে নিসর্গ সম্বন্ধে কোল্‌রিজের দুটি মতবাদ। সকলেরই অল্পবিস্তর পরিচিত সে মত দুটি রিচার্ডসের কঠিন-শব্দ-সঙ্কুল নব বেশে হচ্ছে এই :—

The mind of the poet at moments, penetrating 'the film of familiarity and selfish solicitude,' gains an insight into reality, reads Nature as a symbol of something behind or within Nature not ordinarily perceived। এবং The mind of the poet creates a Nature into which his own feelings, his aspirations and and apprehensions, are projected.

রিচার্ডস্ স্থির করতে পেরেছেন যে অন্তত এ মত দুটি যথার্থ-ই মানসিক ব্যাপার। কিন্তু সতর্ক বিচারে সাবধানী ভাষায় প্রকৃতি বা বহিঃপ্রকৃতির চার রকম অর্থ ও তার বর্ণনা রিচার্ড্‌স্ করেছেন। প্রথম অর্থে প্রকৃতি শুদ্ধ, মানব মনের আয়ত্তের বাইরে, স্বাধীন, দুর্জ্ঞেয় এবং মানুষের ওপর প্রভাববিস্তারে

সমর্থ। এ প্রকৃতিতে মানসলোক আরোপ করতে মানবীয় কল্পনা অক্ষম। দ্বিতীয় অর্থে প্রকৃতি মানব মনের লীলাক্ষেত্র। এ লীলায় ভণ্ডামি নেই, কিন্তু যে সব রূপ গুণ এতে প্রকৃতির উপরে আরোপিত হয়, তারা সব mythical। রিচার্ডসের এক অধ্যায় হলো পৌরাণিকের সীমানির্দ্দেশ।• যাঁরা fiction-এর সঙ্গে ও রিচার্ডসের বিশ্বাস বা belief-এর সঙ্গে পরিচিত তাঁরা এ অধ্যায়ে খুসি হবেন। বলা বাহুল্য, আমাদের জীবন-যাত্রায় একান্ত প্রয়োজন এই সব বিশ্বাসকে 'পুরাণ' আখ্যা দিয়ে রিচার্ডস্ আমাদের অন্ধ পৌত্তলিক বলেন নি। কারণ এসব পুরাণেই আমাদের সভ্যতা। এদের অনুবর্ত্তনেই আমাদের ইচ্ছাশক্তি সংহত, মানস তথা ইন্দ্রিয়শারীর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ও আমাদের বিকাশ সমঞ্জস হয়। একান্ত-সহায় এই ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সর্ব্বমানবীয় পুরাণগুলিতে অবশ্যই বিপরীত বিপদ আছে। যুক্তি-বিচার যেখানে কম বিকশিত, সে অসভ্য আদিম সমাজে পুরাণ মানুষকে অনেক সময় পুরাণহীন বানরের চেয়েও ভয়ানক করে তোলে। সভ্য সমাজেও তা করে' তোলে, যার ফলে জাতিতে জাতিতে লাগে নৃশংস দ্বন্দ্ব। যদি কোন পুরাণ অন্যান্য নৈতিক সামাজিক বা আন্তর্জাতিক পুরাণের বিপক্ষে না যায়, তাহলে আমরা তাকে হয়তো বলি ধর্ম্ম কিম্বা লীগ্ অব্ নেশন্স্। এ সব পুরাণে বিশ্বাস অল্প বিস্তর সবাই করে। কিন্তু পূর্ণ বিশ্বাস তাকেই বলে, যে বিশ্বাস জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, আচরণকে চালিত করে। এ পূর্ণ বিশ্বাস দুর্লভ। যাদের এ আছে, তাদের কেউ ঈশ্বরের দূত বলে পূজা পায়, কাউকে পাঠানো হয় উন্মাদ-আশ্রমে। ভগ্নাংশ থাকলেও এ বিশ্বাসের জোরে কেউ হয় লেনিন্, কেউ পিএর ভিদাল, কেউ শেলি, কেউ ডন্ জুয়ান্। সেই জন্যেই কোল্‌রিজের মতে অত প্রয়োজন শুভবুদ্ধির, যে-বুদ্ধি দেয় সামঞ্জস্য। We receive but what we give, তার বেশী চাইলেই ঘটে অসাধারণত্ব—প্রতিভা বা উন্মত্ততা। এই পুরাণ সৃষ্টিতে কাব্যের স্থান ব্যাপক ও উচ্চে। প্রকৃতিবিজ্ঞানের পুরাণের সঙ্গে কাব্যের পুরাণের প্রধান তফাৎ হচ্ছে যে শেষোক্তের মধ্যে প্রথমের অবশ্যস্বীকার্য্য দাবী নেই। নাইটিঙ্গেলের সঙ্গে আমরা বিপদসঙ্কুল সাগরে ও জনহীন দূর দেশে নাও যেতে পারি, কিন্তু মোটার কারের সামনে থেকে না সরলে হাঁসপাতালে যেতে হয়। যারা রিচার্ডসের অতিমাত্রায় বৈজ্ঞানিকমন্যতায় বিরক্ত হতেন, এবারে তাঁরা খুসি হবেন। ব্র্যাডলির কথা তুলে' জ্ঞানী রিচার্ডস্ এবার বলেছেন যে কোল্‌রীজীয় ঈশ্বরের মতো বিজ্ঞানও পুরাণজীবী ও ব্যবহারী।

কোল্‌রিজের সঙ্গে সেণ্ট টমাসের মিল দেখানো এখানে অসম্ভব। তাছাড়া তফাৎই বেশি। সেণ্ট টমাসের বিপুল সর্ব্বব্যাপী ও গভীর জ্ঞান ও খর বুদ্ধির সম্পূর্ণতার অভাবের জন্যই কোলরিজ থেকে রিচার্ডস্ তাঁর কাব্যতত্ত্ব বিকশিত করতে পারেন। তাছাড়া টমাস স্পষ্টতঃ কাব্যতত্ত্ব আলোচনা করেন নি। এমন কি মারিতাঁর Art and Scholasticism লেখবার আগে আমরা জানতুম না যে এ ভগবদ্বাদী দর্শনে কাব্যাদির কোনো স্থান আছে। কিন্তু ডমিনিকান্-ব্রতী গিল্‌বি তাঁর আদিগুরুর বিপুল দর্শন থেকে কাব্যতত্ত্ব গঠন করতে পেরেছেন। ন্যায়শিক্ষিত ঘনসন্নিবদ্ধ এই সুলিখিত ছোট বইটি তাই প্রতি পৃষ্ঠায় উক্ত বৃহত্তর দর্শনের সহিত পরিচিতি ধরে নেয়। স্থানসঙ্কোচে তাঁর

দার্শনিক ভাষার আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক ভাষ্য করা কঠিন এবং এক জায়গায় মূলগত প্রভেদ এ কাব্যতত্ত্বকে আধুনিক বিজ্ঞানপ্রণোদিত তত্ত্ব থেকে স্বতন্ত্র করেছে—সে হচ্ছে ঈশ্বরেই সব জ্ঞানের, সব আচরণের পূর্ণতা। তা না হলে এ তত্ত্বালোচনায় মধ্যে মধ্যে চিন্তনীয় ও গ্রাহ্য কথা পেয়েই দ্বিধায় ক্ষান্ত হতে হতো না। প্রথমতঃ বইয়ের আরম্ভ ধরা যাক্, জ্ঞান যে শুধু আধিপ্রত্যয়—conceptual নয়—প্রত্যক্ষও হয়, এবং সে প্রত্যক্ষ জ্ঞানই মানবমনের পক্ষে প্রেয় ও গভীরতর জ্ঞান এই ধরে' গিলবির সূত্রপাত। কারণ শুদ্ধ প্রত্যয় নয়, অনবচ্ছিন্ন বিশেষের প্রতি মানবমনের গভীর প্রেম, এই প্রেমই ঈশ্বরের দিকে টমাস্‌কে নিয়েছিলো, এরই জন্যে ঈশ্বরে বিশেষের চরম বিশেষত্ব। কাব্য এই অনবচ্ছিন্ন বিশেষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অপেক্ষাকৃত পূর্ণ পরিচয়—অপেক্ষাকৃত, কারণ মানুষের মনের গঠনে সম্পূর্ণ পরিচয় হয় শুধু ঈশ্বরেরই ও ঈশ্বরেই। কোল্‌রিজের মতাবলীর সঙ্গে এ মতের সম্বন্ধ নির্ণয় স্থগিত রেখে প্রত্যক্ষানুভূতির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যে একালের বৈজ্ঞানিকরাও বাগ্‌বহুল, সে কথা মনে রাখা ভালো। কোলরিজ হয়তো এবং গিল্‌বি স্পষ্টই আগামী ব্যঙ্গের উত্তর দিয়ে গেছেন। টমাসের দর্শনে অপরাবুদ্ধির বা প্রত্যয়গত জ্ঞানের কারবার অবচ্ছিন্ন সার্ব্বিক নিয়ে—সেখানে ইন্দ্রধনু দেখলে তার ব্যাস-দৈর্ঘ্যের মাপ করতে হয় কিন্তু কবির যে বিশেষ ইন্দ্রধনু তার সত্তা ও তার জ্ঞান সেই বিশেষ ইন্দ্রধনুত্বেই। সেখানে মাপের প্রশ্ন ওঠে না, কারণ টমাসের মতে form প্রত্যক্ষজ্ঞানের নয়, প্রত্যয়জ্ঞানের কারবার।

সে যাক, বলা দরকার যে টমাস্‌কে বুদ্ধি-বিদ্বেষী ভাবলে ভুল হবে। কারণ প্রত্যক্ষজ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যয়বুদ্ধির তিনি পূর্ব্বাপরমধ্য সম্বন্ধ রেখেছেন। তাই এ তত্ত্বকে thingism তথা ব্যক্তিসর্ব্বস্ব বলে' ঝেড়ে ফেলা যায় না। টমাসের কাছে মন প্রাকৃত বিশ্বের অংশ, শারীর। এবং এই মনেরই এক প্রক্রিয়ায় কোল্‌রিজিয়ান সুরে বিষয় ও বিষয়ী, ব্যক্তি ও বস্তু এক হয়ে ওঠে। অবশ্য এই অখণ্ডমিলন পদার্থিক নয়, চৈতন্যগত। ছবি যে দেখি, তাতে কয়েকটি রেখার যোগফল আমরা দেখি না, দেখি একটা সমগ্র ছবি। তেমনি মন দিয়ে দেখি না, বা অক্ষিতারা দিয়ে, দেখি সমস্ত ব্যক্তি দিয়ে। Gestalt মনোবিজ্ঞানের সমর্থনে গিলবি দুটো ছবি এঁকেছেন। সে ছবি দুটিতে চারটি ক'রে রেখার মধ্যে একটিতে শুধু তফাৎ, কিন্তু সমগ্র ছবি দুটি হলো ভিন্ন। ষ্টার্লিং-কৃত উপায়ে স্নায়ুসম্পর্কহীন করে' হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষিত হয়, কিন্তু সে হৃদয় তখন শুধু একটি মাংসপিণ্ডযন্ত্র। যা হোক, এই সমগ্রের সঙ্গে সমগ্রের প্রেমালাপের বাহন ইন্দ্রিয়াদি এবং এই ইন্দ্রিয়গুলির সকলের জ্ঞানরাজ্যে এক মর্য্যাদা নেই। এ সব মানসিক ক্রিয়াদি কিন্তু চেতনারই কোলে। চেতনার বর্ণনা টমাস্ করেছেন। তার শুধু এক অংশ হচ্ছে স্মৃতি। চেতনার পরিচয় দিয়ে গিল্‌বি ভগবৎ-করুণার তুলনায় কাব্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। আবে ব্রেমোঁর প্রার্থনা ও কাব্য তাঁকে প্রামাণ্য দিয়েছে। বইয়ের বাকি অর্দ্ধেক মোটামুটি এই জ্ঞানতত্ত্বের কাব্যে আরোপ। কোনো বিশেষ কবিতা তাতে আলোচিত হয় নি, পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি অল্পবিস্তর কাব্যার্থে বিশ্লিষ্ট, ব্যাখ্যাত ও বিস্তৃত হয়েছে। তার শেষ সিদ্ধান্ত হয়েছে যে কাব্য পরমার্থজ্ঞানেরই জাতের প্রক্রিয়া, তবে বাধ্যতঃই নিচু দরের এবং একটু অসম্পূর্ণ। রিচার্ডস্ অবশ্য কাব্যের পারমার্থিক গোত্র মানেন বটে কিন্তু পরমার্থ

মানেন না। মাথু আর্ণল্ড্ আজকেও আমাদের সমসাময়িক। রিচার্ডস্ আজ একলা নয়।

বিষ্ণু দে

Retreat From Glory—By R. H. Bruce Lockart (Putnam).

পরিচয়ের এক অতীত সংখ্যায় লক্‌হার্ট-আত্মচরিতের প্রথম ভাগটির সমালোচনা করেছিলাম। আলোচ্য জীবনচিত্রখানি তারই সম্প্রসারণ হলেও ভাব ও বস্তু-গত ঐক্য বিবর্জ্জিত এবং পৃথক্‌ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তরুণ বয়সের সে উদ্দীপনাপূর্ণ রচনাভঙ্গী নিষ্প্রভ হয়ে গেছে বয়োবৃদ্ধি ও চাকুরী-ক্ষেত্রে মর্য্যাদা-হানির সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু ছোট ছোট পার্শ্বচরিত্রের ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের বর্ণনা অঙ্কিত হয়েছে অধিকতর বিচিত্র হয়ে। ভাবপরায়ণ ব্যস্ত-বাগীশের দিনপঞ্জিকায় বিবৃত ইংরেজ-রাষ্ট্রলীলার কয়েকটি গোপন চিত্র ছিল পূর্ব্বতন গ্রন্থের বিশেষ সম্পদ। বর্ত্তমান রচনা অপেক্ষাকৃত সংযত ও লঘুগামী হলেও এর ঐতিহাসিক অলঙ্কার পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু কম মূল্যবান নয়। যে ঘোর মসীলিপ্ত ধূম্র মেঘ ভের্সাই-সন্ধি কক্ষের হিংসানল হতে উঠে সারা ডানিয়ুব উপত্যকা আচ্ছন্ন করে আছে তার অন্তর্নিহিত প্রলয়ঙ্কর শক্তির পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায় লক্‌হার্টের অনতিরঞ্জিত তালিকায়। নগণ্য রাজদূতের স্বল্পপরিসর জীবনের সঙ্গে যেটুকু রাষ্ট্র-রহস্য সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে তার অতিরিক্ত কথা অবশ্য আত্মকাহিনীর মত অন্তরঙ্গ সাহিত্যে স্থান পায় নি—তবু অপরিহার্য্যের মত এসে পড়েছে আন্তর্জ্জাতিক স্বার্থ-সংঘর্ষ ও বিসংবাদের মর্ম্মস্পর্শী বিবরণ, ফরাসী-ইতালী-বিদ্বেষ, ইউরোপীয় জাতি-সমূহের পররাষ্ট্র-পদ্ধতির ব্যাখ্যা। লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিমতের স্থূল রেখা-গুলিকে ন্যায়নিষ্ঠার আস্তরণে ঢাক্‌তে গিয়ে যে সব ছোট ছোট তর্কের আলোড়ন তুলেছেন সেগুলির মীমাংসা যাই হোক, সমস্যার জটিলতা যে কতখানি নিবিড়, তা বোধগম্য হয় তাইতে। লক্‌হার্ট-জীবনের অন্তরঙ্গ কাহিনী ব্যয়বাহুল্য, কর্জ্জ গ্রহণ, বংশাভিজাত্যের শ্লাঘা, মৎস্য শিকার ইত্যাদি বাজে কাজে ভারাক্রান্ত হলেও সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। তার কারণ, আলোচ্য আলেখ্যে তাঁর অন্তরের কোন নিবিড় যোগসূত্র নেই; এবার সেইজন্যে পাঠকের দৃষ্টি প্রথম হতেই নিরুদ্ধ হয় সমস্যাকুল রাষ্ট্র-গগনে। যুক্তিটি স্বতোবিরুদ্ধ শোনাচ্ছে বলে আর একটু বিশদ করে বলতে হচ্ছে। তাঁর কায়াবহুল জীবনযাত্রা বিচিত্র হলেও মানব-হৃদয়ের কোন নিবিড় স্পর্শ পেয়ে একটি পরম মূর্ত্তায় পরিণত হয়ে ওঠেনি বলে পাঠক-চিত্তে সহানুভূতি জাগরূক হয় না। মনে হয় স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু-বর্গ, এমন কি প্রণয়ী পর্য্যন্ত যেন ভাসমান ক্রীড়নক—মরীচিকার মত বিচিত্র অথচ অলীক। ঘটনার বিন্যাস চিত্রল ছায়ার মত মানস চক্ষে ঈষৎ তৃপ্তিদায়ক হিল্লোল জাগিয়ে মিলিয়ে যায়।

কিন্তু রাষ্ট্র-কাহিনীর পারম্পর্য্যশৃঙ্খল গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠকের নিগূঢ় কৌতূহল জাগিয়ে রাখে। দীর্ঘায়িত গল্পকথা সমালোচনের স্বল্প পরিসর কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ হলে রসোৎপাদনে অন্তরায় হয়, তবু সঙ্কলন করে দিলাম সংক্ষিপ্তসার।

লক্‌হার্টের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হলো লেনিনের আততায়িনীর কল্যাণে। বলশেভিক নেতার হত্যাচেষ্টার সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, সে বিষয় চেকা নিঃসন্দেহ হলেও তিনি সোভিয়েট কারাগারের অন্তর্ভুক্ত হলেন আর্চএঞ্জেলে মিত্রশক্তির কূট চক্রান্তের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত থাকার অপরাধে। তারপর যদিচ লিটিনভের বিনিময়ে মৃত্যুমুখ হতে অব্যাহতি পেলেন, স্বদেশে প্রত্যাগমন করে তাঁর অবস্থা হয়ে রইল ত্রিশঙ্কুর মত। লেনিন ট্রট্স্কী প্রমুখ তথাকথিত জার্ম্মান গুপ্তচরদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করেছিলেন বলে চাকুরীর ক্ষেত্রে উন্নতির পথ চিররুদ্ধ হলো; লয়েড জর্জ্জ, চার্চ্চিল প্রভৃতি ধুরন্ধর কর্ত্তারা অবজ্ঞা ভরে উড়িয়ে দিলেন তাঁর বলশেভিক শক্তির স্থিতিসামর্থ্যে আস্থা এবং সেই সঙ্গে স্বদেশী কমিউনিষ্টরা প্রকাশ্য সভায় তাঁকে লেনিনের আততায়ী বলে আক্রমণ করলেন। ক্রমে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রকট হওয়াতে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়লো।

সুদীর্ঘ বৎসর কাল পরে তাঁর কর্ম্মজীবনের অনাড়ম্বর বিকাশ হলো আর এক দিকচক্রবালে যখন তিনি চেকোশ্লোভাকীয়াতে চলে গেলেন সরকারী বাণিজ্য বিভাগের সামান্য সংবাদ-সংগ্রাহক হয়ে। তখন অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীর যুদ্ধক্লান্ত বিকলাঙ্গ দেহ গৃধ্র শৃগালের যথেচ্ছ-বিহার-স্থান। মিত্র শক্তির কল্যাণে রাষ্ট্রের পূর্ব্বতন সঙ্গতি বিলুপ্ত হয়ে সেখানে প্রবেশ করেছে শ্রেণী-সংঘর্ষ ও বিসংবাদ, অর্থ অনটন ও দুর্ভিক্ষ। খণ্ডিত দেহাংশগুলি অভিহিত হলো নূতন নূতন নামে—চেকোশ্লোভাকীয়া রিপাবলিক, যুগোশ্লাভীয়া, অষ্ট্রীয়া, রুমানীয়া। হাঙ্গেরীর মধ্যে অন্তর্বিরোধ জেগে উঠলো নৃশংস হয়ে। অভ্রভেদী শুল্কপ্রাচীর উঠে বাণিজ্যের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রবাহ রুদ্ধ করে দিল। মিত্রশক্তির প্রতিহিংসাপরায়ণ স্থূল হস্ত-প্রক্ষেপে পঞ্চাশ কোটি জার্ম্মান ও বিশ কোটি হাঙ্গেরীয়ান স্বজাতির সংসর্গচ্যুত হলো। পঞ্চাশ কোটি লোকের প্রতিভূকল্প রাজধানী ভিয়েনা ছয় কোটি লোকেব স্বল্পপরিসর পরিধির মধ্যে নিরুদ্ধ হয়ে মৃতকল্প হয়ে রইল। রাজনৈতিক ক্ষেত্র হতে যুগযুগান্তরের ঐতিহ্যের সঙ্গে উন্মূলিত হলো পূর্ব্বতন অভিজাত মণ্ডলীর আধিপত্য ও বিত্তাবত্তার প্রদীপ্তি। আকস্মিক গণতন্ত্রের আবির্ভাবে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ জাতিসমূহ থেকে বুদ্‌বুদের মত ঠেলে উঠলো কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় নবতর রাষ্ট্রপণ্ডিতের দল। বিরাজ করলো অরাজকতা।

কৃষিপ্রধান দেশ হাঙ্গেরী বয়নশিল্প প্রসারের জন্যে অযথা অর্থব্যয় করতে লাগলো অথচ প্রতিবেশী চেকোশ্লোভাকীয়া বিশাল যন্ত্রপ্রধান দেশ হয়েও রাজকোষ উজাড় করে ফেল্লে কৃষিকার্য্যের সম্প্রসারণে। শুল্ক-যুদ্ধের মর্ম্মান্তিক উদাহরণ পাওয়া যায় চেক-হাঙ্গেরীর সীমান্ত প্রদেশে। দুইটি অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত গ্রাম সহস্র বছর ধরে পরস্পরকে যুগিয়ে এসেছে জ্বালানি কাঠের বিনিময়ে ফসল এবং ফসলের বিনিময়ে জ্বালানি কাঠ—তারপর যুদ্ধশেষে অকস্মাৎ আন্তর্জ্জাতিক সীমান্ত কমিশন এসে দুইটি গ্রামের মাঝে ছেদ টেনে দিলে—আজ বেরেহোভের কাঠুরীয়ারা অনাহারে মৃতকল্প আর তারপরে চাষীরা শীতে তুষারে মুমূর্ষু।

হাঙ্গেরী দৃঢ় সঙ্কল্প করে বলেছে যে যতদিন না সীমান্ত প্রদেশের ন্যায়সঙ্গত পুনর্ব্বণ্টন হচ্ছে সে সহযোগিতার জন্যে হস্ত প্রসার করবে না। যুগোশ্লাভীয়ার সঙ্কীর্ণচিত্ত রাজধানী বেলগ্রেড আন্তর্জ্জাতিক মিলন-চেষ্টাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে--তার অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি সারবীয়ান সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের ইঙ্গিতে চালিত। তাদের দ্বিধা-বিরহিত উক্তি হচ্ছে 'আমাদের যা আছে তা থাকবে, ভাল মন্দ বুঝি না।' অষ্ট্রীয়ার অর্থনৈতিক বিধি ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত হলো না আজ পর্য্যন্ত। এ অবস্থায় মন্দের ভাল হচ্ছে যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের স্বার্থান্বেষণ-পদ্ধতি পরস্পর-বিরোধী। নবজাত প্রদেশগুলিও রুমানীয়ার সহিত সামরিক সাহায্য বিনিময়ের সন্ধি করে নির্লজ্জ ফ্রান্স কর্ত্তৃক বিজিত জাতিগুলিকে নির্ম্মমভাবে কোণ-ঠেসা করে রেখেছে। ইংলণ্ড সর্ব্বনেশে ভের্সাই সন্ধিপত্রের স্বাক্ষরের ফলে ফ্রান্সের উত্তরোত্তর স্পর্দ্ধা ও প্রভাব বৃদ্ধি সহ্য করতে বাধ্য; কিন্তু সেই সঙ্গে আপন আধিপত্য বিস্তারে সে নিশ্চেষ্ট একথা মনে করলে ব্রিটিশ বুদ্ধিবত্তার সম্ভ্রম লঘু করা হয়। সেখানকার পররাষ্ট্র-বিভাগ স্থূল সামরিক হস্ত পশ্চাতে রেখে প্রসারিত করে দিল ব্যাঙ্ক-অফ-ইংলণ্ডের নয়নাভিরাম কণক পাণি। অর্থনৈতিক নাগপাশের অনাড়ম্বর নিভৃত আলিঙ্গনের অন্তরালে যে ক্রিয়া-প্রক্রিয়াব লীলা চল্লো লক্‌হার্ট হয়ে গেলেন তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে একীভূত। তাঁর কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তার বেড়ে যেতে উৎসাহের আর অন্ত রইল না। এদিকে অনাহূত অযাচিত শুভাকাঙ্ক্ষার প্রাদুর্ভাবে অস্থির হয়ে উঠলো গৃহস্বামীরা। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু ফরাসী দন্তস্ফুটনই কায়েম হয়ে রইল। ধীরে ধীরে প্রতীয়মান হলো যে, যে জাতিসমষ্টির প্রাণশক্তির মজ্জাটুকুও বিলুপ্ত, অর্থসাহায্য তাদের পক্ষে বাহুল্য মাত্র। অবশেষে ব্যাঙ্ক-অফ-ইংলণ্ডকে তুলতে হলো তল্পি তল্পা এবং সেই সঙ্গে লক্‌হার্টের সৌভাগ্যরবি দ্বিতীয়বার অস্তমিত হলো।

লক্‌হার্টের জার্ম্মান-প্রীতি ফরাসী-বিদ্বেষ ও দুর্ব্বলের প্রতি ব্যক্তিগত সহানুভূতির দ্বৈত-প্রভাব-জনিত, সে কথা সহজেই অনুমেয় কিন্তু এই মনোভাবটি অধিকাংশ ইংরাজের মনোভাবের প্রতিভূকল্প বলে প্রণিধান-যোগ্য। আলোচ্য গ্রন্থে জার্ম্মানীর আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি অসঙ্গতির কথা উল্লিখিত নেই কিন্তু প্রগাঢ় লাঞ্ছনা-সঞ্জাত জ্বালা যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল এবং একদিন যে তা হিটলার প্রতীকে প্রকট হয়ে উঠবে, তার পূর্ব্বাভাস হিণ্ডেনবার্গের অশীতি বৎসরের জয়ন্তী-উৎসবে প্রতিভাত হয়েছিল।

আলোচ্য বইখানির অনেক স্থানে আবেগের অতিভাষ দৃষ্টিকটুভাবে ফুটে উঠেছে। পড়ার সময় স্বতঃই মনে হচ্ছিল যে রাজকর্ম্মচারীর অভিজ্ঞতা-কাহিনী সত্যের অতিরঞ্জন বা অবদমনশূন্য হতে পারে না। কর্ত্তব্যবোধ-নিয়ন্ত্রিত কর্ম্মক্ষেত্রের পরিপ্রেক্ষিত ও পরিমণ্ডল তাদের এতই সঙ্কীর্ণ যে কোন সমস্যারই সর্ব্বাঙ্গীণ রূপ চোখে পড়ে না—অকিঞ্চিৎকব ব্যাপারের ওপর অযথা বিশেষণের ঝোঁক পড়ে—অথচ অতিরিক্ত সন্নিধির জন্যে অনেকে অর্থগর্ভ ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতীতি অবধারণে অক্ষম হয়।

অবশ্য লক্‌হার্টের আত্মকথায় সত্যের ব্যত্যয় হয়েছে বেশীর ভাগ অন্তরঙ্গ জীবন-কাহিনীতে এবং সেইজন্যে যারপর নাই হতাশ হয়েছি। মনস্তাত্ত্বিক সত্যশীলতা জীবন-কাহিনীতে অপরিহার্য্য গুণ না হতে পারে কিন্তু আমার আশার বিস্তার বেড়ে উঠেছিল গোড়ার দিকের এই কটা কথায়:

From my early youth I have had an instinctive capacity for extracting the full flavour from an experience.

আমার দুঃখ যে বইখানি আদ্যোপান্ত পড়ার পর এ উক্তির সার্থকতা পেলাম না। রাশিয়ার জীপসী নৃত্যের তালে তালে তাঁর ধমনীর রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে—বেহালার সুরকম্পনে তাঁর উদাস চিত্ত উধাও হতে পারে দুস্তর পারাবারে, কিন্তু তার সঙ্গে পাঠক হৃদয়ের সংযোগ কোথায়?

আর একটি কথা না বলে সমালোচনা শেষ করতে পারছি না এবং সেজন্য যদি আমার মতো পাঠকের চিত্তও তিক্ত হয় তার জন্য দায়ী স্বয়ং বিধাতা—কারণ তিনিই হরিদ্রা ও কৃষ্ণ বর্ণের জাতি সৃজন করেন এবং এখন লক্‌হার্টের চিত্ত-পীড়ন করে আলোচ্য গ্রন্থের ফাঁকে ফাঁকে দু একটি কটু কথা বলিয়ে নিয়েছেন।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

The Letters of Gerard Manley Hopkins to Robert Bridges. The Correspondence of Gerard Manley Hopkins and Richard Watson Dixon : (Oxford University Press.) 2 Volumes.

সমরোত্তর যুগের ইংরেজী কবিতার উৎকর্ষবিচারে তর্কের অন্ত নাই, কিন্তু তাহার আবর্ত্তনের গতি যে অত্যন্ত দ্রুততাল, একথা তর্কাতীত। ফলে দাঁড়াইতেছে এই যে আজিকার দেবতা আগামী কল্যে পূজা পাইতেছেন না। তৃতীয় দশকে যে এলিয়টের প্রভুত্ব ছিল অবিসংবাদিত, চতুর্থ দশক পড়িবার পূর্ব্বেই তিনি হইয়া উঠিতেছেন অতীতসংখ্যা। অডেন, স্পেণ্ডার, ডে লুইস প্রভৃতি অতি সাম্প্রতিক কবিরা তাঁহার প্রভাব স্বীকার করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা আর এলিয়টীয় প্রত্যয়বিহীন পতিত জমিতে আবদ্ধ নন। তাঁহারা সন্ধান পাইয়াছেন এমন একটি কবির যাঁহার রচনা ভাষায় ছন্দে ও ভাবে বিদ্রোহপ্রবণতা ও রক্ষণশীলতার অপূর্ব্ব সমন্বয়। এই কবিটির নাম—জেরার্ড ম্যানলি হপকিন্‌স্।

হপকিন্‌স্-এর কবিজীবনের ইতিহাসও কম বিস্ময়কর নয়। ভাবিতে অবাক লাগে, যে-হপকিন্‌স-এর দিব্য প্রতিভায় আজ ইংলণ্ডীয় কাব্য-জগৎ উদ্ভাসিত, বছর পাঁচেক আগেও তাঁহার নাম প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। ওয়ার্ড-প্রমুখ যাঁহারা বিংশ শতকের তৃতীয় দশক পর্য্যন্ত ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহারা হপকিন্‌স্-এর নাম হয় জানিতেন না, না হয় উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। অথচ হপকিন্‌স জন্মিয়াছিলেন ১৮৪৪ অব্দে ও তাঁহার মৃত্যু ঘটে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে ১৮৮৯ সালে। অর্থাৎ কালানুক্রমের দিক দিয়া তিনি রোজেটি মরিস্ সুইন-বার্ণ-এর সমসাময়িক। এই সুবিখ্যাত প্রির‍্যাফেলাইটগণ, যাঁহারা বহুকাল পূর্ব্বে আপন আপন প্রতিভাবলে সাহিত্যের ইতিহাসে নিজেদের আসন কায়েমী করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত হপকিন্‌স্-এর মিল ঐ সমকালীনতা পর্য্যন্ত। তাঁহার

স্বকীয়তা এমনই দুর্দ্ধর্ষ যে ইহার অতিরিক্ত সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। সুতরাং সেযুগে তাঁহার কবিতা সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইলে যে তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষিত হইত, তাহা বোধহয় নিঃসংশয়ে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। একথা বলার কারণ এই যে তাঁহার কবিতা তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় নাই। কেন হয় নাই তাহার কারণ পরে দেখানো যাইবে। ১৯১৮ সালে ব্রিজেস তাঁহার কবিতাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। অনেকের অনুযোগ, প্রকাশে এই বিলম্ব করিয়া ব্রিজেস তাঁহার মৃত নির্ভরশীল বন্ধুর প্রতি অবিচার করিয়াছেন। মনে হয়, এ অনুযোগ ভিত্তিহীন। ব্রিজেস জানিতেন যে হপকিনস-এর কবিতা এমনই অপ্রচলিত ধরণের, এমনই বিভিন্ন, যে প্রকাশিত হইলেই আদৃত হইবার সম্ভাবনা কম। তাই তিনি ধীরে ধীরে পাঠক মনকে প্রস্তুত করিতেছিলেন। হপকিন্স্-এর কবিতা হস্তলিখিত অবস্থায় অনেককে পড়িতে দেওয়া হইত। বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি কবিতা ব্রিজেস চয়ন-গ্রন্থে নিবেশিত করিয়াছিলেন, যাহাতে হপকিন্স সম্বন্ধে রস-সন্ধানী পাঠকের কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়। তাঁহার বহুপঠিত চয়নগ্রন্থ, "দি স্পিরিট অব্ ম্যান" প্রকাশিত হওয়ার পর ব্রিজেস বুঝিলেন, এইবার হপকিন্স্‌কে সাধারণ্যে প্রচার করার সময় আসিয়াছে। ব্রিজেস যে বিলম্ব করিয়া ভুল করেন নাই তাঁহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, ১৯৩০ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার প্রয়োজন হইল—ব্রিজেস প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইতে সময় লাগিল বারো বৎসর।

১৯৩০ হইতে আরম্ভ হইল খ্যাতির আকাশে হপকিন্স্‌এর ভাগ্য-তারকার ঊর্দ্ধগতি। পাঠকসমাজ আজ শুধু তাঁহার কাব্য পড়িয়া নিবৃত্ত হইতে চাহে না, কবির জীবন সম্বন্ধে তাহার সশ্রদ্ধ কৌতূহল অদম্য। লাহি-প্রণীত জীবনচরিতেও সে আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই। তাঁহার পত্রাবলী সুবৃহৎ দুই গ্রন্থাকারে তিরিশ শিলিং মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। শুধু হপকিন্স্ নহে, য়ুরোপীয় সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্বন্ধে যাহাদের আন্তরিক দরদ আছে, গ্রন্থ দুটি তাহাদের নিকট অমূল্য সম্পদ। ইংরেজী সাহিত্যে কীটস্-এর পত্রাবলী ইহাদের একমাত্র তুলনাস্থল, যদিচ বর্ত্তমান পত্রাবলী অনেকাংশে ব্যাপকতর।

হপকিন্স্, ব্রিজেস ও ডিক্সন্, ইহাদের পরস্পর সম্পর্কও বিচিত্র। তিনজনই অক্সফোর্ডের ছাত্র, তবে ঠিক সমসাময়িক নয়। ডিক্সন্ বয়োজ্যেষ্ঠ। অক্সফোর্ড ছাড়িয়া ইংলিশ চার্চ্চে চাকরী লইবার পূর্ব্বে দিনকতকের জন্য তিনি হাইগেট স্কুলে শিক্ষকতা করেন, যেখানে হপকিন্স্ ছিলেন ছাত্র। তখন শিক্ষকে ছাত্রে মুখচেনা হইয়াছিল, আলাপ হয় নাই। স্কুল ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার সময় ডিক্‌সন্ ওখানকার একজন শিক্ষককে স্বরচিত কবিতাপুস্তক উপহার দিয়া যান। বইটি ক্রমে হপকিন্স্-এর হাতে পড়িলে তিনি তাহার বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হন। কিন্তু তখনও আলাপের সূত্রপাত হয় নাই। অক্স্‌ফোর্ডে হপকিন্স্ ও ব্রিজেস সমসাময়িক কাব্যানুরক্ত ছাত্র হিসাবে আসেন। ব্রিজেস তখন সাহিত্যের ছাত্র নন, তিনি পড়িতেন চিকিৎসাশাস্ত্র ও এরূপ শোনা যায় যে ভবিষ্যতে তাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বিচ্ছেদ ঘটিল এই অক্স্‌ফোর্ড জীবনেই। অক্স্‌ফোর্ডে তখন নিউম্যানের যুগ—ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র মাত্রেই তাঁহার প্রভাবের কথা অবগত আছেন। সে প্রভাবে হপকিন্স্‌কে পাইয়া বসিল। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া

জেসুইট সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন। এ সংসারত্যাগ পরাজিত-মনোভাব-উদ্ভূত নহে। ভবিষ্যৎ উন্নতির অনেক উপায় হপকিন্‌স্-এর করায়ত্ত ছিল। তাঁহার কবিতা পুরস্কৃত হইয়াছিল, তাছাড়া ক্ল্যাসিক্‌স্, ইতিহাস, গণিত, বিজ্ঞান, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার প্রতিভা ছিল অসামান্য। তাঁহার মতো মনীষাসম্পন্ন ছাত্র অক্‌স্‌ফোর্ডের ইতিহাসেও, বিরল। সৌন্দর্য্য-বিরূপ বৈরাগ্যপ্রবণ মন যে তাঁহার নয়, তাহার বহু নিদর্শন তাঁহার কাব্যে পাওয়া যায়। বহিঃপ্রকৃতির বিচিত্র রূপসম্ভার তাঁহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিত, নরদেহের গৌরবও তাঁহার নিকট উপেক্ষিত হইত না। তাঁহার এক ধর্ম্মভাই এইরূপ লিখিয়াছেন—

"I have rarely known anyone who sacrificed so much in undertaking the yoke of religion. If I had known him outside, I should have said that his love of speculation and originality of thought would make it impossible for him to submit his intellect to authority."

তবু ভগবৎ-উপলব্ধির প্রেরণা যখন আসে, তখন এমনই নিষ্ঠুর সর্ব্বাধিকারী-রূপেই তা দেখা দেয়। হপকিন্‌স্ তরুণজীবনের সমস্ত আকর্ষণকে তুচ্ছ করিয়া এমন এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ে যোগদান করিলেন যাহার মূলমন্ত্র চরম বিনতি, একান্ত আত্মসমর্পণ চার্চ্চের নিকট, উচ্চতমের নিকট। এই পথ অবলম্বনের পর হপকিন্‌স স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ডিক্‌সন্‌কে পত্র লেখেন। এই যে পত্রবিনিময় সুরু হইল তাহা এখন সুসজ্জিত ও সুসম্পাদিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ডিক্‌সনের কবিতাগ্রন্থগুলি লোকসমাজে এখন আর অপরিচিত নাই। কিন্তু তাহার মূলে হপকিন্‌স্। তিনি যখন তাঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন, তখন এক রোজেটি ব্যতীত কেহই ডিক্‌সনের তারিফ করেন নাই। হপহিন্‌স্-এর মধ্যস্থতাতেই ব্রিজেস-এর সহিত ডিক্‌সন-এর পরিচয় ঘটে। এ বিষয়ে যাঁহারা আরো জানিতে চাহেন, তাঁহারা ব্রিজেস-সম্পাদিত ডিকসন-এর নির্ব্বাচিত কবিতাগ্রন্থে তাঁহার স্মৃতি-লিপি পড়িয়া দেখিতে পাবেন।

ব্রিজেস-এর সহিত পত্রব্যবহার সুরু হয় জেসুইট দলভুক্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই। বড়ই পরিতাপের বিষয়, আমরা এক্ষেত্রে দুপক্ষের পত্র পাই না; ব্রিজেস তাঁহার নিজের সমস্ত পত্র বিনষ্ট করিয়া গিয়াছেন। ইহার কারণ অনুমান-সাপেক্ষ। হারবার্ট রীড ব্রিজেস-কে দেখিতে পারেন না। তাই তিনি অনুমান করেন, লোকচক্ষে অশ্রদ্ধেয় হইবার ভয়ে। কাব্যরচনা-প্রণালী, জীবনাদর্শ-অনুসন্ধান প্রভৃতি মূলগত বিষয়ে ব্রিজেস-এর ছিল হপকিন্‌স্-এর সহিত গভীর মতভেদ। কাজেই যে পাঠক হপকিন্‌স্‌কে গ্রহণ করিবে, সে বাধ্য হইবে ব্রিজেসকে বর্জ্জন করিতে। আমার মনে হয়, হারবার্ট রীড-এর এ ধারণা মানসিক বিদ্বেষ-সঞ্জাত। আসল কারণ, বোধ হয়, ব্রিজেস-এর স্বাভাবিক অনাড়ম্বরশীলতা, যাহার জন্য তিনি তাঁহার জীবনচরিত লিখনেও নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। একথা ঠিক হপকিন্‌স ও ব্রিজেস-এ মতভেদ মূলগত ও গভীর। জেসুইট সম্প্রদায়কে ব্রিজেস দেখিতে পারিতেন না। কিন্তু তাহার প্রধান কারণ ছিল, এ-দল হপকিন্‌স্-এর মতো প্রতিভাকে কাব্যসৃষ্টি হইতে বিরত করে। দলে ভর্ত্তি হইবার সময় হপকিন্‌স্ তাঁহার সমস্ত পূর্ব্বরচনা পোড়াইয়া ফেলেন; ও তাঁহার ঊর্দ্ধতনদের আদেশ ব্যতীত

কবিতা ছাপানো দূরে থাক, লিখিতেও চাহিতেন না। ব্রিজেস ও ডিক্‌সন্‌ বহুবার তাঁহাকে কবিতা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন; কিন্তু হপকিন্‌স্‌ তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহার উপর কাজের চাপও ছিল এত যে কবিতা লেখার, এমন কি কবিতা পড়ার অবসরও হপকিন্‌স্‌ অতি অল্প পাইতেন। অথচ অপরের বেলায় হপকিন্‌স্‌ কবিতা প্রকাশের বিরোধী ছিলেন না। ব্রিজেসকে একপত্রে তিনি লিখিতেছেন :—

"I would have you and Canon Dixon and all true poets remember that fame, the being known, though in itself one of the most dangerous things to man, is nevertheless the true and appointed air, element, and setting of genius and its works.

অন্য এক পত্রে লিখিয়াছিলেন :—

"A great work by an Englishman is like a great battle won by England. It is an unfading bay tree. It will even be admired by and praised by and do good to those who hate England (as England is most perilously hated), who do not wish even to be benefited by her. (ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এ ঝাঁঝটুকু কবির আয়ার্লণ্ড-নিবাসের ফল; তখন দুই দেশে ভীষণ বিবাদ, হপকিন্‌স্‌-এর মন ছিল আইরিশদের পক্ষে—গ্লাডষ্টোনকে তিনি ঠাট্টা করিয়াছেন, Grand Old Mischief-maker বলিয়া)।

যে-ব্রিজেস কাব্য-সরস্বতীর উপাসনাকেই জীবনের চরম সাধনা বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন তিনি যে-সাধনায় নিয়োগ করিয়া শেষ বয়সে "দি টেষ্টামেণ্ট অব বিউটি" লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার নিকট হপকিন্‌স-এর চার্চ্চ-আনুগত্য অতিশয় বিসদৃশ লাগিত। ডিক্‌সন্‌ জেস্যুইট না হইলেও চার্চ্চ-ধর্ম্মী। তাই তিনি হপকিন্‌স্‌-এর জীবনযাত্রাকে যতটা দরদ দিয়া দেখিতে পারিতেন, চার্চ্চ-বহির্ভূত অথচ আদর্শবাদী ব্রিজেস তাহা পারিতেন না। কাব্য সম্বন্ধে হপকিন্‌স্‌-এর নিঃস্পৃহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া ডিক্‌সন্‌ লিখিয়াছিলেন :—

"So I will say nothing, but cling to the hope that you will find it consistent with all that you have undertaken to pursue poetry still. Surely one vocation cannot destroy another; and such a society as yours will not remain ignorant that you have such gifts as have seldom been given by God to man."

এ সম্বন্ধে ব্রিজেস্‌-এর উক্তি আমরা পাই না। কিন্তু হপকিন্‌স্‌-এর প্রতিবাদ হইতে অনুমান করা যায় যে তাহার সুর নিশ্চয়ই আরো চড়া হইত। এই তিন বন্ধু পরস্পর কাহাকেও রেয়াৎ করিয়া কথা কহিতেন না, ইহা এই পত্রাবলীর প্রকাণ্ড বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিগত জীবনের বাহিরে বিশাল পাঠক সমাজের উপর চোখ রাখিয়া ইহাদের লিখা হয় নাই, ইহারা হৃদয়ের রক্ত দিয়া লিখিত। ইহারা পরস্পরের রচনার সমালোচনা করিতেন এমন সূক্ষ্ম অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়া যাহা মাঝে মাঝে মর্ম্মচ্ছেদী হইয়া উঠিত। কিন্তু ত্রুটি আবিষ্কারে ইহাদের—বিশেষ করিয়া ব্রিজেস ও হপকিন্‌স্‌—যেমন আলস্য বা সঙ্কোচ ছিল না, কৃতিত্ব স্বীকারেও তেমনি কুণ্ঠা বা কার্পণ্য ছিল না। তাই দেখিতে পাই, হপকিন্‌স্‌-এর ছন্দঃপরীক্ষণকে

ব্রিজেস বলিতেছেন, "presumptuous jugglery" ও রাগের চোটে বানানে ভুল করিয়া বসিতেছেন; দেখিতে পাই, হপকিনস্ বলিতেছেন, I say it because you always were and I see you still are given to conceit"। আবার অন্য দিকে দেখিতে পাই ডিক্‌সন্ হপকিন্‌স্‌কে লিখিতেছেন,—

"Bridges struck the truth long ago when he said to me that your poems more carried him out of himself than those of any one."

আর হপকিন্‌স্ ব্রিজেসকে লিখিতেছেন ;—

"I connot think of altering anything. Why should I? I do not write for the public. You are my public and I hope to convert you.

You say you would not for any money read my poem again. Nevertheless I beg you will. Besides money, you know, there is love.

আর একটি পত্রে :—

"If I were not your friend I should wish to be the friend of the man that wrote your poems. They shew the eye for pure beauty and they shew, my dearest, besides, the character which is much more rare and precious.

এখানে ইহাও স্মর্ত্তব্য, হপকিন্‌স্-এর শেষ চিঠি ব্রিজেস-এর নিকট ও শেষ কবিতা ব্রিজেস-এর উদ্দেশ্যে লিখিত একটি সনেট।

'স্প্রাঙ্ রীদ্‌ম্', এই কথাটি হপকিন্‌স্-এর কবিতার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইহার অর্থ কি ও বিশেষত্ব কি ; তিনি কেন বাধ্য হইয়াছিলেন উহার আবিষ্কার অথবা পুনরুজ্জীবন করিতে, ইহা ছন্দের অতিরিক্ত বন্ধন, না বন্ধনরিক্ত ব্যাভিচার; এ সমস্ত আলোচনায় যাঁহাদের আগ্রহ আছে, তাঁহারা এই পত্রাবলী মন দিয়া পড়িয়া দেখুন ও অপেক্ষায় থাকুন হপকিন্‌স্-এর সেই সমস্ত অপ্রকাশিত পত্রের যাহা তিনি কাভেন্টি প্যাটমোরকে লিখিয়াছিলেন। এখানে এটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, বর্ত্তমানে এমন ইংরেজী কবিতাই দুর্ল্লভ যাহাতে হপকিন্‌স্-এর ছন্দ গঠনের বা শব্দ প্রয়োগের প্রভাব না মেলে। আজকালকার অনেক স্বেচ্ছাচারিতার জন্যও তাঁহাকে দায়ী করা চলে। কারণ, হপকিন্‌স্ অতিমাত্রায় স্বকীয়; পরের ব্যবহৃত কোন কিছুই লইব না, ইহা যেন তাঁহার প্রতিজ্ঞা। ফলে স্বকীয়তা অনেক স্থলে উদ্ভটতায় নামিয়া আসিয়াছে। এ ত্রুটি সত্যসন্ধানী কবির দৃষ্টি এড়ায় নাই।

"No doubt, my poetry errs on the side of oddness. I hope in time to have a more balanced and Miltonic style. But as air, melody is what strikes me most of all in music and design in painting, so design, pattern, or what I call inscape is what I, above all, aim at in poetry. Now it is the virtue of design, pattern or inscape to be distinctive, and it is the vice of distinctiveness to become queer. This vice I cannot have escaped.

দুঃখের বিষয়, হপকিনস্-পন্থী কবিরা এই পার্থক্যটি প্রায়ই মনে রাখিতে পারেন না।

পত্রাবলী পড়িতে পড়িতে একটি প্রশ্ন বারবার মনকে উত্তেজিত করে, বস্তুত

হপকিন্‌স্‌-এর সম্বন্ধে তাহাই কেন্দ্রীয় প্রশ্ন, জেস্থইট-চার্চ্চে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কাব্য-জীবন ব্যাহত হইয়াছিল কিনা। এ-জটিল প্রশ্নের স্থনির্দ্ধারিত মীমাংসা নরলোকের ক্ষমতাতীত। ইহাতে সন্দেহ নাই, বাহিরে থাকিলে তাঁহার কবিতা সংখ্যায় বাড়িত। আবার ইহাও সত্য, তাহা হইলে তাঁহার কবিতার সারমর্ম্ম অন্যরূপ হইত। কারণ, হপকিন্‌স্‌-এর কবিতা তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্থদৃঢ়প্রোথিত। আমি গুণতির অপেক্ষা গুণের পক্ষপাতী; হপকিন্‌স্‌-এর কবিতায় যে বিশেষ গুণটি রূপময় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অতি বিরল, স্থবিশাল ইংরেজী সাহিত্যে তাহার অনুরূপ কিছু মেলে কিনা সন্দেহ; মিল্‌টনের সহিত তাঁহার ন্যায়সঙ্গত তুলনা চলে না; তাঁহাকে মিষ্টিক বলিলে এই বহু-অপব্যবহৃত কথাটির পুনঃ অপব্যবহার করা হয়; যদি কাহারও সহিত তাঁহার সাদৃশ্য থাকে তবে তাহা তাঁহারই মতো বৈশিষ্ট্যবান্‌ কবি ডান্‌-এর সহিত। আমার মনে হয় এ বৈশিষ্ট্য চার্চ্চ-সংযোগের ফল। ডান্‌ও ছিলেন পুরোহিত-কবি। হপকিন্‌স্‌ তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনকে কি নিবিড়ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারি যখন পড়ি;—

When a man has given himself to God's service, when he has denied himself and followed Christ, he has fitted himself to receive and does receive from God a special guidance, a more particular providence. This guidance is conveyed partly by the action of other men, as his appointed superiors, and partly by direct lights and inspirations. If I wait for such guidance, through whatever channel conveyed, about anything, about my poetry for instance, I do more wisely in every way than if I try to serve my own seeming interests in the matter. Now if I value what I write, if I do myself, much more does our Lord. And if he chooses to avail himself of what I leave at his disposal he can do so with a felicity and with a success which I could never command. And if he does not, then two things follow; one that the reward I shall nevertheless receive from him will be all the greater; the other that then I shall know how much a thing contrary to his will and even to my own best interests I should have done if I had taken things into my own hands and forced on publication. This is my principle, and this in the main has been my practice; leading the sort of life I do here it seems easy, but when one mixes with the world and meets on every side its secret solicitations, to live by faith is harder, is very hard; nevertheless by God's help, I shall always do so.

অন্যত্র: My vocation puts before me a standard so high that a higher can be found nowhere else.

বিস্ময়ের কথা এহেন ব্যক্তিত্ব-নিরোধী লোক অন্য একটি কবি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

He has all the gifts that make a poet excepting only that last degree of individuality which is the most essential of all.

আরো বিস্ময় লাগে যখন দেখি হপকিন্‌স্‌-এর মতো চার্চ্চ-অনুরক্ত ব্যক্তি

লিখিতেছেন ১৮৭১ সালে, যখন কমিউনিজম আজিকার মতো ফ্যাশান বা প্যাশান হইয়া দাঁড়ায় নাই—

I must tell you I am always thinking of the Communist future. I am afraid some great revolution is not far off. Horrible to say, in a manner I am a communist.

হপকিন্স গোঁড়া খৃষ্টান হইয়াও কমিউনিষ্ট; বর্ত্তমান ইংলণ্ডের অনেক তরুণ কবি গোঁড়া কমিউনিষ্ট, খৃষ্টান কিনা জানি না। তাঁহারা হপকিন্‌স্‌কে গুরু বলিয়া মানেন। যদি এই গুরুভক্তির ফলে তাঁহারা আদর্শ-নিষ্ঠার সহিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সমন্বয় করিতে শিখেন, হতাশার চোরা বালিতে মুহ্যমান না হইয়া জীবনকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করেন; যদি, ব্রিজেস-এর ভাষায়, হপকিন্‌স্‌-এর plumage of far wonder and heavenward flight তাঁহার শিষ্যবর্গকে অনুপ্রাণিত করিতে পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে হপকিন্‌স্‌-এর কঠিন শৃঙ্খল-শাসিত ধর্ম্মজীবন তাঁহার অসাধারণ মনীষা-মণ্ডিত কাব্যজীবনের সার্থকতার পথে অন্তরায় হয় নাই।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

The Nature of Mathematics—By Max Black, (Kegan Paul).

গণিতের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া কাণ্ট্‌ শুধাইয়াছিলেন উক্ত শাস্ত্র প্রকৃত-পক্ষে বিকলনমূলক, না সঙ্কলনমূলক—analytic না synthetic? এ-প্রশ্নের জবাব দিবার সময় যদিও অধিকাংশ গণিতব্যবসায়ীরই নাই, তবু ইহা প্রত্যেক দার্শনিকেরই জিজ্ঞাস্য। গণিত কি কেবল বহিরায়তনিক গঠনবৈশিষ্ট্যের পর্য্যালোচনায় আবদ্ধ? ভিত্তিগত স্বয়ংসিদ্ধগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যসাধনই কি উহার উদ্দেশ্য? উহা কি formal logic অথবা প্রকারক ন্যায়ের অঙ্গমাত্র, এবং ২+৩=৫ ইত্যাদি সমীকরণ-গুলি কি শুধুই পুনর্ব্বাদ—tautology? তবে কি গণিতের সংজ্ঞা petitio principii-নামক সিদ্ধসাধন-দোষে দুষ্ট? গণিতের সঙ্গে বহির্জ্জগতের সম্পর্ক কি? উহাতে যে যুক্তির প্রয়োগ হয়, তাহার প্রচ্ছদপটে কি বস্তুবিশ্ব চিত্রাপিত থাকে, না কি উহা নিরঞ্জন ও নিরপেক্ষ? উপরোক্ত পুস্তকে এই সকল সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা আছে, এবং বইখানির বেশির ভাগই রাসেল্‌ ও হোয়াইট্‌হেড্‌ প্রমুখ ইংরেজ দার্শনিক সম্প্রদায়ের বিচার ও বিবেচনায় পূর্ণ। ব্ল্যাক্‌ এই মতের নাম দিয়াছেন 'লজিষ্টিক্‌স্‌', এবং শুধু ইহার আলোচনা করিলে পাছে গ্রন্থের ভারসাম্য নষ্ট হয়, সেই ভয়ে লেখক এই সংক্রান্ত আরো দুইটি মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার একটি হিল্‌বার্ট্‌-প্রবর্ত্তিত 'ফর্ম্যালিজ্‌ম্‌' যাহা লজিষ্টিক্‌স্‌-এর নিকট আত্মীয়, অন্যটি ক্রয়ার-প্রচারিত 'ইণ্টুইশনিজ্‌ম্‌' যাহার জনক স্বয়ং কাণ্ট্‌। গ্রন্থের কোথাও একদেশদর্শিতা নাই, এবং ফলত লেখকের পক্ষপাতশূন্য বিবৃতি দুই শ্রেণীর পাঠকের প্রয়োজনে লাগিবে—যে-গণিতজ্ঞ তত্ত্ব-সম্বন্ধে সজাগ হইতে চান এবং যে-দার্শনিক তথ্য-সম্পর্কে উদাসীন নন।

এই তিন সম্প্রদায়ের কার্য্যক্রম সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা সহজ নহে, এবং লজিষ্টিক্স্-এর ক্ষেত্রে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। এ-গুলির মধ্যে ফর্ম্যালিজ্ম্-ই সব চেয়ে সুবোধ্য; এবং ইতিহাস আলোচনায় জানা যায় যে বোলিয়ে ও লোবাচেভ্স্কি জ্যামিতিকে সমান্তরালবাদ হইতে মুক্তি দেওয়াতেই উহা সম্ভব হইয়াছে। ফলে জ্যামিতির রাজ্যে ইউক্লিড্‌কে আর সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া বিবেচনা করা হয় না। বিভিন্নধর্ম্মী স্বতঃসিদ্ধের উপরে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য জ্যামিতিও আজ সমান মর্য্যাদায় অধিকারী। নূতন নূতন পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে এই সত্য ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে জ্যামিতির পক্ষে সংজ্ঞা ও স্বতঃসিদ্ধের অন্তরঙ্গ সুসঙ্গতি ব্যতীত অন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই। অল্পে অল্পে গণিতের অপরাপর বিভাগেও এই বিশ্বাসের প্রভাব ছড়াইয়া গিয়াছে, এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও স্বতোবিরোধের নিরাকরণই আজ গণিতশাস্ত্রের সার্ব্বত্রিক আদর্শ। ফর্ম্যালিষ্ট্‌দের মতে গণিত ন্যায়শাস্ত্রের মতো, বিষয়বস্তুর সহিত তাহার মূলগত কোনো সংস্রব নাই। আধুনিক কোয়াণ্টাম্ গতিবিজ্ঞানও এই মতের সমর্থন করে।

ইন্ট্ইশনিষ্ট্‌রা এই সিদ্ধান্তে সায় দিতে অপারগ। গণিতের যুক্তিশৃঙ্খলার মধ্যে স্বজ্ঞার অনধিকার প্রবেশের দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া তাঁহারা বলেন যে প্রত্যয়কে প্রত্যক্ষগোচর করিতে না পারিলে গণিতের কোনো নির্দ্দেশই মানুষের শিরোধার্য্য হইত না। যে তত্ত্ববিচারে আমাদের রূপগঠনকারী অন্তর্দৃষ্টি অচল, সেইখানেই গণিত আর প্রামাণ্য থাকে না। অবশ্য বিশ্লেষণমূলক পুনর্ব্বাদের কথা স্বতন্ত্র; সেখানে নূতন জ্ঞানের অবকাশ নাই বলিয়া প্রত্যয়গুলির মূর্ত্তি-পরিকল্পনা অনাবশ্যক। কিন্তু নূতন জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রত্যয়মাত্রেরই সাক্ষাৎ উপলব্ধি অপরিহার্য্য; এবং অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে প্রত্যয়কে মূর্ত্ত করিতে না পারিলে নূতন জ্ঞানার্জ্জন যেহেতু অসাধ্য, তাই ইন্ট্যুনশনিষ্ট্‌দের কাছে law of excluded middle অর্থাৎ মধ্যনিরসনের নিয়ম সাধারণত অগ্রাহ্য। রাম যে শ্যাম নহে, এই বাক্য যদি মিথ্যাও হয়, তবু রামই যে শ্যাম ইহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়না। ওই শেষোক্ত বাক্য প্রমাণ করিবার জন্য রাম ও শ্যামের মধ্যে সাক্ষাৎ সাদৃশ্য অনুভূত হওয়া চাই।

লজিষ্টিশিয়ন্‌রা গণিতকে ন্যায়াতিরিক্ত যুক্তিপ্রকরণ বলিতে অনিচ্ছুক। ন্যায়কে বিস্তৃত করিয়া, তাহার মধ্যে গণিতকে বসানোই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। সেইজন্যই তাঁহারা প্রথমত ন্যায়শাস্ত্রকে গণিতানুরূপ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। অর্থাৎ উপযুক্ত সাঙ্কেতিকের সাহায্যে তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রকে সম্প্রসারিত করিতে চান, যাহাতে আজ না হোক, অন্তত অচির ভবিষ্যতে গণিত উক্ত নববিধানে অবলীলাক্রমে স্থান পাইতে পারে। কিন্তু এই অদ্ভুত ও ভয়াবহ পরিভাষাই লজিষ্টিক্স্-এর মর্ম্মগ্রহণে প্রধান অন্তরায়। যাঁহারা অসতর্ক পাঠক, বিশেষজ্ঞ নহেন পল্লবগ্রাহী, তাঁহাদের পক্ষে সেই চিহ্নবিভ্রাট এমনি প্রহেলিকাময় যে লজিষ্টিক্স্-এর নাম শুনিয়াই তাঁহাদের তুষ্ট থাকিতে হইবে, তাহার অধিক আশা বিড়ম্বনা মাত্র।

শ্রীসীতেশচন্দ্র কর

Prefaces—By Bernard Shaw (Constable).

বছর চারেক ব্যাঙ্কের চাকুরি করে বিশ বছর বয়সে বার্ণার্ড শ ডাবলিন ছাড়লেন। ব্যাঙ্কের কাজে তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সে মার্গে সাফল্য ছিল তাঁর করায়ত্ত। কিন্তু তাঁর প্রতিভার মার্গ অন্যতর, ক্ষেত্রও অন্যত্র। এরূপ অস্পষ্ট বোধ নিয়ে তিনি লণ্ডনে গেলেন। সেখানে তাঁর মা ছিলেন সঙ্গীতের শিক্ষয়িত্রী। বড় ঘরের মেয়ে, স্বামী মদ খেয়ে সব উড়িয়ে দিয়েছেন বলে নিজকে উপার্জ্জনের উপায় দেখতে হয়।

হিতৈষীরা পরামর্শ দিলেন চাকুরী কর, মার সাহায্যে লাগ। কেউ কেউ চাকুরীও যোগাড় করে দিলেন। শ কিন্তু দরিদ্রা মায়ের গলগ্রহ হয়ে বছরের পর বছর কাটালেন। এটা ওটা খুচরা কাজ করেন, কোনো গানের আসরে পিয়ানো বাজান, কোনো সঙ্গীত সমালোচকের সহকারী হয়ে সমালোচনা লিখে দেন। টেলিফোন কোম্পানীতে যোগ দিয়ে বেশী দিন মন লাগে না, তবু সেই উপলক্ষে লণ্ডনের সর্ব্বত্র ঘুরে দেখা হয়। মিউজিয়ম বা আর্ট গ্যালারী যে দিন বিনা মাশুলে খোলা থাকে সে দিন মূর্ত্তি বা ছবি দেখে বেড়ান।

প্রতি রাত্রে পাঁচ পৃষ্ঠা করে লিখতে লিখতে পাঁচ বছরে পাঁচ খানা নভেল লিখে ফেল্লেন। কোনো প্রকাশক সে সব নভেল ছাপল না। তখন তিনি লিখলেন খবরের কাগজে রঙ্গ সমালোচনা। থিয়েটারের, কনসার্টের, প্রদর্শনীর। পাঁচ বছরের নীরব সাধনায় ভাষা শিখেছিলেন। সঙ্গীত তাঁর মায়ের কাছে শেখা, অভ্যাস করে আসছিলেন। আর তাঁর হাস্যরস তাঁর স্বভাবগত। লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ বিদূষক বলে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল। অমনি তাঁর উপর হল অর্থবৃষ্টি।

ইতিমধ্যে তিনি কার্ল মার্কস্ পড়েছিলেন। তাৎকালীন সোশ্যালিষ্ট আন্দোলনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল। ব্যক্তিগত সাফল্যের মোহ তাঁর ছিল না। নতুন সমাজের আইডিয়া তাকে সম্পূর্ণ অধিকার করেছিল। তিনি সুযোগ পেলেই বক্তৃতা দিতেন। সেই বক্তৃতাই হাস্যরসের সহিত ওতপ্রোত হয়ে অভিনয় সমালোচনা আকারে পত্রিকার পাতে পরিবেশিত হল। যে মানুষের নিজের কোনো বাঁধন নেই লোভ নেই সংস্কার নেই তাকে ঠেকায় কিসে? তার উপর রাগ করলে সে ভয় পায় না, তাকে গালাগাল দিলে সে তামাসা করে, তার সঙ্গে তর্কে নামলে সে নাকাল করে ছাড়ে।

একটি ছোট থিয়েটারে ইবসেনের নাঠক অভিনীত হয়। ইংলণ্ডে কেন অমন নাটক লেখা হয় না? শ বল্লেন, আচ্ছা, আমি লিখছি। তাঁর প্রথম নাটক "Widowers' Houses" চারিদিকে নিন্দার ঝড় তুল্ল। কিন্তু তিনি আবিষ্কার করলেন যে তিনি নাটক লিখতে পারেন এবং যা আজ নিন্দার ঝড় তাই কাল স্তুতির ঝড় হবে। তিনি আবিষ্কার করলেন যে থিয়েটারই তাঁর চার্চ, নাটকই তাঁর সার্মন। একদিন চার্চ খালি করে লোক থিয়েটারে আসবে ধর্ম্মের ব্যাখান শুনতে।

তাঁর ধর্ম্ম তিনি ইতিমধ্যে উপলব্ধি করেছিলেন। সে ধর্ম্মের তত্ত্ব হচ্ছে ক্রিয়েটিভ ইভলিউশন, আর কর্ম্মকাণ্ড হচ্ছে সোশ্যালিজম্। বিবর্ত্তনবাদ প্রচলিত হয়ে অবধি পরমপিতা পরমেশ্বর যে ক্ষুদ্র কীট থেকে বৃহৎ তিমি পর্য্যন্ত সকলের এককালীন

স্রষ্টা এ ধারণা সুধীজনের পরিত্যক্ত হয়েছিল। কিন্তু বিবর্ত্তন সম্বন্ধে সেকালের লোক ডারউইনকে একমাত্র প্রমাণ্য বলে গ্রহণ করায় ব্যক্তিসম্পত্তিবাদীদের বিবেক দরিদ্রের দুঃখ দেখে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করছিল না। অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন। ধনিকরাই যোগ্যতম, তারাই থাকবে। শ্রমিকরা মরবে। প্রকৃতির নিয়ম যন্ত্রের মত অমোঘ ও নির্ম্মম। সেই যন্ত্রের দ্বারা প্রতি-নিয়ত বাছাই-য়ের কাজ চলেছে। যারা প্রকৃতির আপন হাতে নির্ব্বাচিত হল তারা পৃথিবীর প্রভু ও ভোক্তা। যারা বাতিল হল তারা ভারবাহী, তারা ভোগ করবে না, তারা ভুগবে।

ডারউইন কথিত বা ডারউইনের প্রতি আরোপিত এই হৃদয়হীন সমাচার কখনো মানুষের নব ধর্ম্ম হতে পারে না, পুরাতন ধর্ম্মের স্থান পূরণ করতে পারে না। এটা ধর্ম্ম নয়, এটা ধনিকতন্ত্রের সাফাই। এ যদি ধর্ম্ম হয় তবে চুরি ডাকাতিও ধর্ম্ম। বার্ণার্ড শ তাই ডারউইনকে উপহাস করলেন। তিনি গেলেন ডারউইনের পূর্ব্বগামী লামার্কের কাছে। প্রাণী আপনাকে ইচ্ছানুযায়ী বিবর্ত্তিত করতে পারে, এত কাল তাই করে এসেছে। চিরকাল তাই করবে। প্রকৃতি একটা যন্ত্র নয়, প্রকৃতি পরীক্ষা করছে, ভুল করছে, ভুল করতে করতে ঠিক করছে, যা ঠিক করছে তাকে বংশানু-ক্রমিক বৃত্তিতে পরিণত করছে। ইচ্ছা করলেই আমরা আমাদের সমাজের গঠন পরিবর্ত্তন করতে পারি, তার দ্বারা বংশের বিবর্ত্তন ঘটাতে পারি, অতিমানব হয়ে উঠতে পারি। আর তা যদি না করি, যদি যন্ত্রের হাতে আত্মসমর্পণ করি, তবে পরিবর্ত্তনশীলা পরীক্ষাপরায়ণা প্রকৃতি একদিন আমাদের উপর আস্থাহীন হয়ে অন্য কোনো প্রাণীকে শ্রেষ্ঠতায় উন্নীত করবে। আমাদের প্রতি তার পক্ষপাতের হেতু নেই।

সমাজের গঠন কি রূপ হবে পুরাতন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ তার সূচনা দিয়ে গেছেন। আমরা তার কালোপযোগী সংস্কার সাধন করলে তাই হয়ে দাঁড়ায় সোশ্যালিজম। সঞ্চয় ও সম্পত্তি প্রায় প্রত্যেক প্রবর্ত্তকের দ্বারা নিন্দিত হয়েছে। যীশু বলেছেন উটের পক্ষে বরং সূচের ছিদ্র দিয়ে যাওয়া সহজ, কিন্তু বড় লোকের পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ দুষ্কর।

অথচ সম্পত্তি না হলে মানুষের চলে না। চাষ করব, তার জন্য হাল লাঙ্গল চাই। বাস করব, তার জন্য এক কাঠা জমি চাই। সম্পত্তি দোষের নয়, দোষের হচ্ছে ব্যক্তির স্বত্ব। সেইজন্য সোশ্যালিষ্টদের প্রস্তাব সম্পত্তি রাষ্ট্রের অধিকারে যাক, ব্যক্তির যা দরকার তা ব্যক্তি নিক রাষ্ট্রের ভাণ্ডার থেকে। তা নইলে ধনী দরিদ্রের উপর প্রভুত্ব করতে থাকবে, দরিদ্রের সম্পত্তি কিনে নিয়ে তার স্বাধীনতা কিনে নিতে থাকবে। রাষ্ট্র সকলের সম্পত্তি গ্রহণ করে তার পরিচালনা করবে ও লভ্য হতে সকলকে সমান ভাগ দেবে। ব্যক্তির নিজের সঞ্চয় বলে কিছু থাকবে না, কারণ সঞ্চয়ই ত মূলধন, মূলধন থেকেই ত পরকে খাটিয়ে স্বয়ং লাভবান হওয়া। উৎপাদনের উপায় ব্যক্তির হাতে দেওয়া যাবে না, ব্যক্তিকে দেওয়া যাবে কেবল সম্পত্তির ব্যবহার।

রাষ্ট্রের উপর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করার আনুষঙ্গিক বিপদ এই যে রাষ্ট্রের চালক যারা হবে তারা চালনকার্য্যে অনিপুণ হতে পারে। নাবিক অনভিজ্ঞ

হলে জাহাজের ভরাডুবি। সাধারণত যারা ভোটের জোরে পার্লামেণ্টে যায় ও পার্টির জোরে গবর্ণমেণ্ট দখল করে তাহাদের মূঢ়তা, অদূরদর্শিতা ও হৃদয়হীনতা এমন যে তাদের স্কন্ধে সকল সম্পত্তি ন্যস্ত করলে সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। অতএব এক দল অতিমানব চাই। এদের প্রজনন করতে হবে যেমন করে উৎকৃষ্ট বৃষ বা উৎকৃষ্ট অশ্ব প্রজনন করা হয়। সমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের দ্বারা হবে আধান, শ্রেষ্ঠ নারীদের দ্বারা ধারণ। পরস্পরের সহিত দাম্পত্য জীবন-যাপনে এদের অরুচি থাকতে পারে, কিন্তু সমাজ হিতায় জগদ্‌হিতায় চ এরা সাময়িকভাবে সঙ্গত হবে। ফলে যেসব সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে তারাই হবে সকলের ভাগ্যবিধাতা।

বার্ণার্ড শ'র মতবাদের থেকে অতিমানবের আবশ্যকতা এমন অবিচ্ছেদ্য বলে সে মতবাদ সোশ্যালিষ্ট মহলেও উপেক্ষিত। ইংলণ্ডের সোশ্যালিষ্টরা অতিমানব চায় না, তারা চায় পক্ষপাতী ভোটার। বেশীর ভাগ ভোট যেদিন তাদের হস্তগত হবে সেদিন তারা অর্থাৎ তাদের নায়করা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে ভোটারের নির্দ্দেশ অনুসারে। ইংলণ্ডের সোশ্যালিষ্টরা ডিমোক্রেসীর উপর আশা রাখে। তার মানে বেশীর ভাগ লোকের মত যে একদিন তাদের মতবাদের অনুকূল হবে এ তাদের ধ্রুব বিশ্বাস। তা যদি হয় তবে একে একে রেলপথ, খনি, ব্যাঙ্ক, কলকারখানা, জমি ইত্যাদি রাষ্ট্রের হাতে আসবে, যেমন ইতিমধ্যে ডাকঘর, বেতার ইত্যাদি এসেছে।

রাশিয়ার ওরা অতিমানবের অপেক্ষা করে নি। লেনিনকে যদিও শ্রদ্ধা করে তবু লেনিনকে ওরা অতিক্রম করেছে। অতিমানব আর যাই হোন তিনি ব্যক্তি বিশেষ। ব্যক্তি বিশেষের জন্য কমিউনিষ্ট দর্শনে স্থান নেই। ব্যক্তিকে হতে হবে সমষ্টির সহিত একাত্ম। সমষ্টিচিত্তে যে চেতনা, সমষ্টিমানসে যে কল্পনা, সমষ্টি-হৃদয়ে যে আবেগ, সমষ্টিজীবনে যে উদ্দেশ্য, তোমার আমার ব্যক্তিত্বের শিশিরবিন্দু তাই প্রতিফলিত করবে। তুমি আমি সমষ্টির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তুমি আমি ইউনিট নই, ইউনিট হচ্ছে সমষ্টি। কাউকে যেমন মুখ দেখেই চেনা যায়, কাউকে গলা শুনে, তেমনি সমষ্টিকে চেনা যায় তোমাকে আমাকে দেখে। আমাদের আপন আপন পরিচয় নেই, আমরা সমষ্টির পরিচায়ক।

সমষ্টির উদ্দেশ্য যাদের মধ্যে প্রতিমূর্ত্ত হয়েছে, যারা সমষ্টির অন্তঃকরণস্বরূপ, তারা সমষ্টির পক্ষে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করবে, নাই বা হল তারা মেজরিটির প্রতিনিধি। তাদের নিজের বলতে কিছু নেই, না ধন না মন। কমিউনিষ্ট রাশিয়া, ফাসিষ্ট ইটালী ও নাৎসী জার্ম্মানী এক্ষেত্রে এক মার্গী। তবে এদের প্রত্যেকে রাষ্ট্রসম্পত্তিবাদী নয়। দ্বিতীয় দুই দেশ কণ্টকের দ্বারা কণ্টকের উচ্ছেদ চায় বলে কণ্টকের অনুকরণ করেছে।

কাজেই প্লেটো যে আশা করেছিলেন দার্শনিকরা শাসক হবে, পোপরা যে মনে করেছিলেন যাজকরা হবে শাসক, বার্ণার্ড শ যে প্রস্তাব করেছেন অতিমানবরা শাসন করবে এর কোনোটার ললাটে সিদ্ধি লেখা নেই।

তারপর অতিমানবের জন্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও আশঙ্কার কারণ রয়েছে। উৎকৃষ্ট ব্যাঘ্র প্রজনন করা যায় না। চিড়িয়াখানায় যে বাঘ জন্মাক সে যতই থাক যতই বাড়ুক যতই শিক্ষা পাক তাকে জঙ্গলে ছেড়ে দিলে সে খাস জঙ্গলী বাঘের এক

আঘাতে মারা পড়বে। তোমার অতিমানব উকীলের সঙ্গে বুদ্ধির দ্বন্দ্বে জিতবে না, বেণের সঙ্গে দরাদরির খেলায় হার মানবে, সৈনিকের উচ্চাভিলাষের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, পলিটিসিয়ানের চালবাজিতে মাৎ হবে।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় শ আক্ষেপ করেছেন, তাঁর পুরানো কথা আ ও পুরানো হয়নি, সমাজ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, আগে চলছে না, মিথ্যা বড়াই করছে প্রগতির নামে। কিন্তু প্রগতি নাই হোক পরিবর্ত্তন কি হয়নি? ধনী দরিদ্র বলে দুটো স্বতন্ত্র শ্রেণী কি আছে? গরীবরাও কিছু না কিছু ব্যাঙ্কে জমাচ্ছে, শেয়ার কিনছে, সুদ ও ডিভিডেণ্ড পাচ্ছে। তারাও ছোটোখাটো ক্যাপিটালিষ্ট। ইংলণ্ডে এদের সংখ্যা শ'র জীবনকালে বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ধনীরা যত ধনী হবে দরিদ্ররা তত দরিদ্র হবে মার্ক্সের এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা কোথায়? ইংলণ্ডে বেকার সমস্যাও থাকত না যদি না ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর আয়ের আদর্শ বাড়ত। তারা যদি অল্পে সন্তুষ্ট হয় তবে দশজনের মজুরি কমিয়ে যা বাঁচে তা দিয়ে আরো দু'তিন জনের পোষণ হয়। শ্রমিক সাধারণের মজুরি বেড়েছে, খাটুনি কমেছে, ইনশিওরেন্স প্রবর্ত্তিত হয়েছে, কিছু না হোক ডোল আছে। অন্যান্য দেশেও এই সকল সংস্কার অনুসৃত হয়েছে ও হচ্ছে।

তা সত্ত্বেও পৃথিবীতে দারিদ্র্য রয়েছে, এবং দারিদ্র্য একটা নিবার্য্য ব্যাধি। এদিক থেকে দারিদ্র্যের শত্রু ও মানবের মিত্র বার্ণার্ড শ'র শেষ বয়সের আক্ষেপ তাঁর প্রথম বয়সের আপত্তির মতই সহেতুক। এর জন্য কাকে দোষ দেওয়া যায় জানিনে, কেননা শাসকরা সব দেশেই শাসিতের প্রকৃতি গ্রহণ করে, চাষা যেমন গোরুর পিছন পিছন ঘুরে গোরু ব'নে যায়। মানবের হিতৈষীরা হতাশ হয়ে মানবজাতিটাকেই তিরস্কার করেছেন, কোনো বিশেষ শ্রেণীকে না। মনে হয় শ'র অভিমান মানব জাতির প্রত্যেকের উপরে।

তাঁর বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি এখনো ভবিষ্যৎ বংশধরদের সম্বন্ধে আশান্বিত।

লীলাময় রায়

অন্তঃশীলা—শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, (ভারতী ভবন)

এতদিন এই মনস্বী লেখকের রচনা, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষা, সঙ্গীত ও সাহিত্যবিষয়ক চিন্তাশীল প্রবন্ধেই নিবদ্ধ ছিল। গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে পদার্পণ ধূর্জ্জটিবাবুর নূতন। ধূর্জ্জটিবাবু সবুজপত্র যুগের লেখক; তবু সেই সময় থেকে সুরু করে আধুনিক লেখকদের নিয়ে যদি গণ্ডী রচনা করা যায়, তবে বলতে হয় সে গণ্ডীর মধ্যে গুণগ্রাহী ধীমান প্রতিভাশালী লেখক ও সমালোচক যাঁরা আছেন, ধূর্জ্জটিবাবু তাঁদের অগ্রণী। শুধু রচনায় নয় পঠনেও। ধূর্জ্জটিবাবুর সমতুল মেলা দুষ্কর। তাঁর অধীত বিদ্যার প্রাচুর্য্য তাঁর রচনা ও চিন্তাশীলতার অন্তরে অন্তরে পরিব্যাপ্ত। এমনও হয়েছে যে অনেকের কাছে এটা একটা নালিশের বিষয় যে তাঁর লেখার প্রধান উপজীবিকা পঠনাশ্রিত বুদ্ধি। বুদ্ধির এলাকা ও চিন্তার এলাকা এক কিনা ঠিক আমি জানি না। কিন্তু আমার মনে হয় আসলে ধূর্জ্জটিবাবু চিন্তার ব্যাপারী। এইজন্যই তাঁর

এক বইয়ের নামকরণ হয়েছে চিন্তয়সি। তাঁর প্রথম বই "আমরা ও তাঁহারা" এইজন্যই চিন্তা বনাম অনুষ্ঠান ও আপ্তবাণীর তর্কে মুখর। কিন্তু এখানে গ্রন্থকারের বহুমুখী অধ্যয়ন ও চিন্তাপ্রসূত রচনাবলীর মূল্য নিরূপণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার উদ্দেশ্য তাঁর গল্পউপন্যাসের সঙ্গে তাঁর অন্যান্য লেখার যে যোগাযোগ আছে তারই প্রতি এই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এই যোগাযোগের সূত্র গ্রন্থকারের চিন্তাশীলতায়। ধূর্জ্জটিবাবুর গল্প ইতিপূর্ব্বেই সাহিত্যরসিকদের কাছে যোগ্য মর্য্যাদালাভ করেছে ;—সে সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু বলা অনাবশ্যক ও বাহুল্য। কিন্তু গল্পগুলির শ্রেণীবিভাগ করা আমি এখানে প্রয়োজন মনে করি। তাঁর এক শ্রেণীর গল্প বিবৃতিমূলক ; কিন্তু এগুলির ঘটনাসমাবেশ নিজগুণে তেমন প্রতিষ্ঠা পায় না যেমন পায় বিবৃতিকারের অনুরাগ বা আবেগচিহ্নিত কথকালিতে ; তাঁর অপর শ্রেণীর গল্প হোল চিন্তাশ্রিত,—ঘটনাসমাবেশ বা চরিত্র-সমাবেশের মধ্যে এর মূল সংস্থাপিত নয়, এর অবলম্বন নায়কের চিন্তাবৈচিত্র্য। এর পূর্ব্বে গ্রন্থকারের "রিয়ালিষ্টে" যে গল্পসংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে তাদের এই দুই শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা যেতে পারে ; এবং দুই শ্রেণীর গল্প লেখাতেই ইনি প্রভূত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন যদিও কারো কাছে প্রথম শ্রেণীর, কারো কাছে বা তাঁর দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্প বেশী সমাদর লাভ করবে।

অন্তঃশীলা শেষোক্ত শ্রেণীর গল্পের সমজাতীয়। অন্তঃশীলার ঘটনাসমাবেশ সামান্য, চরিত্রসমাবেশও গৌণ, চিন্তাসমাবেশই এর প্রধান ও অমূল্য সম্পদ। কিসের চিন্তা? নিছক চিন্তা যা আধুনিক শিক্ষিত ও মনস্বী ব্যক্তির মনকে পদে পদে আবিষ্ট করে। বিদ্যা ও ভাবনার সঙ্গে স্থাবর জঙ্গম অনুষ্ঠান ধর্ম্ম আদর্শ বিজ্ঞান সমাজ প্রভৃতি সমস্ত কিছুর সংঘাতের ফলে চিন্তা ; সংঘাত ঘটনার ক্ষেত্রে নয় সংঘাত চেতনার ক্ষেত্রে। চিন্তাও ধারাবাহিক নয়, চিন্তা অবচ্ছিন্ন অথচ সব কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত। চিন্তা না বলে বলা যেতে পারে চেতনমনের বিকাশ। বিবেকের দংশনে ভবানন্দের বিলাপোক্তির মত একধারায় চেতনা প্রবাহিত হয় অল্প ক্ষেত্রেই, চেতনার রূপই হোল অবচ্ছিন্ন ও বহুধা। সহজ ও অকৃত্রিম বলে একে চিন্‌তে দেরী হয় না। এই ধরণের চিন্তার বিকাশে গ্রন্থকার যে মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যে বিরল। চিন্তাধারার রূপ সর্ব্বত্রই এই রকম কি না, এর উত্তর যাই হোক, ধূর্জ্জটিবাবুর নায়ক খগেন অন্ততঃ এ রকম চিন্তাশীলতার প্রতিভূ। সন্দেহ হয় গ্রন্থকার আপন অজ্ঞাতসারেই এই নায়কের মধ্যে নিজেকেই প্রতিবিম্বিত করেছেন। অন্ততঃ নায়ক স্বয়ং গ্রন্থকারের মতই বিদ্যায় ভাবুকতায় বিচারে ও পর্য্যবেক্ষণে পারদর্শী। গ্রন্থকারের সঙ্গে নায়কের এই একাত্মতার সুফল হয়েছে এই যে কোন জায়গায়ই চিত্রণ অপ্রাকৃত ঠেকে না।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে অন্তঃশীলার আখ্যানবস্তু সামান্য। কিন্তু গ্রন্থকার যে বিশিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আখ্যানভাগটিকে নির্দ্দিষ্ট সীমা ও পরিমাপের মধ্যে আবদ্ধ রেখে ভালই করেছেন। তিনি কাহিনীটিকে যেখানে সুরু করেছেন অন্যের হাতে সেটাই হোত শেষ, এবং এ-ক্ষেত্রে এই কারণেই উপন্যাসটি হয়েছে খুব ধারাল। বস্তুতঃ যে শ্রেণীর চিন্তার গতি এ উপন্যাসটিতে প্রকট হয়েছে তার জন্য চাই ঘটনাজালবিমুক্ত

যথেষ্ট অবসর, তার জন্য চাই সুরুতেই তীব্র আঘাত। এটা ধূর্জ্জটিবাবুর প্রথম উপন্যাস; তা হলেও এ যেন ওস্তাদের হাতের মার। খগেনবাবুর স্ত্রী সাবিত্রী আত্মহত্যা করেছেন, কারণটা বাহ্যতঃ অকিঞ্চিতকর। কিন্তু আন্তরিক কারণ খগেনবাবুর বুদ্ধি ও বিচারবৃত্তির সঙ্গে সাবিত্রীর সহজ প্রবৃত্তির সংঘর্ষ। সে সহজ প্রবৃত্তি বুদ্ধি ও বিচারের দ্বারা মার্জ্জিত নয়; তাতে আছে জয়ের ইচ্ছা ও জিঘাংসা। সাবিত্রীর বন্ধু ছিলেন রমলা, সম্পূর্ণ আধুনিক, অন্ততঃ আধুনিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন। স্বামীর কলুষিত ব্যবহারের জন্য তিনি পৃথক বাস করতেন ও দাম্পত্যজীবনের প্রতি তাঁর যে বীতস্পৃহা হয়, সাবিত্রীর দাম্পত্যজীবন তাতেই প্রতিহত হয়ে সাবিত্রীর ঈর্ষার ইন্ধন জুগিয়েছিল। তারই ফলে সাবিত্রীর আত্মহত্যা। আখ্যায়িকা আরম্ভ হয়েছে এই দুর্ঘটনার পর করোনারের কোর্টে ও সাবিত্রীর সৎকারে। খগেনবাবুর মন তখন চিন্তাবিক্ষোভে ও অবচেতনার তরঙ্গে উদ্‌ভ্রান্ত। মৃত্যুর অনুচর এই যে উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তার অমোঘতা, গ্রন্থকার এর যে চিত্র অঙ্কিত করেছেন, বাংলা সাহিত্যে তা দুর্লভ। এই অধ্যায়টিই বোধ হয় বইটির শ্রেষ্ঠাংশ বলে বিবেচিত হবে,—যদিও এটি ঈষৎ অতিরঞ্জিত। পাঠক বইটির এ অংশে একটা কীর্ত্তন ও তজ্জনিত খগেনবাবুর বিক্ষিপ্ত মনে প্রতিক্রিয়ার একটা অপরূপ সুন্দর স্কেচ্ দেখতে পাবেন। এর পর ঘটনাস্রোতের পরিবর্ত্তন হয় রমলার সঙ্গে খগেনবাবুর মুখোমুখী আলাপ-পরিচয়ে। উভয়ের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক ও কথোপকথন হয় এবং উভয়ের মধ্যে যে একটা অজ্ঞানের আচ্ছাদন ছিল তা হয় অপসারিত। সাবিত্রীর প্রতি যে অবিচার করা হয়েছিল তাও উভয়ের নিকট উদ্ভাসিত হয়। রমলার বাড়ীতে খগেনবাবু এক নবীন ছাত্রের হৃদয় ও মনের পরিচয় পান, সে সুজন। সুজনও আধুনিক কালের শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন কিন্তু রমলার সংস্পর্শে তার হৃদয় দরদী হয়েছিল। রমলা ও সুজনের সঙ্গে কথোপকথনের ফলে খগেনবাবুর নিজেকে অনুসন্ধান করে দেখবার ইচ্ছা জাগে। ফলে খগেনবাবু রমলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মাসীমার কাছে কাশী যান। সেখান থেকে রমলার সঙ্গে কিছু পত্র বিনিময়ও হয় ও পরিশেষে নিজের ডায়েরী পাঠিয়ে দিয়ে খগেনবাবু লোকচক্ষুর অন্তরালে নিরুদ্দেশ হন।

আমার মনে হয় খগেনবাবুর সঙ্গে রমলার পরিচয় আর কিছু নয়, খগেনবাবুর নিজের চিন্তাজালের গ্রন্থিউন্মোচন বা আত্মোপলব্ধি। রমলা শুধু প্রাসঙ্গিক ভাবে উপস্থিত মাত্র। এমন অনুমান করা অসম্ভব নয় যে রমলা থাকুক বা না থাকুক খগেনবাবুর চিন্তাজালের গ্রন্থিউন্মোচন ব্যাহত থাকত না। অথবা বলা চলে খগেনবাবু ও রমলা সেই চিন্তাবৃত্তির এপিঠ ওপিঠ। বাস্তবিক অন্তঃশীলার আখ্যায়িকার প্রকৃত সংস্থান মাত্র একটি, ও প্রথম দুই অধ্যায়ই তার চূড়ান্ত প্রকাশ। স্বীকার করতেই হয়, চরিত্রচিত্রণ বা আখ্যায়িকার ক্রমপরিণতির দিক থেকে পাঠকের দাবী কথঞ্চিত অপূর্ণ থেকে গেছে। কথোপকথনের ধারাল চমক বাদ দিলে উপন্যাসের মাঝের অংশ একটু গতিহীন। অপরপক্ষে বলা যায় গতি ঘটনাচক্রে নয়, গতি মনের জাল-জঞ্জাল অপসারণে। এই দিক থেকেই বইটির সার্থকতা।

আর একটা জিজ্ঞাসা মনে জাগে, কেবল মাত্র চিন্তাশীল, সজীব মনের

সফলতা কোথায়। খগেনবাবু চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন ও সেই জন্যেই তাঁর নিষ্ক্রমণ—escape। এ নিষ্ক্রমণ শুধু সমাজ বা রমলার মিলন লাভের সম্ভাবনা থেকে নয়, এ নিষ্ক্রমণ বুদ্ধি ও বিচারের কারাগার থেকে। এই নিষ্ক্রমণ-তত্ত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় খগেনবাবুর ডায়েরীর পৃষ্ঠাগুলিতে। সে দিক থেকে ও ভাবের প্রগাঢ়তার জন্য এ পৃষ্ঠাগুলি পাঠকের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। কিন্তু আমার মনে হয় এই নিয়ে গ্রন্থকারকে একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতেই হবে—সমগ্রভাবে দেখতে গেলে গ্রন্থের সারতত্ত্ব কি এই যে বুদ্ধির বন্ধন থেকে নিষ্ক্রমণই হোল বুদ্ধিজীবীর প্রকৃষ্ট পথ? এটা মানতেই হয় যে বুদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া খগেনবাবুর চিত্রে ও ডায়েরীর পৃষ্ঠায় ফুটে উঠেছে। অথচ খগেনবাবু সাংখ্য বেদান্ত যোগ আর্ট বিজ্ঞান কোথাও মুক্তি খুঁজে পান নি। তিনি সকল রকম সম্বন্ধসূত্র ছিন্ন করে নূতন সম্বন্ধ-সৃষ্টির আভাস দিয়েছেন। গ্রন্থকার বোধ হয় নূতন আদর্শে নূতন সমাজ স্থাপনার কথা বলতে চেয়েছেন। যে কেউ ধূর্জ্জটিবাবুর প্রকাশিত রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত তাঁরাই জানেন যে এ কল্পনা ধূর্জ্জটিবাবুর নূতন নয়। কিন্তু ও আদর্শসম্বন্ধে বিশদ কোন কিছুই বিবৃত করা নেই। অন্ততঃ খগেনবাবুর চিন্তার ছকের মধ্যে ও সারা বিশ্বের প্রাক্তন ও আধুনিক যা কিছু প্রচলিত তত্ত্ববাদের আলোড়নে তা যে কোথায় আত্মগোপন করে আছে তা খুঁজে পাওয়া শক্ত। অপর পক্ষে গ্রন্থকর্ত্তা বলতে পারেন যে মানব সমাজের আহরিত বিদ্যা পুঁথিপত্তর ও অনুষ্ঠানের প্রাচীরগাত্রে মানুষের যে মাথা ঠুকে মরতে হচ্ছে তাই দেখানই শুধু ঔপন্যাসিকের কাজ, কেমন করে আবার সে প্রাচীর ভাঙতে হবে তা দেখান তাঁর কাজ নয়—আর যারই হোক। সমালোচক এতে বলবেন যে মাথাঠোকা ও বেদনাবোধ শুধু বিবৃত করলেই হবে না, তাকে উপন্যাসে সাকার করতে হবে।

আমার এ অভিযোগ যে কত নগণ্য সে বিষয়ে আমার কোন ভ্রান্ত ধারণা নেই কেননা একে উপন্যাসই বলা হোক বা আর কোন নামেই ডাকা হোক, অন্তঃশীলা কেবল সম্পূর্ণভাবে নূতন নয়—অন্তঃশীলা অসাধারণ বই। অন্তঃশীলার মূলপ্রসঙ্গ প্রেম নয়, অসামান্য বিদ্যাবুদ্ধির দুর্ব্বিষহ ভারই যে আধুনিক জগতের মহাট্র্যাজেডী এই অন্তঃশীলার মূলগত প্রসঙ্গ। ঐকান্তিক ভাষাও অন্তঃশীলার স্বকীয়তা বর্দ্ধন করেছে। প্রকৃত পক্ষে এ বইটি সাগ্রহে না পড়লে বাংলাসাহিত্যামোদীকে বাংলাভাষার একটা অনন্যসাধারণ বই পড়ার লাভ থেকে বঞ্চিত হতে হবে; আর মূলতঃ চিন্তা ও অন্তর্মুখী জীবনের নক্সা হলেও অন্তঃশীলায় ভৃত্য ও আশ্রিতের প্রতি স্নেহ, ছাত্রজীবনের প্রতি অসীম সহানুভূতি ও গ্রন্থ এবং গ্রন্থাগারের প্রতি সত্যিকারের ভালবাসার যে চিত্র আছে অন্য কোন বাংলা লেখায় তার দোসর পাওয়া শক্ত।

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

The Indus Civilisation—By Ernest Mackay. (Lovat Dickson & Thompson Ltd.)

প্রায় তের বছর আগে ৺ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সিন্ধু প্রদেশে 'মহেন্-জো-দড়ো' (সিন্ধী ভাষায় অর্থ 'মৃতস্থান') নামক স্থানে ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগের নানা নিদর্শন আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর পরে প্রত্ন-তত্ত্ব-বিভাগের অন্যান্য মনীষীরা মহেন্-জো-দড়ো ও হারাপ্পা প্রভৃতি বিবিধ স্থানের খনন-কার্য্যে মনোযোগ দিয়ে আরও অনেক মূল্যবান্ তথ্য ও দ্রব্য আহরণ করেছেন। আলোচ্য পুস্তকে প্রধানতঃ সেই সব তথ্য ও দ্রব্য সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের মনে একটা স্থূল ধারণা দেবার প্রয়াস আছে।

প্রয়াস যে সফল হবে, এ ভবিষদ্বাণী করা নিরাপদ। লেখকের রচনার প্রসাদগুণ যথেষ্ট, এবং চিত্রগুলিও সু-চয়িত। অবিনীত পাণ্ডিত্য কোথায়ও চোখে পড়ে না। ইতিহাস যে দর্শন নয়, একথা লেখক নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন। সেকালের দৈনন্দিন জীবন কেমন ছিল—তারা কি রকম বাড়ীতে থাকৃতো, কি কাপড় কি গয়না পরতো, কি অস্ত্র ব্যবহার করতো, কি খেলা খেল্‌তো, কি শিল্প আয়ত্ত করেছিল, কি দেবতা তাদের পূজ্য ছিল,—এই সবের পরিচয়েই গ্রন্থটী পরিপূর্ণ, প্রোজ্জ্বল। এক কথায়, বইখানি একটী সুলিখিত গল্পের মতো সুপাঠ্য।

বাড়ীগুলোর পোড়া ইট ও সহরের জল-নির্গম-প্রণালী দেখে অনুমান হয় যে সেকালে ঐ স্থানে যথেষ্ট বৃষ্টি পড়তো। বন্যারও প্রকোপ ছিল খুব; অন্তত দুটী বন্যার প্রমাণ পাওয়া যায়। হয়ত একটা ভীষণ বন্যার ফলেই মহেন্-জো-দড়ো পরিত্যক্ত হয়। বহু শতাব্দী পরে, খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে, নগরের একটী অংশে আর একবার লোকের বসতি হয়েছিল। নতুবা 'মহেন্-জো-দড়ো' যথার্থই 'মৃত-স্থান'।

বাড়ীগুলো নিতান্ত প্লেন; অন্ততঃ কারুকার্য্যের বিশেষ চিহ্ন তো পাওয়া যায় নি। জানেলা ছিল কিনা তা জানা যায় না; না থাকাই সম্ভব, লেখকের মতে গরম দেশে জানেলা নিষ্প্রয়োজন। দরজাগুলো বড় রাস্তার উপর না থাকাই ছিল রীতি; সম্ভবতঃ চোরের ভয়ে। দেয়াল যে রকম পুরু, তার থেকে মনে হয় বাড়ী অনেক সময়ে দু-তলা, তিন-তলা, কিম্বা তার চেয়েও উঁচু ছিল; কোথাও কোথাও ছাতের কড়ি বসাবার গর্ত্তও দেখা যায়। কোনো-কোনো বাড়ীর সিঁড়ি রাস্তা থেকেই উঠেছে; লেখকের অনুমান, সে রকম বাড়ীতে একাধিক স্বতন্ত্র পরিবার বাস করৃতো,—অনেকটা আধুনিক 'ফ্ল্যাট'-জাতীয়। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই বাথ-রুম ছিল—সকল ক্ষেত্রেই রাস্তার দিকে। বিশেষ সুব্যবস্থা ছিল ড্রেনের; নর্দ্দমা নিয়ে এত চিন্তা আর কোনো প্রাচীন জাতি করেছিল কি না সন্দেহ। 'ড্রেন'-গুলোর মধ্যে অনেক মাটির খেলনা বেরিয়েছে; বোঝা যায়, স্নানাগারে পুতুল নিয়ে যাওয়ার অভ্যাসটী সেকালেও ছিল। ঘরের আসবাব সম্বন্ধে অবশ্য বেশী কিছু বলা এখন সম্ভব নয়। তবে একটি শীল-মোহরে এক রকম টুলের ছবি আছে, যার পায়া ষাঁড়ের পায়ের মতন; এই ধরণের জিনিষ প্রাচীন মিশরেও মেলে। একটী মাটির বাতি-দানও পাওয়া গিয়েছে। উঠোনেই সচরাচর রান্না করা হ'ত। তবে ছোট ছোট রান্নাঘরও ছিল, যার মধ্যে ইটের উনুন লক্ষ্য করা যায়।

পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার সম্বন্ধে খুব বেশী জানা যায় নি। অনাবৃত পুরুষের ও স্ত্রীলোকের প্রতিকৃতি থেকে অনুমান করা যায় যে সেগুলিতে বীরপুরুষ ও দেবদাসীর রূপ ধরা দিয়েছে। দেবদেবীর মূর্ত্তির আবরণ ও আভরণ যদি সাধারণ লোকের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের অনুরূপ গণ্য করা হয়, সেটা অসঙ্গত বলা যায় না। এই যুক্তি মান্য করে লেখক সেকালের গয়না পোষাকের বর্ণনা দিয়েছেন। মেয়েরা পরতো ছোট ঘাগ্‌রা (short skirt) আর মরদ-রা পরতো কোমর-বন্দ্। কোমরের উপর দেহের যে অংশ সেটা পরিচ্ছদে ঢেকে রাখাটা সেকালের মেয়েদের ফ্যাশান্ ছিল না। কেবল একটী নারী-মূর্ত্তির গায়ে cloak দেখা যায়; cloak-টীতে হাত ঢাকা পড়েছে, কিন্তু বুক ঢাকা পড়ে নি—বোধ হয় এটী শীত-নিবারণের বস্ত্র। হারাপ্পায় একটী পুরুষ-মূর্ত্তির পরণে ধুতি বা 'ব্রীচেস্' লক্ষিত হয়। কখনো-কখনো পুরুষদের বাম স্কন্ধে প্রলম্বিত একখানি 'দোছোট' দেখা যায়, এবং একটী মূর্ত্তিতে সেটী হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত নেমে এসেছে। পুরুষেরা প্রায়ই দাড়ী রাখ্‌তো, গোঁফ কামাতো। মাথার চুলের কেয়ারী অনেকটা সুমেরীয় রীতি অনুযায়ী মনে হয়; একটী দেব-মূর্ত্তির মাথায় সীঁথেকাটাও দেখা যায়। পুরুষরা খোঁপা বাঁধ্‌তো। মেয়েদের চুল-বাঁধার প্রণালী বোঝা কঠিন; তবে হাতীর দাঁতের হেয়ার-পিন, তাঁবার আরসি, প্রসাধনের এই সব সরঞ্জামের অভাব ছিল না। একটী নারী-মূর্ত্তির মাথার পিছনে একরাশ কুঞ্চিত কেশ লম্বমান; আর কয়েকটী দেবী-জাতীয়া প্রতিকৃতির বেশ-বিন্যাসে আধুনিক কালের মতন 'বিনুনি' আর 'বো' (bow) দেখা যায়। অলঙ্কারের বর্ণনা লেখক অতি সযত্নে দিয়েছেন; তার ছবিও অনেক রয়েছে। কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকারা সেই বর্ণনা ও ছবি প্রত্যক্ষ করলে সে বিষয়ে ধারণা করে নিতে পারবেন। রমণীর অলঙ্কার সম্বন্ধে বর্ত্তমান সমালোচকের জ্ঞান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, সুতরাং লেখক-প্রদত্ত বর্ণনার পরিচয় এখানে দেওয়া গেল না।

খেলা-ধুলো নানারকমের ছিল। ছোট ছেলে-মেয়েরা মাটির খেলনা তৈরী করতো। কোনো কোনো খেলনায় তাদের কচি আঙ্গুলের দাগ আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। মাটির ঝুম্‌ঝুমি, বাঁশী, রঙীন পাখী, ঘাড়নাড়া ষাঁড়, গরুর গাড়ী, খেলা-ঘরের হাঁড়ী-কুঁড়ী—এই রকম অনেক খেলনা পাওয়া গিয়েছে। এত প্রচুর ক্রীড়া-সামগ্রীর মধ্যে যুদ্ধোপযোগী শকটের মৃন্ময় নিদর্শন একটীও না মেলায় লেখক অনুমান করেন যে লোকগুলো রণপ্রিয় ছিল না, এবং তাদের সভ্যতার শেষ অবস্থায় আসবার পূর্ব্বে তারা শত্রু-বিধ্বস্ত হয় নি।

প্রবীণদের খেলার মধ্যে পাশা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অক্ষক্রীড়া যে প্রাচীন তার যথেষ্ট প্রমাণ সাহিত্যে বর্ত্তমান; প্রত্ন-তত্ত্ব-বিভাগের খনকের মারফৎ আজ আমরা সেকালে ব্যবহৃত হাতীর দাঁতের পাশা, পাথরের বা মাটির dice প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হচ্ছি। বাগ্‌-বন্দীর ধরণের একটী ঘরকাটা ইট আবিষ্কৃত হয়েছে; লেখক অনুমান করেন, খেলাটী প্রাচীন মিশরের 'সেন্ট' বা সুমেরীয় কোনো খেলার মতন ছিল। মাটির ও পাথরের অনেকগুলো বোড়ে পাওয়া গিয়েছে।

হারাপ্পা ও মহেন-জো-দড়োর মৃন্ময় পাত্রগুলো প্রায় একই রকমের। শেষোক্ত নগরের সন্নিহিত একটী আধুনিক গ্রামে এখনও কলাল-চক্র ব্যবহৃত হচ্ছে; একালের

তৈরী জিনিষগুলোর রং সেকালের মতো বটে, কিন্তু ঢপ্‌ আলাদা। হয়তো তখনো এখনকার মতোই পুরুষরা চক্র-চালনা দ্বারা পাত্র নির্ম্মাণ করতো, আর স্ত্রীলোকরা সেই পাত্র বর্ণ যোজনা দ্বারা সুন্দর করবার চেষ্টা করতো। বর্ণ-যোজনায় সৌন্দর্য্য-বোধের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। হাতল-ওয়ালা পাত্র বড় একটা মেলে না; কিন্তু মুখ-নল-যুক্ত 'ফীডিং কাপ' কয়েকটী আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং সে রকম কাপ্‌ সুমেরেও দেখা যায়। একপ্রকার পাত্রের গায়ে ডুমো-ডুমো knobs দেখতে পাই; মেসোপটেমিয়াতে ডক্টর ফ্রাঙ্কফোর্ট এই জাতীয় পাত্র পেয়েছেন এমন এক স্তর থেকে যেটা নাকি আমাদের মহেন্‌-জো-দড়ো ও হারাপ্পার সমসাময়িক। মৃৎপাত্রে অঙ্কিত চিত্রগুলির আকৃতি প্রায়ই 'জিওমেট্রিক্যাল'—ত্রিকোণ-চতুষ্কোণ-মণ্ডল-আত্মক। জন্তু-জানোয়ারের ছবিও মাঝে মাঝে মেলে। মানুষের চেহারার একান্ত অভাব; কেবল হারাপ্পার একটী মৃৎপাত্রে মনুষ্যের আকৃতি দেখা যায়। মহেন্‌-জো-দড়োয় প্রাপ্ত সুন্দর ছোট ছোট আধ ইঞ্চি উঁচু কয়েকটী পাত্র স্থানীয় যাদুঘরে রয়েছে; সেগুলি বোধ হয় গন্ধ-দ্রব্যের আধার। লেখক বলেন, সিন্ধু-সভ্যতা যে মূলতঃ কর্ম্মোপযোগী এ সত্য মহেন্‌-জো-দড়ো ও হারাপ্পার তৈজস-পত্রাদি ও গৃহ-নির্ম্মাণ-প্রণালী দেখেই উপলব্ধি করা যায়।

অস্ত্র শস্ত্র প্রধানতঃ তাঁবা বা 'ব্রোনজ্‌' দিয়ে গড়া। ছুরি, ক্ষুর, ছেনি, করাৎ, ছোরা, কুড়ুল, তরওয়াল, বর্শা, তীরের ফলা ইত্যাদি নানাপ্রকার যন্ত্র ও অস্ত্র দেখা যায়। পাথরের তৈরী গদার মাথা (mace-heads) অনেকগুলো বেরিয়েছে; অতএব আমরা ধরে নিতে পারি, লোকে তখন গদা-যুদ্ধ করতো। সুতো জড়ানো মাছ-ধরা বঁড়সীও কয়েকটী উদ্ধার করা হয়েছে। সুতোর টেকো (spindle-whorls) প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মাছ মাংস খাওয়ার আরও প্রমাণ মেলে; বড় বড় মাটির জালায় মাছের কাঁটা আর ছাগল-কচ্ছপ-হরিণ-গরু-শূয়ারের হাড় বিস্তর দেখা যায়। মসলা পেষণের পাষাণ, রুটী বেল্‌বার বেলুন, কেক্‌ করবার ছাঁচ পর্য্যন্ত না-কি আবিষ্কৃত হয়েছে। দুজন ইংরেজ মনীষী লক্ষ্য করেছেন যে খাবার সময়ে টেবিল চেয়ারের ব্যবহার অজানা ছিল না; চামচ তো পাওয়া যায়-ই; এমন-কি টেবিলে ব্যবহারযোগ্য ছুরিরও না-কি সন্ধান মেলে, যদিচ শেষোক্ত অভ্যাস সম্বন্ধে লেখক নিজে সন্দিহান।

সিন্ধু-সভ্যতার শিল্প-কৌশলের প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় কতকগুলি steatite পাথরের কবচ-জাতীয় চতুষ্কোণ পদার্থে। এগুলিকে seal-amulet বলা হয়; কিন্তু 'শীল' করা জিনিষ খুব কমই পাওয়া গিয়েছে। কবচগুলি দুই শ্রেণীর; এক শ্রেণীর প্রত্যেকটীর উপর আছে একটী প্রাণীর আকৃতি ও একটী সেকেলে অক্ষরে শিলালিপি; আর এক শ্রেণীতে প্রাণীর আকৃতি নেই, আছে শুধু শিলালিপি। কোনো কোনো কবচে খোদিত জন্তু দেখে লেখক শিল্পীকে বিশেষ প্রশংসা করেছেন :—

(p. 160) "A specimen bearing the figure of a humped, or Brahmani, bull (pl. M, 1) is a very good example of the fine work that could be produced. The muscles ripple under the skin in a most realistic fashion, and the well-nourished hump drooping at the back is also extremely well engraved, especially when

it is remembered that all the work had to be done on so small a scale. A fragment of a larger seal with just the head and shoulder of a tiger is aiso a splendid piece of work, the open mouth, tongue, bared fangs, and careful placing of the double stripes being indicated with great fidelity."

মহেন্-জো-দড়ো বা হারাপ্পায় যদিও কোনো মন্দির অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নি, তথাপি সেকালকার লোকের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। একটী দেব-মূর্ত্তির ভগ্নাংশের চিত্র আলোচ্য পুস্তকে স্থানলাভ করেছে। সেটীর গলার দুপাশে গয়না (necklace) পরবার গর্ত্ত আছে; মনুষ্যমূর্ত্তিতে এরকম গর্ত্ত থাকে না। চোখ দুটীর ভাব অর্দ্ধ-নিমীলিত। এভাবের চোখ Kish ও Ur-এ প্রাপ্ত সুপ্রাচীন মৃন্ময় মূর্ত্তিতেও দেখা যায়। সুতরাং আমাদের 'যোগ'-এর সঙ্গে এ চোখের কোনো যোগাযোগ না-ও থাকতে পারে। শিবের মূর্ত্তি একটী কবচে পাওয়া যায়। পশুপতি-রূপে তিনি বিরাজ করছেন—হাতী, বাঘ, মোষ, গণ্ডার, হরিণ তাঁকে বেষ্টন করে আছে। 'মাতৃ-দেবী' (Mother Goddess) অতি প্রাচীনকালে প্রাচ্যে পূজা পেয়েছেন। লেখক বলেন, এই দেবীর বহু সংখ্যক মৃন্ময়ী মূর্ত্তি মহেন্-জো-দড়ো ও হারাপ্পায় আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলির মাথার দুপাশে প্রায়ই দুটী বাটীর মত লাগানো আছে, কখনো কখনো ধোঁয়ার দাগ লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবতঃ ঐ বাটীতে তেল বা ধূপ জ্বালানো হতো। মূর্ত্তিগুলি যে দেয়াল-ধারে রাখার জন্যেই গড়া, তার প্রমাণ সেগুলোর পিছন-দিকটার কাজ সাম্নে দিকের মতো সাফাই নয়।* এই 'মাতৃ-দেবী' উল্লিখিত শিবের পত্নী কি-না বলা যায় না। তিনি কুমারী হওয়া অসম্ভব নয়; তাঁর স্তন-দ্বয়ের ক্ষুদ্রতা এই অনুমানের পরিপোষক।

পশু-পূজা, বৃক্ষ-পূজা, দুই-ই প্রচলিত ছিল। কবচগুলি তার সাক্ষ্য দেয়। হাতী, বাঘ, গণ্ডার, মোষ, ষাঁড়, কুমীর, ঘড়িয়াল ইত্যাদি নানা জীবের মূর্ত্তি কবচে দেখা যায়।† লেখকের মতে, মিশরে পশু-পূজা উপলক্ষে পূজ্য পশুটীকে শোভা-যাত্রায় বহন করার পদ্ধতি মহেন্-জো-দড়োতেও প্রচলিত ছিল। একই আকৃতিতে বিভিন্ন পশুর সমবায়ও কোনো কোনো কবচে চিত্রিত আছে। তিন প্রকার গাছের পূজা দেখা যায়—অশ্বত্থ, নিম্ব আর acacia জাতীয় একটী বৃক্ষ। সুমেরীয়দের উপাস্য দেবতা 'নর-বৃষ' (man-bull) মহেন্-জো-দড়োর একটী কবচে দৃষ্ট হয়।

এ সভ্যতা কত প্রাচীন তা ঠিক বলা যায় না। অবশ্য প্রস্তর-যুগ অতিক্রম করে' ধাতু যুগের কোনো সময়ে যে সভ্যতাটি গড়ে উঠেছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে; তাঁবা আর 'ব্রোনজ্' (টিন মেশানো তাঁবা) দুই-ই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত ছিল, কিন্তু লোহার ব্যবহার ছিল না। বৈদিক সাহিত্যে লোহার উল্লেখ যজুর্ব্বেদেই প্রথমে পাওয়া যায়। সিন্ধু-সভ্যতা যে pre-Aryan, এ সিদ্ধান্তকে লেখক স্থির সিদ্ধান্ত বলে' মেনে নিয়েছেন। মেসোপোটেমিয়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্য্য সোৎসাহে অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে টেল-আসমারে একটি সিন্ধু-সভ্যতা-প্রসূত কবচ আবিষ্কৃত হয়েছে যাতে

---

* হয়তো এগুলি সেকালের 'দেয়াল-গিরি।' মাত্র একটী বাতি-দান পাওয়া যায়।

† পাখী-পূজার লক্ষণ নেই; কেবল ঘুঘুর পূজা হয়তো ছিল। মিশরের চিত্র-লেখায় পাখী বিশেষ দেবতা বা তদ্বিষয়ক ভাবের সূচক।

হাতী, গণ্ডার ঘড়িয়ালের প্রতিকৃতি দেখা যায়। ডক্টর ফ্রাঙ্কফোর্ট এই আবিষ্কারটী করেছেন; এবং তাঁর মতে, যে স্তরে কবচটী পাওয়া যায় সে স্তর খৃষ্টজন্মের প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের। সিন্ধু-সভ্যতা যে এতই প্রাচীন, এই আবিষ্কারটী হচ্ছে তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ। কিন্তু লেখক স্বীকার করেন: "That it depends on Mesopotamian chronology, and that any modification of the latter must entail a corresponding re dating of the Indus valley finds"।

মিশর, ক্রীট, গ্রীস সুমের্ এসব দেশের সঙ্গে সিন্ধু-সভ্যতার কিছু কিছু যোগাযোগ ছিল, তার প্রমাণও লেখক অল্প-বিস্তর আলোচনা করেছেন। এবং প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের চেষ্টায় জানা গিয়েছে যে ঐ সভ্যতা শুধু হারাপ্পা মহেন্-জো-দড়োতে নয় এদিকে বেলুচিস্থান অপরদিকে শিম্‌লা-শৈলের সন্নিহিত রূপর-নামক স্থানেও প্রসার লাভ করেছিল। দুঃখের বিষয় এই সভ্যতার প্রধান পরিচায়ক যে কবচগুলো আমরা পাই তার লিপিতাংশের পাঠোদ্ধার আজ পর্য্যন্ত হয় নি, যদিও এ কার্য্যে অনেকেই ব্রতী হয়ে রয়েছেন।

আলোচ্য পুস্তকখানি এদেশে সমাদরের যোগ্য; আশা করি, বইটী সুধী পাঠকের মনে অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক করে' সত্য-নির্দ্ধারণের সহায়ক-রূপে মান্য হবে।

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

Wheels and Butterflies—By W. B. Yeats (Macmillan & Co.)

The House of Titans—By A. E. (Macmillan & Co.)

ঊনবিংশ শতকের শেষাশেষি আয়র্ল্যাণ্ডের রাজনৈতিক আন্দোলনের তীব্রতা আয়রিশ সাহিত্যকেও বহুদিকে এবং বহুভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। রাজনৈতিক বিপ্লব ও আন্দোলনের মধ্যে তাহার জন্ম বলিয়া সেই সাহিত্যের সজাগ ও সজ্ঞান ধর্ম্ম নেতিমূলক। কিন্তু মানুষের চিত্ত সৌন্দর্য্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলে তাহার প্রকাশকে কেবলমাত্র প্রতিক্রিয়ার নাস্তিকতার মধ্যে আবদ্ধ রাখা অসম্ভব। তাই সজ্ঞানে আইরিশ সাহিত্য ইংরাজি সাহিত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার প্রতীক মাত্র, কিন্তু রূপসৃষ্টিতে সে সাহিত্য আপনার স্বধর্ম্মের সাধনায় উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই বিশ্বমানবের চিত্ত তাহাকে আপনার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ইয়েটসকে আইরিশ চিত্তের এই রূপসাধনার সর্ব্বপ্রথম না হইলেও সর্ব্বপ্রধান সাধক বলিলে কোনই অত্যুক্তি হয় না, সে সাধনায় এ-ই তাঁহারই বন্ধু এবং সহকর্ম্মী।

বিদ্রোহ কেমন করিয়া স্বরাষ্ট্রে পরিণত হইল, আয়রিশ সাহিত্যের মূলমন্ত্রের আলোচনা করিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজনৈতিক আয়র্ল্যাণ্ড সেদিন বিধ্বস্ত, বিক্ষুব্ধ, তাহার সমাজ-সংগঠনে প্রতিপদে ইংরাজের করচিহ্ন, এমনকি তাহার অর্দ্ধজাগ্রত চিত্ত সম্পূর্ণভাবে ইংরাজের মায়ামন্ত্রে আচ্ছন্ন। দেহে এবং মনে,

বাক্যে এবং ভাবে, চিন্তা এবং কল্পনায় সেদিন আয়রিশ চিত্ত ইংরাজের প্রতিধ্বনি করিয়াই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছিল। ইংলণ্ডেও সেদিন যান্ত্রিকতার জয়জয়কার, আর্থিক সফলতা ও সিদ্ধিতে মদমত্ত ইংরাজ সেদিন বস্তুবিলাসকে বাস্তবতার চরিতার্থতা জ্ঞানে আত্মপ্রসাদে পরিপূর্ণ। তাহারই বিরুদ্ধে তরুণ আইরিশ-চিত্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করিল, ইংরাজের যাহা কিছু গর্ব্বের বিষয়, যাহা কিছু তাহার সাফল্যের চিহ্ন, তাহাকেই অস্বীকার করিয়া আয়রিশ তরুণ বলিল যে আয়র্ল্যাণ্ডের মুক্তি তাহার আপনার ইতিহাসের পুনরুজ্জীবন; তাহার আপনার বিস্মৃত ও অবহেলিত অতীতকে কল্পনার মায়ামন্ত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াই আয়রিশচিত্তের কল্যাণ। তাই পুরাতন আয়র্ল্যাণ্ডের কাহিনী ও রূপকথা, স্বপ্নবিলাস ও অভিলাষকে ঘিরিয়াই আয়রিশ সাহিত্যের জন্ম। বর্ত্তমান ও ঐতিহাসিক অতীতের যত পরাজয়, যত গ্লানি ও লজ্জা সমস্তকেই অস্বীকার করিয়া তাই আয়রিশ-চিত্ত গৌরবান্বিত অতীত ও উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, ইংরাজের সঙ্গে যে তাহার কোনদিন কোনবিষয়ে কোনস্থানে কোন সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, তাহা ভুলিয়া সর্ব্ববিষয়ে অমিশ্র আইরিশিকতাকেই মূলমন্ত্র করিয়া লইল।

অবিমিশ্র রোমান্টিকবাদ তাই এই আইরিশ সাহিত্যের প্রাণমন্ত্র। যেখানেই জাতীয়তাবাদ প্রবল হইয়া ওঠে, সেখানেই রোমান্টিকতার আবির্ভাব ও যথেচ্ছ বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। বিদ্রোহে তাই আইরিশ রোমান্টিক সাহিত্যের আরম্ভ, এবং বহু সাহিত্যিকের জীবনে তাহা বিদ্রোহের যুদ্ধঘোষণা মাত্রই রহিয়া গেল। সত্যিকারের শিল্পী কিন্তু তাহার মধ্যে আপনার আত্মপ্রতিষ্ঠা খুঁজিয়া পান নাই। তাই প্রথম হইতেই ইয়েটসের সাহিত্য সাধনা ধ্বংশ অপেক্ষা সৃজনকে মহত্তর বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল। তাই তাঁহার জাতীয়তাবাদে সঙ্কীর্ণতার কোন ছোঁওয়া লাগে নাই, প্রথম হইতেই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে আপনার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া কোন জাতি কোন দিন বড় হইতে পারে নাই, সমগ্র বিশ্ব ইতিহাসের সমস্ত মানবচিত্তের ঐশ্বর্য্যকে আপন করিয়া লইয়াই জাতির গৌরব। "Plays & Commentaries"র মতন যৌবন বয়সের লেখাতেও এ কথা পরিস্ফুট, তাই বারম্বার তাঁহার সহকর্ম্মীদের তিনি বলিয়াছেন যে যদি গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকে তবে গ্রহণে কোন গ্লানি নাই, এলিজাবেথীয় যুগের ইংরাজ তাই যাহা পাইয়াছে, তাহাকেই আত্মসাৎ করিয়াছে, কিন্তু সেই জন্যই আজিও সে যুগ ইতিহাসের গৌরবের যুগ। ইয়েটসের রোমান্টিকবাদে বিদ্রোহ তাই শেষ কথা নয়। স্থান-কালদেশসভ্যতা নির্ব্বিশেষে তাঁহার সৌন্দর্য্যের মাপকাঠিতে যখনই যাহা ধরা পড়িয়াছে, তাহাকেই তিনি আপনার সাহিত্যের উপাদান স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন।

রোমান্টিক সাহিত্যের সৌন্দর্য্যের প্লাবনের মধ্যে কিন্তু অপূর্ণতার সম্ভাবনা স্বভাবতই নিহিত। প্রাত্যহিক এবং পরিচিত জগৎকে অতিক্রম করিয়া তাহা অপরূপ মায়ালোকের সন্ধানে উন্মুখ, কিন্তু সেই একাগ্রতার ফলেই তাহা একমুখীন বা একদেশদর্শী হইতে বাধ্য। বাস্তবকে লঙ্ঘন করিয়া তাহা কল্পনার জগতে আকাঙ্ক্ষার সিদ্ধি খুঁজিয়া ফেরে। কিন্তু বাস্তবকে অস্বীকার করিবার সে প্রয়াসের ফলে সে সাহিত্য কালে আপনার সত্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। সম্পূর্ণতাই সাহিত্যের প্রাণ, এবং জীবনের সত্যপ্রকাশ করিয়াই সাহিত্য সম্পূর্ণ। তাই রোমান্টিক সাহিত্যের

কল্পনাবিলাস কালক্রমে জীবনের সত্যবিচ্যুত হইয়া পড়ে, এবং সেই বিচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাহিত্যধর্মের হানিও অবশ্যম্ভাবী। অপরূপ সৌন্দর্য্য অনুভূতির সূক্ষ্মতা এবং আবেগের তীব্রতা সত্ত্বেও তখন সে সাহিত্য প্রাণহীন হইয়া পড়ে, মানুষের চিত্ত সে সাহিত্যকে আদর করিতে পারে, তাহার স্বপ্নমদিরার নেশায় আত্মবিস্মৃতি খুঁজিতে পারে, কিন্তু সে সাহিত্যের প্রাঙ্গণে আপনার স্থায়ী বাসগৃহ স্থাপন করিতে পারে না, তাহার অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যের মাদকতার মধ্যে আত্মার তৃপ্তি খুঁজিয়া পায় না। সেইজন্যই রোমান্টিক সাহিত্যে সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বদেশেই চিত্তবৃত্তির প্রবলতার সঙ্গে সঙ্গে আত্মার মুমূর্ষতার সূচনাও লুক্কায়িত। সাহিত্যিক প্রতিভার রচনায় সে দৌর্ব্বল্য হয়তো সম্পূর্ণ আত্মবিকাশ করেনা, কিন্তু প্রতিভাশালী সাহিত্যিককে পর্য্যায়ভুক্ত করিলে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয়ও দেওয়া হয় না।

আয়রিশ সাহিত্যের বেলায়ও ঠিক তাহাই হইয়াছে। প্রতিভাশালী দুয়েকজন সাহিত্যিককে বাদ দিলে জাতীয়তাবাদী রোমান্টিক আয়রিশ লেখকদের অধিকাংশের মধ্যেই এই রোমান্টিকবাদ বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে অভ্যাস মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাদের রচনায় তাই রূপসৃষ্টির সাধনা নূতনত্বের মোহে চাপা পড়িয়া যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রকাশভঙ্গিতে চিত্ত চমৎকৃত হয় বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের সন্ধান পায় না; কচিৎ সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইলেও সে সৌন্দর্য্যের ক্ষণভঙ্গুর দীপ্তিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এ কথা অনেকাংশে এ-ই'র রচনার পক্ষেও সত্য। মানবচিত্তের গভীরতায় মুহূর্ত্তের জন্য যে বিশ্বাতীত জ্যোতি ফুটিয়া উঠে সেই অবিনশ্বর মুহূর্ত্তকে কাব্যালোকে বন্দী করিবার ফলে তাঁহার অনেক রচনাই ভাস্বর, সে সমস্ত রচনার সম্মুখে চিত্ত আপনা হইতেই বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া উঠে। তাই তাঁহার কাব্যগগনে আত্মকেন্দ্রিক নক্ষত্রের দীপ্তি বিচ্ছিন্ন, তাহাদের পরিসর অল্প, আলোকের উজ্জ্বলতা অধিক নহে, কিন্তু আপনার মধ্যে তাহারা পরিপূর্ণ।

নক্ষত্রলোকের বিচ্ছিন্ন দীপ্তিতে সূর্য্যালোকের বিপুল প্রসারের কোন আভাস মেলে না, তাই এ-ই'র রচনায়ও জীবনের প্রসার ও বিস্তারের পরিচয় আমরা পাই না। সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতা যতই গভীর হউক না কেন, মানব হৃদয়ের অনন্ত বৈচিত্র্যের স্থান তাহার ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে মেলে না, তাই কেবলমাত্র মুহূর্ত্তের অভিজ্ঞতার মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে অবশেষে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে, জীবনের নিষ্ঠুরতা ও কঠিনতা, তাহার নির্ম্মম প্রবাহের প্রবলতার জন্য তৃষিত হইয়া পড়ে। এ-ই'র রচনার অপার্থিব সৌন্দর্য্যের মধ্যেও চিত্ত তাই ক্লান্ত হইয়া পড়িতে চাহে, হয়তো এ-ই'র নিজের চিত্তও সেই অবিমিশ্র সৌন্দর্য্যের কারাপ্রাচীরের বাহিরে আসিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। আলোচ্য গ্রন্থে তাই আমরা এ ই'র রচনার একটী নূতন দিকের পরিচয় পাই। অভিজ্ঞতার অমর মুহূর্ত্তগুলিকে গ্রথিত করিবার সাধনা পরিত্যাগ করিয়া তিনি এবার জীবনের প্রসার ও বৈচিত্র্যকে তাঁহার কাব্য-সাধনায় প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন, ফলে রক্তমাংসের নরনারীর সুখদুঃখই এবার তাঁহার কাব্যলোকে ঝঙ্কার তুলিয়াছে। পরাজয় ও তাহার গ্লানি, প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় কেমন করিয়া জীবনের নবীন ঔজ্জ্বল্য দিনে দিনে ম্লান হইয়া আসে,

তরুণ দিনের সমস্ত আদর্শই অভ্যাসের জড়তায় প্রাণহীন হইয়া পড়ে,—জীবনের সেই চিরপরিণতির ইতিহাসই কাব্যগ্রন্থখানির নামকবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। নর-নারীর প্রেম কেবলমাত্র প্রীতিপ্রদ ও সুখদায়ক নহে, প্রেমের অবসানে চিত্তের বিক্ষোভ ও আত্মবিদ্রোহ জাগে, সন্দেহের তীব্র জ্বালা ও ঈর্ষার বিষে হৃদয় তিলে তিলে দহিয়া মরে—এ-ই'র পূর্ব্বেকার রচনায় জীবনের এই অন্ধকার দিকের কোন ইঙ্গিত মেলে কিনা সন্দেহ।*কিন্তু Dark Ladyতে মানবচিত্তের সেই আত্মঘাতী বিরোধই মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিয়াছে। এতদিনে তাই তাঁহার কাব্যরাণী অতীন্দ্রিয় জগতের মায়া-সৌন্দর্য্যের বেড়া পার হইয়া আমাদের পরিচিত জগতের আলো-অন্ধকার হাসিকান্নার প্রাঙ্গণে আসিয়া মানুষীর বেশে দাঁড়াইয়াছে।

এ-ই'র রচনাভঙ্গি কোনদিনই বিপ্লবী নহে, ধ্রুপদী সাহিত্যিকদের রচনা-রীতির প্রভাব তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টিতে পরিস্ফুট। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে এই ধ্রুপদী রচনাভঙ্গি ইঙ্গিত ও প্রতিধ্বনির সৌন্দর্য্যে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। House of Titans পড়িতে পড়িতে প্রতিপদে তাই Keats-এর কথা মনে হয়, তাঁহার প্রভাব যে কেবলমাত্র বিষয়বস্তুকেই রূপ দিয়াছে, তাহা নহে, রচনাভঙ্গি এমন কি শব্দ-সংযোজনায়ও তাঁহার ছায়া পরিস্ফুট। Dark Lady-তেও ঠিক তেমনি ভাবে প্রতিপদে Shakespeare'র প্রতিধ্বনিতে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সে প্রতিধ্বনি কেবলমাত্র বিষয়বস্তু ও রচনাভঙ্গিতে নহে, Shakespeare'র চরিত্র-সৃষ্টি ও ধ্বনিসঙ্গীতও আমাদের কানে বাজিতে থাকে।

ইয়েটসের প্রতিভার বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তাঁহার রচনায় কল্পনাবিলাসের চূড়ান্তপ্রকাশও আপনার অন্তর্নিহিত জীবনশক্তির প্রাবল্যে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। তাই ইয়েটসের রচনা কখনও ক্ষীণজীবী নহে, রোমান্টিক সাহিত্যের সূক্ষ্মতা ও সৌকুমার্য্যের মধ্যেও তাহার চিত্তবৃত্তির প্রবলতা অনুভব করা যায়। রোমান্টিক-বাদ তাই ইয়েটসের পক্ষে কাব্যবিলাস মাত্র নহে, তাঁহার কাব্যরচনার তাহাই স্বধর্ম। তাই তিনি প্রথম হইতেই আপনার কাব্যক্ষেত্রকে প্রসার করিতে চাহিয়াছেন। স্থান, কাল বা দেশ নির্ব্বিশেষে সৌন্দর্য্যের সন্ধানে তাঁহার কাব্যের অভিযান। জাতীয়তাবাদের সঙ্কীর্ণতাও তাই তাঁহাকে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই, কাব্যের সত্য সাধনায় তিনি সমস্ত সঙ্কীর্ণতার আহ্বানকে অবহেলা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

সত্যের সেই সাধনায় তাঁহার কাব্যপ্রতিভা তাই সহজেই কল্পনাবিলাসকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। পরিণত বয়সের রচনা Towerএ মানবতার এই সাধনা যেমন স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে, আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যের আর কোথাও তাহার তুলনা মেলে কিনা সন্দেহ। জীবনের এই বিপুলতা ও অন্ধ নিয়তির অনিবার্য্য গতির অনুভূতিতে আলোচ্য গ্রন্থখানিও পরিপূর্ণ, তাহার নামের সার্থকতাও সেইখানে। চক্রের আবর্ত্তনে প্রজাপতি নিষ্পিষ্ট হইলে সমস্ত সৌন্দর্য্য সত্ত্বেও তাহার মৃত্যু যেমন অবশ্যম্ভাবী, কালপ্রবাহের প্রগতিতে প্রতিভা, রূপ ও মহত্ত্ব লইয়া মানুষের মৃত্যুও তেমনি নিশ্চিত। ট্র্যাজেডীর মর্ম্মকথা দুঃখ নহে, সমস্ত প্রয়াসের অনিবার্য্য অবসানেই জীবনের প্রকৃত ট্র্যাজেডী। জীবনের এই ট্র্যাজেডীর অনুভূতিতে তাই আলোচ্য গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ।

চারিখানি নাটিকায় গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ, কিন্তু সমস্ত নাটিকাগুলিরই মূলমন্ত্র এক। সপ্তদশ শতাব্দীকে প্রতিভার যুগ বলা হয়, বুদ্ধির এমন মুক্তি ইয়োরোপের ইতিহাসে অন্য কোন যুগে হইয়াছে কিনা সন্দেহ। সেই বুদ্ধিউদ্ভাসিত যুগেও বুদ্ধিতে Swift বোধ হয় অতুলনীয়। কিন্তু তাঁহার সমস্ত প্রতিভার অবসানে হতাশ প্রেমিকের ব্যর্থতা, উন্মাদের জীবনের বিফলতা। তিনশত বৎসর পরে কেবল তাহার স্মৃতিই রহিয়াছে। যে ঘরে Swift'র জীবন-নাটিকা প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই ঘরে অধ্যাত্মবাদীর গবেষণায় কেবল মাত্র তাহারই কয়েকটী ছিন্ন খণ্ড ভাসিয়া ওঠে।

অপর একটী নাটিকার মূলসুর রূপ ও প্রেমের ভঙ্গুরতা। অবিনশ্বর ও অনন্ত প্রেমের শপথে প্রণয়ের সুরু, কিন্তু অবশেষে প্রেমলাভের ভরসাটুকুতেও বিসর্জ্জন দিয়া আত্মার শান্তি। এমনি করিয়া জীবনের যাত্রাপথের পাথেয় পথ ফুরাইবার আগেই ফুরাইয়া আসে।

মানুষের সীমাবদ্ধ চেষ্টার চারি পার্শ্বে যে বিপুল ও অসীম শক্তিসমূহের লীলা, তাহারই আসন্ন অনুভূতিতে নাটিকাগুলি ভারাক্রান্ত। নিয়তির এই দ্বন্দ্ব প্রকাশে তাহাদের জন্ম বলিয়াই বোধ হয় ইয়েটস চরিত্রসৃষ্টির দিকে মনোযোগ দেন নাই। চরিত্রগুলি রক্ত মাংসের মানুষ নহে, বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে যে সমস্ত অদৃশ্য শক্তির লীলা চলিয়াছে, তাহারা তাহাদের প্রতীক মাত্র।

হুমায়ুন কবির

Men Without Art—By Wyndham Lewis, (Cassell).

Make It New—By Ezra Pound, (Faber & Faber).

প্যারিস্ কম্যুন্-এর তাণ্ডবে ধৈর্য্য হারিয়ে, গুস্তাভ্ ফ্লোবের স্বাবলম্বী শিল্পের আইভরি মিনারে আত্মরক্ষার আয়োজন করেছিলেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছিলো যে সে-তনুবাত শিখরে হিমের প্রকোপ যদিও প্রচণ্ড, তবু পারিপার্শ্বিক গ্রহ-নক্ষত্র সেখানে অম্লান, জনতার পাশব চীৎকার সেখানে সুদূরপরাহত। কিন্তু গণতন্ত্রে বীতশ্রদ্ধ হলেও ফ্লোবের রাজতন্ত্রকে সংশয়ের চক্ষে দেখতেন; এবং বর্ত্তমানের সংসর্গে তিনি যেমন বদ্ধমূল থাকতে পারেননি, তেমনি ভূত-ভবিষ্যতের স্বপ্নও তাঁকে শান্তি দেয়নি। সেইজন্যেই কলাকৌশলের অতখানি বহিরাশ্রয়িতা সত্ত্বেও তিনি ধ্রুপদী লেখকদের শেষ বংশধর নন, অত্যাধুনিক খেয়ালী সাহিত্যের অগ্রদূত; সেইজন্যেই তিনি নিষ্কাম অথচ বৈনাশিক, নির্লিপ্ত বটে, কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক আখ্যার অযোগ্য; সেইজন্যেই তাঁর নিজের সুবুদ্ধি যদিও সুবিখ্যাত, তবু তাঁর মন্ত্রশিষ্য মোপাসাঁ-র মৃত্যু উন্মাদরোগে। কারণ স্বপ্রাধান্যের পরিসমাপ্তি প্রজ্ঞাপারমিত সোহংবাদে যেখানে সঙ্গতি অথবা প্রকৃতিস্থতা নিরর্থ ও নিষ্প্রয়োজন; এবং যুক্তির ধর্ম্ম যেহেতু একাধিক ব্যক্তির মধ্যে ঐক্যস্থাপন, তাই এক ও অদ্বিতীয় ভগবানের মতো নীট্শে-র অতিমানুষও ন্যায়বিচারে উদাসীন। তাহলেও এ-যুগের রূপকার ফ্লেবের-এর পদাঙ্কে চলতে বাধ্য, তাঁর আদর্শ ছাড়া আমাদের হয়তো

গত্যন্তর নেই। কেননা সম্বন্ধমাত্রেই আদান-প্রদানের ফল, এবং শিল্পের পক্ষে সমাজ-শোভনতা যতখানি আবশ্যক, সমাজের শিল্পশোভনতা ততোধিক অপরিহার্য্য। সুতরাং এমন সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই পোষণীয় যে শুধু আত্মাভিমানী কবিরাই আজ সংসার-বিবাগী নয়, সঙ্কীর্ণ সংসারও তাদের অপাংক্তেয় করেছে। এই ব্যবধান দিন দিন এ-রকম দুস্তর হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে অচির ভবিষ্যতে সভ্যসমাজ থেকে শিল্পের চির-নির্ব্বাসন প্রায় নিঃসন্দেহ।

অনেকের মতে সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে উক্ত বিসংবাদ এমনি সনাতন ও সার্ব্বভৌম যে এ-ক্ষেত্রে মধ্যপথের কল্পনাও হাস্যকর; এবং উইণ্ড্‌হ্যাম্ ল্যুইস্ বিশদ বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে অধিকাংশ আপাতনিরপেক্ষ লেখকই ভিতরে ভিতরে পক্ষপাতদোষে দুষ্ট। কিন্তু স্বয়ং ল্যুইস্ ছাড়া অন্যান্য সাহিত্যিক যদিচ এক বা অপর দলের অন্তর্ভুক্ত, তবু মুখে সে-কথা মানতে সকলেই অসম্মত; এবং এলিয়ট্-আদি ঐতিহ্যনিষ্ঠেরা সমালোচনার সময়ে যতই সমাজসেবা শেখান না কেন, রচনার বেলায় তাঁরা প্রত্যেকেই সেই সমাজকে কেবল বিদ্রূপবাণ হানেন। অবশ্য এর জন্যে ল্যুইস্ তাঁদের নিন্দনীয় ভাবেন না। কারণ ক্রিশ্চানী হিতোপদেশে ভক্তি না থাকলেও, আদম-কৃত আদিম পাতকে তাঁর অগাধ বিশ্বাস; এবং তিনি যদিও জানেন যে গ্রীক শিল্পের দৃষ্টান্তে আর্টে জীবনের প্রতিবিম্ব খুঁজতে গিয়েই পশ্চিমী ললিতকলা আজ যথাসর্ব্বস্ব খুইয়েছে, তবু মানুষ-সম্বন্ধে গ্রীক নাটকের খেদোক্তিতে তাঁর সমর্থন আছে। ল্যুইস্-এর বিবেচনায় মানুষ অভিশপ্ত, তার সমাজে শৃগালের শাঠ্যে সিংহের নিপাত অবশ্যম্ভাবী, তার গুণ গাওয়া যেমন গর্হিত, তাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া তেমনি প্রশংসনীয়। সেইজন্যেই ব্যক্তি হিসেবে অর্ভিং ব্যাবিট্ তাঁর কাছে মর্য্যাদা পান বটে, কিন্তু ব্যাবিট্-প্রবর্ত্তিত মনুষ্যধর্ম্ম তাঁর চক্ষুশূল। কেননা মানুষের ধর্ম্ম বলতে তিনি বোঝেন অনাচার আর অত্যাচার; তাই মানুষের পূজা দূরের কথা, তার মনোরঞ্জনও তাঁর অসহ্য লাগে। কিন্তু আধুনিক লেখকেরা এমনি কাপুরুষ যে 'বিশ্ববৈরী' ল্যুইস্-এর অনুসরণে তাঁরা পশ্চাৎপদ। দুর্ব্বৃত্তের দুরভিসন্ধি আবিষ্কারের ভার ফ্রয়েডী ড্রেন-পরিদর্শকের উপরে ছেড়ে দিলে পাছে তাঁদের নিজস্ব আত্মপ্রসাদের ফাঁকি ধরা পড়ে, এই ভয়ে তাঁরা শুধু রূপসৃষ্টিতে তৃপ্ত হননা, অমূলক মনস্তত্ত্বের পৃষ্ঠপোষণে মানুষী স্খলন-পতন-ত্রুটির ব্যাপদেশ সন্ধানেও তাঁরা বদ্ধপরিকর। কিন্তু লেখক আর পাঠক যেকালে ভিন্ন স্তরের জীব, তখন তাদের মধ্যে সন্ধির আশাও বিড়ম্বনা। কাজেই ল্যুইস্-এর বিচারে শতকরা নিরেনব্বই জন লেখকই হয় রূপকারী বিবেকে বঞ্চিত, নয় ঘরের শত্রু বিভীষণ, এবং সমগ্র আধুনিক সাহিত্যই জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অপলাপে পরিপূর্ণ।

তার মানে এ নয় যে ল্যুইস্ কলাশুদ্ধির পুরোধা। বরং উল্টো দিকেই তাঁর ঝোঁক; এবং তিনি শুধু রিচার্ড্‌সী কাব্যার্চ্চনাকেই আক্রমণ করেননি, হেন্‌রি জেম্‌স্-এর সৌন্দর্য্যবিলাসও তাঁর বিদ্বেষের বস্তু। কারণ ল্যুইস্-এর মতে জেম্‌স্-এর শিল্পপ্রাণতা স্বায়ত্তশাসনের ধার ধারেনা, তাঁর বৈদগ্ধ্য নিরুপদ্রব জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপলক্ষ্য মাত্র। হয়তো সেইজন্যেই এ-যুগের উন্নাসিক কাব্যবিবেচকদের কাছে জেম্‌স্-এর অত প্রতিপত্তি। সেই স্বদেশপলাতক স্নবের মতো আমাদের অন্তঃপ্রকৃতিও নারী-

সুলভ ; তাই আজকালকার সুকুমার বৃত্তি যুক্তিনির্ভর তত্ত্বে, বুদ্ধিপ্রসূত রাজনীতিতে, সঙ্গতিসাধক শিল্পে আর আরাম পায় না. এ-কালের উদ্বাস্ত দৃষ্টিতে ছদ্ম ঐতিহ্যের নির্ব্বিঘ্ন গড্ডলিকাই অগতির গতি। এই মনোভাবের সঙ্গে উনিশ শতকের শেষ দশার সাদৃশ্য এত সুস্পষ্ট যে ল্যুইস্-ও, মারিও প্রাৎস্ এর নির্দ্দেশে, অধিকাংশ আধুনিক লেখককেই অস্কার ওয়াইল্ড্ প্রমুখ 'সয়তানী' বিকৃতচেতাদের সগোত্র বলতে প্রস্তুত। এ অনুমান যদি মিথ্যাও হয়, তবু ইদানীকার ক্লাসিক্ হাল-চালে তাঁর হাসি আসে। কারণ যে-পরিগ্রহণ প্রাচীন সাহিত্যের পরম সম্পদ, তাতে অর্ব্বাচীনেরা নিতান্ত নিঃসম্বল, দিনগত পাপক্ষয় তাঁদের ধাতে সয়না ব'লেই তাঁরা ফ্রেস্‌ৎ-এর শুচিগ্রস্ত অন্তর্দ্দর্শনের অন্ধ ভক্ত। অবশ্য ল্যুইস্ অস্বীকার করেন না যে পূর্ব্বসূরীদের উদাহরণ-ব্যতিরেকে শিল্পাভ্যাস অসম্ভব। কিন্তু আদর্শের মূল্য-বিচারে তিনি বর্ষগণনার পক্ষপাতী নন, তাঁকে টানে শুধু মানদণ্ডের সময়োপ-যোগিতা, এবং তাঁর বিবেচনায় বর্ত্তমান মানুষ যেহেতু বীভৎসরসেই উৎস, তাই সাময়িক সাহিত্যকে তিনি পেটার-এর ছুৎমার্গে চালাতে চাননা, সুইফ্ট্-প্রবর্ত্তিত ব্যঙ্গরচনাই তাঁর বাঞ্ছিত পদ্ধতি। অর্থাৎ ল্যুইস্ বিশ্বাস করেন যে মানুষ দুর্গ্রহের ঝষ্টি নিয়েই জন্মায়, আত্মচরিতকে ট্র্যাজিডির অতিরঞ্জনে বাড়িয়ে তোলার সাধ যদি বা তার থাকে, তবু সে সাধ্যে সে একেবারে বঞ্চিত। কাজেই পরবশ মনুষ্য জীবন ল্যুইস্ এর কাছে পুতুল নাচের মতো একটা যান্ত্রিক প্রহসন মাত্র, তার মধ্যে অভিপ্রায়ের অন্বেষণ কেবল পণ্ডশ্রম নয়, অমঙ্গলকরও বটে।

উপরে যা বললুম, তাতে যুক্তিসঙ্গতির চেয়ে স্বতোবিরোধই হয়তো বেশি। কিন্তু সেজন্যে সমালোচক ততটা দায়ী নয়, যতটা দায়ী স্বয়ং গ্রন্থকর্ত্তা, কারণ 'মেন্ উইদাউট্ আর্ট্'-এর মুখবন্ধে ল্যুইস্ যদিও সাড়ম্বরে ঘোষণা করেছেন যে সাম্প্রতিক সাহিত্যাচার্য্যদের কুৎসা রটানোতে তিনি অনিচ্ছুক, লেখকবিশেষকে নিদর্শন হিসেবে ধ'রে সাহিত্য সম্বন্ধে কতকগুলো সামান্য সত্যে পৌছনোই তাঁর উদ্দেশ্য, তবু কার্য্যত সে-গন্তব্যে তিনি যেতে পারেন নি, ছিদ্রান্বেষণের কুটিল পথে একাধিকবার দিশাহারা হয়েছেন। তাহলেও বইটি ভাবুকমাত্রেই অবশ্যপাঠ্য, কারণ ল্যুইস্-এর মন্তব্য প্রামাণ্য না-হলেও প্রণিধেয়, এবং তাঁর বক্তব্যে তর্কের অবকাশ আছে বটে, কিন্তু শুভবুদ্ধির অভাব নেই। পক্ষান্তরে ল্যুইস্ যেকালে দার্শনিক নন, মুখ্যত শিল্পী, তখন তাঁর সিদ্ধান্তে ব্যাপ্তি খোঁজা অনুচিত। তিনি যে লোকপ্রসিদ্ধিতে ভয় না-পেয়ে সর্ব্বপূজ্য মৃন্ময় মূর্ত্তিগুলির সাক্ষাৎকারে এগিয়েছেন. শুধু এই দুঃসাহসের জোরেই আলোচ্য পুস্তকখানি স্মরণীয়। কিন্তু এ-ছাড়া আরো অনেক গুণে 'মেন্ উইদাউট্ আর্ট্' ঐশ্বর্য্যবান। ল্যুইস্ এর রচনারীতি সত্যই উপভোগ্য, তাঁর শ্লেষবাণের প্রায় প্রত্যেকটিই লক্ষ্যভেদী, তাঁর ধীশক্তি আশ্চর্য্য রকমের সচেতন। তাঁর ভক্তেরা তাঁকে ড্রাইডেন্-এর সমকক্ষ ব'লে ভেবে থাকেন। ল্যুইস-এর সম্প্রতি প্রকাশিত পরিহাস-কবিতা পড়ে, এ-দাবীতে সায় দেওয়া যদিও শক্ত, তবু বাদবিতণ্ডায় তিনি বারম্বার যে-দক্ষতা দেখিয়েছেন, তা অষ্টাদশ শতকেরই যোগ্য। উপরন্তু 'মেন্ উইদাউট্ আর্ট্'-এর মূল প্রতিপাদ্যের আমি সমর্থন করি। ল্যুইস্-এর মতোই, শিল্প আমার অবসরবিনোদনের সাথী নয়, চিত্তশুদ্ধির সহায়। তাই আমার নিকষেও বিদূষকের গৌরব বন্দীর অপেক্ষা

অধিক। আজকের জগতে যারা হাসতে জানে না, তারা তো শেষ পর্য্যন্ত কাঁদবেই, এমন-কি মতিভ্রান্তিও হয়তো তাদের অনিবার্য্য বিধিলিপি।

"মেন্ উইদাউট্ আর্ট্"-এর অভিব্যাপ্ত দুরুক্তি থেকে কেবল একজন নব্য লেখক অল্পে অব্যাহতি পেয়েছেন, এবং তিনি হচ্ছেন এজ্রা পাউণ্ড্। কিন্তু এই লোভনীয় সম্মান পাউণ্ড্-এর প্রাক্তন সুকৃতির পুরস্কার নয়, সেজন্যে তাঁর ইহলীলার বিশৃঙ্খলাই ধন্যবাদার্হ। যে-জীবন্মুক্তিকে ল্যুইস্ মনীষার তাম্মাত্র বলেছেন, অনেকে পাউণ্ড্-এর মধ্যে তার পরাকাষ্ঠা দেখেন। কারণ পাউণ্ড্ ভুলেও কখনো প্রিয়চিকীর্ষার পথে চলেন নি; পঞ্চাশোর্দ্ধে পৌঁছেও তিনি আজ উদ্‌ভট আর উৎকটের আকর্ষণে আবিষ্ট; পরের মুখে ঝাল খাওয়ায় তাঁর এত আপত্তি যে 'এ বি-সি অফ্ রীডিং'-নামক পুস্তকে তিনি চাসার-কে ঠেলে তুলেছেন শেক্‌সপীয়র-এর উপরে। শুনেছি ইংরেজীর চেয়ে চীনভাষাতেই তিনি বেশী ব্যুৎপন্ন, স্বদেশের চেয়ে ত্রুবাদুরদের জন্মভূমির সঙ্গে অধিক পরিচিত, তর্কযুদ্ধে মসিব্যয়ে ততটা অভ্যস্ত নন, যতটা সিদ্ধহস্ত অসিচালনে। কিন্তু তাহলেও তাঁর সম্বন্ধে বাতুল-বিশেষণটা শব্দের অপপ্রয়োগ, তিনি যথার্থই প্রতিভাবান। পাউণ্ড্ ইদানীন্তন কাব্যকলার উদ্ভাবক এবং আবহমান রচনারীতির অকৃপণ গুণগ্রাহী; তাঁর সুমন্ত্রণায় শুধু অপরিণত শিল্পীরাই উপকৃত হননি য়েটস্-এর মতো আত্মস্থ কবিও সে-প্রভাবের মূল্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। অবশ্য তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা সন্দিহান, কিন্তু সে-বিদ্যানুরাগের বিস্তার সর্ব্ববাদিসম্মত; এবং নানা দেশের গদ্য-পদ্যের যে সমস্ত অনুবাদ তিনি এতকাল ইংরেজ পাঠককে উপহার দিয়ে এসেছেন, তাতে যদিও ভাষাতত্ত্ববিদের মন ওঠে না, তবু তার প্রত্যেকটিই রসোত্তীর্ণ। পাউণ্ড্ সমালোচক হিসেবেও নমস্য। সত্য বটে তাঁর মত পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুর মতোই অস্থির, তিনি নিশ্চয়ই নিন্দা প্রশংসা দুয়েতেই শতমুখ, তাহলেও এলিয়ট্, জয়েস্, ল্যুইস্ ইত্যাদি সাহিত্যরথীরা পাউণ্ড্-এর আবিষ্কার। সুতরাং তাঁর রুচি অমোঘ; যে-কাব্যজিজ্ঞাসার দ্বারা ভাবি-কথন সম্ভব, তার একদেশদর্শিতা বাহ্য ও নগণ্য।

কিন্তু পাউণ্ড্-এর কল্যাণেই ল্যুইস্-এর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটলেও, এই দুই দিক্‌পালের মধ্যে আকাশ-পাতালের তফাৎ, এবং গুরু-শিষ্যের প্রকৃতিগত প্রভেদ সুপ্রকট হেন্‌রি জেম্‌স্-প্রসঙ্গে উভয়ের মতদ্বৈতে। অবশ্য পাউণ্ড্-এর বিচারেও জেম্‌স্ অনবদ্য নন। কিন্তু ল্যুইস্ যেখানে তাঁর বিরুদ্ধে গণমনোভাবপোষণের অভিযোগ আনেন, সেখানে পাউণ্ড্ তাঁকে দোষ দেন আভিজাতিক নিরাসক্তির জন্যে। কারণ পাউণ্ড্ 'এবষ্ট্র্যাক্ট্ প্যাটার্ন্'-এ বা বিষয়বিবিক্ত রূপকল্পে আস্থাহীন; হয়তো পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁর অনুযোগ নেই; কিন্তু বিগ্রহের মধ্যে তিনি বিগ্রহাতীতের আবির্ভাব খোঁজেন। কাব্যের অভিধাকে রসাত্মক বাক্যে আট্‌কে রাখতে তাঁর সাময়িকতায় বাধে বটে, কিন্তু কবিতা যে আবেগপ্রভব, তা তিনি নিঃসঙ্কোচে মানেন। সেই-জন্যেই তাঁর বিশ্বম্ভর অনুকম্পা থেকে মালার্মে বাদ পড়েছেন; সেইজন্যেই ভালেরি-কীর্ত্তিত প্রতীকের স্বাধিকারস্বীকারে তিনি অক্ষম; সেইজন্যেই হৃদয়বান রেমি দ গুর্ম তাঁকে আজও বিস্ময়বিমুগ্ধ ক'রে রেখেছেন। কারণ অর্জ্জিত ক্রিয়ায় আধুনিকদের নেতৃস্থানীয় হলেও পাউণ্ড স্বভাবত ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ-

পন্থী ; এবং তাঁর রচনায় অভিব্যক্তি যদিও সমাদৃত, তবু তাঁর কাব্যের মুখ্য উপজীব্য অভিজ্ঞতা। তবে হাল আমলে কোল্‌রিজী দীর্ঘসূত্রতার সুযোগ নেই ; আজকের দিনে বাকৃজীবন নাবিক যেমন দুর্লভ, গন্তব্যবিস্মৃত বরযাত্রীও তেমনি বিরল ; এটা পরিভাষার যুগ, সংসারের বৈচিত্র্য এখন এত বেড়ে গিয়েছে যে সাঙ্কেতিক ভিন্ন তার সময়োচিত প্রকাশ অসাধ্য। কাজেই সংক্ষিপ্ততার খাতিরে পাউণ্ড্‌-ও আলেখ্যপ্রধান কাব্য লিখতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তাঁর শব্দচিত্র নিরালম্ব নয়, জীবন্ত উপলব্ধির অভিজ্ঞান ; তাঁর অলঙ্কারমাত্রেই রূপক। কারণ পাউণ্ড্‌ বিশুদ্ধ শিল্পের লোকোত্তর জয়যাত্রায় পরাঙ্মুখ ; পদার্থবিদের মতো তিনিও ইন্দ্রিয়ার্থপ্রসিদ্ধির দাস ; এবং বিজ্ঞান যেমন অভূতপূর্ব্ব ঘটনার ব্যাখ্যায় উপমিতির শরণ নেয়, তিনি তেমনি তাঁর অপরূপ অভিজ্ঞতার বিবরণে অগত্যা উপমা-উৎপ্রেক্ষাকে প্রশ্রয় দেন। অর্থাৎ পাউণ্ড্‌-এর মতে কাব্যগত চিত্রকল্প মনোরাজ্যের গূঢ়ৈষণাগ্রন্থির সমতুল্য ; এবং ঐ শেষোক্ত ক্ষেত্রে যে-অনুভূতি-সংমিশ্রণ দেখা যায়, কবির ভাবচ্ছবিতে তারই আভাস মেলে ব'লেই পাউণ্ড্‌ 'ইমেজিষ্ট্‌'।

উল্লিখিত মতামতের ল্যুইসী টীকা বানানো সহজ, এবং মূল প্রবন্ধাবলী না হোক, 'মেক্‌ ইট্‌ ন্যু'-এর প্রক্ষিপ্ত উক্তিগুলি অহঙ্কৃত। কিন্তু ম্যাথ্যু আর্নল্ড্‌-এর ফিলিষ্টিয়া-ভীতির মতো পাউণ্ড্‌-এর লোকহিংসাও আত্যন্তিক হিতৈষণার ফল, তাতে আত্মম্ভরিতার নামগন্ধ নেই। আজকালকার কোনো কবি যদি মরমী সমর্পণের মানে বুঝে থাকেন, তবে তিনি 'ক্যাণ্টোজ্‌'-প্রণেতা এজ্রা পাউণ্ড্‌। কারণ ওই অসমাপ্ত মহাকাব্য বিশ্বমানবের জীবনেতিহাস, তার কোনো নায়ক নেই, এবং তাতে ব্যক্তি দূরের কথা, বিভিন্ন দেশ ও কালের সীমাসন্ধি সুদ্ধ পাউণ্ড্‌ মানেন নি। তিনিও স্পেংলার-এর মতো প্রগতিবিমুখ, তাঁর চক্ষেও সভ্যতা ঘূর্ণাবর্ত্তের সরূপ, এবং এই ভ্রমিজাত সমধর্ম্মী বুদ্‌বুদ্‌গুলোকেই তিনি ব্যক্তি ব'লে ভাবেন। তাই 'ক্যাণ্টোজ্‌'-এ ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য গ্রাহ্য হয়নি, এবং রিনেসেন্স্‌-এর ষড়যন্ত্রী ইটালিয়ানরা সশরীরে মার্কিনী বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। এই দিক থেকে 'ক্যাণ্টোজ্‌'-এর সঙ্গে 'ওয়েষ্ট্‌ ল্যাণ্ড্‌'-এর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এলিয়ট্‌-এর প্রসঙ্গই শুধু অনাত্ম, এবং পাউণ্ড্‌ বিষয় ও ব্যঞ্জনা দুয়েতেই নৈর্ব্যক্তিক। কারণ তাঁর দার্শনিক দৃষ্টি তো স্পেংলার-এর অনুবর্ত্তী বটেই, উপরন্তু অভিজ্ঞতার স্বরূপ-সম্বন্ধে তিনি ক্রোচের শিষ্য। হয়তো পাউণ্ড্‌-ও মনে করেন যে অভিজ্ঞতা নিজের অভিব্যক্তি নিয়েই লোকসমক্ষে আসে, এবং ভাষার দারিদ্র্যে ভাবের অকিঞ্চিৎকরতাই সূচিত হয়। সম্ভবত সেই-জন্যেই তিনি তাঁর মহাকাব্যের প্রকাশিত চল্লিশ সর্গ কেবল অনুবাদ আর উদ্ধারের সাহায্যেই রচেছেন। মানুষ যখন অভিজ্ঞতার কল্যাণেই স্মরণীয়, তখন ব্যক্তিত্ব একটা উপসর্গ মাত্র ; এবং বর্ণনা যথাযথ না-হলে যেহেতু অভিজ্ঞতার মানহানি ঘটে, তাই কবির পক্ষে স্বকীয়তাসম্পাদন দোষাবহ ; তার কর্ত্তব্য অনুকরণ, অথবা প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবে, সাক্ষী-সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা। এইখানেই এলিয়ট্‌-এর সঙ্গে পাউণ্ড্‌-এর বৈষম্য। এলিয়ট্‌ পরিণামবাদী, ক্ষণপ্রাণ অভিজ্ঞতাকে কর দিতে তিনি কুণ্ঠিত, তাঁর পৃথিবীর মানদণ্ড ধর্ম্মের শাশ্বত নগাধিরাজ। অতএব আবেগের চাঞ্চল্যকে তিনি সইতে পারেন না, তাঁর কাছে মনুষ্যজীবন ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই

নয়, মরুভূমির পরপার থেকে তাঁকে ডাকে শুধু সৃষ্টি ও সমালোচনার তীর্থসঙ্গম। পাউণ্ড্ সে-মরীচিকার পিছনে ছুটতে রাজী নন; তাই তাঁর আর এলিয়ট্-এর মধ্যে বিচ্ছেদ ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

অবশ্য পাউণ্ড্ আলোচ্য পুস্তকে এত কথা বলবার সময় পাননি; এবং 'মেক্ ইট্ ন্যু'-এর বিষয়সূচী এমনি বিপ্রযুক্ত যে তার পৃষ্ঠায় কোনো সুচিন্তিত মতবাদের প্রতিষ্ঠা বা খণ্ডন দুষ্কর ব্যাপার। উপরন্তু অন্যান্য ভূয়োদর্শীর মতো পাউণ্ড্-ও নৈয়ায়িক-র উপরে রুষ্ট; তাঁর বিশ্বাস তিনি তত্ত্বপিপাসু নন, তথ্যসন্ধানী। কিন্তু নিঃসম্পর্ক কৈবল্যই যদি তথ্যের লক্ষণ হয়, তবে তা শুধু অন্বীক্ষারই বহির্ভূত নয়, ভাষারও অতীত। কারণ ভাষা সামান্যবাচক, এবং পাউণ্ড্ যেকালে তাঁর ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ-সম্বন্ধে নীরব নন, অতিশয় বাঙ্ময়,তখন ঐকান্তিক অভিজ্ঞতার অখণ্ড উপভোগ তাঁর আয়ত্তাতিরিক্ত, তিনিও বৈশিষ্ট্যের ধ্যানমূর্ত্তিকে জ্ঞানগোচরে আনেন সাধারণ্যের পরিপ্রেক্ষিতে। বলাই বাহুল্য যে এরি নাম এলিয়টী ঐতিহ্য, এবং এর সপক্ষে পাউণ্ড্-এর কোনো উদ্ধারযোগ্য উক্তি যদিও আমার জানা নেই, তবু ডাগ্লাসী ধনবিজ্ঞান-সম্বন্ধে তাঁর দুরূহ উৎসাহ নিশ্চয়ই বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গলের জন্যে। কিন্তু এই দুর্ব্বলতা স্বীকারে তাঁর দ্বিধা আছে, তাই 'মেক্ ইট্ ন্যু-'এ আধুনিক ফরাসী কবিদের তালিকা দিতে গিয়ে তিনি এইটুকু ব'লেই ক্ষান্ত হয়েছেন যে সমসাময়িক শিল্পের নির্ব্বাচনক্ষেত্র দ্বিধ্রুবীয়। তার একপাশে উইণ্ডহ্যাম্ ল্যুইস্-এর নিঃসঙ্গ গিরিবর্ত্ম যার যাত্রীরা আত্মসমাহিত, অন্যদিকে জ্যুল্ রোম্যা-র জনাকীর্ণ রাজপথ যার পথিকেরা তদ্গতচিত্ত। আমার বিবেচনায় এই পথদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ নেই, এ-দুটো বিপরীতগামী হ'লেও এদের লক্ষ্য এক; অতিমানুষ যেমন অলৌকিক কল্পরাজ্যের অধিবাসী, বিশ্বমানবও তেমনি অন্তর্ভৌম অবচেতনালোকের জীব, এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ অস্মিতার মতো সার্ব্বজনীন সাযুজ্যও একটা অতিবাস্তব প্রত্যয়। অতএব এ উভয়সঙ্কটে কোনো দলেই নাম লেখানোর প্রয়োজন নেই; পাউণ্ড্-এর মতো দু নৌকোয় পা রেখেও শিল্পোৎপাদক নৈরাত্ম্য সাধনায় এগুনো যায়। তবে এই রকমের অন্যায় স্থিতিস্থাপকতায় হয়তো দার্শনিক মহলে কুনাম রটে। কিন্তু তাতে বিশেষ ক্ষতি নেই; কারণ নির্লিপ্ত সর্ব্বাস্তিবাদীই যে কাব্যভারতীর প্রিয়পাত্র তার আজস্র প্রমাণ পাউণ্ড্-এর অসংখ্য কবিতায় বর্ত্তমান। অতএব তাঁর আদর্শকে বুঝতে চাইলে 'মেক্ ইট্ ন্যু'-এর প্রবন্ধ কটা পর্য্যাপ্ত নয়, সেজন্যে তাঁর সমগ্র রচনাবলী পড়াই বিধেয়। কেননা, পূর্ব্বেই বলেছি, পাউণ্ড্-এর প্রয়োগপ্রবণ মন পরমার্থের প্রতিকূল; ব্যাবহারিক সত্যের তন্ময় উপলব্ধিই তাঁর ব্যক্তিস্বরূপকে আলোকসামান্য ক'রে তুলেছে। আলোচ্য পুস্তকখানিতেও সে-গুণ ভূরিপরিমাণে মেলে; তাই অন্তত আমার কাছে এই প্রবন্ধগুলি, মন্ত্রদ্রষ্টার অসম্বদ্ধ সূত্রের মতো, স্বাধীন ভাষ্যের ভিত্তিভূমি।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

মানবত্ব কি? * * * *

বইখানি প্রাণের আবেগে লেখা। প্রকাশক শ্রীপূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় এম্, এ মুখবন্ধে বলেছেন,—

"আজ আমাদের যা অবস্থা তাতে আমরা কেহই কাহাকেও চিনি না, কেহই কাহাকেও জানি না, কেহই কাহাকেও বুঝি না, ফলে তার প্রতিক্রিয়াও সেই রকম হচ্ছে, *সকলেই স্ব স্ব প্রধান, আত্মঘাতী, এবং পরস্পর পরস্পরের অবিশ্বাসী, বস্তুত।*"

বক্তা ও শ্রোতা যখন থাকেন মুখোমুখী, তখন তিনি মুখে যা বলেন বা না বলেন, তার অপূর্ণতা অল্পাধিক আনুকূল্য লাভ করে তাঁর ভাবব্যঞ্জনায়। কথায় ঠিক যেটা প্রকাশিত হল না, সেটা কতকটা বুঝে নেওয়া যায় তাঁর চোখের দৃষ্টিতে, বাহুর ভঙ্গীতে, ভাষার বাহুল্যের অবকাশে এবং সর্ব্বোপরি চেষ্টাকুল অব্যক্ততার বেদনায়।

কিন্তু ছাপার হরপে যখন লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে, চাক্ষুষ পরিচয় দূরের কথা, নাম পর্য্যন্ত উহ্য, সে স্থলে পাঠককে রচনানৈপুণ্যের উপর একান্ত ভাবে নির্ভর করতে হয়। লাজুক্ লোক হয় হন মুখচোরা, না হয় কথা বলবার উত্তেজনায় হন প্রগল্‌ভ। অল্প কথায় যে বক্তব্যটি সহজ সরল ভাবে প্রকাশিত হতে পারৃত, বাগ্‌বাহুল্যে তা চাপা পড়ে। এই দ্বিতীয়োক্ত প্রাচূর্য্যে লেখক আপনাকে কতকটা দুর্ব্বোধ্য করে তুলেছেন। মনে হয় তিনি যেন পাঠকবর্গ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সজাগ ও সন্ত্রস্ত এবং কেবলি যেন শঙ্কিত হচ্ছেন, তারা নারাজ। এরূপ অবস্থায় জোর করে যতটা কথা ব'লে ফেলেন সে অনুপাতে বক্তব্য বিষয়টি বাগ্‌জালে আরও অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে পাঠকের স্বতঃই এই কথাটি মনে হয়, লেখক যদি আর একটু আত্মভোলা হয়ে আপনার অভিজ্ঞতা অনুভূতির কথা বল্‌তেন তাহলে পাঠকের সহানুভূতি অর্জ্জন করা সহজ হত। প্রাসঙ্গিক কথার সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক বহুবাক্য ও অপূর্ণ দৃষ্টান্তের অবতারণা কর্‌তে হত না।

লেখক স্বয়ং এ বিষয়ে অন্ধ নন। কারণ ১৯৯ পৃষ্ঠার কেতাবের ১৪৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন—

এতদুর পথ চলে এসে, এইবার হয়ত বা এতক্ষণে আমাদের মধ্যে অনেকেরই ধৈর্য্যচ্যুতি এসে পড়েছে কারণ যা নিয়ে প্রসঙ্গ, অর্থাৎ "মানবত্ব কি?" কথাটার এখনও সুস্পষ্ট ক'রে কোনো কিছুই বলা হয় নি।

দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, কথাটা সত্য। দুঃখের সঙ্গে বল্‌ছি এই জন্য যে, বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সঙ্গে বইখানি আদ্যোপান্ত পড়ে মনে হল লেখক চেষ্টাতিরেকেই আপনার স্বচ্ছন্দ প্রাঞ্জলতাকে কতকটা অস্পষ্ট ও ভারাক্রান্ত করে তুলেছেন। তবু তাঁর আন্তরিকতার পরিচয় পেয়েছি। সত্য বটে, দেশকালপাত্র অনুসারে সকল তত্ত্ব সকল বিষয়েরই একটা বিশিষ্ট রূপ ফোটে। মানবত্বের তাৎপর্য্য কি এই প্রশ্নের পটভূমি "দেশ, কাল, পাত্র" শীর্ষক তিনটি অধ্যায়ে প্রায় ১০০ পৃষ্ঠায় প্রসারিত হয়েছে। অবশিষ্ট "সওয়ালে" মানবত্বের একটি ব্যাখ্যার সমীপে আমাদের উপনীত করেছেন। যথা—

"যিনি অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ হয়ে "স্বতঃ মুক্ত" কেন্দ্রটিকে এক পেশে অবস্থার থেকে উদ্ধার করে নিয়ে "স্বভাবমুক্ত" অবস্থায় পর্য্যবসিত করতে পারেন… …তিনি প্রকৃত মানব।"

স্থানাভাবে সবটা উদ্ধৃত করা গেল না। পুনশ্চ,—

"এর পরেও আর একটি পদের সন্ধান শ্রীকৃষ্ণ দিয়ে গেছেন, সেটি হল মানবের নারায়ণত্ব"।

ঠিক কথা এবং পুরাতন কথা। কিন্তু পুরাতন সত্যগুলি চিরদিনই নূতন হয়ে আমাদের মুগ্ধ করে ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও বিবৃতির বিশিষ্টতায়। সেই বৈশিষ্ট্যটি বিফলে অন্বেষণ করেছি লেখকের সাগ্রহ সাবলীল রচনার মধ্যে।

উপসংহারে মাতৃজাতির উদ্দেশে গ্রন্থকার এই উদ্দীপনাপূর্ণ অনুনয় জানিয়েছেন।

কুপুত্র হলেও 'কু' মাতা হওয়া কি উচিত হচ্ছে? আবো জিজ্ঞাস্য মায়ের মর্য্যাদা মায়েরা ছাড়া কে বুঝবে বলত? তাই আবার ডাকি—'মা' জাগো! ছেলেদের জাগাও। আবার জগৎ সত্যানন্দে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠুক্।"

শ্রীদেবেশ শর্ম্মা

East & West.—Gilbert Murray & Rabindranath Tagore. International Institute of Intellectual Co-operation. League of Nations. 1935.

লীগ অব নেশন্‌স্ বা জাতি সঙ্ঘ যে মহৎ আদর্শের প্রেরণায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহা সার্থকতা লাভ করে নাই। এই জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধার অভাব অনেক স্থলেই দেখা যায় তাহা একেবারে অকারণ বলা চলে না। জাতি-সঙ্ঘের সংশ্লিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান—International Institute of Intellectual Co operation। এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য জগতের বিভিন্ন দেশের মনীষিগণের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের ব্যাপারে সহযোগিতাসাধনে সহায়তা করা। সাধু উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকেও এই যোগাযোগ চিরকাল সাধিত হইয়াছে এবং হইবে, অর্থাৎ যতক্ষণ না এইরূপ যোগাযোগের পথে রাষ্ট্রনৈতিক বা অর্থনৈতিক অন্তরায় উপস্থিত হয়। অন্তরায় উপস্থিত হইলে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের এমন কোনো শক্তি নাই যে তাহার প্রতিরোধ করে। গত মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মানির মনীষিসম্প্রদায় 'পিতৃভূমির' সুসন্তান হইয়া যুদ্ধনীতির সমর্থন করিয়াছিলেন এবং বহু ফরাসী পণ্ডিত জার্ম্মান পণ্ডিতসম্প্রদায়কে প্রকাশ্যে 'বর্ব্বর' আখ্যা দিতে দ্বিধা করেন নাই। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও দেখা গিয়াছিল—কিন্তু তাহার মূলে ছিল ততটা মনীষাগত সহযোগ নয়, বিশেষত এই জাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে, যতটা ফরাসীদেশ, জার্ম্মান এবং অপর সকল দেশের জনসাধারণের স্বার্থ যে মূলত এক ও অখণ্ড এই বোধ। এই বোধ উদ্বুদ্ধ করিতে মনীষিগণ অবশ্য সাহায্য করিতে পারেন, কিন্তু সকল দেশের নিম্নতম

শ্রেণীর নরনারীর মধ্যে স্বার্থপ্রণোদিত সার্ব্বভৌমিকতার বিস্তার ছাড়া এই বোধের বিকাশ অসম্ভব; এবং এই স্বার্থ জাতিসঙ্ঘের যাঁহারা পরিচালক তাঁহাদের স্বার্থের বিরোধী। এই জাতিসঙ্ঘের সংশ্লিষ্ট এবং ইহা দ্বারা প্রভাবান্বিত কোনো প্রতিষ্ঠান-দ্বারা এই উদ্দেশ্য কি ভাবে সাধিত হইতে পারে তাহা ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।

সমালোচ্য পুস্তিকাটির উপর যে ছাপ আছে উপরের উক্তিগুলি শুধু সেই ছাপ সম্বন্ধই প্রযোজ্য। পুস্তিকাটিতে গিলবার্ট মারে ও রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের সঙ্গে যে দুইটি পত্র বিনিময় করিয়াছেন তাহাই মুদ্রিত হইয়াছে। এই পত্র দুইটির নিন্দা করা আমাদের অভিপ্রায় নহে। গিলবার্ট মারে মানুষের সহিত মানুষের সহযোগের কথাই লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও উত্তরে উদার মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপর জগতের সকল জাতির মিলনের সম্ভাবনা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মারে সাহেবের মতন তাঁহার লেখনী শুধু মধু বর্ষণ করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। প্রবলপ্রতাপ পাশ্চাত্য জাতিসমূহ তাহাদের বিপুল জ্ঞানবিজ্ঞান, তাহাদের বিস্ময়কর মনীষা, তাহাদের সার্ব্বভৌম দর্শন সত্ত্বেও যে প্রাচ্য জাতিসমূহকে শোষণ করিতে দ্বিধা করে নাই এবং ইহারই ফলেই যে জাতিগত বৈর ও বিরোধের সৃষ্টি হইয়া সভ্যতার সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের লেখনী তাহার বর্ণনায় যদি কিঞ্চিৎ তিক্ত হইয়া থাকে তবে তাঁহাকে দোষ দেওয়া চলে না। কিন্তু সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় নানা সঙ্কীর্ণ আচার সংস্কার প্রভৃতির ফলে কি ভাবে সমগ্র দেশ পঙ্গু হইয়াছে তাহাও অত্যন্ত তীব্রভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার কারণ রবীন্দ্রনাথ শুধু ফাঁকা সার্ব্বভৌমিকতার মন্ত্রে বিশ্বাস করেন না, এই সার্ব্বভৌমিকতার পথে যে সকল অন্তরায় রহিয়াছে, তাহা প্রাচ্যই হউক, বা প্রতীচ্য হউক, তাঁহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তি তন্ন তন্ন করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছে। সমস্যা—কি ভাবে অন্তরায়গুলির নিবারণ অসম্ভব। এই সমস্যা সমাধানের কোনো আভাস এই পত্র দুইটির মধ্যে পাঠক হয়তো পাইবেন না। কিন্তু এই অন্তরায়গুলি যে প্রকৃত—এই বোধেরও যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই বোধ আমাদের নিকট আরো সুস্পষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু ইহার জন্য জাতিসঙ্ঘ বা সংশ্লিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠানের গৌরবের কিছু নাই। ম্যাক্‌মিল্যান্ কম্পানির মধ্যস্থতায়ও এই পত্রের বিনিময় ও মুদ্রণ সংঘটিত হইতে পারিত।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

প্রকাশক—শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী, ২৪।৫এ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ,
১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট হইতে শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পরিচয়

ত্রৈমাসিক
পত্রিকা

বার্ষিক
৪৷০
প্রতি সংখ্যা
১৲

পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
শারদীয়া, ১৩৪২

বিষয়-সূচী

সম্পাদক :
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ভারতী ভবন
কলিকাতা


কেমিকোর
জনপ্রিয়
টুথ্ পেষ্ট ও
ফ্রিস্ (নিম ডেন্টাল পাউডার)
NEEM TOOTH-PASTE
MARGO SOAP
MARGO SOAP CONTAINS ACTIVE PRINCIPLES TOILET & MEDICINAL
স্নানে ও প্রসাধনে নিত্য ব্যবহারে
চিত্ত প্রফুল্ল হয়
চর্ম্ম মসৃন ও বর্ণ উজ্জ্বল করে
সকলপ্রকার চর্ম্ম
রোগ নিবারণে
অদ্বিতীয়।
তিলল
সিলট্রেস
লাইজু
BHRINGOL
CASTEROL
KOKONOL
TEELOL Scented Teel (Sesame) Oil Guaranteed Pure
'ভৃঙ্গল'
আয়ুর্ব্বেদীয় 'মহাভৃঙ্গরাজ তৈল'
কেশবৃদ্ধি করে ও মস্তিষ্ক
শীতল রাখে
'ক্যাষ্টরল'
সুবাসিত বিশুদ্ধ ক্যাষ্টর অয়েল
কেশ পতন নিবারণ করে
'কোকোনল'
সুবাসিত কোচিনের বিশুদ্ধ
নারিকেল তৈল
'তিলল'
চামেলি গন্ধ বিশুদ্ধ
তিল তৈল
'সিলট্রেস'
মাথাঘষা ও চুল পরিষ্কারের
সুগন্ধ 'শ্যাম্পু'
সাড়স
রেশমী ও পশমী বস্ত্র
পরিষ্কারের শ্রেষ্ঠ সাবান
ক্যালকেমিকোর
চন্দন গন্ধ
ক্যালকেমিকোর
ক্ষৌর-সহায়।
শেভল
সেভিং ষ্টিক্ ও সেভল ক্রীম
দাড়ির চুল যতই কড়া হোক 'শেভল'
রেণু
সুগন্ধযুক্ত নিম টয়লে
RENUKA MARGOSIA TOILET POWDER
শিশু ও নারীর
অঙ্গের সম্পূর্ণ
ব্রণ ছুলি
প্রভৃতি

৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা
কার্ত্তিক, ১৩৪২

পরিচয়

কাণ্ট্ ও বিজ্ঞানবাদ

পরিচয়ে কাণ্টের দর্শন সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা করিবার চেষ্টা পূর্ব্বে একবার করিয়াছি, কিন্তু সে আলোচনা কোন কোন স্থানে দুর্ব্বোধ্য বা অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে মনে হয়। ব্যক্তিগত অসামর্থ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও বলা চলে যে সে প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ বোধ হয় অসম্ভব। আমার জ্ঞাতসারে বাংলায় কাণ্টের দর্শন-আলোচনার এই প্রথম উদ্যম বলিয়া জানিতাম, পরে শুনিয়াছি যে বহুদিন পূর্ব্বে "প্রবাসীতে" একবার এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। সে নিশ্চয়ই বহুদিনের কথা, এবং সাধারণের পক্ষে সে আলোচনা সহজলভ্য নহে; বিশেষতঃ কাণ্টের দর্শন বিচার ইংরাজিতেও অতি অল্পদিনই হইল যথাযথ ভাবে সুরু হইয়াছে। পূর্ব্বে কাণ্টের দর্শনবিচার বহুস্থলেই কাণ্টের অপেক্ষা হেগেলের মতবিচারেই অধিক মনোযোগ দিয়াছে, ভাবিয়াছে যে হেগেলীয় মতবাদের পূর্ণতার তীর্থ-পথে কাণ্টীয় দর্শন কেবল একটী সোপান মাত্র। বহু ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন অধ্যাপনায় আজিও এ মনোবৃত্তির পরাভাস পরিস্ফুট, কিন্তু কোন দার্শনিককেই তাঁহার পরবর্ত্তীদের মতবাদের উপাদানমাত্র বিবেচনা করিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হয়, বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে তাঁহার নিজস্ব দানকে উপলব্ধি করার পথে তাহা পরিপন্থী। সকল দার্শনিকের বেলায়ই এ কথা প্রযোজ্য, কিন্তু কাণ্টের সম্বন্ধে ইহার সত্য স্বপ্রকাশ। তাঁহার গবেষণাকে ভিত্তি করিয়াই আধুনিক জগতের দর্শনের গতি ও বিকাশ, এবং সেই জন্যই আধুনিক

জগতের মনোবৃত্তিকে জানিতে হইলে কান্টের দর্শনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় না থাকিলে চলে না। প্রয়োজনীয়তার এই গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়া পাঠকগোষ্ঠী কান্টের দর্শন আলোচনায় আমার এই অসম্পূর্ণ প্রচেষ্টাসমূহকে ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন, ইহাই ভরসা করি।

১

আধুনিক জগতের মনোবৃত্তির দিকে লক্ষ্য রাখিলে বলা চলে যে ইহা বিশেষ করিয়া বিজ্ঞানের যুগ। এ যুগে বিজ্ঞানের যুগান্তরকারী প্রগতির প্রতি লক্ষ্য করিলে এ কথা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কেবলমাত্র সে প্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আধুনিক যুগকে বিজ্ঞানের যুগ বলা হয় না। বিজ্ঞানের নিত্যনব আবিষ্কার, নূতন নূতন অভিযান এবং নবীন পদ্ধতি আমাদের চিরাচরিত জীবনকে রূপান্তরিত করিয়াছে সত্য, কিন্তু সেই রূপান্তর জীবনের প্রচলিত ধারাকে অতিক্রম করিয়া আমাদের মানস-গঠন ও বিশ্বদৃষ্টিকেও রঞ্জিত করিয়াছে বলিয়াই বর্ত্তমান যুগকে বিজ্ঞানের যুগ বলা সার্থক।

বিভিন্ন কালে বিভিন্ন মনোবৃত্তির ফলে পৃথিবীতে বিভিন্ন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে, ইতিহাসে তাহার সাক্ষ্য মেলে। সভ্যতার এ বৈচিত্র্যের অর্থ ইহা নয় যে কোন বিশেষ দেশ বা কালের সভ্যতার উপাদান অবিমিশ্র। মানবচরিত্র এবং মানবসমাজের জটিল সংগঠনের দিকে দৃষ্টি রাখিলে এ কথার সত্য সহজেই প্রতীয়মান হইবে। রূপবোধ, নৈতিকতা অথবা ধর্ম্মান্বেষণার প্রবলতা বিশেষ দেশ অথবা যুগের বিশ্বদৃষ্টিকে রঞ্জিত করিয়া সমসাময়িক সভ্যতার অভিমুখ ও সংগঠন নির্দ্দেশ করিতে পারে, কিন্তু সে নির্দ্দেশের ফলে মানবচিত্তের অন্যান্য বৃত্তিসমূহ নিষ্পেষিত হয় না, কেবলমাত্র রূপান্তরিত হয়। ফলে মানবসভ্যতার বৈচিত্র্য উপাদানমূলক নহে, সংগঠনমূলক। সমস্ত সভ্যতার ক্ষেত্রেই একই প্রকারের উপাদানসমূহ ক্রিয়াশীল, কেবলমাত্র বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের প্রাধান্যে ও সংগঠনের পার্থক্যে সভ্যতার অবয়ব ও মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রকাশ পায়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা সভ্যতা হিসাবে বোধ হয় পৃথিবীর অন্য যে কোন সভ্যতার অপেক্ষা হীন নহে। প্রাচীন চীনের রূপসাধনা, সাহিত্যসৃষ্টি অথবা সমাজ সংগঠনের কথা মনে করিলে আজিও আমাদের আশ্চর্য্য লাগে। জীবনযাত্রার ধারা বিচার করিলেও চীন সভ্যতার উৎকর্ষ বিস্ময়কর মনে হয়। কালপ্রবাহের দৈর্ঘ্য এবং নরনারীর সংখ্যা বিবেচনায় বলা চলে যে বিশ্বসভ্যতার বিকাশে চীনের স্থান প্রায় সর্ব্বোচ্চে, অথচ এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে চীনসভ্যতার সে বিকাশে বিজ্ঞানের স্থান অতি নগণ্য। ব্যক্তিগত হিসাবে যে চীনবাসী বিজ্ঞানে প্রতিভার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু জাতি অথবা সভ্যতা হিসাবে যে চৈনিক চিত্ত বিজ্ঞানে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে নাই, সে কথাও সমানই নিঃসন্দেহ। চীনবাসীর চরিত্র অথবা বুদ্ধির অভাবের কথা এ প্রসঙ্গে উঠিতে পারে না, কারণ দর্শন, সাহিত্য এবং রূপসৃষ্টিতে চৈনিক চিত্ত যুগযুগান্ত ধরিয়া যে স্থির সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছে, বিশ্বের ইতিহাসে তাহার তুলনা অধিক মেলে না। ভারতবর্ষ অথবা পারস্যের সভ্যতা সম্বন্ধেও বোধ হয় এ কথা বলা চলে। এই সমস্ত সভ্যতায় বিজ্ঞানের বিকাশ হয় নাই, এ কথা মনে করিলে কিন্তু ভুল হইবে। অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য ও আবিষ্কারের ইতিহাসই এই সভ্যতাসমূহের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত, কিন্তু বিজ্ঞানের সে বিকাশ এ সভ্যতার মর্ম্মকথা নহে।

আধুনিক যুগকে বিজ্ঞানের যুগ বলিবার অর্থ এইখানেই মেলে। কোন একটী বিশেষ আবিষ্কারের তুলাদণ্ডে বিচার করিলে আধুনিক যুগের বিজ্ঞানের বিকাশকে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগসমূহের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলা চলে কি না, সে কথা বিচারের বিষয়। কিন্তু বিশেষ আবিষ্কারের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যদি যুগধর্ম্ম এবং মানুষের বিশ্বদৃষ্টি দিয়া আমরা সভ্যতার স্বরূপ নির্ণয় করিতে চাহি; তবে আধুনিক সভ্যতা যে একান্তভাবে বিজ্ঞানধর্ম্মী সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। প্রাচীন সভ্যতায় বিজ্ঞান ছিল মানুষের চিত্তবৃত্তির বিচিত্র

সাধনার উপাদানসমূহের মধ্যে একটী মাত্র উপাদান,—বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞান সেই সাধনার ধারানির্দ্দেশক।

আধুনিক যুগে মানুষের চিত্তবৃত্তির সমস্ত প্রকাশের ক্ষেত্রেই এই বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সভ্যতাকে বুঝিতে হইলে তাই এই বৈজ্ঞানিক মনোভাব এবং বিজ্ঞানের পদ্ধতির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিকে বিশ্লেষণ করিয়া বলা চলে যে বিশ্বসৃষ্টির প্রকাশ শৃঙ্খলাবদ্ধ, এই বিশ্বাসই তাহার মূল। প্রকৃতির পর্য্যায়ে সহজ বিশ্বাস না থাকিলে বিজ্ঞানের বিকাশ অসম্ভব, তাই এই বিশ্বাসের আবির্ভাবের ফলেই অসভ্য যুগের যাদুবিদ্যা বিজ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। বৈজ্ঞানিকের সজ্ঞান মতবাদ যাহাই হউক না কেন—এবং অনেক স্থলেই সে মতবাদ একান্তরূপে অভিজ্ঞতানির্ভর বলিয়া শৃঙ্খলার সার্ব্বিকতায় অবিশ্বাসী—তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণাই প্রমাণ করে যে প্রকৃতির পর্য্যায়েব সহজ বিশ্বাস তাঁহার স্বধর্ম্ম। দর্শনের সিদ্ধান্ত হিসাবে তাই বৈজ্ঞানিক বহু স্থলেই হিউমের সন্দেহবাদকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু সাধনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকের নিষ্ঠা দর্শনের সেই অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতকেও অক্লেশে লঙ্ঘন করিয়া যায়।

প্রকৃতির শৃঙ্খলায় বিশ্বাস তাই বিজ্ঞানের ভিত্তি, কিন্তু কেবল মাত্র সাধারণ ভাবে এ বিশ্বাসকে বরণ করিয়া লইলে বিজ্ঞানের সাফল্যের কোন বিবরণ দেওয়া চলে না। পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতার মূলেই এ বিশ্বাস রহিয়াছে, জগৎ-প্রপঞ্চের বৈচিত্র্যের মধ্যে স্থৈর্য্যের এ সন্ধান না পাইলে মানুষের চিত্ত অভিজ্ঞতাকে সুসংবদ্ধ করিবার কথা কল্পনায়ও আনিতে পারিত না। সুতরাং কেবলমাত্র এই বিশ্বাসকে ভিত্তি করিয়া বিজ্ঞানের বিশেষ মনোবৃত্তিকে বুঝিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য, কারণ মানবচিত্তের অন্যান্য বিকাশের তুলনায় বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ইহাতে প্রকাশ পায় না। বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য বিশেষের সঙ্গে বিশেষের সম্বন্ধ স্থাপনে। এক পক্ষে এ সম্বন্ধ সাধারণ সম্বন্ধ, কারণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষের সাংখ্যিক বা স্থানকালগত বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করিবার অবকাশ নাই। বিশেষের স্বভাব বা লক্ষণ বিচার করিয়া সেই লক্ষণের

সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াই বিজ্ঞান তৃপ্ত। সেই লক্ষণের পুনরাবির্ভাব হইলে সেই সম্বন্ধেরই পুনরাবির্ভাবও অবশ্যম্ভাবী, ইহাই বিজ্ঞানের নির্দ্দেশ। অন্য পক্ষে এ সমস্ত সাধারণ সম্বন্ধও বিশেষের বিশিষ্ট স্বভাববিচারের ফলে আবিষ্কৃত। বিশ্বসৃষ্টি নিয়মানুবর্ত্তী, প্রকৃতির সমস্ত প্রকাশই শৃঙ্খলা মানিয়া চলে, পৃথিবীর ধারাবাহিকতায় এ সাধারণ বিশ্বাস বিজ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট নহে। তাই বিজ্ঞান সৃষ্টিকে নিয়মানুবর্ত্তী বলিয়া তৃপ্ত নহে, বিচিত্র সৃষ্টির বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে বিশিষ্ট নিয়ম আবিষ্কারই তাহার লক্ষ্য, প্রকৃতির বিশিষ্ট প্রকাশের মধ্যে বিশিষ্ট শৃঙ্খলাস্থাপনেই তাহার সিদ্ধি। কার্য্যকারণ-বিধির উদাহরণ দিয়া বলা চলে যে কার্য্যকারণ-বিধির সর্ব্বব্যাপকতায় বিশ্বাস বিজ্ঞানের ধর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু তাহার সাধনা বিশিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষের মধ্যে বিশিষ্ট কার্য্যকারণ-বিধির আবিষ্কার।

সৃষ্টির প্রত্যেকটী ঘটনাই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাসমূহের সঙ্গে অলঙ্ঘ্য নিয়মের সূত্রে আবদ্ধ—এই বিশ্বাসই বিজ্ঞানের ভিত্তি। এই বিশ্বাসের বলেই বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির রহস্য নির্ণয়ের জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করিতে সমর্থ। কিন্তু একটু বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে এ বিশ্বাসের ফলে বিশ্বসৃষ্টির সর্ব্বত্রই যান্ত্রিকতার অমোঘ বিধানে বিশ্বাস করিতে আমরা বাধ্য। যান্ত্রিকতার এ সর্ব্বব্যাপকতা কার্য্যকারণ-বিধির সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে ব্যগ্র, সৃষ্টির সমস্ত রহস্যের উপর বুদ্ধির অমিশ্র আলোক ফেলিয়া পৌর্ব্বাপর্য্যের অলঙ্ঘ্য সূত্রের শৃঙ্খলে তাহাকে প্রকাশ করিতে উৎসুক।

যান্ত্রিকতার এ বিজয়-অভিযান বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম হইলেও মানবচিত্ত দুই দিক হইতে তাহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হয়। কার্য্যকারণ-বিধির সম্প্রসারে যান্ত্রিকতার রাজ্যস্থাপন বিজ্ঞানের লক্ষ্য, কিন্তু বিজ্ঞানের পদ্ধতির মধ্যেই সে সাধনার পথে বাধা রহিয়াছে। বিজ্ঞান বিশিষ্টকে ভিত্তি করিয়া সৌধ রচনায় রত, কিন্তু বিশিষ্টের প্রতি একান্তভাবে বদ্ধ-দৃষ্টি বলিয়া বিজ্ঞান অভিজ্ঞতানির্ভর। বৈজ্ঞানিক চিত্তবৃত্তির পরাকাষ্ঠা তাই হিউমের সন্দেহবাদে, কিন্তু সে সন্দেহবাদের মধ্যে বিজ্ঞানের

সাধারণ সূত্রের স্থান নাই, সেকথা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। ফলে বিজ্ঞানের মূলগত বিশ্বাস এবং তাহার সাধনার পদ্ধতি পরস্পর-বিরোধী। এই জন্যই কোন কোন দার্শনিক বিজ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না, কারণ জ্ঞান স্বপ্রকাশ, তাহার মধ্যে অসঙ্গতি বা বিরোধের কোন স্থান নাই। তাঁহাদের মতে বিজ্ঞান তাই মানুষের কর্ম্মপদ্ধতি মাত্র, ব্যবহারিক জীবনে তাহার প্রয়োজনীয়তা এবং কার্য্যকারিতা যতই অধিক হউক না কেন, জ্ঞানের স্বপ্রকাশ সম্পূর্ণতার কোন চিহ্ন সেখানে নাই। একথা মনে করিবার আরো কারণ রহিয়াছে। কার্য্যকারণ-বিধি বিজ্ঞানের প্রাণমন্ত্র, যতদূর তাহার প্রসার, ততদূর পর্য্যন্তই বিজ্ঞানের সাম্রাজ্য, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে কার্য্যকারণ-বিধির স্বভাবের মধ্যেই স্ববিরোধ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কার্য্যকারণ-বিধি বিশেষ ঘটনাকে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাসমূহের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ দিয়া বিচার করে, তাহার স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিচয় পূর্ব্ববর্ত্তীদের স্বভাবের মধ্যেই পাইতে চাহে। ফলে বিশিষ্টের বৈশিষ্ট্য ঘটনা-পর্য্যায়ের মধ্যে তাহার অবস্থানের ফল বলিয়া প্রতিভাত হয়, কিন্তু অন্য পক্ষে স্বভাবকে অবস্থান-নিরপেক্ষ বলিয়া স্বীকার না করিলে বিজ্ঞানের সাধারণ সূত্র অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়।

এই স্ববিরোধের ফলেই বৈজ্ঞানিক কর্ম্মপদ্ধতির তাৎপর্য্য লইয়া দার্শনিকদের মধ্যে এত মতভেদ। বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা-নির্ভরতা ও বৈশিষ্ট্যবোধের উপর যাঁহারা আস্থা স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে বৈজ্ঞানিক কর্ম্মপদ্ধতির তাৎপর্য্য নিরীক্ষা ও পরীক্ষায়। তাহার ফলে যে সংযোজক বাক্য আবিষ্কৃত হয়, তাহাতে আমাদের জ্ঞানের বৃদ্ধি, কিন্তু সে বৃদ্ধির মধ্যে সার্ব্বিকতার অবকাশ নাই বলিয়া বস্তুতপক্ষে জ্ঞানের সে বিকাশ কেবলমাত্র আপাতদৃষ্ট, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। অন্য পক্ষে বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া বিরুদ্ধ মতাবলম্বী দার্শনিকেরা বলিয়াছেন যে সাধারণ সম্বন্ধের সার্ব্বিকতার উপরই বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, তাই প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রত্যয়ের স্বভাবযোগ বিচার করিয়াই বিজ্ঞানের পরিণতি। গণিত তাই বিজ্ঞানের প্রতীক, এবং গণিতের

সাধারণ সূত্রে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহাই প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞানের বিষয়। ফলে বস্তুর দেশকালগত অবস্থান বিজ্ঞানের বিচারে অপ্রাসঙ্গিক, এমন কি নিরীক্ষা ও পরীক্ষাও বস্তুতপক্ষে বিজ্ঞানের অপরিণতির সাক্ষ্য মাত্র। বিজ্ঞানের পরিণতির ফলে তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া গণিতের সার্ব্বিক সূত্রে বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত রহস্যই একদিন উদ্ভাসিত হইবে।

একপক্ষে আপনার কর্ম্মপদ্ধতির স্ববিরোধ যান্ত্রিকতার সর্ব্বব্যাপী বিজয় অভিযানের অন্তরায়। অন্যপক্ষে মানুষের আত্মোপলব্ধি এবং চিত্তবৃত্তির আদর্শবোধ এ অভিযানকে অস্বীকার করিতে চাহে। সৌন্দর্য্যসৃষ্টিতে মানুষের আত্মা বিশ্বের যান্ত্রিকতাকে লঙ্ঘন করিয়া আপনার পূর্ণতার সন্ধান পায়, নীতিবোধের গভীরতায় এবং কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্রেরণায় কার্য্যকারণ-বিধির অজানিত আদর্শকে বাস্তব বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়, ধর্ম্মান্বেষণার আহ্বানে বিজ্ঞানের সমগ্র আদেশ অনুদেশকে অগ্রাহ্য করিয়া পরম সত্যের সন্ধান করে। বিজ্ঞান আপনার দৃষ্টিকোণ হইতে তাহাদের সত্যকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছে। বর্ত্তমান সভ্যতা প্রধানতঃ বিজ্ঞানধর্ম্মী বলিয়া সে সভ্যতার তুলাদণ্ডে বিজ্ঞানের তুলনায় সৌন্দর্য্য, নীতি অথবা ধর্ম্মবোধ অবহেলিত হইয়াছে, তাহাও সত্য, কিন্তু মানুষের চিত্ত বিজ্ঞানের সে দাবীকে কোনদিনই সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া লয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর রোমান্তিক সাহিত্য ও শিল্প এবং রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রে তাহাদের প্রতিক্রিয়া বিজ্ঞানের এ সর্ব্বগ্রাসী অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। নীতি ও ধর্ম্মবোধও চিরদিনই বিজ্ঞানের সে যান্ত্রিকতাকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছে, প্রতিদিনের নিত্যকর্ম্মে সামাজিক মানুষও তাহার ব্যবহারে স্বভাবে বিশ্বাসে বিজ্ঞানের সে যান্ত্রিকতাকে কার্য্যত অগ্রাহ্য করিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। দ্বন্দ্বকে অগ্রাহ্য করিলেই দ্বন্দ্বনিরসন হয় না। তাই আধুনিক সভ্যতার আত্মঅবিশ্বাস এবং আত্মঘাতী সন্দিগ্ধতার মূলও বোধ হয় এই দ্বন্দ্বেরই মধ্যে নিহিত।

কাণ্টের দর্শনের লক্ষ্যও তাই দুইটী। বিজ্ঞানের স্বভাবের

মধ্যে যে বিরোধের সন্ধান মেলে, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য নিরূপণ এবং সেই সূত্রে বিজ্ঞানের কর্ম্মপদ্ধতির পরিপূর্ণতর উপলব্ধি তাঁহার দর্শনসাধনার একটী প্রধান লক্ষ্য। বিজ্ঞানকে তাহার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই কাণ্ট ক্ষান্ত হন নাই, তাহার অধিকারের সীমানির্দ্দেশ করিবার প্রয়াসও তাঁহার সাধনার অঙ্গীভূত। তাঁহার ফলে নীতি ও ধর্ম্মবোধের প্রেরণায় যে বিশ্বছবি আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়, সেই ছবির সঙ্গে বিজ্ঞানের যান্ত্রিক বিবরণের সমন্বয়সাধনও তাঁহার দর্শনের অন্যতম লক্ষ্য। একপক্ষে বিজ্ঞানের কর্ম্মপদ্ধতির সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়া তাহার যৌক্তিকতা ও সত্যসন্ধানকে তিনি সমর্থন করিতে চাহিয়াছেন, অন্যপক্ষে বিজ্ঞানের সঙ্গে আদর্শবোধের যে সংঘর্ষ, তাহার সমাধান করিয়া অভিজ্ঞতাকে তিনি পরিপূর্ণ ও সর্ব্বতোমুখী বলিয়া জানিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

(২)

বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়কে পৃথক করিয়া দেখিলে সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্যের কোন বিবরণ দেওয়া যে অসম্ভব তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। প্রতিমুহূর্ত্তের অভিজ্ঞতায়ই এই প্রকারের বাক্য প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া অভিজ্ঞতার বিবরণ হিসাবে বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদ উভয়েই অগ্রাহ্য। ঠিক একই কারণে বিজ্ঞানের পদ্ধতি এবং তাহার তাৎপর্য্যের আলোচনায় বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদ উভয়েরই নিষ্ফলতা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাই এই সমস্যার সমাধানেই কাণ্ট তাঁহার দর্শনের মর্ম্মকথা খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। সে সমাধানের মূলকথা এই যে বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়কে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিলেও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহাদের সংযোগকে অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। ইন্দ্রিয়গম্য ও বুদ্ধিলব্ধ বিষয় যে বিভিন্ন নহে, সে বিষয়ে কাণ্টের কোন সন্দেহ নাই। তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেখিবার ফলেই কাণ্ট-পূর্ব্ব দর্শন চালমাৎ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির বিষয়ের ঐক্য নির্দ্দেশ করিয়া কাণ্ট

দর্শনকে সে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে যদি আমরা স্বতন্ত্র মনে করি, তবে অভিজ্ঞতায় তাহাদের সংযোগের কোন বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। পক্ষান্তরে অভিজ্ঞতায় তাহাদের সংযোগকে স্বীকার করিয়া লইয়া যদি আমরা তাহার বিশ্লেষণ করিতে চাহি, তবে অভিজ্ঞতার সার্ব্বিকতা এবং বৈশিষ্ট্য বুঝিবার পথে কোন বাধা থাকে না। ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির বিষয়ের ঐক্যস্বীকারের ফলে কাণ্ট দেখিলেন যে প্রত্যয় এবং সংবেদনার মধ্যে প্রভেদ থাকিলেও তাহারা পৃথক নহে, সংবেদনা না থাকিলে প্রত্যয় অর্থহীন, প্রত্যয় না থাকিলে সংবেদনা অজ্ঞেয়।

এখানে আপত্তি উঠিতে পারে যে প্রত্যয় বস্তু অথবা ঘটনার স্বভাবকে প্রকাশ করে বলিয়া তাহা সার্ব্বিক, সার্ব্বিক বলিয়া দেশকালের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, তাই তাহার অস্তিত্বেরও কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। পক্ষান্তরে সংবেদনা বিশিষ্ট, বিশেষ দেশকালজ বলিয়া বিশিষ্ট অস্তিত্বের মধ্যে তাহা সীমাবদ্ধ। বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে এক মনে করিলে প্রত্যয়কে সংবেদনার মধ্যে আবদ্ধ মনে করিতে হয়; কিন্তু তাহা হইলে প্রত্যয়ের সার্ব্বিকতাকে স্বীকার করিবার অর্থ কি? এ আপত্তির উত্তরে কাণ্টের বক্তব্য এই যে বিভিন্ন সংবেদনার অস্তিত্বগত পার্থক্যকে অবহেলা করিয়া তাহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত ঐক্যস্থাপনই প্রত্যয়ের কাজ, তাই ইন্দ্রিয়জ বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াই বুদ্ধির বিকাশ। ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় বুদ্ধির পক্ষেও সমানই অলভ্য। ন্যায়ের ভাষায় বলিতে হয় বিশেষ ও সামান্যকে পৃথক জ্ঞান করিলেও বিশেষ ব্যতীত সামান্যের অথবা সামান্য ব্যতীত বিশেষের জ্ঞান সমানই অসম্ভব।

কাণ্টের বক্তব্যকে ঘুরাইয়া বলা চলে যে প্রত্যয়ের ধর্ম্ম সংবেদনার মধ্যে সম্বন্ধস্থাপন করিয়া তাহাদের শ্রেণীবিভাগ। সেইজন্যই প্রত্যয় এবং সংবেদনার বিষয় এক, অথচ প্রত্যয় এবং সংবেদনা বিভিন্ন। ফলে প্রত্যয়কে সংবেদনার সঙ্গে সমশ্রেণীয় মনে না করিয়া অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য সাধনের মনন-রীতি গণনা করাই সঙ্গত। বিভিন্ন প্রত্যয়ের

বিষয়ে যাহা সত্য, মানবচিত্তের মনন-রীতির বেলায় সাধারণভাবে তাহা আরো বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ফলে এই সমস্ত মনন-রীতির সম্বন্ধ সাক্ষাৎভাবে সংবেদনার বিষয়বস্তুর সঙ্গে নহে, অভিজ্ঞতার যে সংগঠনের উপর তাহাদের সম্ভাব্যতা ও বোধগম্যতা নির্ভর করে, তাহাদের সঙ্গেই আমাদের মননরীতির কারবার। মননরীতির সম্বন্ধে যাহা আমরা বলি, তাহা অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুর বর্ণনা নহে, অভিজ্ঞতার সম্ভাবনারই তাহা বর্ণনা। সমস্ত সংবেদনা ও চিন্তাধারার মূলে যে সমস্ত সাধারণ সূত্র, অভিজ্ঞতার সম্ভাব্যতা দিয়াই তাহাদের সত্য প্রমাণিত হয়, কিন্তু ঠিক সেই কারণেই তাহারা অভিজ্ঞতার সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ।

বিজ্ঞান কি করিয়া সম্ভব তাহার বিবরণও এইখানেই মেলে। বিশেষের পরীক্ষা ও নিরীক্ষার ফলে তাহার স্বভাব সম্বন্ধে সাধারণ সূত্র আবিষ্কারই বিজ্ঞানের ধর্ম্ম, তাই ভবিষ্যদ্বাণীতেই বিজ্ঞানের সাফল্যের পরিচয়। ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ প্রকৃতিকে আদেশদান, বিশেষ বস্তুর অভিজ্ঞতার পূর্ব্বেই তাহার স্বভাব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ। আমরা তাহার সম্বন্ধে যাহা ভাবিতেছি, বস্তুতও তাহা সেই স্বভাবের পরিচয় দিবে, এই ভরসাই সেই পূর্ব্বজ্ঞানের ভিত্তি। এই ভরসাকে কেবলমাত্র আবেগের দাবী বলিয়া গণনা করা যায় না, কারণ তাহা হইলে বিজ্ঞান এবং সমস্ত অভিজ্ঞতাই আবেগের প্রতিক্রিয়া হইয়া দাঁড়ায়। অভিজ্ঞতাকে সাধারণ ভাবে অস্বীকার করা স্ববিরোধী, তাই অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই সমস্ত সন্দেহের সুরু। সেই অভিজ্ঞতার সাধারণ সর্ত্তের উপরেই কাণ্ট বিজ্ঞানের সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, বলিয়াছেন, যে সমস্ত সাধারণ সূত্র অভিজ্ঞতার সম্ভাবনার সঙ্গেই জড়িত, অভিজ্ঞতার সম্ভাবনাই তাহাদের সত্যকে প্রমাণ করে। কাজেই যে ভরসা এই সমস্ত সাধারণ সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা কেবলমাত্র ভরসা নহে, তাহাকে জ্ঞানের পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

মানুষের অভিজ্ঞতায় ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির প্রভেদ অথচ সংযোগের প্রয়োজনীয়তা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। চিত্তের যে মননরীতি অভিজ্ঞতার সম্ভাবনার ভিত্তি, তাহাকে সাধারণ সূত্রে প্রকাশ করিতে

গিয়া কাণ্ট তাই ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির কর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে খানিকটা প্রভেদ স্বীকার করিয়াছেন। কাণ্টপূর্ব্ব দর্শনের মতে কেবলমাত্র তাহাদের কর্ম্মপদ্ধতিই যে বিভিন্ন, তাহা নহে, মননশক্তি হিসাবেও তাহারা সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন, এবং সেই জন্য তাহাদের জ্ঞাতব্য বিষয়ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্লেটোর দর্শনেও আমরা এই মতবাদেরই পরিচয় পাই, কারণ তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয় জ্ঞানের সামগ্রী নহে, তাহা কেবলমাত্র অভিমত। জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা তাই একমাত্র বুদ্ধির মধ্যেই নিহিত। বাস্তব এবং অবাস্তবের পার্থক্যের সঙ্গে বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের পার্থক্যের সমীকরণের চেষ্টা তাই ইয়োরোপীয় বুদ্ধিবাদের একটী প্রধান অঙ্গ। তাহাকে অস্বীকার করিয়া কাণ্ট বলিলেন যে বুদ্ধি বাস্তবকে জানিবার উপকরণ নহে, বুদ্ধি দিয়া আমরা কেবলমাত্র জ্ঞানের বিষয়বস্তুকে জানিতে পারি। ফলে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বুদ্ধির পার্থক্য বিষয়গত অথবা স্বভাবগত নহে, কেবলমাত্র কর্ম্মপদ্ধতিতেই তাহাদের পার্থক্য এবং মানুষের জ্ঞানের বিকাশের ফলে হয়তো ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি একই মননশক্তির বিচিত্র বিকাশ বলিয়া প্রতিভাত হইবে।

বাস্তবের সঙ্গে জ্ঞানের বিষয়বস্তুর পার্থক্যই কাণ্টের বিজ্ঞানবাদের মূলমন্ত্র। প্রথম দৃষ্টিতে এ পার্থক্যকে অর্থহীন মনে হইতে পারে, কারণ আমরা সাধারণত মনে করি যে যাহা জ্ঞানের বিষয় তাহাই বাস্তব, তাহাই জ্ঞানের লক্ষ্য। বিশ্লেষণের ফলে কিন্তু এ সহজ বিশ্বাস টিঁকিতে পারে না, কারণ মরীচিকা, ভ্রান্তি, স্বপ্ন এবং অন্যান্য অভিজ্ঞতার ফলে কোনটী জ্ঞান এবং কোনটী নহে, সেই সম্বন্ধেই মনে সন্দেহ জাগে, এবং বাস্তবকে জ্ঞানের বিষয়বস্তু বলিয়া বর্ণনা করিবার আর কোন সার্থকতা থাকে না। সেই কথাকেই কাণ্ট বাস্তবের সঙ্গে জ্ঞানের বিষয়বস্তুর পার্থক্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার মতে বাস্তবের স্বপ্রকাশ কোন পরিচয় নাই, থাকিলেও আমরা সে সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি না। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে বাস্তবের যতটুকু প্রবেশ, বাস্তব সম্বন্ধে কেবল ততটুকুই আমরা জানিতে পারি, কিন্তু অন্যপক্ষে অভিজ্ঞতাকে অভ্রান্ত বলিয়া জানিবার কোন উপায় নাই,

তাই অভিজ্ঞতার অভ্যন্তরীণ বাস্তবকেও নিঃসন্দেহভাবে বাস্তব বলিয়া জানিবার কোন স্বপ্রকাশ লক্ষণ মেলে না। অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ বাস্তব তাই আমাদের কাছে অজ্ঞেয় এবং চিরকাল অজ্ঞেয় থাকিতে বাধ্য,—তাহার সম্বন্ধে কোন বিবরণ দিতে যাওয়া অর্থহীন। অভিজ্ঞতায় লব্ধ জ্ঞানের বিষয়বস্তু লইয়াই তাই আমাদের কারবার, তাহাকে জানিয়া এবং তাহার মধ্যে সত্য মিথ্যার বিচার করিয়াই জ্ঞানের বিকাশ।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে অভিজ্ঞতার মধ্যে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, এবং অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ বাস্তব আমাদের কাছে অজ্ঞেয়, একথা স্বীকার করিলে অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ বাস্তবের কল্পনাই বা আমাদের মনে কেমন করিয়া আসিল? অভিজ্ঞতা-নিরাপক্ষ বাস্তককে যদি ব্রহ্ম[১] এবং জ্ঞানের বিষয়বস্তুকে যদি প্রকৃতি[২] বলা হয়, তবে বলিতে হয় যে প্রকৃতির সঙ্গেই আমাদের সমস্ত কারবার, তাহাকে জানিয়াই বুদ্ধি তৃপ্ত, কিন্তু তাহা হইলে ব্রহ্মের সঙ্গে প্রকৃতির পার্থক্যজ্ঞান কি করিয়া সম্ভবপর হইল? কাণ্টের মতে সঙ্গতিই প্রকৃতির লক্ষণ, তাই অভিজ্ঞতা সুসংবদ্ধ হইতে বাধ্য এবং অভিজ্ঞতার এই সঙ্গতিই জ্ঞানের ভিত্তি। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে সঙ্গতি রহিয়াছে বলিয়াই সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্য সম্ভবপর, এবং সেই সম্ভাবনার উপর বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। সেই জন্যই আমাদের জ্ঞান অভিজ্ঞতার সীমানাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না, সাক্ষাৎ অথবা বর্ত্তমানকে অতিক্রম করিলেও অতীত এবং ভবিষ্যৎকে লঙ্ঘন করিবার তাহার কোন ক্ষমতা নাই। ঘটনার সঙ্গে সম্ভাবনার সম্বন্ধস্থাপন করাই তাই বুদ্ধির কাজ, কিন্তু অভিজ্ঞতার সঙ্গতি রক্ষা করিয়া তবেই বুদ্ধি সম্ভাবনার বিচার করিতে পারে। এ সমস্ত কথা স্বীকার করিয়া লইয়াও, অথবা এ সমস্ত স্বীকার করিবার ফলেই কিন্তু প্রশ্ন উঠে যে সঙ্গতির প্রতিমানই যখন জ্ঞানের একমাত্র মানদণ্ড, তখন ব্রহ্মের নামোল্লোখেরও কাণ্টের কোন অধিকার নাই।

এ আপত্তি কাণ্টের নিজের মনেও উঠিয়াছিল, কিন্তু বিচার করিয়া তিনি দেখিলেন যে প্রথম দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে

---

১ ব্রহ্ম = noumenon ২ প্রকৃতি = phenomenon (appearance)

তাহা ভিত্তিহীন। ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির পার্থক্য সত্ত্বেও সমস্ত অভিজ্ঞতায় তাহাদের সংযোগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেই এ প্রশ্নেরও মীমাংসা অবশ্যম্ভাবী। সমস্ত অভিজ্ঞতায়ই ইন্দ্রিয়ক্রিয়াশীল, ইন্দ্রিয়-মুক্ত অমিশ্র বুদ্ধির বিষয়বস্তু বলিয়া কিছুই নাই। অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়াই জ্ঞানের বিকাশ, তাই সে বিকাশে ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে অতিক্রম করিবার কোন ইঙ্গিত তাহার মধ্যে নাই। অন্যপক্ষে ইন্দ্রিয় যে বিষয়বস্তু আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত করে, তাহা প্রকৃত হইলেও খণ্ডিত। একথা প্রমাণ করিবার জন্য কোন যুক্তির প্রয়োজন নাই, প্রতিদিনের অভিজ্ঞতাই তাহার সত্য প্রকাশ করে। ইন্দ্রিয়ের সংবেদনায় অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুর বিশেষ দিক অথবা খণ্ডমাত্র আমরা জানি, তাহার অন্যান্য দিক অথবা উপাদান ইন্দ্রিয়লব্ধ নহে, বুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত কল্পনার ফলেই তাহারা জ্ঞান-গোচর। এই সমস্ত অন্যান্য দিক অথবা উপাদানও কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত নহে, ইন্দ্রিয়াতীত হইলে তাহারা অভিজ্ঞতার বিষয় বলিয়াই গণ্য হইতে পারিত না। ঘরে বসিয়া যখন দেওয়ালের দিকে আমরা চাহি, তখন দেওয়ালের অপর দিক সংবেদিত হয় না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া অন্য পিঠ নাই, একথা স্বপ্নেও আমাদের মনে হয় না। অন্য পক্ষে, দেওয়ালের বাহির দিকও সংবেদনারই বস্তু, আমাদের অবস্থানের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাহাও ইন্দ্রিয়জ বলিয়া প্রকাশিত হয়। দূরে যে পাহাড়ের চূড়া আমি এই মুহূর্ত্তে দেখিতেছি, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে পাহাড় বলিয়া জানিবারও কোন উপায় নাই। ইন্দ্রিয় কেবলমাত্র আমার দৃষ্টিপথে বিশেষ আকারবিশিষ্ট বর্ণপুঞ্জকে সংবেদনা হিসাবে প্রকাশ করিতেছে। সে সংবেদনা যে প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তুর অঙ্গীভূত অথবা উপাদান, সে বস্তু যে কেবলমাত্র দ্রষ্টব্য নহে, তাহা যে স্পর্শনীয়, দার্ঢ্যশীল এবং অন্যান্য বহু প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য গুণসম্পন্ন, ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিয়া তাহা জানিবার কোনই উপায় নাই।

সঙ্গতিই প্রকৃতির লক্ষণ, কিন্তু সঙ্গতিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। তবুও

ইন্দ্রিয়জ বিষয়ের মধ্যেই সঙ্গতির সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ, তাই উপস্থিত দেশ-কালকে অতিক্রম করিয়া গেলেও সমস্ত দেশকালকে অতিক্রম করিবার কোন নির্দ্দেশ অভিজ্ঞতায় মেলে না। ব্রহ্ম এবং প্রকৃতির পার্থক্যে কাণ্ট এই কথাই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। একপক্ষে সমস্ত অভিজ্ঞতার মূলেই ইন্দ্রিয়জ উপাদান, অন্যপক্ষে ইন্দ্রিয়জ বর্ত্তমানকে অতিক্রম না করিয়া গেলে অভিজ্ঞতার কোন অর্থই হয় না। এই অতিক্রমণ বুদ্ধির ধর্ম্ম, এবং কাণ্টপূর্ব্ব বহু দার্শনিকের মতে এই অতিক্রমণেই জ্ঞানের সম্ভাবনা। তাঁহারা বলিয়াছেন যে ইন্দ্রিয়-লব্ধ বিষয় প্রকৃত, কিন্তু ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিয়া বুদ্ধি যে বিষয়ের পরিচয় পায়, তাহা কেবলমাত্র প্রকৃত নহে, তাহা বাস্তব অথবা ব্রহ্ম। কাণ্ট কিন্তু সে কথা অস্বীকাব করিয়াছেন। বারম্বার এই সত্যই তিনি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন যে এ অতিক্রমণ ইন্দ্রিয়ের বর্ত্তমানের অতিক্রমণ হইলেও ইন্দ্রিয়ের অতিক্রমণ নহে।

কাণ্টের জ্ঞানতত্ত্বকে প্রকাশ করিয়া বলা চলে, অভিজ্ঞতায় যে প্রকৃতিকে আমরা জানি, তাহা ব্রহ্ম অথবা বাস্তবেরই অংশ। খণ্ডের সঙ্গে সমূহের যে সম্বন্ধ, প্রকৃতির সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধও তাহারি অনুরূপ। ব্রহ্ম এবং প্রকৃতি বিভিন্নধর্ম্মী নহে, বিভিন্ন মনোবৃত্তির বিষয়বস্তু হিসাবে তাহাদের গণনা করা চলে না, এমন কি প্রকৃতিকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব অথবা কার্য্যফল মনে করিবারও কোন কারণ নাই। ফলে তাহাদের পার্থক্য স্বভাবগত নহে. আমাদের জ্ঞান ক্রমবর্দ্ধমান বলিয়া তাহা বিকাশগত।

কথাটীকে আরো একটু পরিষ্কার করিয়া বলা বোধ হয় আবশ্যক। আমাদের জ্ঞান ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির সংযোগের ফল। ইন্দ্রিয় কেবলমাত্র দেশকালগত মুহূর্ত্তিক বর্ত্তমানকে প্রকাশ করে, কিন্তু সেই আণবিক সময়ের মধ্যে চিত্ত সীমাবদ্ধ থাকিতে পারেনা। তাই বুদ্ধি প্রতি নিমেষেই সেই আণবিক মুহূর্ত্তকে অতিক্রম করিয়া যায়, কিন্তু বুদ্ধির এই অভিযান কোনকালেই সমস্ত দেশকালের সীমানা পার হইয়া যাইতে পারেনা। সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্যের সম্ভাব্যতা এই অতিক্রমণের উপরেই

প্রতিষ্ঠিত। তাই এই প্রকারের বাক্য কেবলমাত্র বিজ্ঞানের সাধারণ সূত্রকেই প্রকাশ করেনা, সমগ্র অভিজ্ঞতায়ই এই প্রকারের বাক্য বর্ত্তমান।

কাণ্টের মতে আমরা বাস্তব বা ব্রহ্মকে সাক্ষাৎভাবেই জানি। কিন্তু সে জ্ঞান আংশিক এবং অসম্পূর্ণ। তাহাতে ব্রহ্মের দিক বা খণ্ডবিশেষ প্রকাশ পায় বলিয়াই তাহাকে আমবা প্রকৃতি বলিয়া থাকি। তাহার প্রকৃতি নামের অর্থই এই যে ব্রহ্মের সমগ্রতা আমাদের অভিজ্ঞতার বোধগম্য নহে। কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জ্ঞান বিকাশ লাভ করে, অবস্থানের পরিবর্ত্তনেও নিত্যনূতন সামগ্রী জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়। কিন্তু দেশ ও কালের সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যেও আমাদের জ্ঞান আংশিকই থাকিয়া যায়। ব্রহ্মের বিভিন্ন দিক এবং বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন দেশে ও কালে জ্ঞানগোচর হয় এবং তাহাদিগকে কল্পনা ও স্মৃতিশক্তির সাহায্যে গ্রথিত করিয়া যাহা আমরা পাই তাহাই আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ। ব্রহ্মের ঐক্য তাই অভিজ্ঞতার পূর্ব্বমীমাংসা[1] কিন্তু সে ঐক্যকে আমরা কখনই সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারি না, অনুমানের সাহায্যে তাহার ধারণা কবি মাত্র। অভিজ্ঞতায় বিষয়ীর এবং বিষয়ের ঐক্য এই ঐক্যকেই বিভিন্ন রূপে প্রকাশ করিতেছে। তাহারি ফলে বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা বলিয়া জানিতে পারি, ইন্দ্রিয়লব্ধ বিভিন্ন এবং বিচ্ছিন্ন সংবেদনার মধ্যে একই বস্তুর প্রকাশ দেখিতে পাই।

ব্রহ্মের যে অংশ সাক্ষাৎভাবে আমাদের জ্ঞানগোচব, সেখানে সমস্ত সংবেদনাই দেশ ও কালের নিয়মাধীন। সেই সাক্ষাৎ সংবেদনাকে আণবিক মনে করিলে অভিজ্ঞতার কোন বিবরণ দেওয়া যায় না, তাই অসাক্ষাৎ সংবেদনার সঙ্গে তাহাদের যোগ অবশ্যচিন্তনীয়। এই সংযোগকে আকস্মিক অথবা দৈবাৎ মনে করিবার কোন উপায় নাই, কারণ তাহাই আমাদের বস্তুবোধের ভিত্তি। বস্তুর বিশিষ্ট স্বভাবকে প্রকাশ করে বলিয়া বিশেষ বস্তুর বেলায় এই সংযোগরীতি

১। পূর্ব্বমীমাংসা—presupposition।

বিভিন্ন কিন্তু অভিজ্ঞতার সামগ্রী হিসাবে সমস্ত বস্তুরই স্বভাবের যে ঐক্য, সংযোগরীতির উপর তাহারও প্রভাব না থাকিয়া পারে না। তাই দেশ ও কালের যে সংগঠন সাক্ষাৎ সংবেদনার মধ্যে প্রকাশিত, অসাক্ষাৎ সংবেদনার মধ্যেও তাহার উপস্থিতি না ভাবিয়া আমরা পারি না। তাই কাণ্টের মতে অভিজ্ঞতায় ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়মাত্রই দেশ-কালগত, এবং দেশ ও কালের ঐক্য অভিজ্ঞতার সঙ্গতির প্রধান উপকরণ। দেশ ও কালের ঐক্য না থাকিলে অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়, তাই দেশ এবং কালের ঐক্য বুদ্ধির পক্ষে অনতিক্রমণীয়। ব্যক্তির সমস্ত অভিজ্ঞতাই তাই দেশকালনির্দ্দিষ্ট, এবং ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধও অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু বলিয়া এই দেশকাল কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের প্রতি প্রযোজ্য নহে, সমস্ত বিশ্বসৃষ্টিরই দেশকাল এক। ফলে দেশ ও কাল কেবলমাত্র ঘটনার সঙ্গে ঘটনার সম্বন্ধের ফল নহে, বরঞ্চ এক অসীম ও অনন্ত দেশকালের কাঠামোর মধ্যেই অভিজ্ঞতা বিকশিত হইতেছে।

কাণ্টের বিজ্ঞানবাদের অর্থ এখানেই মেলে। প্রকৃতি এবং ব্রহ্মের পার্থক্যে কাণ্ট কাল্পনিক বা মানসিকের সঙ্গে বাস্তবের পার্থক্যকে প্রকাশ করিতে চাহেন নাই। তাই তাঁহার মতে প্রকৃতি চিত্তজাত নহে, বরঞ্চ বস্তু এবং চিত্তের পার্থক্য প্রকৃতিরই অন্তর্ভুক্ত। প্রতিবিম্ববাদের[১] বিরুদ্ধে তিনি তাই বারে বারে বলিয়াছেন যে বস্তুকে জানিয়াই আমরা চিত্তকে জানিতে পারি, বিষয় না থাকিলে বিষয়ীর জ্ঞানও সমানই অসম্ভব। সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্য কি করিয়া সম্ভবপর, তাহাই কাণ্টের প্রধান সমস্যা। ইন্দ্রিয় যে জগৎকে প্রকাশ করে, তাহা আণবিক ও বিচ্ছিন্ন, অথচ অভিজ্ঞতা সংবেদনার মধ্যে আবদ্ধ নহে, বর্ত্তমানকে অতিক্রম করিয়া অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে তাহা বর্ত্তমানের সম্বন্ধস্থাপন করিতে চাহে। এ সমস্যার উত্তর প্রতিবিম্ববাদে মেলে না, কারণ ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয় বাস্তবের প্রতিবিম্ব, একথা বলিলে সংবেদনার সঙ্গে সংবেদনার সম্বন্ধের যে প্রয়োজনীয়তা, তাহার বিষয়ে

১। প্রতিবিম্ববাদ—representationism.

কিছুই বলা হয় না। জ্ঞানতন্ত্রবাদ এবং বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদও এ প্রশ্ন সম্বন্ধে নিরুত্তর, কারণ অভিজ্ঞতার বিষয় মানসিক অথবা চিত্তবহির্ভূত, যাহাই হইক না কেন, সাক্ষাতের সঙ্গে অসাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার অচ্ছেদ্য বন্ধনের কোন বিবরণই তাহাতে মেলে না। বস্তু ও চিত্তের সত্তার আলোচনা কাণ্টের উদ্দেশ্য নহে, প্রকৃতি ও ব্রহ্মের পার্থক্যেও তাই তিনি স্বভাবের কোন পার্থক্য প্রকাশ করিতে চাহেন নাই। তাঁহার বক্তব্যকে প্রকাশ করিয়া বলা চলে যে ইন্দ্রিয়জ্ঞান সাক্ষাৎ দেশকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বুদ্ধি সাক্ষাৎকে অতিক্রম করিয়া যায়, কিন্তু সে অতিক্রমণেও ইন্দ্রিয়জ জগতের সংগঠন ও সংযোগরীতিকে পরিত্যাগ করে না। তাই মনে হইতে পারে যে এই সংগঠন ও সংযোগরীতি সমগ্র বাস্তবেরই পক্ষে সত্য, সুতরাং তাহারা ব্রহ্মেরই স্বভাবকে প্রকাশ করিতেছে, তাহাদিগকে জানিয়া আমরা ব্রহ্মকেই জানিতেছি। এই সংগঠন ও সংযোগরীতি কিন্তু ইন্দ্রিয়লব্ধ নহে, তাহারা বুদ্ধির সামগ্রী, এবং সেই জন্যই কাণ্টপূর্ব্ব বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের ধারণা যে বুদ্ধি দিয়া আমরা ব্রহ্মের স্বভাব জানিতে পারি। ফলে ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির বিষয়ের দ্বিত্বস্বীকার অবশ্যম্ভাবী, এবং অভিজ্ঞতায় তাহাদের সংযোগ রহস্যই থাকিয়া যায়।

এই রহস্যের সমাধান করিবার সাধনায় কাণ্টের বিজ্ঞানবাদের বিকাশ। তিনি দেখিলেন যে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার সংগঠন ও সংযোগ-রীতিকে ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্মের স্বভাবের পরিচয় মনে করিলে স্ববিরোধী সিদ্ধান্ত অবশ্যম্ভাবী। ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির সংযোগকে স্বীকার করিয়া লইয়া এই সমস্ত মননরীতিকে আমরা যতদূর ইচ্ছা প্রসারিত করিতে পারি। তাহার ফলে ব্রহ্মের নূতন নূতন অংশ এবং রূপ আমাদের জ্ঞানগোচর হয়, বিজ্ঞানের সাধনা বর্ত্তমান এবং ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করিয়া মানবচিত্তের সম্মিলিত অভিজ্ঞতায় সমগ্র জগতের পরিচয় দিতে চাহে। কিন্তু ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিতে চাহিলেই মুস্কিল বাধে, তাহার ফলে জ্ঞানের বিকাশের পরিবর্ত্তে ভ্রান্তিরই বিস্তার অবশ্যম্ভাবী। তাই কাণ্টের মতে ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিকে বিচ্ছিন্ন

করা অসম্ভব, তাহাদের বিষয়বস্তুও স্বতন্ত্র নহে। বুদ্ধি তাই ইন্দ্রিয়াতীত সত্যকে প্রকাশ করিতে পারে না, ইন্দ্রিয়জ বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপন করিয়াই তাহাকে তৃপ্ত থাকিতে হয়। বুদ্ধির জ্ঞানে তাই সম্পূর্ণতার সাধনা রহিয়াছে, কিন্তু সাধনা রহিয়াছে এই বোধই সে জ্ঞানের অপূর্ণতার পরিচায়ক। সেই অপূর্ণতা-বোধ হইতেই আমরা ব্রহ্মের পূর্ণতার ধারণা করি, কিন্তু তাহা কেবলমাত্র ধারণা থাকিতে বাধ্য। ক্রমবর্দ্ধনশীল হইয়াও মানুষের জ্ঞান চিরদিনই আংশিক এবং অসম্পূর্ণ, প্রকৃতি এবং ব্রহ্মের পার্থক্যে কাণ্ট এই সত্যকেই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন,—ইহাই তাঁহার বিজ্ঞানবাদের মর্ম্মকথা।

হুমায়ুন কবির

প্রাচীন শিলালিপি ও কাব্য

প্রাচীন শিলালিপি আলোচনা করলে আমরা নানাযুগের সাহিত্য-সৃষ্টির ধারা সম্বন্ধে একটা ইঙ্গিত পাই। সে ইঙ্গিত হ'তে যে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের ক্রমবিকাশের খোঁজ পাওয়া যায় সে কথা ইউ-রোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে ব্যুলার ও লেভি বিশেষ করে বলেছেন।

সব চেয়ে প্রাচীন শিলালেখ হচ্ছে অশোকের খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের। অশোকলিপি ছন্দোবদ্ধ নয়, তার ভাষাও সংস্কৃত নয়। কিন্তু সে লিপির রচনায় ও শব্দবিন্যাসে একটা সহজরীতির খোঁজ পাওয়া যায়। লঘুত্বই হচ্ছে সে রচনা-ভঙ্গীর প্রাণ এবং সেই জন্যই তাকে সুকুমার সাহিত্যের গণ্ডী থেকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া চলে না। যখন অশোক বলেন—"দেবনাং পিয়ে পিয়দশি লাজা হেবম্ আহা দুবাদ-শবাভিসিতেন মে ইয়ম্ আনপয়িতে সবতা বিজিতসি মম সুতা লাজুকে পাদেসিকে পংচসু পংচসু বসেসু অনুসয়ানং নিখমংতু"—[দেবানাং প্রিয়ো প্রিয়দর্শী রাজা এবমাহ দ্বাদশবর্ষাভিষিক্তেন ময়া ইদমাজ্ঞাপয়িতম সর্ব্বথা বিদিতোঽস্তু মম যুক্তাঃ রাজুকাঃ প্রদেশিকাঃ পঞ্চসু পঞ্চসু বর্ষেষু অনুসংযানং নিষ্ক্রমন্তু], কিংবা যখন বেহিস্তান শিলালিপিতে দরায়ুস অনাড়ম্বরের সঙ্গে বলেন—থাতিয়্ দারয়বুস্ খ্‌সায়থিয় [রাজা দরায়ুস বল্‌ছেন—] তখন আমাদের বুঝতে দেরী হয় না যে এই দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী ও রাজা দরায়ুস সত্যকার রাজা। অথচ নানা বিশেষণের আড়ম্বর সত্ত্বেও "পরমেশ্বরপরমবৈষ্ণবপরমভট্টারকমহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবঃ কুশলী" যে সত্যই সে মর্য্যাদার মহারাজাধিরাজ ছিলেন না তা সহজেই বোঝা যায়।

অশোকলিপির রচনানৈপুণ্যের পরিচয় সমসাময়িক বৌদ্ধ সাহিত্য থেকেও পাওয়া যায়। সুত্তনিপাত বৌদ্ধ সাহিত্যের একখানি প্রাচীন গ্রন্থ—আর এর মধ্যে কখনো কখনো যে রচনারীতির খোঁজ পাওয়া যায় তা নিতান্ত মামুলী ধরণের নয়। সে রীতির সহজগতি ও লঘুত্ব সংস্কৃত

সাহিত্যের বৈদর্ভী রীতির সঙ্গে তুলনা করা চলে। সুত্তনিপাতের ধনীয়সুত্তে ধনীয়ো গোপ বুদ্ধকে বলছে—

পক্কোদনো দুদ্ধখীলো' হম্ অস্মি,
অনুতীরে মহিয়া সমানবাসো,
ছন্না কুটি, আহিতো গিনি,
অথ চে পথয়সী পবস্স দেব।

[আমি ভাত রেঁধেছি, দুধ দুইয়েছি, মাহি নদীর তীরে আমার বাস, ছাউনির কুটীর, সেখানে আগুন জ্বালা রয়েছে। সুতরাং বৃষ্টি এখন হতে পারে।]

এর উত্তরে বুদ্ধ বলছেন—

অক্কোধনো বিগতখিলো' হম্ অস্মি,
অনুতীরে মহিয়েকরত্তিবাসো।
বিবটা কুটি নিব্বুতা গিনি,
অথ চে পথয়সী পবস্স দেব॥

[আমি ক্রোধ ও মনের বাধা নষ্ট করেছি। মাহি নদীর তীরে এক রাত্রি আমার বাস, ব্যাবৃত কুটীর, নিবৃত আগুন, সুতরাং বৃষ্টি এখন হতে পারে]

বুদ্ধের এ উত্তর দ্ব্যর্থবোধক হলেও তার সহজগতি কিছুমাত্র ব্যাহত হয় নি। বরং তা বজায় রেখে যে শব্দালঙ্কারের সৃষ্টি করা হয়েছে তা কোন সুদক্ষ কবি ব্যতীত অন্যের সম্ভব নয়।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শিলালিপিতে সত্যকার সংস্কৃত কাব্যের ছায়া ধরা পড়ে। এ যুগের দুখানি শিলালিপির রচনাভঙ্গী কাব্যরীতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের গির্ণার লিপি ও মহারাজ শ্রীপুলমায়ির নাসিক লিপি। গির্ণার লিপি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষভাগের, তার রচনা গদ্য ও ভাষা সংস্কৃত। নাসিকলিপিও ঐ শতকের মধ্যভাগের, তার রচনারীতি গদ্য ও ভাষা প্রাকৃত আর সে প্রাকৃত হচ্ছে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত।

গির্ণার লিপি যিনি রচনা করেছিলেন তিনি কাব্যরীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কাব্যের প্রাণ হচ্ছে ওজঃ গুণ আর এ গুণ নির্ভর করে সমাসবহুলতার উপর। এ দুই লিপিই হচ্ছে সমাসবহুল। গির্ণার লিপিতে শব্দ ও বর্ণের অনুপ্রাসেরও বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। আর এ সব অনুপ্রাস না থাকলে কাব্যরচনা সম্পূর্ণতা লাভ করে না। শব্দানুপ্রাস—গুরুভিরভ্যস্তাম্নো রুদ্রদাম্নো, সৃষ্টবৃষ্টিনা,—বিধেয়ানাং যৌধেয়ানাং,—ন্যায়াগতানাং বিদ্যানাং ইত্যাদি। বর্ণানুপ্রাস—গিরিশিখর-তরুতটাট্টালকোপতল্পদ্বারশরণোচ্ছ্রয়-বিধ্বংসিনা।

গির্ণার লিপিতে উপমা ও উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার বিরল হলেও আছে, যেমন—পর্ব্বতপ্রতিস্পর্দ্ধী, মরুধন্বকল্প, পর্জ্জন্যেন একার্ণবভূতায়ামিব পৃথিব্যাঃ কৃতায়াং।

এই সব গুণ থাকাতেই গির্ণার লিপিকে গদ্যকাব্য বলা চলে, আর এ লিপির রচয়িতাও এ রচনা যে কাব্য তা নিজেই বলেছেন। কারণ মহারাজা রুদ্রদামনের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—স্ফুট-লঘু মধুরচিত্রকান্তশব্দসময়োদারালঙ্কৃতগদ্যপদ্য-[কাব্যবিধানপ্রবীণে] ন—

সুতরাং এই অজ্ঞাতনামা প্রাচীন কবির মতেও কাব্য দুই প্রকারের গদ্য ও পদ্য। সে কাব্যের গুণ হচ্ছে স্ফুটত্ব, লঘুত্ব, মাধুর্য্য, বৈচিত্র্য, কান্তি, শব্দবিন্যাস, ঔদার্য্য ও অলঙ্কার। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রেও কাব্যের বিশেষতঃ বৈদর্ভীরীতির এই সব গুণের কথা বলা হয়েছে—

শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা সমাধির্মাধুর্য্যমোজঃ
পদসৌকুমার্য্যম্।
অর্থস্য চ ব্যক্তিরুদারতা চ কান্তিশ্চ
কাব্যস্য গুণা দশৈতে॥ (নাট্যশাস্ত্র)

শ্রীপুলমায়ির নাসিকলিপিতেও এসব গুণ আছে সেইজন্য সে লিপিও কাব্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করা যেতে পারে। প্রথমতঃ এ লিপি সমাসবহুল সুতরাং ওজঃ গুণবিশিষ্ট, এ লিপিতে নানা অলঙ্কার ও অনুপ্রাস ব্যবহৃত হয়েছে তা ছাড়া ভাষায় মাধুর্য্যের অভাব নাই। রাজাকে নানা পর্ব্বতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—হিমবত-মেরু-মদর-

পবত-সম-সারস (হিমবতমেরুমন্দারপর্ব্বতসমসারস্ত—)। রাজা নানা রত্নের অধিপতি হিসাবেই হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বতের তুল্য। এ উপমা আমরা কালিদাদের কাব্যেও পাই·—

পরস্পরেণ বিজ্ঞাতস্তেষূপায়নাপানিষু।
রাজ্ঞা হিমবতঃ সারো রাজ্ঞঃ সারো হিমাদ্রিণা॥
(রঘুবংশ)

কাদম্বরীতেও রাজা শূদ্রককে বলা হয়েছে—

মেরুরিব সকলভুবনোপজীব্যমানপদচ্ছায়ঃ—

শ্রীপুলমায়িকে আরও যে সব বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে তা' সংস্কৃত কাব্যরীতির সঙ্গে পরিচিত কোন কবি ব্যতীত অন্য লেখকের কল্পনার বহির্ভূত। তাঁকে বলা হয়েছে—সবরাজলোকমডলপতিঘাত-সাসন, দিবসকরবিবোধিতকমলবিমলসদিশবদন, তিসমুদতোয়পীতবাহন, পটিপুণচদমডলসসিরীকপিয়দশন, বরবারণবিকমচারুবিকম—, ভুজগপতি-ভোগপীনবাটবিপুলদীঘস্দ...ভুজ, অভয়োদকদানকিলিননিভয়কর, অবিপনমাতুসুসাসক, পোরজননিবিসেসসমসুখদুখ—, খতিয়দপমানমদন—ইত্যাদি।

শিলালিপিতে ছন্দোবদ্ধ কাব্যের প্রথম পরিচয় পাই সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি ও কুমারগুপ্তের রাজ্যকালীন বন্ধুবর্ম্মণের মান্দাসোর প্রশস্তিতে। এলাহাবাদ প্রশস্তি খৃষ্টীয় চতুর্থশতকের ও মান্দাসোর পঞ্চম শতকের। মান্দাসোরের প্রাচীন নাম হচ্ছে দশপুর, পশ্চিম মালবের রাজধানী, শিবানী নদীর তীরে অবস্থিত। এ নদী হচ্ছে তাপ্তীর শাখা বিশেষ। দশপুরের প্রশস্তিকার বৎসভট্টি যে উজ্জয়িনীর কাব্যকলানিপুণ কবিদের এমন কি কালিদাসের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে এই প্রশস্তি রচনা করেছিলেন তা' খুবই সম্ভব।

মান্দাসোর প্রশস্তিতে মহাকাব্যের যে সব গুণ নির্দ্দিষ্ট হয়েছে তা' সবই আছে। তাতে দেশ, নগর, সমুদ্র, পর্ব্বত, ঋতু রাজা প্রভৃতির বর্ণনা পাই। তাতে ছন্দের বৈচিত্র্যের অভাব নাই।

মোট ৪৪টী শ্লোকের মধ্যে অনুষ্টুভ, আর্য্যা, ইন্দ্রবজ্রা, উপজাতি, উপেন্দ্রবজ্রা, দ্রুতবিলম্বিতা, মন্দাক্রান্তা, মালিনী, বংশস্থ, বসন্ততিলকা, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, হারিণী, প্রভৃতি নানা ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

কবি বৎসভট্টি মঙ্গলাচরণের পর দেশের বর্ণনা করেছেন। সে দেশ হচ্ছে লাট দেশ, সে দেশ কবির মতে পৃথিবীর মধ্যে রমণীয় কারণ সে দেশের গাছপালা কুসুমভরে অবনত, সে দেশের পর্ব্বতমালা শ্যামল বনানীদ্বারা আবৃত আর সে দেশ মন্দির, সভাগৃহ ও বিহারে পূর্ণ।

কুসুমভরাবনততরুবরদেবকুলসভাবিহাররমণীয়াৎ।
লাটবিষয়ান্নগাবৃতাশৈলাজ্জগতি প্রথিতশিল্পাঃ॥

এই লাট দেশ হ'তে একদল প্রসিদ্ধ শিল্পী দশপুর নগরে এলো। দশপুর নগর ক্রমে পৃথিবীর তিলকস্বরূপ হয়ে উঠলো। সে নগরের সরোবর কারণ্ডবসংকুল, প্রফুল্ল পদ্মে সমাকীর্ণ, আর তার তটদেশস্থ বৃক্ষসমূহ হতে পতিত পুষ্পরাশি জল পর্য্যন্ত তীরদেশকে বিচিত্রিত করেছে। এই সরোবরে যে সব হংস ক্রীড়া করে তারা বিলোল তরঙ্গের আঘাতে পতিত পদ্মের রেণু দ্বারা আবৃত, সরোবরের কোথাও বা মৃণাল কেশরপূর্ণ পদ্মের ভারে অবনত। বনরাজি নিজপুষ্পভারে নত বৃক্ষে পূর্ণ, আর প্রগল্ভ অলিকুল ও অজস্রগীতনিপুণ পুরাঙ্গনাদের সঙ্গীতে মুখর সে নগরের গৃহসমূহ উন্নতদেহা ও শুক্লবর্ণা নারী ও চঞ্চল পতাকায় শোভিত হয়ে তড়িল্লতাবৃত শ্বেতবর্ণ মেঘশৃঙ্গের ন্যায় দেখায়, সে নগরের অট্টালিকা গন্ধর্ব্বদের সঙ্গীতে মুখর কৈলাস-পর্ব্বতের তুঙ্গ শিখরের ন্যায় দেখায়; আর সে সব অট্টালিকা, বেদিকা, চঞ্চল কদলীবন ও নানা চিত্রকর্ম্মের দ্বারা শোভিত। উন্নতবক্ষা প্রীতি ও রতির আলিঙ্গনে আবদ্ধ কামদেবের ন্যায় সে নগর দুটী চঞ্চল স্রোতস্বতীর আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ।

এই বর্ণনায় বৎসভট্টি সমসাময়িক কবিদের অনুকরণ করবার চেষ্টা করেছেন মনে হয়। বিশেষতঃ নগরের গৃহ ও অট্টালিকা ও পুরবাসিনী-দের বর্ণনায় মেঘদূতের ছায়া ধরা পড়ে। বৎসভট্টি বলেছেন—

চলৎপতাকান্যবলাসনাথান্যত্যর্থশুক্লান্যধিকোন্নতানি।
তড়িল্লতাচিত্রসিতাভ্রকূটতুল্যোপমানি গৃহাণি যত্র ॥
কৈলাসতুঙ্গশিখরপ্রতিমানি চান্যান্যাভান্তি দীর্ঘবলভীনি সবোদিকানি।
গন্ধর্ব্বমুখরাণি নিবিষ্ট চিত্রকর্ম্মাণি লোলকদলীবনশোভিতানি ॥

আর মেঘদূতে—

বিদ্যুৎবন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সংগীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদস্তাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ ॥

দেশের ও নগরের বর্ণনার পর বৎসভট্টি রাজবর্ণনা করতেও ভোলেন নি। প্রথমে হচ্ছে গুপ্তবংশীয় মহারাজা কুমারগুপ্তের বর্ণনা—কারণ মন্দাসোর লিপি উৎকীর্ণ হয় কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে। মহারাজা কুমারগুপ্ত হচ্ছেন সমস্ত পৃথিবীর [ভারতের] অধিপতি, সে পৃথিবীর মেখলা চতুঃসমুদ্রের তটদেশ, সুমেরু ও কৈলাস তার পয়োধর আর তার হাসি হচ্ছে বনান্তের প্রস্ফুটিত কুসুম—

চতুস্সমুদ্রান্তবিলোলমেখলাম্ সুমেরুকৈলাসবৃহৎপয়োধরাম্।
বনান্তবান্তস্ফুটপুষ্পহাসিনীম্ কুমারগুপ্তে পৃথিবীম্ প্রশাসতি ॥

সেই সময়ে দশপুরের রাজা ছিলেন বিশ্ববর্ম্মণের পুত্র রাজা বন্ধুবর্ম্মণ। বিশ্ববর্ম্মণ নিজে দীনের প্রতি অনুকম্পাপরবশ, আর্ত্ত ও বিপন্নের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ, অনাথের নাথ, বন্ধুবর্গের প্রতি দানে কল্প-দ্রুম, ভয়ার্ত্তের অভয়দায়ক, সমস্ত রাজ্যের বন্ধু আর তা' ছাড়া—

দীনানুকম্পনপরঃ কৃপণার্ত্তবর্গসন্ধাপ্রদোঽধিকদয়ালুরনাথনাথঃ।
কল্পদ্রুমঃ প্রণয়ীনামভয়ংপ্রদশ্চ ভীতস্য যো জনপদস্য চ বন্ধুরাসীৎ ॥

আর তাঁর পুত্র বন্ধুবর্ম্মণ ছিলেন স্থির, রাজনীতিকুশল, বন্ধুপ্রিয়, প্রজামণ্ডলের বন্ধু, বন্ধুবর্গের ভয়হর্ত্তা, দৃপ্ত, শত্রুপক্ষের সংহারে দক্ষ। তিনি সুপুরুষ, যৌবনসম্পন্ন, রণপটু, বিনয়নম্র এবং রাজা হয়েও রিপুর বশবর্ত্তী ছিলেন না।...

স্থৈর্য্যনয়োপপন্নো বন্ধুপ্রিয়ো বন্ধুরিব প্রজানাং ।
বংধবর্ত্তিহর্ত্তা নৃপবন্ধুবর্ম্মা দ্বিড়দৃপ্তপক্ষক্ষপণৈকদক্ষঃ ॥
কান্তো যুবা রণপটু বিনয়ান্বিতশ্চ রাজাপি সন্ন-পাশ্রিতোন মদৈঃ স্মরাদ্যৈঃ ।
শৃঙ্গারমূর্ত্তিরভিভাত্যনলঙ্কতোঽপি রূপেণ যঃ কুসুমচাপ ইব দ্বিতীয়ঃ ॥
বৈধব্যতীব্রব্যসনক্ষতানাং স্মৃত্বা যমদ্যাপ্যরিসুন্দরীণাম্ ।
ভয়াদ্‌ভবত্যায়তলোচনানাং ঘনস্তনায়াসকরঃ প্রকম্পঃ ॥

এ বন্ধুবর্ম্মণের রাজত্বকালে দশপুরনগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে ও সে নগরেব শিল্পীরা নিজেদের একটী শ্রেণী স্থাপন করে এবং সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করে। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা বলতে গিয়ে কবি বৎসভট্টি ঋতু বর্ণনার অবকাশ পেয়েছেন আর সে বর্ণনায় তিনি বিশেষ-ভাবে রচনানৈপুণ্যের প্রমাণ দিয়েছেন। মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় যে ঋতুতে সে হচ্ছে হেমন্ত—

রামাসনাথরচনে দরভাস্করাংশুবহ্নিপ্রতাপসুভগে জললীনমীনে।
চন্দ্রাংশুহর্ম্ম্যতলচন্দনতালবৃন্তহারোপভোগরহিতে হিমদগ্ধপদ্মে ॥
রোধ্রপ্রিয়ংগুতরুকুন্দলতা-বিকাশপুষ্পসবপ্রমুদিতানি কলাভিরামে,
তুষারকণকর্কশশীতাবাতবেগপ্রনৃত্তলবলীনগনৈকশাখে ॥
স্মরবশগতরুণজনবল্লভাঙ্গনাবিপুলকান্তপীনোরু ।
স্তনমজঘনঘনালিঙ্গন নির্ভর্ৎসিততুহিনহিমপাতে ॥

তখন নারীরা তাদের প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হন, সূর্য্যকিরণের খরতাপে উপত্যকাসমূহ আনন্দদায়ক হয়, ও মীন গভীর জলে প্রবেশ করে। তখন চন্দ্রকিরণ, হর্ম্ম্যতল, চন্দন, তালবৃন্ত কিংবা হার কিছুই উপভোগ করা যায় না, পদ্ম শিশিরসিক্ত হয়ে তার গন্ধ হারায়। তখন রোধ্র, প্রিয়ঙ্গতরু, কুন্দলতা প্রভৃতির বিকশিত পুষ্পের মধুর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমর সুমধুর কলধ্বনি করে। তখন শীতবায়ু শিশির-কণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কর্কশ হয়ে ওঠে আর সে বায়ুর দ্বারা উদ্বেলিত হয়ে লবলীকুঞ্জ ও নগমবৃক্ষের বিরল শাখা নৃত্য করে।

হেমন্তের এই বর্ণনা কালিদাসের ঋতুসংহারে অনুরূপ বর্ণনার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

ন চন্দনং চন্দ্রমরীচিশীতলং হর্ম্যপৃষ্ঠং শরদিন্দুনির্মলম্।
ন বায়বঃ সান্দ্রতুষারশীতলা জনস্য চিত্তং রময়ন্তি সাম্প্রতম্॥

এই হেমন্ত ঋতুতে প্রতিষ্ঠিত দশপুরের সূর্য্যমন্দির কালক্রমে জীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন তার সংস্কার প্রয়োজন হয়। সে সংস্কার হয় শীত ঋতুতে। সুতরাং এই অবসরে কবি বৎসভট্টি শীতঋতুর বর্ণনা করেছেন—

স্পষ্টৈরাশোকতরুকেতকসিন্দুবারলোলাতিমুক্তকলতামদয়ন্তিকানাং।
পুষ্পোদ্গমৈরভিনবৈরাধিগম্য নূনমৈক্যং বিজৃম্ভিতশরে হরপূতদেহে॥
মধুপানমুদিতমধুকরকুলোপগীত-নগনৈকপৃথুশাখে।
কালে নবকুসুমোদ্গমদন্তুরকান্তপ্রচুররোধ্রে॥

অর্থাৎ সে (শিশির) ঋতুতে যে দেবতার দেহ হরকোপানলে ভস্মীভূত হয়েছিল, সেই কামদেব অশোক, কেতকী, সিন্দুবার, চঞ্চল অতিমুক্তকলতা ও মদয়ন্তিকার অভিনব পুষ্পোদ্গমের সঙ্গে তাঁর (পঞ্চ) শর ফিরিয়ে পান। তখন নগনবৃক্ষের বিরল পৃথুল শাখা মধুপানে মত্ত মধুকরকুলের সঙ্গীতে মুখর হয়। আর প্রচুর পল্লবে মনোহর রোধ্র নবকুসুমোদ্গমে সজ্জিত হয়ে দোদুল হয়ে ওঠে।

এলাহাবাদ প্রশস্তি বৎসভট্টির প্রশস্তির মত দীর্ঘ না হলেও তার রচয়িতা বৎসভট্টির চেয়ে বেশী কাব্যকলাকুশল ছিলেন। এলাহাবাদ প্রশস্তি খৃষ্টীয় চতুর্থশতকের মধ্যভাগে রচিত হয়েছিল আর তার রচয়িতা হরিষেণ সে প্রশস্তিকে নিজেই কাব্য বলেছেন (এতচ্চ কাব্যমেব—)। এ প্রশস্তিতে যে রাজার গুণকীর্ত্তন করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন সমুদ্রগুপ্ত। প্রশস্তির প্রথম অংশ ছন্দোবদ্ধ আর দ্বিতীয় অংশ গদ্য—সে গদ্যও কাব্যগন্ধী। প্রথম অংশে হরিষেণ যে সব ছন্দ রচনায় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন সেগুলি হচ্ছে—স্রগ্ধরা, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ও মদাক্রান্তা। প্রশস্তির এ অংশ খণ্ডিত, মাত্র একটী শ্লোক সম্পূর্ণ পাওয়া যায়—

আর্য্যো হীত্যুপগুহ্য ভাবপিশুনৈরুৎকীর্ণিতৈ রোমভিঃ
সভ্যেষুচ্ছ্বসিতেষু তুল্যকুলজম্লানাননোদ্বীক্ষিতঃ।
স্নেহব্যালুলিতেন বাষ্পগুরুণা তত্ত্বেক্ষিণা চক্ষুষা
যঃ পিত্রাভিহিতো নিরীক্ষ্য নিখিলাং পাহ্যেবমুর্ব্বীমিতি॥

সমুদ্রগুপ্তের পিতা তাঁকে 'তুমি সত্যই আর্য্য' এই বলে আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন 'তুমি এইবার পৃথিবী শাসন কর।' তাঁর নয়ন তখন স্নেহে ব্যালুলিত, আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তীক্ষ্ণদৃষ্টি-সম্পন্ন ; সভাসদেরা তখন আনন্দে উচ্ছ্বসিত আর স্বজনবর্গের আনন ম্লান।

হরিষেণের এই শ্লোকটী নিখুঁত, এর ছন্দ ও শব্দ-বিন্যাস নির্দ্দোষ-একার্থবোধক শব্দের পুনরুক্তি নাই আর এর বিষয়বস্তু কবি অতি অল্প কথায় স্পষ্টভাবে আমাদের সাম্‌নে ধরে দিয়েছেন। আমরা চোখের সাম্‌নে দেখতে পাই বৃদ্ধ মহারাজা চন্দ্রগুপ্ত পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে সম্রাটপদে অভিষিক্ত করছেন, স্নেহার্দ্র হলেও তাঁর নয়ন তত্ত্বদর্শী, ভবিষ্যতে পুত্রদের মধ্যে কে সম্রাটপদের মর্য্যাদা রক্ষা কবতে পারবে তাঁর সূক্ষ্মদর্শী নয়ন তা বুঝতে পেরেছে। সমুদ্রগুপ্তকে যখন তিনি 'তুমি সত্যই আর্য্য' বলে বরণ করছেন তখন সাম্রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সভাসদেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে আনন্দাপ্লুত হয়ে উঠেছে আর অন্য কুমারগণের আনন তখন ব্যর্থতার আক্ষেপে ম্লান।

হরিষেণের এই প্রশস্তির আর একটী খণ্ডিত শ্লোক থেকে আমরা বুঝতে পারি যে মহারাজা সমুদ্রগুপ্ত বিদ্যা ও কাব্যের মর্য্যাদা জান্‌তেন। তিনি বিদ্বানের সঙ্গে কালযাপনে আনন্দ লাভ করতেন (প্রজ্ঞানু-ষঙ্গোচিতসুখমনসঃ); শাস্ত্রতত্ত্বকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন (শাস্ত্রতত্ত্বার্থভর্ত্তুঃ)। সুতরাং তাঁর আজ্ঞা পণ্ডিতমণ্ডলীর গুণের দ্বারা যেন বহুগুণ শক্তিসম্পন্ন হয়ে সৎকাব্য ও লক্ষ্মীর মধ্যে যে চিরন্তন বিরোধ তা' দূরীভূত করেছিল। সেই জন্যই তাঁর রাজ্যকীর্ত্তি বিদ্বল্লোকে বহু কবিতায় কীর্ত্তিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

—সৎকাব্যশ্রীবিরোধান্ বুধগুণিতগুণাজ্ঞনাহতানেব
বিদ্বল্লোকে বি-··স্ফুটবহুকবিতাকীর্ত্তিরাজ্যং ভুনক্তি।

কাব্যকলা ও শ্রীর এই বিরোধের কথা অন্য কবিরাও বহু স্থানে উল্লেখ করেছেন আর তাদের উভয়ের মিলনের কথা কালিদাসও বলেছেন—

পরস্পরবিরোধিন্যোরেক সংশ্রয়দুর্লভম্।
সংগতং শ্রীসরস্বত্যোর্ভূতয়েস্তু সদা সতাম্॥

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে উজ্জয়িনীতে শকরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, আর শকরাজারা বিজাতীয় হলেও ভারতীয় সভ্যতায় অল্পায়াসেই দীক্ষালাভ করেন। তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পরিপোষক, আর বিদ্বান্ ও কবিদের সত্যকার বন্ধু। এর কারণ হয়ত ব্যক্তিগত, কারণ যদি প্রশস্তিকারের কথা মান্তে হয় তাহলে বলতে হবে যে মহারাজা রুদ্রদামন্ ছিলেন নিজে কাব্যকলায় নিপুণ। উজ্জয়িনীর এই 'কাব্যবিধান-প্রবীণ' রাজা ও তাঁর অনুবর্ত্তী অন্যান্য রাজাদের পরিপোষকতায় উজ্জয়িনী ও তার নিকটবর্ত্তী দশপুর প্রভৃতি স্থানে বহুদিন ধরে সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা চলে, আর সে চেষ্টার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা পাই গির্ণার নাসিক ও দশপুরের প্রশস্তিতে।

উজ্জয়িনীর কবিদের সাহিত্যসৃষ্টির এই চেষ্টার হয়ত একটা পূর্ব্বেকার ইতিহাস আছে। সুত্তনিপাতের ধনিয়সুত্তের নিপুণ কবি বুদ্ধকে ও সে সঙ্গে আমাদের নিয়ে যান মাহী নদীর তীরে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের লোক—আর তিনি উজ্জয়িনী নিকটবর্ত্তী গোনর্দ্দে বসে যে মহাভাষ্য রচনা করেছিলেন তার মধ্যেই আমরা প্রথম সংস্কৃত কাব্যছন্দের প্রয়োগ পাই (যেমন মালতী, বসন্ততিলকা ইত্যাদি)। উজ্জয়িনী থেকে বিদিশা পর্য্যন্ত যে প্রাচীন রাজপথ, গোনর্দ্দ সেই পথের উপর অবস্থিত। আর সেই বিদিশাই হচ্ছে আবার, কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের পটভূমি।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে গুপ্তরাজারা নূতন সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, আর তাঁদের নূতন রাজধানী পাটলিপুত্রে আবার আমরা নূতন কবিদের সাক্ষাৎ পাই। হরিষেণের প্রশস্তিতে আমরা কাব্যরচনার পরাকাষ্ঠার পরিচয় পাই, গুপ্তবংশের পরবর্ত্তী কালের প্রশস্তিতেও কাব্যরীতির

প্রভাব সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। কিন্তু পরবর্ত্তীকালের প্রশস্তির রচনারীতিতে আমরা বেশীর ভাগ পাই অনুকরণ, বাগাড়ম্বর ও চাটুবাদ।

সুতরাং সংস্কৃত শিলালিপির রচনারীতি থেকে বিচার করলে মানতেই হবে যে, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হ'তে ষষ্ঠ শতক পর্য্যন্ত সংস্কৃত কাব্যসৃষ্টির প্রধান যুগ আর সে কাব্যসৃষ্টি সুরু হয় প্রথম পশ্চিম ভারতে অবন্তিদেশে—উজ্জয়িনীকে কেন্দ্র ক'রে।

এ প্রদেশ কেন কাব্যরচনায় প্রথম কেন্দ্র হয়েছিল তার হয় ত কোন গূঢ় কারণ থাকতে পারে। বনরাজিতে শোভিত, অনুচ্চ পর্ব্বতসঙ্কুল ও নদীমাতৃক এই দেশ হয় ত কবিকে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করতে পারত—সেই জন্যই তাঁদের রচনা আমাদের মনকে মাহী, নর্ম্মদা রেবা প্রভৃতি নদীর তীরে টেনে নিয়ে যায়। আর সেই জন্যই হয় ত কাব্য-প্রকাশের রচয়িতা ও তাঁর সঙ্গে বাংলার ভাবপ্রবণ সাধক চৈতন্যদেব রেবা নদীর তীরবর্ত্তী বেতসীতরুতলে আর চৈত্র মাসের রজনীতে বিকসিত মালতীর সৌরভযুক্ত কদম্বকাননের মন্দ মন্দ সমীরণ না হলে দয়িত কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন না—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তেচোন্মীলিত-মালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়া কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপিতত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

'মান লজ্জা ভয়'

উপনিষদের ব্রহ্ম—সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্, তিনি একাধারে 'অস্তি ভাতি প্রিয়ঃ'—খৃষ্টানী ভাষায়, তিনি Life, Light and Love. তিনি Trinity (ত্রেধাত্মা)—সচ্চিদানন্দ।

He is eternally, He knows eternally, He desires eternally
—St Augustine

অর্থাৎ তিনি যুগপৎ Omnipotent, Omniscient and All-loving; এক কথায়, প্রতাপ প্রজ্ঞা ও প্রেম—Power, Wisdom and Bliss—তাঁহাতে পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত।

এই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য-সিদ্ধিই জীবের পরম পুরুষার্থ—তাহার Summum Bonum. ঐ সিদ্ধির সাধন কি? প্রকৃতির প্রভেদ-অনুসারে ঐ সাধন ত্রিবিধ—কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি। যিনি 'বীর' সাধক (Hero-type)—ব্রহ্মের প্রতাপের প্রতি যাঁহার পক্ষপাত, তিনি কর্ম্মযোগ দ্বারা ব্রহ্মণ্যদেবের সহিত মিলিত হন। যিনি 'ধীর' সাধক (Sage-type)—ব্রহ্মের প্রজ্ঞার প্রতি যাঁহার পক্ষপাত, তিনি জ্ঞান-যোগ দ্বারা ব্রহ্মণ্যদেবের সহিত মিলিত হন। আর যিনি 'পীর' সাধক (Saint-type)—ব্রহ্মের প্রেমের প্রতি যাঁহার পক্ষপাত, তিনি ভক্তি-যোগ দ্বারা ব্রহ্মণ্যদেবের সহিত মিলিত হন। কর্ম্মী ও জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম ঈশ্বরের ঈশ্বর, মহেশ্বর—তিনি 'ঈশতে ঈশনীভিঃ,' তিনি 'মহদ্ ভয়ং বজ্রম্ উদ্যতম্', তিনি 'সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ',—তাঁহার উপর বা অপর কোন কিছু নাস্তি—যস্মাৎ পরং নাপরম্ অস্তি কিঞ্চিৎ—তাঁহাকে ঊর্দ্ধে বা অধে বা মধ্যে গ্রহণ করা যায় না—নৈনম্ ঊর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভবৎ (Him, not from above nor from below, nor midmost can one grasp)—তিনি বৃহৎ যশঃ (great Glory)—তাঁহার তুলনা নাই—ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্ যশঃ।

কিন্তু ভক্তের কাছে তিনি প্রেমময় ভগবান্—'God is Love.' Love is the essence of God. —Emerson

ভক্তের কাছে তিনি ঐশ্বর্য্য-গহন নন, তিনি মাধুর্য্যসঘন। তিনি 'রসো বৈ সঃ', তিনি রসতম—রসামৃতসিন্ধু। তিনি 'Dolce Amore' (Sweetest Love)—তিনি 'মধু ক্ষরতি তদ্ ব্রহ্ম'—তিনি মধু হ'তে মধু—তিনি 'মধুরং মধুরং সকলং মধুরং'। তিনি পিতম্ (প্রিয়তম)—প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ। তিনি 'বামনী'—Lord of Love—তিনি দয়িত, বনিত, মাস্থক (Beloved)। যিনি ভক্ত, যিনি পীর—তিনি প্রেমিক (Lover), তিনি 'আসেক'—তাঁহার স্পর্শে ভক্তি প্রেমে পরিণত হয়—সা (ভক্তিঃ) কস্মৈ পরম-প্রেমরূপা (নারদ)—এবং তিনি ভগবানে এস্‌ক্ বা আসনাই করিয়া প্রেমের দ্বারা তাঁহার সহিত মিলিত হন। ইহাই প্রেমধর্ম্ম।

প্রেমধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্ব কি? অতি সংক্ষেপে প্রেমধর্ম্মের Philosophy এই:

ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ং—তিনি শুধু এক নন, তিনি অ-দ্বিতীয়—তিনি Unit এবং Unique—কিন্তু

স বৈ নৈব রেমে—তস্মাৎ একাকী ন রমতে × × স ইমমেব আত্মানং দ্বেধা অপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নীচ অভবতাং—বৃহ, ১।৪।৩

অর্থাৎ,

লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ—চরিতামৃত
প্রকৃতি হইলা কৃষ্ণ, পুরুষ আপনে
বিভিন্ন আকার হইল রমণ কারণে—দুর্ল্লভসার

ভগবান্ আত্মারাম—কেন? কিরূপে?

আত্মা তু রাধিকা তস্য তয়ৈব রমণাদ্ অসৌ।
আত্মারামতয়া প্রাজ্ঞৈঃ প্রোচ্যতে গূঢ়বেদিভিঃ॥

—স্কন্দপুরাণ

এখানে রাধিকা সমস্ত আরাধিকার, সমস্ত Lovers of God-এর type, symbol, প্রতীক, প্রতিভূ।

প্রেমলীলায় ভগবান্ রমণ—ভক্ত রমণী।

If thy soul is to go on to higher spiritual blessedness, it must become woman—yes, however manly you may be among men.—F.W. Newman.

সেইজন্য নরোত্তম দাস বলিয়াছেন—ছাড়িয়া পুরুষ দেহ, কবে বা প্রকৃতি হ'ব। ব্রজে (ভবে নয়) শ্রীকৃষ্ণই একা পুরুষ—আর সবাই প্রকৃতি। রূপগোস্বামীর প্রতি মীরা বাইয়ের উক্তি স্মরণ আছে ত'? মীরা রূপ গোস্বামীর ভক্তি-যশের কথা শুনিয়া তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চান। গোঁসাইজি বলেন 'আমি প্রকৃতির মুখ দর্শন করি না—কিরূপে দেখা করিব?' উত্তরে মীরা বলিয়া পাঠান 'গোঁসাই প্রভু কবে থেকে পুরুষ হ'লেন—আমরা ত' জানিতাম বৃন্দাবনে সবাই প্রকৃতি—একা পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ।' তখন রূপগোস্বামীর ভ্রান্তি তিরোহিত হয়, তিনি সাদরে মীরার অভ্যর্থনা করেন।

প্রেয়সীর প্রিয়তমের প্রতি যে ভাব, ভক্তের ভগবানের প্রতি সেই ভাব হওয়া চাই। এই ভাবের পরিপক্ক অবস্থা প্রেম। ইহার আরম্ভ পূর্ব্বরাগে—খৃষ্টান মিষ্টিকেরা যাহাকে First Flame of Love বলেন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন—অমনি

পহিলহি রাগ নয়নরঙ্গ ভেল!

যমুনার জলে যাইতে সজনি—
কালারূপ দেখিয়াছি—
সবে ছুটি আঁখি দিয়াছে বিধাতা—
রূপ নিরখিব কি?

তারপর আকুল উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুল সঙ্গমলিপ্সা—'অনুদিন বাড়ল, অবধি না গেল'। তখন ভক্ত বলেন—হৃদয়ং তদলোককাতরং দয়িত! ভ্রমতি কিং করোম্যহম্ (মাধবেন্দ্রপুরী) অর্থাৎ, খৃষ্টান মিষ্টিকের ভাষায়—

Never there was or can there be imagined such a love as there is between a humble soul and Thee.—Gertrude More.

কিন্তু এক হাতে ত' তালি বাজে না। শ্রীকৃষ্ণের জন্য রাধিকার যেমন উৎকণ্ঠা—রাধার জন্য শ্রীকৃষ্ণও—

'অনঙ্গবাণ ব্রণখিন্নমানসঃ' (জয়দেব)।

শ্রীকৃষ্ণও বলেন—

হঁরি হরি কো দেই দারুণ বাধা !
নয়নক সাধ আধ নাহি পূরল
পালটি না হেরিনু বাধা।

তাঁহার দৃষ্টিতে—

দশাং কষ্টামষ্টপদমপি নয়ত্যাঙ্গিক রুচিঃ
বিচিত্রং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং বিলসতি ॥

—সেই কাঞ্চন প্রতিমা পদ্মবনের শোভাকেও বিড়ম্বিত করে এবং তাঁহার কটাক্ষ চঞ্চলা ভ্রমরীর ভ্রম জন্মাইয়া তদীয় হৃদয় দংশন করে—

হৃদয়মিদমদাঙ্ক্ষীৎ পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কটাক্ষঃ ॥ (বিদগ্ধ মাধব)

ইহাকেই বৈষ্ণবেরা 'মধুরিপু-কাম' বলেন—পূরয়মধুরিপুকামম্ (জয়দেব)।

শ্রীকৃষ্ণের এইভাব লক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণব মহাজন তাঁর মুখে বলান—

প্রাণপ্রিয়ে ! শুন মোর সত্য বচন।
তোমাসবার স্মরণে
ঝুরো মুই রাত্রিদিনে
মোর দুঃখ না জানে কোন জন।

অর্থাৎ, শ্রীরাধা তিনি—'যার প্রেম-গুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ।'

এই যে ভক্ত ও ভগবানের প্রেম-সম্বন্ধ—উত্তর-প্রত্যুত্তর—'দিলে নিলে বদল পেলে', reciprocity—অন্য দেশের মিষ্টিকেরাও তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন—

When the love of God arises in thy heart,—without doubt God also feels love for thee.—Rumi

. The endless love that was without beginning, and is and shall

be for ever. And with this our good Lord said full blissfully,—Lo ! how that I loved thee * *

Oh soul ! before the world was, I longed for thee and thou for Me. Even as from everlasting thou hast loved thyself—so from everlasting thou hast loved Me.

এই যে বহমান মিথঃ-প্রেমের স্রোত—Rippling tide of love which flows secretly from God into the soul and draws it mightily—ইহা আধ্যাত্মিক প্রেমরাজ্যের এক অপরূপ রহস্য। এই মিথঃ আকর্ষণকে (mutual attraction) মিষ্টিকেরা Divine Osmosis (দৈব আদান প্রদান) বলেন—a 'give and take' is set up between the finite and the Infinite Life.

মিষ্টিকের আর একটি উক্তি শুনুন,—

Orison (আরাধন) brings together the two lovers—God and the Soul—into a joyful room when they speak much of love.

ইহাই বৈষ্ণবের কুঞ্জক্রীড়া—'রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে'।

এ মিলনে বাধা কি ?

'মান লজ্জা ভয়, তিন থাকৃতে নয়'।

এ আনন্দপথ মাঝ
কণ্টক সঙ্কোচ লাজ—চমৎকারচন্দ্রিকা

It is the sense of shame, of diffidence, of timidity before the thought of God, that is the obstacle to realisation.

—C. Jinarajadasa's Mysticism p. 17.

যখন এই সঙ্কোচ-বাধা তিরোহিত হয়, তখন—

অঙ্গ অবশ ভেল, লাজ ভয় মান গেল
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল।

সেইজন্য রূপগোস্বামী শ্রীরাধার সহচরীর মুখ দিয়া বলিয়াছেন—

হিত্বা দূরে পথি ধবতরোরন্তিকং ধর্ম্মসেতোঃ
ভঙ্গোদগ্রা গুরুশিখরিণং রংহসা লঙ্ঘয়ন্তী ॥

'হে কৃষ্ণ ! রাধা-তরঙ্গিনী পতিতরু পরিহার করিয়া, ধর্ম্মসেতু ভঙ্গ করিয়া, গুরুজন-রূপ পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া তোমাতে মিলিতে চায় ।'

শ্রীরাধার নিজের উক্তি এই ;—

যস্যোৎসঙ্গ সুখাশয়া শিথিলিতা গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা,
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমা সখি ! তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ ।
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহান্ময়া ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো,
ধিক্ ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী ॥

—বিদগ্ধ মাধব

'হে সখি ! যাঁহার আলিঙ্গন-সুখাশায় আমি গুরুজনের লজ্জাকে শিথিলিত করিয়াছি, প্রাণাধিকা সখীগণকে ক্লেশ দিয়াছি, আব সতীকুলসেবিত মহান্ ধর্ম্মকেও অবজ্ঞা করিয়াছি, অধুনা সেই কৃষ্ণ যখন আমাকে উপেক্ষা করিলেন, তখন আমার এই পাপ প্রাণ ধারণের ধৈর্য্যকে ধিক্ ।'

এই 'মান লজ্জা ভয়' সম্বন্ধে একটু নিবিড় ভাবে আলোচনা করিতে চাই ।

প্রথমতঃ মান । মান কি ? মান=Spiritual Pride, দৈন্যাভাব । সাধন-পথে ভক্তকে দীনাতিদীন হইতে হয় । তাই তাহার প্রতি উপদেশ—That power which the Disciple shall covet is that which shall make him appear as nothing in the eyes of men. (Light on the Path). ইহাকেই বলে 'অকিঞ্চন' হওয়া । সেই গীতার প্রাচীন কথা—

অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ।

বুদ্ধদেবেরও ঐ উপদেশ—

যস্‌স রাগো চ দোসো চ মানো মক্‌খো * চ পাতিতঃ ।
সাস্‌সপোরিব আরাগ্‌গা তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ॥

এক কথায়, যদি 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে' রাধাকে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিতে হয়, তবে 'মান অপমান ভাসিয়ে দিয়ে চ'ল সখি ! কুঞ্জ মাঝে' এবং শ্রীচৈতন্যের কথায় বলিতে হয়—

---

* মক্‌খ=কাপট্য

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনান্ মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটঃ
মৎ-প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।

ইহাই ত' প্রকৃত রাধাভাব। শ্রীরাধা তাঁহাকে ভুলিতে চান, কিন্তু

পাশরিতে চাহি মনে, পাশরা না যায় গো
বল সখি! কি করি উপায়?

রাধা ভাবেন—তাঁর বলা ক'ব না—তাঁকে ভুলে যাব—কিন্তু তিনি যে হৃদয়েশ—সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া আছেন—তাঁকে ভুলিবেন কেমনে?

কিম্ ইহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতম্ আশয়া
কথয়ত কথাম্ অন্যাং ধন্যাম্, অহো হৃদয়েশয়ঃ।
মধুর মধুর স্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে
কৃপণ কৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে॥—কর্ণামৃত
(স্মের—হাস্য)

তাঁর কথা ছেড়ে সখি! ধন্যা অন্যা কথা বল
তিনি মোর হৃদয়েশ, তাঁকে কিসে ভুলি বল।
গুরুগঞ্জন—চন্দন অঙ্গভূষা
রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরসা
সম শৈল কুলমান দূর করি—
তব চরণে শরণাগত কিশোরী।

ইহাই শরণাগতি। ভক্ত বলেন—তুমি কে আর আমি কে? আমি তোমার পদরেণু!

অয়ি নন্দতনূজ! কিঙ্করং, পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥

ভক্তের আবার মান?—'অমানিনা মানদেন'

ভক্তের যেমন মান নাই—তেমনি ভয়ও নাই। খৃষ্টান বলেন—Love—which casteth out fear—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন (উপনিষদ্)। সেই প্রহ্লাদের কথা—

ভয়ংভয়ানাম্ অপহারিণি স্থিতে
মনস্যনন্তে মম কুত্র তিষ্ঠতি?

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে কত বিভীষিকা প্রদর্শন করিল কিন্তু প্রহ্লাদ বিচলিত হইলেন না। কেন হইবেন? তিনি যে, অভয়ং বৈ প্রাপ্তোসি জনক! (বৃহদারণ্যক)। তিনি বলিলেন—সেই 'অনন্ত চিরবসন্ত যখন অন্তরে আমার' তথাপি ভয়! সেই জন্য গীতা সাধকের 'দৈবী-সম্পদ্' গণনায় 'অ-ভয়'কে প্রথম স্থান দিয়াছেন—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ

রাধা কুলকামিনী—তাঁহার প্রথম ভয় কুলশীলের ভয়—কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমে,

গুরুয়া গরব কুল নাশাইল কুলবতী
কলঙ্ক চলিয়া আগে ফিরে।

হ'ন না তিনি কুলবতী, হ'ক না তাঁর 'সুদুস্তজ আর্য্যকুল'—কৃষ্ণানুরাগের প্রবল বন্যায় সে কুলশীল, ধরমকরম সমস্তই ভাসিয়া গেল। পদকর্ত্তা যদুনন্দন বলিতেছেন—

গঞ্জে গঞ্জুক গুরুজন তাহে না ডরাই
ছাড়ে ছাড়ুক নিজপতি আপদ এড়াই
বলে বলুক পাড়ার লোকে তাহে নাহি ডর
না বলুক না ডাকুক না যাব কারু ঘর
ধরম করম যাউক তাহে না ডরাই
মনের ভরম পাছে বঁধুরে হারাই!

এক কথায়, 'কুলশীল মান ভয়, তেয়াগিয়া সমুদয়' তিনি কৃষ্ণ ভজনা করিলেন। তার উপর রাধা অন্তঃপুরিকা—তাঁর শাশুড়ী ননদ আছেন—অতএব গুরুজনের ভয়। জটিলার কুটিলার ভয়ে তিনি কি করেন?

গুরুজন নয়ন বিধুন্তুদ * মন্দ
নীল নিচোলে ঝাঁপল মুখচন্দ

এ অভিসারের কথা। কিন্তু যখন ঘরে থাকেন?

গুরুগরবিত মাঝে বসি সখী সঙ্গে
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে

* বিধুন্তুদ=রাহু

পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার
ঘরের যতেক লোক করে কানাকানি
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি।

আর যখন ধৈর্য্যধারণ অসম্ভব হয়, তখন

রন্ধন শালাতে আসি
গুরুজন ভয় বাসি
ধূঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।

কিন্তু এত বাধা সত্ত্বেও রাধার অন্তঃশীলা প্রেম-নির্ঝরিণী অবাধ গতিতে প্রবাহিত হয়। ইহাকেই বলে প্রেমবৈচিত্র্য!

অধিকন্তু রাধা সুকুমারী—বিকচ কুসুম জিনি তাঁহার পেলব তনু। অথচ ঘনান্ধকারে ফণি-ফণার উপর দিয়া 'পন্থ বিজন অতিঘোর' অতিক্রম করিয়া সঙ্কেতস্থানে অভিসারে যাইতে হইবে। ভয় (physical fear)? ভীরু হইলেও রাধার ভয় নাই—কারণ, তিনি জানেন—'মান লজ্জা ভয়, তিন থাকিতে নয়'।

অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ
কত শত কোটি শবদে জিউ কাঁপ
ভ্রমত ভুজঙ্গম নিশি আঁধিয়ার
তহি বরখত অবিরত জলধার
পাঁতর মা ভেল আঁতর বারি *
কৈছে পঙারব সো সুকুমারী।

আর লজ্জা? কিসের লজ্জা? কার কাছে লজ্জা?

যো সুখ চাহে তো লজ্জা ত্যাগে
প্রিয়সে হিলমিল লাগে।—কবির

যদি প্রিয়তমের সঙ্গে গভীর ভাবে মিলিতে চান—তবে প্রিয়াকে নগ্ন হইতে হইবে। তা'ই খৃষ্টান মিষ্টিক বলেন—Naked follow the Naked Christ.

If the soul were stripped of all her sheaths, God would be discovered all naked to her view and would give Himself to her,

* প্রান্তর বারি-পূর্ণতা হেতু অন্তর (দূর) হইল। মা=Oh

withholding nothing. As long as the soul has not thrown off all her veils, however thin, she is unable to see God.

—Meister Eckhart.

ইহা কামুক-কামিনীর নগ্ন হওয়া নয়—'ফেলগো বসন ফেল, ঘুচাও অঞ্চল, পর শুধু সৌন্দর্য্যের নগ্ন আবরণ'—নয়।

ইহা উপনিষদের আধ্যাত্মিক নগ্নতা—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎত্বং পূষন্ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥—ঈশ

এইরূপ মায়ার আবরণ-উন্মোচনে রিক্ত হওয়াই প্রকৃত নগ্নতা—আধ্যাত্মিক লজ্জাত্যাগ।

Just as a true pilgrim going towards Jerusalem, leaveth behind him house and land, wife and children and maketh himself poor and bare from all things that he hath, that he may go lightly without letting. Right so, if thou wilt be a spiritual pilgrim, thou shalt strip thyself naked of all that thou hast.—Hilton

অর্থাৎ, একটি 'fig-leaf' দ্বারাও লজ্জা নিবারণ করিতে পাইবে না।

It is then that, caught up above all things, by the sublime ardours of a stripped and naked spirit, we obtain the immediate contact of the Divine.—Ruysbrock's De Contemplatione, cited on p. 519 of Underhill's Mysticism.

শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ-লীলায় এই লজ্জা-ত্যাগের আধ্যাত্মিক রূপক অতি নিপুণ ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। বাহ্য দৃষ্টিতে ইহা বেশ জুগুপ্সিত—শ্রীকৃষ্ণ নাকি 'গোপবধূটি-দুকুল চৌরায়—' তিনি 'গোপতিতনয়া-কুঞ্জে গোপবধূটি বিটং ব্রহ্ম'—কিন্তু ভক্ত ভাবুকের চক্ষে ইহা পরম রমণীয়।

ভাগবতে বস্ত্রহরণের বিবরণ এই : একদিন গোপিকারা যমুনার কূলে বসন ছাড়িয়া জলে অবগাহন করিতেছেন—হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া সেই সব বস্ত্র গ্রহণ করতঃ কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিয়া সহাস্যে বলিলেন—

তাসাং বাসাংস্যুপাদায় নীপমারুহ্য সত্বরঃ।
হসদ্ভিঃ প্রহসন্ বালৈঃ পরিহাসমুবাচ হ॥
অত্রাগত্যাবলাঃ! কামং স্বং স্বং বাসঃ প্রগৃহ্যতাম্।

'হে অবলাগণ! এখানে আসিয়া স্ব স্ব বসন গ্রহণ কর।' গোপী বলিলেন—"অবিনয় করিও না—হে নন্দনন্দন!, তুমি আমাদের সকলের প্রিয়—ব্রজবাসীর শ্লাঘ্য—আমরা শীতকাতর—বসনগুলি দাও'।

মা২নয়ং ভোঃ কৃথাস্ত্বাং তু নন্দগোপসুতং প্রিয়ম্।
জানীমো২ঙ্গ! ব্রজশ্লাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—তোমরা যদি সত্য সত্য আমার অনুগতা, তবে যাহা বলিলাম কর—এইখানে আসিয়া স্ব স্ব বসন গ্রহণ কর।

ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তং বা করিষ্যথ।
অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছন্তু শুচিস্মিতাঃ॥

শীতার্ত্তা গোপবালারা কি করেন? সলজ্জায় জল হইতে উত্থিত হইয়া পাণি দ্বারা যোনি আবরণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন—

ততো জলাশয়াৎ সর্ব্বা দারিকাঃ শীতবেপিতাঃ।
পাণিভ্যাম্ যোনিমাচ্ছাদ্য প্রোত্তেরুঃ শীতকর্ষিতাঃ॥

Even that was not enough! শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—না, ঠিক হয় নাই। হস্ত উত্তোলন করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হও—মস্তকে দুই হাত তুলিয়া নমঃ কর—তবে বস্ত্র পাইবে।

বদ্ধাঞ্জলিং মূর্দ্ধ্ন্যপনুত্তয়ে২ংহসঃ।
কৃত্বা নমো২ধো বসনং প্রগৃহ্যতাম্॥

বরাকী গোপীরা নাচার—কি করেন? লজ্জা ত্যাগ করিয়া তাহাই করিলেন। তখন,

তাস্তথাবনতা দৃষ্ট্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
বাসাংসি তাভ্যঃ প্রাযচ্ছৎ করুণস্তেন তোষিতঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে সম্পূর্ণ নগ্ন দেখিয়া তুষ্ট হইলেন এবং করুণা করিয়া তাহাদের বসন ফিরাইয়া দিলেন। সংক্ষেপে ইহাই বস্ত্রহরণ-লীলা।

বলা বাহুল্য, এ সমস্তটাই রূপক—যাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা খৃষ্টান মিষ্টিকদিগের মুখে পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। সাধু ভাস্বানি এই রূপকের অধ্যাত্মিক অর্থ এই ভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

Blessed, thrice-blessed
Were Gokul and Brindaban,
And the simple, guileless *gopis*
Whose garments he stole in love.

Steal Thou in Thine mercy,
My garments tinted, tainted, soiled,
My gaudy garments of power and pride,
Steal them, O Lord of Love !

And ne'er give them back to me
But tear them to the shreds,
Or burn them in the Sacred Flame
Of Thy all-consuming Love !

And I shall at Thy lotus-feet
Stripped, self-emptied, naked sit
To see the naked Truth of Love,—
The Love that steals and sanctifies.

—T. L. Vaswani

যে রমণী—'নারীণাং ভূষণং লজ্জা' ত্যাগ করিয়াছে, তার পক্ষে লোকলজ্জা ত্যাগ করা আর বেশী কি ?

সখীগণ সবে মিলি,　　যাওগে গোকুলে চলি
বোলবি ননদিনী সনে।
গোবিন্দ-প্রেমসায়রে　　ডুবিয়াছে রাই
পুনঃ না আসিবে নিকেতনে॥

* * *

কণ্ঠের ভূষণ কলঙ্কের হার, নাসার ভূষণ গন্ধ।
পিরীতিভূষণ প্রতি তনুমন কহয়ে দাস গোবিন্দ।

ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া দাশুরায় লিখিয়াছিলেন—

ননদিনী বল্‌গে নগরে—
ডুবেছে রাই কলঙ্কিনী কৃষ্ণকলঙ্ক সাগরে।

এ সম্বন্ধে জ্ঞানদাসের পদ এই :—

শ্যাম-রূপ দেখি আকুল হইয়া,
দুকুল ঠেলিনু হাতে
ভুবন ভরিয়া অযশ ঘোষণা
নিছিয়া লইনু মাথে ॥

সজনি কি আর লোকের ভয়!
ও চাঁদ বয়ানে, নয়ান ভুলল,
আন মনে নাহি লয় ॥

অর্থাৎ, 'লজ্জা লজ্জিতৈব পলায়িতা'।

আরাধিকা মীরাবাইও এই কথাই বলিয়াছেন,—

তাত মাত ভাই বন্ধু আপনা না কোই—
সন্তন ঢিগ্‌ বৈঠি বৈঠি লোকলাজ খোই।

এইরূপে 'মান, লজ্জা, ভয়' যখন সমুদয় ত্যাগ হয়, তখন প্রেয়সী প্রিয়তমের সহিত নিবিড় মিলনে আবদ্ধ হন এবং তাঁহার নিরন্তর অনুভূতি হয়—

শ্যামরূপ জাগয়ে মরমে—
কিবা নিশি কিবা দিশি শয়নে স্বপনে!

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সারথি

স্বষ্টিধর মাঝির তিন পুরুষের খবর জানা যায়। তাহাদের কাহারও জীবন নিজগৃহে রোগশয্যায় শেষ হয় নাই। প্রপিতামহ উমানাথের মৃত্যু হইয়াছিল পদ্মার বুকে জলদস্যুর হাতে, পিতামহ দশরথের মেঘনায় নৌকাডুবিতে এবং পিতা অভয়াচরণের নিজ নৌকায় সর্পদংশনে। স্বষ্টিধরও প্রায় চল্লিশ বৎসর অবধি মাঝির কাজ করিয়াছিল। তাহার পর তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল ম্যালেরিয়ায়, সে ব্যবসায় ছাড়িয়া সঞ্চিত কিছু অর্থ লইয়া মহাজনী করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ব্যবসায় ছাড়িবার আগে হইতেই তাহার মনে বিশেষ সুখ ছিল না। এখনকার লোকে নৌকায় যাতায়াতের সুখ বোঝে না। তাহারা ষ্টীমারেই হোক বা ডাক বা গহনার নৌকায় হোক— তাড়াতাড়িতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারিলেই সুখী। পৌঁছানোটাই যেন সব, আর যাওয়াটা কিছু নয়। কোথায় গেল সেই আগের কালের যাত্রী সব। তাহারা মাঝিকে চাকরের মত দেখিত না। দ্বিপ্রহরে কোনো বাজারের কাছে গাছের ছায়ায় নৌকা লাগাইত। যাত্রীদের কর্ত্তা বাজার করিয়া আনিতেন। মাঝিদের খাবারও তাহার সঙ্গে আসিত। তারপর সেই গাছের ছায়ায় রান্নাবান্না হইত। গ্রামের লোক আলাপ করিতে আসিত। অপরাহ্ণে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার নৌকা চলিত। এমনি করিয়া আজকালকার তিন দণ্ডের পথে সারাদিন কাটাইয়া যাত্রা শেষ হইলে কর্ত্তারা খুসী হইয়া যাহা দিতেন, মাঝিদের তাহাতে কখনও অসন্তুষ্ট হইতে হয় নাই। এখন আর সেদিন নাই। নৌকাভাড়া কড়ায় গণ্ডায় ঠিক করিয়া তবে যাত্রী নৌকাতে পা দেয়। চুক্তি অনুযায়ী সময়ের মধ্যে না পৌঁছাইয়া দিতে পারিলে আবার তাহা হইতে কাটা যায়। যাত্রীদের যাহা ব্যবহার, আগের কালের লোকে চাকরের সহিতও সেরূপ করিত না। তখনকার কালে পাল তুলিয়া বসিলে কর্ত্তাদের সহিত সুখদুঃখের,

দেশবিদেশের গল্প হইত, কোনো মাঝি পাঁচালী পড়িত, কেহ বা গান করিত—কিন্তু সেদিন আর নাই। সুতরাং ব্যবসায় ছাড়িবার আগে হইতেই সৃষ্টিধরের ব্যবসায়ে আর মন ছিল না; কিন্তু তবু যখন বর্ষায় তাহাদের গ্রামের নাগর নদী দুকূল ছাপাইয়া শীতলাতলা অবধি আসিত, যখন বাতাসে আসিত নূতন ধান ও পাটের গন্ধ, তখন একটা অনির্দ্দিষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টিধরের মেজাজ খারাপ করিয়া দিত। রাত্রিতে ভালো ঘুম হইত না। সৃষ্টিধরের স্ত্রী ইচ্ছাময়ী ভয়ে ভয়ে থাকিত; এবং প্রতিবেশিনীদের কাছে বলিত যে বর্ষায় তাহার কর্ত্তার শরীর একেবারেই ভালো থাকে না।

সৃষ্টিধর বুঝিয়াছিল দিনকাল বদলাইয়াছে। তাই তাহার একমাত্র পুত্র শঙ্করকে লেখাপড়া শিখাইবে ঠিক করিয়াছিল। শঙ্করের পাঠশালার পড়া হইয়া গেলে সৃষ্টিধর একদিন বড় স্কুলের হেডমাষ্টারের সহিত দেখা করিতে গেল। হেডমাষ্টার তখন লাইব্রেরিতে ছাত্রদের আবেদন-পত্র দেখিতেছিলেন। তাঁহাকে প্রগাঢ় এক প্রণাম করিয়া সৃষ্টিধর নিজের আবেদনটী জানাইল। কিন্তু কথা তাহার যেন আর ফুরায় না। তাহার আবেদনটী যেন সৃষ্টিছাড়া এবং তাহার জন্য যেন প্রভূত কৈফিয়ৎ দেওয়া নিতান্তই প্রয়োজন—একবার কহিল সে নিজে চোখ থাকিতেও অন্ধ, তাই তাহার ইচ্ছা তাহার ছেলেটীর সেরূপ না হয়। তারপর অন্য কথা পাড়িয়া আবার কহিল যে তাহার ছেলে বাবুদের ছেলের মত চাকরী করিবে এ আশা সে করে না। কিছুদিন পড়িলেই সৃষ্টিধর গ্রামের বাজারে তাহার জন্য একটী দোকান করিয়া দিবে।

হেডমাষ্টার ব্যস্ত লোক, এত কথা শুনিবার তাঁহার অবসর ছিল না। এতক্ষণ নিজের কাজে ছিলেন বলিয়া বাধা দেন নাই। এবার তাঁহার হাতের কাজ শেষ হইয়া যাওয়ায় অধৈর্য্যের সুরে কহিলেন, "সে আর এমন কথা কি সৃষ্টিধর, পাঠশালার পণ্ডিতের নিকট থেকে একটা সার্টিফিকেট নিয়ে তোমার ছেলেকে নিয়ে একদিন এস। ভর্ত্তি হবার ফি দুটাকা, মাসিক বেতন আট আনা, পরে আরো বেশী দিতে হবে।"

সৃষ্টিধরের জীবনে সে একটা দিন। মাঝিপাড়ার কোনো ছেলে এতদিন বড় স্কুলে যায় নাই। সেই স্কুলে বাবুদের ছেলেদের সহিত শঙ্কর একসঙ্গে পড়িবে এই চিন্তা যুগপৎ তাহার মনে হর্ষ ও আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। জেলার সহরে গিয়া সৃষ্টিধর শঙ্করের জন্য নূতন কাপড় চোপড় কিনিয়া আনিল। তারপর নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রত্যেক প্রতিবেশী বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে প্রণাম করিয়া, আষাঢ় মাসে কোট গায়ে দিয়া ও শাল চড়াইয়া শঙ্কর পিতার সহিত স্কুলে যাত্রা করিল। স্নানের সময় দুএকজন বর্ষীয়সী ইচ্ছাময়ীকে বলিল, "শঙ্করকে ত লেখাপড়া শিখাতে পাঠালে, কিন্তু ওকি আমাদের সইবে?" ইচ্ছাময়ী মনে করিল ওটা হিংসার কথা, উত্তর দিল না।

২

ক্লাসের ছেলেদের চাপাহাসির যেন আর অন্ত নাই। গরমের সময়ে এই অপূর্ব্ব বেশ পরিহিত নিম্নজাতির ছাত্রটী তাহাদের কাছে যেন একটী অদ্ভুত জীব। এ উহার মুখের দিকে তাকায় আর হাসে। ক্লাসময় একটা ফিস্‌ফাস্ চলিয়াছে। অথচ মুখ ফুটিয়া কেহ কিছু বলে না। শঙ্কর দেখিয়াই বুঝিয়াছিল যে তাহার সহপাঠীদের চেয়ে তাহার গায়ের জোর অনেক বেশী। কিন্তু মারামারি বাধাইবার জন্য ত একটা অছিলা চাই। তাহার বেঞ্চিতে যাহারা বসিত তাহাদের মধ্যে দুএকজন পকেটে করিয়া জামরুল আনিত। খাইবার সময় শঙ্করকে উঠিয়া দাঁড়াইতে বলিত। কিন্তু সে না দাঁড়াইলে তাহারা নিজেরাই উঠিয়া খাইত। স্কুলে জল খাইবার একটী ঘর ছিল। অন্য ছেলেরা ভিতরে গিয়া গ্লাসে করিয়া জল খাইত। শঙ্কর বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিত, দপ্তরী জল ঢালিয়া দিত, সে হাত জোড় করিয়া জল ধরিয়া খাইত। কিন্তু ইহা লইয়াও বিবাদ চলে না। তাহার কাপড় চোপড় দেখিয়া কোনো ছাত্র অপর ছাত্রকে বলিত 'বড় শীতরে ভাই, নয় কি?' কিন্তু সে কথাও তাহাদের নিজেদের মধ্যে। নালিশ করিতেও যেমন তাঁহার লজ্জা করিত,

নিজ হইতে বিবাদ বাধাইতেও তাহার মন তেমনি সঙ্কুচিত হইত। পাঠশালায় সকাল-বিকাল স্কুল হইত, অন্যান্য নিম্নজাতির ছেলে ছিল। এত গোলমাল ছিল না।

মাঝে মাঝে ইচ্ছাময়ীর কাছে সে বলিত স্কুলে তাহাকে কি সহিতে হয়। ইচ্ছাময়ী প্রবোধ দিয়া কহিত, "ছোট বড় করা ভগবানের হাত, অদৃষ্ট নিয়ে কি ঝগড়া করা চলে। এ জন্মে ভাল হয়ে থাকলে আর এক জন্মে আমরাও বড় হব।" এই পরজন্মের আশ্বাসে শঙ্করের মন কখনও ভোলে নাই। কিন্তু মাকে সে ভালবাসিত এবং মায়ের নিকট সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে স্কুলে কখনও ঝগড়াঝাঁটি বা মারামারি বাধাইবে না।

কিন্তু সুখও ছিল। বই লইয়া দশটার সময়ে যখন সে স্কুলে যাইত, পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েরা রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিত—চোখে তাহাদের অসীম শ্রদ্ধা ও বিস্ময়। বয়স্কেরাও তাহার সহিত সম্মানের ব্যবহার করিত। মেয়ে মহলে তাহার আদরের অন্ত ছিল না।

স্কুলের দুঃখও বেশী দিন রহিল না। কিছুদিন পরেই শঙ্কর অন্যান্য ছেলেদেরই মত সাজ করিতে লাগিল। সে মেধাবী ছাত্র ছিল। কাহাকেও পড়া বলিয়া দিয়া, কাহারো অঙ্ক কসিয়া দিয়া, কাহারো ম্যাপ আঁকিয়া দিয়া শীঘ্রই সে জনপ্রিয় হইয়া দাঁড়াইল। যাহারা লেখাপড়ায় ভালো ছিল না, তাহারা তাহাকে স্বতঃই খানিকটা খাতির করিতে আরম্ভ করিল। পরীক্ষার দিনে তাহার কাছে বসিবার জন্য সহপাঠীদের মধ্যে আগ্রহের শেষ ছিল না। কিন্তু এত সুখ বোধ হয় ভগবানের সহিতেছিল না। শঙ্কর থার্ড ক্লাসে উঠিতেই প্রথম ফাল্গুনে একদিন সৃষ্টিধর কঠিন জ্বরে পড়িল। দুদিন পরেই প্রলাপ আরম্ভ হইল। ডাক্তার আসিল, কবিরাজ আসিল। ইচ্ছাময়ী নানা দেবতার কাছে নানারূপ মানৎ করিল। কিছুতেই কিছু হইল না। একদিন শেষ রাত্রিতে সময় হইয়া আসিয়াছে মনে করিয়া ইচ্ছাময়ী শঙ্করকে জাগাইয়া পিতার কাছে লইয়া গেল। সৃষ্টিধর ক্রমাগত প্রলাপ বকিতেছিল। শঙ্করের দিকে তাকাইল

কিন্তু চিনিতে পারিল না, বিড় বিড় করিয়া বলিল, 'নে বেলা থাকতে পাড়ি ধর কালবোশেখীর সময়।' রাত্রি না ফুরাইতেই সৃষ্টিধর শেষ হইয়া গেল। শঙ্কর কাঁদিতেছিল, ইচ্ছাময়ী তাহাকে বুকের কাছে লইয়া মাথায় হাত বুলাইয়া কহিল, 'এসব ভগবানের হাত, দুঃখু করো না, ধন, পরের জন্মে আবার দেখা হবে।' তাহার চোখে জল ছিল না।

(৩)

মানুষের অন্তরের গোপন পুরীতে যে চেতনা রূপকথার রাজকন্যার মত ঘুমাইয়া আছে, তাহারই পায়ের ও মাথার কাছে সোনার কাঠি ও রূপার কাঠির বেশে রহিয়াছে প্রথম শোক ও প্রথম প্রণয়। পিতাকে হারাইবার পর শঙ্কর যেন সংসারকে নূতন চোখে দেখিতে আরম্ভ করিল। পাড়ার প্রত্যেক বৃদ্ধের প্রতি যে মমতা তাহার মনে জাগিল, সেটী একান্তই নূতন। তাহাদের কাহারো অসুখ করিলে শঙ্কর লেখাপড়া ফেলিয়া রাত্রি জাগিয়া শুশ্রূষা করিত। তাহার পিতার মত কোনো বৃদ্ধকে পথে বা নদীর বুকে দেখিলে একটা নিরুদ্ধ ব্যথায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিত। পিতার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তাহার মনের কথা সে চিরদিন মায়ের কাছেই বলিয়াছে। কিন্তু তবু বুঝিতে পারিত কি অফুরন্ত স্নেহ সেই বুকে ছিল। গভীর রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে কত দিনের কত খুঁটি-নাটির কথা মনে করিয়া বালিশ ভিজাইত। তাহার ছেলেবেলায় ইচ্ছাময়ী সৃষ্টিধরকে একটী বড় থালায় করিয়া ভাত দিত। শঙ্কর সেই পাতেই খাইতে বসিত। সেই থালার একটী কোণে পিতা তাহাকে ভাত মাখিয়া দিতেন। ডিমভরা কইএর একটুখানি মুখে দিয়া পিতা মাছটা তাহার দিকে সরাইয়া দিতেন। ইচ্ছাময়ী বলিত—'ওকি, ওর জন্যে ত দিয়েছি আর একটা।' সৃষ্টিধর কহিত, 'কত খাব আর, পেট ভীষণ ভরে গেছে।' দুধের বাটি হইতে একটু দুধ ঢালিয়া লইয়া সৃষ্টিধর তাহার নিজের দিকে ভাত মাখিত। তারপর বাটিভরা দুধ শঙ্করকে দিয়া বলিত, 'এইটুকু এক চুমুকে খাও দিকিনি কেমন পারো।' কতদিন শীতের রাত্রিতে সৃষ্টি-ধর তাহাকে নিজের কাছে শুইতে লইয়া গিয়াছে। রাত্রিতে আধ ঘুমন্ত

অবস্থায় শঙ্কর অনুভব করিয়াছে তাহার চারিদিকে লেপটা গুঁজিয়া দিয়া সৃষ্টিধর তামাক খাইতে উঠিয়া গিয়াছে। কতদিন জ্বর আসিলে নিজের অনবসরের জন্য ইচ্ছাময়ী তাহাকে বাতাস দিবার জন্য বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। একটু পরে সৃষ্টিধর কহিয়াছে, 'তুই পড়াশুনা করগে যা, আমার বড় শীত করেছে।' সেদিন বোঝে নাই এ সবের অন্তরালে কি ছিল। এ সংসারে তাহা আর মিলিবে না। কিন্তু সত্যই কি তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে, না ইচ্ছাময়ীর কথা সত্য, একদিন না একদিন আবার মিলিবে।

ইচ্ছাময়ী তাহার নিকটেই শুইত। অনেক দিন রাত্রিতে শঙ্কর তাহার মাকে তাহার ছেলেবেলার কথা জিজ্ঞাসা করিত। মুখ ফুটিয়া পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না। জানিত যে ছেলেবেলার কথা জিজ্ঞাসা করিলে পিতার কথা আসিয়া পড়িবে। ইচ্ছাময়ী একদিন বলিতেছিল, "তুইও ছেলেবেলায় তাঁকে খুব ভালবাসতিস্। যখন টাকা আদায়ের জন্য বেরোতেন, পথের ধার থেকে যতক্ষণ তাঁকে দেখা যায় দেখতিস, ফিরে এসে বুকে হাত দিয়ে বল্‌তিস্—'মা আমার প্রাণটা যেন পুড়ে যাচ্ছে'। আমি হাসতাম, আর বলতাম, 'কিরে তোর প্রাণে আবার আগুন লাগালো কে ?"

কিন্তু এ সংসারে আর কাহারো কাছে এ কথা সে পাড়িত না। এ মর্ম্মের কথার মর্য্যাদা আর কেহ রাখিতে পারিবে না, এ জ্ঞান তাহার হইয়াছিল। কাহারো নিকট তাহার পিতার কথা শুনিয়া তাহার চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া উঠে নাই। সকলের অগোচরে শুধু মাতাপুত্রে ছিল এই বেদনা-মধুর গোপন জীবনটুকু !

সৃষ্টিধর কিছু অর্থ রাখিয়া গিয়াছিল। আর অনেক টাকা তাহার লাগানো ছিল। সংসারে অভাব ছিল না। শঙ্কর পড়িতে লাগিল। পরের বৎসর পূজার সময়ে তাহার সহপাঠী বন্ধু অবনী চৌধুরীদের বাড়ীতে যাত্রা। অবনীর সহিত শঙ্করের খুব ভাব। অবনী লেখাপড়ায় মন্দ নয়, তাই শঙ্কর তাহার থেকে কত ভালো এটা সে:বেশ বুঝিতে পারিত। অবনী রাস্তার কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। শঙ্কর যাইতেই তাহাকে বসাইল

ও নিজে তাহার নিকট বসিল আসরের ঠিক্ সামনে। চারিদিকে পান সিগারেটের গন্ধ। যাত্রা তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পালা 'মথুরেন্দ্র সংহার'। কংস আসরে আসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সেনাপতিকে যাহারা হরিনাম করে তাহাদের ধ্বংস করিতে আদেশ দিতেছেন।

এত বড় বাড়ীতে এ রকম সভায় শঙ্কর কখনও আসে নাই। প্রকাণ্ড সামিয়ানার নীচে অসংখ্য বাতির ঝাড় জ্বলিতেছে। তাছাড়া স্থানে স্থানে গ্যাসের আলো। অভিনেতাদের সাজ অতি সুন্দর। রাণীর পোষাক যেন হীরা জহরতে ঝলমল করিতেছে। কখনও কংস আসিতেছেন, কখনও বসুদেব,কখনও যশোদা ও নন্দ, কখনও রাধা ও অন্যান্য গোপীরা। কংসের অত্যাচার সহিতে না পারিয়া মথুরাবাসীরা অক্রূরকে দূত করিয়া পাঠাইয়াছেন। অক্রূর বৃন্দাবনে আসিতেছেন। এমন সময়ে কৃষ্ণ ও রাধার যমুনা-পুলিনে সাক্ষাৎ। অন্যান্য সময়ে গান গাহিয়া দিতেছিল মোক্তারের মত কাপড় পরা কতকগুলি গায়ক। কিন্তু কৃষ্ণ ও রাধা নিজেরাই গান করিতেছিলেন। চমৎকার গলা। শঙ্কর তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল। এমনি সময়ে তাহারি কাছে একটা গোলমাল উঠিল।

তাহাদেরই অনতিদূরে বসিয়াছিলেন ভৈরব ভটাচার্য্য। সুপুরুষ, সুগৌর বলিষ্ঠ দেহ। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্র রেখা। গায়ের রঙ্ যেন চাদর ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তন্ত্র-শাস্ত্রে অসীম পণ্ডিত ও অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী। অবনীরা তাঁহার শিষ্য। অবনীকে ক্রমাগত শঙ্করের সহিত কথা বলিতে দেখিয়া তাহাকে একবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও ছেলেটী কে, তোমার কে হয়।"

অবনী জিজ্ঞাসা করিল—"কোন ছেলেটী ?"

ভৈরব কহিলেন—"ঐ যে তোমার কাছেই বসে রয়েছে। শ্যামবর্ণ, বড় বড় চোখ। যার সঙ্গে যাত্রা আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত গল্প করছ।"

অবনী যেন একটু ভয় পাইয়া গেল—বলিল—"ও, ও আমাদের ক্লাসের একটী ছেলে।"

"নাম কি ?"

"শঙ্কর মাঝি, সৃষ্টিধর সেই যে আর বৎসর মারা গেছে, সে ওরই বাবা'।

ভৈরব শেষ পর্য্যন্ত শুনিলেন না। গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। সভার যে অংশ ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দ্দিষ্ট, সেই অংশে হীনজাতি তাঁহারি সহিত একাসনে বসিয়া আছে। উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অবনীর পিতা নন্দ চৌধুরী ছুটিয়া আসিলেন। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ালাপ থামিয়া গেল। শঙ্কর সব শুনিতেছিল। নন্দ চৌধুরী তাহার কাছে আসিয়া তাহাকে বলিলেন, 'তুমি আমার সঙ্গে এস ত, বাছা।'

অপমানে অভিমানে তখন শঙ্করের চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। কোনরকমে নিজেকে সামলাইয়া বলিল—"চলুন।"

নন্দ তাহাকে সভার অন্য কোণে লইয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন, সেখানে আবার একটী গোলযোগের সূচনা করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না, তাই শঙ্কর বসিল। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে নন্দ সরিয়া গেলেন সেই মুহূর্ত্তে সে উঠিয়া সভাত্যাগ করিল।

বড় বাড়ী। যে উঠানে যাত্রা হইতেছে তাহারি পরে একটী ফুলের বাগান। সেই বাগানের বেড়ার ধার দিয়া অনেক লোক কেরোসিনের বাতি জ্বালাইয়া পান, বিড়ি ও সিগারেট বিক্রয় করিতেছে।

যাত্রা আবার আরম্ভ হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের কণ্ঠধ্বনি আসিতেছে। রাধা গাহিয়া বলিতেছেন—'তোমারি কারণে আমি পরি নীলাম্বরী'। কৃষ্ণ গানে উত্তর দিতেছেন, 'আমিও সেইজন্যে রাধে পীতাম্বরধারী।' আর কতকগুলি লোক ধূয়াটী গাহিতেছে—'পড়ে প্রণয়-ফাঁদে প্রাণ যে কাঁদে, হায় পোড়া মন প্রবোধ মানে না'।

(৪)

বাড়ীতে ফিরিয়া শঙ্কর এ ঘটনাটীর কথা তাহার মাকে বলে নাই। শঙ্করের বিশ্বাস ছিল যে এ বিষয়ে তাহার মা তাহার সহিত একমত হইবেন না আর মুখে হইলেও তাহার অন্তরের এ দারুণ জ্বালা বুঝিতে পারিবেন না। পরদিন যথাসময়ে সে স্কুলে গেল।

অবনীও আসিল। দুজনই দুজনকে কিছু এড়াইয়া চলিল, কিন্তু ছুটি হইবার আগে অবনী তাহার কাছে আসিয়া কহিল—'কাল একটু সকালে সকালে এস ভাই, কতগুলি deduction আমি পারি নি, তোমার কাছে বুঝে নেব।' শঙ্কর উত্তর দিল—'বেশ'।

শঙ্কর মনে মনে অবনীকে কম দোষী করে নাই। অবনী একবার প্রতিবাদ করে নাই—একবার বলে নাই যে সেই তাহাকে ওখানে নিয়া বসাইয়াছিল। সে চলিয়া আসিবার সময়ে তাহার সাথে আসে নাই। তবু পরদিন কিছু আগেই স্কুলে আসিল। অবনী আসিয়াই শঙ্করের হাত ধরিয়া কহিল—"আমার উপর সেদিন রাগ করনি ত ভাই। কাল সারাদিন লজ্জায় তোমার দিকে তাকাতে পারিনি।" শঙ্কর আঁক কসিবার খাতাখানি বাহির করিতে করিতে উত্তর দিল—"তোমার আর দোষ কি।"

ব্যাপারটা যদি এইখানেই শেষ হইত, তাহা হইলে হয়ত শঙ্কর মনে আর কিছু রাখিত পারিত না। কিন্তু অবনী ক্ষমা চাহিয়াছে নিজের জন্য, তাহার পিতা বা ভৈরব ভট্টাচার্য্য কোনো অন্যায় করিয়াছেন, পাছে এই স্বীকার করা হইয়া থাকে এজন্য অবনী আবার বলিল—"আর ওতে তোমাদেরও পাপ হয়।"

"পাপ?" বলিয়া বিস্ফারিত নয়নে শঙ্কর অবনীর দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল—' কই, তোমার deduction কই?"

মনের আঁধার মনেই রহিয়া গেল। একথা কাহাকেও বলিবার উপায় নাই। অথচ দিনরাত এ আঘাত কাঁটার মত বেঁধে। পিতার মৃত্যু মাতাপুত্রকে যে নিগূঢ় বন্ধনে বাঁধিয়াছিল, তাহাও যেন শিথিল হইয়া গেল। মায়ের সহিত আর বেশী কথা হয় না। ইচ্ছাময়ীর লক্ষ্য এড়ায় না। মনে করিল শঙ্কর শোক ভুলিয়া আসিতেছে।

হঠাৎ একদিন রবিবারে শঙ্কর মাকে বলিল—"মা আমি নীলগঞ্জের বাজারে যাব। আমার কাপড় নেই, তোমারও বেশী নেই, কিছু কাপড়চোপড় কিনে আনি।"

নীলগঞ্জের বাজার শঙ্করদের গ্রাম হইতে পাঁচ মাইল দূরে।

সেখানে থানা, ডাক্তারখানা সবই আছে। কাপড়চোপড়ের বাস্তবিকই প্রয়োজন—কিন্তু এ কাজের ভার আর কাহাকেও দেওয়া যায় কিনা এই অপেক্ষায় ইচ্ছাময়ী শঙ্করকে কিছু বলে নাই। শঙ্কর প্রস্তাব করিতে ইচ্ছাময়ী বিশেষ আপত্তি করিল না, শুধু বেশী রাত করিতে বারণ করিয়া দিল।

নীলগঞ্জে খৃষ্টানদের একটী মিশন ছিল। সেইখানে যাওয়া ছিল শঙ্করের উদ্দেশ্য। সে শুনিয়াছিল খৃষ্টধর্ম্মে জাতিভেদ নাই। সব সমান। কিন্তু সে কথা তাহার মাকে বলিবার ইচ্ছা ছিল না এবং এ সম্বন্ধে কোনো একটা সুস্পষ্ট ইচ্ছাও তাহার মনে আসে নাই।

নীলগঞ্জে পৌঁছিয়া মিশন-হাউসের আশেপাশে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া যখন সেখানে প্রবেশ করিল, তখন বিকাল হইয়া গিয়াছে। ঢুকিয়াই তাহার ইচ্ছা হইল ছুটিয়া পলাইয়া আসে। কারণ কি বলিবে, কি করিবে এসব কিছুই ঠিক করিতে পারে নাই। তারপর এতটা বড়াবাড়ি করা উচিত কিনা এ সম্বন্ধেও তাহার সন্দেহ ছিল। কিন্তু তাহার আর উপায় ছিল না। মিশন-হাউসের ফটক পার হইতেই একটী সব্জী-বাগান। সেখানে একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক কাজ করিতেছিলেন। শঙ্করকে ঢুকিতে দেখিয়াই তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কি কারো সঙ্গে দেখা করতে চাও?"

শঙ্কর বলিল—"হাঁ, আমি এখানকার পাদরী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি—অনেক দূর থেকে।"

ভদ্রলোক কহিলেন—"আমিই পাদরী সাহেব। চল আমার বসবার ঘরে চল।"

তারপর তিনি শঙ্করকে তাঁহার বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন ও দুজনে বসিবার পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি খ্রীষ্টান?"

"না—আমি আপনাদের ধর্ম্মের কথা শুনতে এসেছি।"

"সে ত সুখের কথা। কতদিন ধ'রে কি ক'রে তোমার মনে এ ইচ্ছা এল?" পাদরীর স্বরে একটী শান্ত স্নেহের ভাব ছিল। সে জন্যই হোক বা অনেক দিনের নিরুদ্ধ ব্যথা কাহাকে বলিতে পারিবার অবসর পাইয়াই

হৌক, শঙ্কর ধীরে ধীরে সমস্ত কথা—তাহার প্রথম স্কুলে যাওয়ার পর হইতে সেই যাত্রা শুনিবার রাত্রির কথা অবধি—অনর্গল বলিয়া গেল। কোনো কিছু গোপন রাখিল না। তারপর জিজ্ঞাসা করিল—"শুনেছি আপনাদের ধর্ম্মে জাতিভেদ নেই, সে ধর্ম্মে কি আমাদের আশ্রয় আছে?"

পাদরী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন—"তুমি ছেলেমানুষ, একটী আঘাত পেয়ে আমার কাছে এসেছ। তোমার আশা আমাদের ধর্ম্মে এমন আঘাত নেই। কিন্তু অত্যাচার কোনো না কোনো রকম সব সমাজেই আছে। আর আমাদের ধর্ম্ম ত শুধু জাত মানে না ব'লেই পৃথক ধর্ম্ম নয়। তার মধ্যে আরও অনেক কথা আছে। তুমি কতদূর লেখাপড়া করেছ?"

শঙ্কর জানাইল সে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে।

পাদরী কহিলেন—"আমাদের ধর্ম্ম কি সে তুমি যিনি আমাদের ধর্ম্মের মূল তাঁর কথা থেকেই সব চেয়ে ভাল বুঝবে।"

তারপর অন্য ঘরে উঠিয়া গিয়া তিনখানা বই লইয়া আসিলেন। একখানি তাঁহারি প্রণীত খ্রীষ্টধর্ম্ম—সহজ বাংলাতে লেখা। অন্য দুখানি St. Matthew'র Testament, ইংরাজী ও বাংলাতে। বই কয়খানি শঙ্করকে দিয়া কহিলেন—"এই কয়খানি বই তোমার অবসর মত পড়ে দেখো। তারপর যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমার সঙ্গে আবার দেখা কোরো।"

শঙ্কর উঠিল। পাদরী তাহাকে ফটক অবধি পৌঁছাইয়া দিয়া বাগানে ফিরিয়া গেলেন। শঙ্কর বাজারে গেল এবং যাহা কিনিবার ছিল, কিনিয়া বেশী রাত্রি হইবার আগে বাড়িতে ফিরিল।

বইগুলির ছত্রে ছত্রে যেন মানুষের গৌরব ভরা। ছোট বড় সংসারে থাকিতে পারে, বিধাতার চোখে নাই। পবিত্রতা অপবিত্রতা জন্মের ধারা বহিয়া চলে না। হাজার হাজার বৎসরের ব্যবধান হইতে কে শুনাইল তাহাকে এই অমৃত বাণী। তাঁহারো জন্ম হীন কুলে—এ পৃথিবীতে তাঁহার দিন বহুদিন হইল ফুরাইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনিই

বলিতেছেন—আমি চিরদিন তোমাদের সাথে আছি—যত দিন সৃষ্টি রহিবে ততদিন আমি তোমাদের সাথের সাথী।

শঙ্কর ঠিক করিল খ্রীষ্টান হইবে। কিন্তু কথাটা মা'কে বলা চাই। মা খুসী হইবেন বলিয়া একদিন রাত্রিতে ইচ্ছাময়ীকে আবার তাহার ছেলেবেলার গল্প বলিতে বলিল। অতি মূর্খ মা'ও নিজের সন্তানের বেলাতে অনেক কথা বুদ্ধিমতীরই মত বোঝে। আর ইচ্ছাময়ী মূর্খ ছিল না। কথাটা যে আর কোনো কথার পূর্ব্বাভাস সে সেটা বুঝিল, কিন্তু তবু যেমন ভাবে সব কথা কহিত সেই ভাবেই বলিতে আরম্ভ করিল।

কিছুক্ষণ পরে ইচ্ছাময়ী শেষ না করিতেই শঙ্কর কহিল—'মা'।

'কি ?'

'আমি মনে করেছি খ্রীষ্টান হব।'

ইচ্ছাময়ী যেন ভালো করিয়া শুনিতে পায় নাই, বলিল—'কি হবি ?'

'খ্রীষ্টান'।

'কেন ?'

মায়ের মন গলিয়াছে মনে করিয়া শঙ্কর পাদরীর নিকট যাহা বলিয়াছিল, আবার সেই সব কথা মায়ের কাছে বলিল।

ইচ্ছাময়ী কহিল—'এতে খ্রীষ্টান হবার কি কথা আছে ? জাত-জন্ম ভগবান করেছেন। ব্রাহ্মণ কলির দেবতা। আমি তোমার দোষ দিই না, দোষ অবনীর, সে তোমাকে ওখানে নিয়ে বসলো কেন ?"

হায়রে, অবনীও ত এই সুরে কথা বলিয়াছিল। তাহার অন্তরের দুঃখের সাড়া কি জগতে কোনো হৃদয়ে নাই ? খ্রীষ্ট সম্বন্ধে অনেক কথা সে মাকে বলিবে ঠিক করিয়াছিল, কিন্তু বলিল না।

খানিক পরে ইচ্ছাময়ী কহিল—'আমার কাছে আয়।'

শঙ্কর মায়ের বিছানায় উঠিয়া গেল। ইচ্ছাময়ী কহিল,—'আমার মাথায় হাত দে।'

শঙ্করের আর কোনো উৎসাহ ছিল না, মাথায় হাত দিল। ইচ্ছাময়ী বলিল,—'এবার বল যে কোনোদিন বাপ-পিতাম'র ধর্ম্ম ছাড়বিনে।'

শঙ্কর শপথ করিল।

ইচ্ছাময়ী আবার কহিল—'যদি করিস, সেদিনই আমার মরা-মুখ দেখবি।'

শঙ্কর মায়ের বুকে মাথা রাখিয়া সব শুনিল। বুঝিল যে তাহার কোনোদিন খ্রীষ্টান হওয়ার সম্ভাবনা নাই—আর বুঝিল মায়ের নিকট হইতে সে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছে এবং সেখানে সে নিতান্ত একাকী।

শঙ্কর নীলগঞ্জে আর ফিরিয়া গেল না। পাদরীও তাহার আব খোঁজ করেন নাই।

(৫)

কিছুদিন ধরিয়া মাতাপুত্রের চিন্তা বিভিন্ন পথে চলিল। ইচ্ছাময়ী ঠাকুর দেবতার নাম স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিত—'কি করে এ অবোধ বালককে বোঝাই সব কথা। সিদ্ধেশ্বরী তলার মাদুলী এনেই না ওকে পেলাম। তারপর যখন হামে ও যেতে বসেছিল, তখন ঠাকুর মশায়েব কাছ থেকে চরণামৃত এনেই না ওকে বাঁচাই। ও বলে খ্রীষ্টান হবে। মা সিদ্ধেশ্বরী, যদি সারা জীবন তোমার নাম ক'রে চলে থাকি, মা, তবে আমার বুকে এমন দাগা দিও না।'

শঙ্কর ভাবিত—'জীবনে এ কি গরমিল। যাকে সব চেয়ে ভালবাসি, সেই আমার অন্তর থেকে সব চেয়ে দূরে। কেমন করে মাকে বোঝাই খ্রীষ্ট কে, কি তাঁর বাণী। তিনি ত আমাদের মত লোকের জন্যই পৃথিবীতে এসে নিজের রক্তে আমাদের মুক্তির দ্বার খুলে গেছেন।'

একদিন রাত্রিতে শঙ্করের ঘুম পাইতেছিল না। মনে করিতেছিল মার মনও কি খ্রীষ্টের দিকে নেওয়া যায় না। ইচ্ছাময়ীকে ডাকিয়া কহিল 'মা, তোমার কথা যদি ঠিক না হয়?'

ইচ্ছাময়ী জাগিয়াই হাতে কি পয়সা আছে, না আছে তাহার হিসাব করিতেছিল। বলিল, 'আমার কোন্ কথা?'

'এই ছোট বড় করা যদি ভগবানের হাত না হয়?'

'তবে কার হাত?'

'এটা যদি মানুষেরই ব্যবস্থা হয়। খ্রীষ্টানদের মধ্যে ত এ নেই, তারাও ত মানুষ।'

ইদানীং ইচ্ছাময়ীর রক্ত ঐ খ্রীষ্টান শব্দটা শুনিলেই গরম হইয়া উঠিত। কিঞ্চিৎ রুক্ষ স্বরে উত্তর দিল—'আর জন্মের পাপ এ জন্মে ভোগ করতেই হবে, বাবা।'

ইহার বিরুদ্ধে অনেক কথা শঙ্করের বলিবার ছিল। পাদরীর প্রণীত "খ্রীষ্টধর্ম্মে" জাতির বিরুদ্ধে, জন্মান্তরের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি সে পড়িয়াছিল এবং সেগুলি তাহার কাছে মনে হইয়াছিল অকাট্য। কিন্তু মাকে তাহার রাগাইবার ইচ্ছা ছিল না। তাই কথাটা কিছু অন্যভাবে ঘুরাইয়া কহিল—'এই ধর যদি তোমার পুণ্য বাবার চেয়ে বেশী হয়, কিংবা আমি যদি পাপ করি, তাহলে পরজন্মে আর কি করে আমাদের দেখা হবে?'

ইচ্ছাময়ী এবার সত্যই রাগ করিয়া উত্তর দিল—'তু'পাতা ইংরেজী পড়ে তোর যে কি হয়েছে জানি না, আমার পুণ্য, তাঁর পুণ্য, তোর পুণ্য এ কি সব পৃথক? সতীর স্বামী কখনও বদ্‌লায়, না তার সন্তানকে সে কোনোদিন হারায়?'

ইহার পর আর কথা চলে না। পরের দিন প্রাতেই ইচ্ছাময়ী তাহাদের জাতির পুরোহিতের কাছে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া আসিল। শঙ্করের মনে এ চিন্তা এতদিন আছে ভাবিয়া তাহার মন আশঙ্কায় ও অশান্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। পাড়ার আর তু-একজনকে গোপনে শঙ্করের জন্য একটী মেয়েও দেখিতে বলিল।

শঙ্কর লেখাপড়ায় অবহেলা করিত না। পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন ছুটি, এমন সময়ে তাহাদের পাড়ায় কলেরা দেখা দিল। ঘরে ঘরে রোগী। রাস্তায় চলিতে গেলে গা ছম্‌ছম্‌ করে। প্রতিদিন কাহারো না কাহারো মৃত্যু হইতেছে। কেহ কাহারো বাড়ীতে বিশেষ যায় না। সকাল সন্ধ্যা নগর-সংকীর্ত্তন হইতেছে।

এ রোগ বড়-ছোটর ভেদ রাখিল না, সমস্ত গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল। ভৈরব গেলেন, নন্দ চৌধুরী যাইতে যাইতে রহিয়া গেলেন।

ইচ্ছাময়ী গেল। গ্রামে ইচ্ছাময়ীর এক দূর সম্পর্কের মাসতুতো ভাই তাহার মহাজনীর কাজকর্ম্ম দেখিয়া দিত সেও গেল। ঘরে ঘরে শোকের রোল উঠিল। তারপর কোনো হিংস্র জন্তুর মত চারিদিকে থাবা মারিয়া ফাল্গুনের শেষে মারী অন্তর্হিত হইল।

মা থাকিলেন না, অথচ সংসার চলিবে, এ চিন্তা একদিন শঙ্কর করিতে পারিত না। কিন্তু সংসার ত চলিলই, এমন কি মায়ের মৃত্যুর পরদিন নিজের রান্না হবিষ্যান্ন যখন ক্ষুধার জ্বালায় পেট ভরিয়াই খাইল তখন নিজের প্রতি তাহার অসীম ঘৃণার উদ্রেক হইল। মানুষকে ভোলা এতই সহজ? তাহার অভাবে দিন রাত হয় না, সেটা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু ক্ষুধাও পায়, ঘুমও হয়? অথচ মানুষ ভাবে সে আর একজনকে ভালোবাসে।

কিন্তু তখনও সে বোঝে নাই তাহার জীবন কতখানি খালি হইয়া গেছে। হঠাৎ হাত বা পা কাটা গেলে যেমন কিছুক্ষণ কোনো বোধ থাকে না, তারপর আসে অসীম যন্ত্রনা এবং তারো পর চিরদিনের অভাব, শঙ্করেরও তেমনি মাতৃবিরহের বেদনা দিনের পর দিন গভীরতর হইয়া উঠিল।

ইচ্ছাময়ী তাহাকে বিশেষ কিছু বলিয়া যাইবার অবসর পায় নাই। শঙ্কর তাহাদের মহাজনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিত না। কিন্তু দুই এক মাস যাইতেই খাতকের পর খাতক আসিতে লাগিল। সকলেরই মুখে এক কথা—টাকা ফেরৎ দিয়াছে। ইচ্ছাময়ী কাজের গতিকে খত ফেরৎ দিতে পারে নাই। নিজের লোক বলিয়া তাহারাও বিশেষ জোর করে নাই। কিন্তু এত শীঘ্র ইচ্ছাময়ী চলিয়া যাইবে এ কেহ ভাবিতে পারে নাই। ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আক্ষেপ করিয়া ফল নাই। এখন যদি শঙ্করের অসুবিধা না হয় তবে খতখানি ফেরৎ দিলে ভাল হয়। তবে যদি শঙ্কর ব্যস্ত থাকে তাহারা আর একদিন আসিতে পারে।

হীরু ভট্টাচার্য্য অধিকাংশ খতের লেখক। সে সাক্ষী দিল যে টাকা প্রকৃত পক্ষেই দেওয়া হইয়াছে—তাহারই সামনে।

শঙ্কর সব খতই ফেরৎ দিল। দু একজন খাতক তখন দেশে ছিল না। শুধু তাহাদের খত রহিল। সেগুলি তামাদি হইবার এখনও সময় আছে।

মায়ের মৃত্যুর পর সে আর স্কুলে যায় নাই। স্কুলের বেতন দিয়া পড়িবার শক্তি তাহার আর নাই। বরাবর ফার্ষ্ট হইয়াছে, আশা করিয়াছিল হেডমাষ্টার ডাকিয়া একটা কিছু বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। দিনের পর দিন গেল। তাহার আর ডাক পড়িল না।

একজন বিধবা প্রতিবেশিনী দুবেলা তাহাকে রাঁধিয়া দিয়া যাইতেন। কিন্তু চলে কি করিয়া। যে টাকা ইচ্ছাময়ী রাখিয়া গিয়াছিল তাহা প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে। শ্রাদ্ধে কম টাকা খরচ হয় নাই। সে নিজে যাহা খরচ করিবে ভাবিয়াছিল, তাহার প্রায় দ্বিগুণ খরচ হইয়া গিয়াছে। সকলেই বলিয়াছে বাপ মা কাহারো দুইবার মরে না, শঙ্কর যেন টাকার কথা না ভাবে। কিন্তু শ্রাদ্ধের পরে পরামর্শ দিতে কেহ আসে নাই।

একবার মনে করিয়াছিল সেই পাদরী সাহেবের কাছে যায়। খানিকটা লজ্জায়, খানিকটা তাহার মায়ের কথা ভাবিয়া তাহা পারিল না। তাহার যতটুকু শিক্ষা এবং যে কুলে তাহার জন্ম, তাহাতে তাহার চাকরীর কোনো আশা নাই। ভাবিয়া কিছুরই যখন কিনারা করিতে পারিতেছে না, এমন সময়ে একদিন নিশিকান্ত দেখা করিতে আসিল।

নিশিকান্ত পাঠশালায় তাহার উপরে পড়িত এবং বয়সও তাহার হইতে প্রায় দশ বৎসর বেশী। পাঠশালা ছাড়িয়াই সে ব্যবসা ধরিয়াছে। বৎসরে দুএক বার গ্রামে ফেরে। পাড়ায় তাহার খ্যাতি অখ্যাতি দুইই ছিল। যতদিন পাড়ায় থাকিত পাড়া মাতাইয়া রাখিত। আজ এবাড়ীতে তাস, কাল সে বাড়ীতে পাশা। প্রায় রোজ রাত্রিতে সংকীর্ত্তন। ছেলেদের খেলনা বানাইয়া দিত। মেয়েদের ফরমাস খাটিত। সব চেয়ে লম্বা গাছের নারিকেল সেই পাড়িয়া দিত। অসুখ বিসুখ বা ক্রিয়াকর্ম্মে তাহার হাতে ভার দিয়া সকলে নিশ্চিন্ত হইত। শুধু তাহার সমবয়সীরা তাহাকে পছন্দ করিত না, বলিত মেয়েদের দিকে ও যেন কেমন নজরে তাকায়।

নিশিকান্ত ও শঙ্করে অনেক আলাপ হইল। উঠিবার আগে নিশিকান্ত কহিল—'একটা কথা মনে করে এসেছিলাম, যদি কিছু না মনে কর ত বলি।'

শঙ্কর বলিল—'তুমি যে কুটুম্বিতা আরম্ভ করলে—বলই না কি কথা ?'

'আজ কাল শুধু মাঝিগিরিতে দিন চলে না। আমি তাই শীতকালে মাছের ব্যবসাও করি কিছু কিছু। কোনো বড় হাটে মাছ কিনে ছোট হাটে বিক্রি করি। যেগুলি জীয়িয়ে রাখা না যায়, সেগুলি কেটে নুন মাখিয়ে রাখি। আর কই মাগুর এ সব ত রাখা যায়। যে লোকটি আমার সাথে কাজ করত, নানা গোলমালে সে চলে গেছে। তুমি লেখাপড়া করেছ, হয়ত তোমার ভালো লাগবে না। কিন্তু এই ত আমাদের জাতের ব্যবসা, যদি ভালো লাগে আমার সঙ্গে আসবে কি—মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে না।'

শঙ্কর যেন আকাশ হাতে পাইল। বলিল—'মোটা ভাত কাপড় ছাড়া কিছুই চাই না, নিশিদা। নিজের নৌকা নেই, না হলে একথা আমিও ভেবেছিলাম। সবাই মুখে না হলেও মনে মনে আমার লেখাপড়া শিখতে যাওয়া নিয়ে ঠাট্টা করে বলে আমি আর কারুর নৌকাতে কাজও চাইতে পারিনি।'

তারপর একদিন সকালে পাল তুলিয়া শঙ্করকে লইয়া নিশিকান্তর নৌকা যখন গ্রামের ঘাট ছাড়িল—পাড়াতে অনেকেই বলিল—'বলেই ত ছিলাম লেখাপড়া আমাদের সয় না। বাপ গেল, মা গেল। লেখা পড়া শেষ হল, রইল কিন্তু জাত ব্যবসা।

শঙ্করের মনে কিন্তু অপূর্ব্ব পুলক জাগিয়া উঠিল। পালে তখন বাতাস লাগিয়াছে। এ যেন রূপকথার পাখী, ডানা মেলিয়া নীলাকাশ ভেদ করিয়া ছুটিয়াছে। নদীর জলে, কূলের ঘাসে, এ কি গন্ধ! আকাশে এক সারি গাংচিল যেন কুচকাওয়াজ করিতেছে। যেন সাদা মেঘের টুকরো সব, এক একবার পালকে ভোরের রোদ লাগিয়া হীরের মত ঝকমক্ করিয়া উঠিতেছে। ঘাটে ঘাটে ঘট কক্ষে গ্রামের

বধূরা। কাহারো স্নান হইয়া গিয়াছে, সখীর জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কেহ জল ভরিতেছে, কেহ বা গামছায় বুক ঢাকিয়া আঁচল কাচিয়া লইতেছে। নিশিকান্ত হালে বসিয়া গুণ গুণ করিয়া গাহিতেছে—

"আমারে ডাক দিয়েছে, ভাই, সোনার দেশের গাঙ্।"

(৬)

নিশিকান্তের কার্য্যকলাপ শঙ্কর অবাক হইয়া দেখিত। তাহার কথা-বার্ত্তা অবাক্ হইয়া শুনিত। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তাহার মনে হইতে লাগিল নিশিকান্তর এ জ্ঞানবুদ্ধির কাছে তাহার পুঁথিগত বিদ্যা নিতান্ত তুচ্ছ। কোন্ তিথিতে কখন জোয়ার আসিবে, কোন্ নদীর কূল কোথায় ভাঙ্গিতেছে, কোন্ ধারে স্রোতের জোর বেশী, কোন্ বাঁকে পাল চলিবে, সবই তাহার জানা। বাতাস দিলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস লইয়া বলিত বৃষ্টি হইবে কিনা। আকাশে যখন মেঘ নাই তখন বাতাসের গতি ও দিনের গরম দেখিয়া বুঝিতে পারিত বিকালে ঝড় হইবে কিনা। নদীর বুকে আমাবস্যার অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহার দৃষ্টি খুঁজিয়া পাইত নৌকা রাখিবার জায়গা। শরীরে তাহার অসীম শক্তি, শঙ্করকে বেশী খাটিতে দিত না। উজানে দাঁড় বাহিত সেই, প্রয়োজন হইলে গুণ টানিত সেই। তারপর দিনের শেষে যখন রাঁধিতে বসিত, তখন শঙ্কর বলিত—'দাও না, নিশিদা, আমি কিছু করি।'

নিশি হাসিয়া বলিত—'করবি রে, সবি করবি। দুদিন সবুর কর। আর কিছু দিন পরে তোর নিশিদা শুধু পায়ের উপর পা দিয়ে শুয়ে থাকবে, তোকেই করতে হবে সব। খাটুনীর জীবন আমাদের, দুদিন একটু আরামে রইলিই বা।'

শঙ্করের উপর তাহার অসীম মমতা ছিল। সর্ব্বদা এমন ভাবে চলিত যেন শঙ্করের উপযুক্ত কাজ এ নয়, এ কাজের কঠোরতা হইতে তাহাকে বাঁচানো চাই। অথচ তাহাকে শিখাইতও সব। ঝড় আসিলে হাল ধরিতে বলিত ও নিজে কাছে বসিয়া রহিত। দরকার হইলে দাঁড় দিয়া কি করিয়া হালের কাজ ও হাল দিয়া দাঁড়ের কাজ করা যায়, তাহা

দেখাইত। শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিত—'তোমার মত সব বিষয়ে পাকা কবে হতে পারব, নিশিদা।' নিশিকান্ত উত্তর দিত—'পারবি, পারবি, আগে রোদ লাগা। তবে দু-একদিকে আমার মত তোর পেকে কাজ নেই।' শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিত—'ব্যাপারটা কি?' নিশিকান্ত চোখে মুখে এক অগাধ রহস্যের ভাব আনিয়া মাথা নাড়াইয়া জানাইত এখনো বলিবার সময় হয় নাই।

নিশিকান্তর সহিত কাজ করিয়াও সুখ ছিল। সর্ব্বদা হাসিমুখ। দোষ কারো দিলে নিজের দোষই দিত। কখনও পাল তুলিবার পর, কখনও বা দিনের শেষে ছুটি মিলিলে নৌকার উপর বসিয়া হয় বাজাইত বাঁশী, না হয় তুলিত গান। মুগ্ধ হইয়া শঙ্কর শুনিত। বাঁশী যেন কাঁদিতে থাকিত। শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিত—'এটা কি বাজালে?' নিশিকান্ত বলিত—মাথুর, না হয় মান, না হয় বিরহ। ক্রমে শঙ্কর বাঁশীর সুর ধরিতে শিখিল।

নিশিকান্তের উপর স্নেহে, শ্রদ্ধায় বিশ্বাসে শঙ্করের মন ভরিয়া গেল।

শীত আসিল। তখন যাত্রী কম। মাছের ব্যবসা করিবার কথা। নিশিকান্ত নৌকা বিরামপুরের বন্দরে লইয়া গেল। প্রায় এক মাইল লম্বা বাজার ও হাজার হাজার নৌকা। এখান হইতে সকালে মাছ কিনিয়া সেই দিন সন্ধ্যাতেই কাছে কাছে হাটে কিছু লাভে বিক্রি করা যায়। কিন্তু পরিশ্রমের কাজ, বিরামপুরে ফিরিতে ফিরিতে রাত্রি গভীর হইয়া যাইত। তারপর রান্না-বান্না, খাওয়া ও ঘুমানো। আবার পরদিন ভোরে বাজার করা, মাছ আনা, নৌকার খোলে তাহাদের জীয়াইয়া রাখা, কাজের অন্ত ছিল না। কিন্তু নিশিকান্তের কোনো পরিবর্ত্তন নাই। সেই অক্লান্ত পরিশ্রম, সেই হাসিভরা মুখ। শুধু জোর করিয়া রান্নার ভারটা শঙ্কর লইয়াছিল।

ক্রমে শীতও শেষ হইয়া আসিল। দেশে ফিরিবার আর বেশী দেরী নাই। একদিন দুপুরে খাইবার পর নিশিকান্ত বলিল—'তোকে একজন দেখতে চায়।'

বিস্মিত হইয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল—'আমাকে, কে ?'

'কাজল গো কাজল।'

'কে কাজল ?'

এবার নিশিকান্ত হো হো করিয়া উঠিল। বলিল—'নিশিকান্তের ছোট ভাই তার ভাজের খবর রাখে না।'

শঙ্করের বিস্ময় বাড়িয়া উঠিল, বলিল—'কি যে বলছ তুমি, পরিষ্কার করে বল না সব, কবে বিয়ে করলে, কিছুই ত শুনি নি।'

নিশিকান্ত হাসি থামাইয়া কহিল—'শোনবার কথা নয়। তুই বড় ভাল ছেলে, তোকে বলতে চাইওনি। কিন্তু কি যে তার সাধ হয়েছে তোকে দেখবে। তোর গল্প করি কি না সব সময়ে'।

'কিন্তু সে কে, নিশিদা ?'

'সে হচ্ছে কাজল বোষ্টমী, আদর করে বলি আমার চোখের কাজল। দেশ বিদেশ ঘুরি, হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খাটি, ওর ওখানে গিয়ে একটু মনটা জুড়োইরে'—তারপর শঙ্করের দিকে একটা গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—'রাগ করলি নাকি, শঙ্কু—'

শঙ্কর এবার একটু একটু বুঝিতে পারিল। বলিল—'রাগ করব কেন, কিন্তু এবার গেলেই বা তার কাছে কবে' ?

নিশিকান্ত আবার হাসিল। উত্তর দিল—'যাই ত রোজই, যখন যাই আর ফিরি, তখন শঙ্কু ভায়া যে ঘুমে অচেতন'।

শঙ্করের কৌতূহল হইল। কিন্তু যাইবার উৎসাহ ছিল না। জিনিসটা তাহার বিশেষ ভালো লাগিতেছিল না; তবে আপত্তিও করিল না বিশেষ। নিশিকান্ত যাহাই করুক তাহার তুলনা জগতে নাই। আর তাহার সাথেই ত যাইতেছে।

বন্দর ছাড়াইয়া গ্রাম, সেই গ্রামের কোণে একখানি মাত্র ঘরে কাজল থাকে। চারিদিকে বেড়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, উঠানে শুক্‌নো পাতাটি নাই। এক কোণে একটী তুলসী-মঞ্চ। তাহারই পিছনে লাউএর মাচা। আর এক কোণে একটী কূয়া। বারান্দায় দুখানা ছোট চৌকি। অন্যদিকে একটী মাদুরে বসিয়া কাজল ডাল বাছিতেছিল।

তখন সন্ধ্যা প্রায় হইয়া আসিয়াছে। বাড়ীতে ঢুকিয়াই নিশিকান্ত উচ্চ কণ্ঠে কহিল—'এই যে এনেছি আজ, কাজল। নয়ন ভরে দেখ এবার, এমন ভালোছেলেটী আর পাবে না।'

কাজল উঠিয়া দুজনকে বসিতে দিল। শ্যামাঙ্গী, ঈষৎ স্থূল কিন্তু ঋজুদেহা। এলায়িত চুল পিঠ ছাইয়া পড়িয়াছে। হাতে কয়গাছি সোনার চুড়ী, কপালে চন্দনের রেখা।

কথা বেশীর ভাগ নিশিকান্তই কহিল। অনাত্মীয়া স্ত্রীলোকের সহিত শঙ্করের পরিচয় এই প্রথম। সে খানিকক্ষণ মাথা উঁচু করিয়া কথাই কহিতে পারিল না। বিশেষতঃ যখন জানিত নিশিকান্তের সহিত এ রমণীর কি সম্বন্ধ। কাজলের মধ্যে লজ্জার আড়ষ্টতা ছিল না, লজ্জা ভাঙ্গার চাঞ্চল্যও ছিল না—যেটুকু কথা কহিল, সে শঙ্করেরই সহিত এবং সে কথার মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নাই।

সেদিন সকালে নিজেদের প্রয়োজনের কয়েকটী জিনিস কেনা হয় নাই। নিশিকান্ত শঙ্করকে রাখিয়া সেগুলি কিনিতে গেল এবং বলিয়া গেল এখানে ফিরিয়া শঙ্করকে লইয়া যাইবে।

শঙ্করের ইচ্ছা ছিল সঙ্গে যায়, কিন্তু কাজলের সামনেই এ কথা বলিতে কেমন বাধিয়া গেল। নিশিকান্ত যাইবার সময় আবার রসিকতা করিয়া বলিয়া গেল— 'কাজল, ও কিন্তু খুব ভালো ছেলে।'

নিশিকান্ত চলিয়া গেলে কাজল ঘরের পিলসুজ জ্বালাইল। আর একটী প্রদীপ জ্বালাইয়া আঁচলে ঢাকিয়া তুলসী-মঞ্চে রাখিয়া দিয়া আসিল। তারপর ফিরিয়া আসিয়া কহিল—'এবার ঘরে চল, বাইরে বড় ঠাণ্ডা।'

শঙ্কর কহিল—'এই কাদাপায়ে ঘরে যাব—জল পেলে ধুয়ে নিতুম।'

ঘরের ভিতর হইতে কাজল ঘটি ভরিয়া জল আনিল। তারপর শঙ্করকে তাহার চৌকিটা বারান্দার প্রান্তে লইয়া যাইতে বলিল। শঙ্কর জল লইতে হাত বাড়াইল এবং কিছু বলিতে পারিবার আগেই নিজ হাতে জল ঢালিয়া কাজল পরিষ্কার করিয়া শঙ্করের পা ধোয়াইয়া

দিল। তারপর হাতের গামছা দিয়া মোছাইয়া দিল। ঘরের বেড়ায় রাধাকৃষ্ণের নানারূপ যুগল মূর্ত্তির ছবি। সন্ন্যাসীর বেশে চৈতন্যদেবের ছবিও একটা ছিল। এক কোণে একখানা খাট। পরিষ্কার বিছানা, ও রঙীন মশারি আর একদিকে একটী আল্‌নায় ভাঁজকরা কয়েকখানি শাড়ী রহিয়াছে। ঘরের মেজেতে নানারূপ তৈজসপত্র। পিছনে আর একটী বারান্দা ঘেরা, সেখানে রান্না হয়।

কাজল বারান্দা হইতে মাতুর আনিয়া ভিতরে পাতিয়া দিল। শঙ্কর বসিয়া একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি রাঁধতে যাবেন না?'

কাজল কহিল—'আমি এক বেলাই রাঁধি, রাত্রিতে কখানা রুটী গড়ে নি, সকাল বেলার তরকারি থাকে।'

ধীরে ধীরে কাজল তাহাকে অনেক প্রশ্ন করিল। দেশের কথা, সংসারের কথা, তাহার জীবনের কথা—কি কোমল কণ্ঠস্বর, কি স্নিগ্ধ চাহনি, যেমন বড় চোখ তেমনি ঘন ভ্রূ ও চোখের পাতা। মায়ের মৃত্যুর পর শঙ্করের অন্তর যেন একটু স্নেহের জন্য তাহারি অগোচরে ভিখারী হইয়া ঘুরিতেছিল, অনবদ্য তৃপ্তিতে তাহার মন ভরিয়া গেল। জগৎ-সংসারের কাছে এ নারী যাহাই হৌক, তাহার ইচ্ছা হইতেছিল উহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়ে।

কাজল বলিতেছিল—'নিশিকান্ত তোমায় ভালোবাসে। পৃথিবীতে ও যে কাউকে এমন করে ভালোবাসতে পারে, আমার মনে হয় নি। তাই তোমায় দেখতে বড় ইচ্ছা হয়েছিল।'

শঙ্করের ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে তাহাই যদি হয়, তবে এখানে আসে কেন। কিন্তু লজ্জায় তাহা পারিল না। বরং কাজলের কথায় সায় দিয়া নিশিকান্ত তাহাকে কত ভালোবাসে, তাহাকে কিরূপ খাটিতে দেয় না, কি বিপদ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়াছে, উচ্ছ্বসিত হইয়া এই সব বলিতে লাগিল।

তারপর আরো কথা হইবার পর কাজল বলিল—'এখন ত চিনলে আমার বাড়ী, এসো মাঝে মাঝে। নিশিকান্তের অপেক্ষায় থেকো না। ও মন-ভোলা লোক, কখন যে ওর কি মনে হয় বোঝা দায়।'

যাহাকে লইয়া এ দেখা, এ যেন তাহারই অগোচরে তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সুর। শঙ্করের যেন কেমন লাগিল, কোনো উত্তর দিল না।

এমন সময়ে নিশিকান্তের গলা পাওয়া গেল।

সে রাত্রিতে নৌকায় ফিরিয়া নিশিকান্ত যেন মাতাল হইয়া উঠিল। গানের উপর গান। যখন নদীর বুক কাঁপাইয়া উচ্চকণ্ঠে গান তুলিল—'সে হোক না কালো, আমার ভালো চোখে লেগেছে', তখন যেন শঙ্করের বুক এক কারণহীন ব্যথায় আড়ষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। রাত্রি গভীর হইলে নিশিকান্ত বাঁশী ধরিল। কিন্তু আজ বাঁশীর অন্য সুর, সে কান্না যেন নাই, যেন সেই নদীর জোয়ারেরই মত, কূল ভরিয়া সুরের জোয়ার আসিয়াছে। অনেক রাত্রিতে বাঁশী রাখিয়া শঙ্করকে একবার জড়াইয়া নিশিকান্ত কহিল—'কেমন করে বলব, রে শঙ্কু, কি ভালো লেগেছে আজ। তোর কাছে আজ আর আমার কিছু গোপন নেই।'

শুধু কেহ জানিত না যে দূর সাগরের গোপন আহ্বান লইয়া শঙ্করেরও দেহ মনে জোয়ার আসিয়াছে একই সাথে দুই কূলে ভাঙ্গনের মাতন সুরু করিয়া দিয়াছে।

৭

সৃষ্টিতে সব চেয়ে ঘৃণা করে লোহা চুম্বককে—কারণ তাহার টানিবার শক্তি আছে কিন্তু আপন করিয়া লইবার শক্তি নাই। শুধু শঙ্করের মনে এ ঘৃণা জাগিতেছিল নিজের উপর—কাজলের উপর নয়। কাজল যদি তাহার মনের সকল দ্বিধা কাটাইয়া সকল বাধা ভোলাইয়া নিজের কাছে টানিয়া লইতে পারিত, শঙ্কর বাঁচিত। অথবা স্বপ্নের মত ঘুম ভাঙ্গিবার সাথে সাথে মন হইতে সরিয়া যাইত, তাহা হইলেও শঙ্কর শান্তি পাইত। কিন্তু অদৃষ্টে তাহা তাহার ছিল না। দেশে ফিরিবার আর চার-পাঁচ দিন মাত্র বাকি আছে। নিশিকান্তের অনুরোধ সত্ত্বেও শঙ্কর কাজলের কাছে আর যায় নাই। নিশিকান্তের খুসীর সীমা ছিল না। কাজলকে জিজ্ঞাসা করিত—'কি, বন্ধুকে লাগল কেমন?' শঙ্করকে বলিত—'কাজল

যে রোজই তোর কথা জিজ্ঞেস করে, গতিক ভালো নয় ত'। নিজের শক্তির উপর তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, তাই হাতের ঘুড়ীর মত নিজের কল্পনাকে মনের আকাশে খেলাইয়া সুখ পাইত। শঙ্কর অনেক সময়ে কর্কশ উত্তর দিত। পরে অনুতপ্ত হইয়া সহস্র রকমে নিশিকান্তকে খুসী করিতে চেষ্টা করিত। নিশিকান্ত কোনোটিই লক্ষ্য করিত না।

কিন্তু পড়ন্ত রোদে ডিঙির উপর ডিঙি যখন নদীর বুক যেন না ছুঁইয়া ভাসিয়া আশ-পাশের গ্রামে ফিরিত, তারপর নদীর বুকে যখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিত, তখন শঙ্করের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিত একটী দীপালোকিত গৃহ, ঘন পল্লবস্নিগ্ধ দুটী নয়ন, আর এই সন্ধ্যারই মত উদাস বৈরাগ্যে ভরা একখানি মুখ। আর মনে পড়িত তাহার পায়ে কোমল দুখানি হাতের নিপুণ স্পর্শ। নিজের আকুলতা আর রাখিতে পারিত না, নিশিকান্তকে বলিত 'একটী গান গাও ত, ভাই—'

এমনি সময়ে সে জ্বরে পড়িল। নিশিকান্ত তাহাকে কাজলের বাড়ীতে লইয়া যাইতে চাহিল। শঙ্কর অনেক আপত্তি করিল, নিশিকান্ত শুনিল না, বলিল—'কতদিন কত অসুখ বিসুখে নৌকাতে কাটাতে হবে, কাজলের বাড়ী কাছে থাকতে কেন এ কষ্ট পাওয়া'। তারপর শঙ্করকে গরুর গাড়ীতে লইয়া, নিজে সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া সন্ধ্যার সময়ে কাজলের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

কাজল সব শুনিয়া ক্ষিপ্র ও নিপুণ হস্তে খাটে শঙ্করের জন্য নূতন বিছানা করিয়া দিয়া রান্নাঘরে নিজের বিছানা করিল। তারপর শঙ্করকে বাতাস দিতে বসিল। নিশিকান্তকেও থাকিতে বলিল, কিন্তু নৌকায় কাহারো থাকা দরকার বলিয়া নিশিকান্ত কিছু কাল পরে ফিরিয়া গেল।

দুদিন পরে শঙ্করেয় জ্বর ছাড়িল। যখনই চোখ মেলিয়াছে, দেখিয়াছে কাজল পাশে বসিয়া কিছু না কিছু করিতেছে। কখন যে সে নিজের কাজ করিত শঙ্কর তাহা বুঝিতে পারিত না। তেমনি পরিপাটী সাজানো ঘর, তেমনি পরিচ্ছন্ন বেশে কাজল।

সেদিন রাত্রিতে শঙ্কর কাজলকে কহিল—'তুমি আজ ঘুমোতে যাও, আমি ত ভালো আছি।'

কাজল উত্তর দিল—'আমি ত রোজই ঘুমোই সময়মত। আজো তুমি দুর্ব্বল, আমি কাছে থাকি, তুমি ঘুমুলে আমি ঘুমুতে যাব।'

কিন্তু ঘুম শঙ্করের আসিল না। এ কি সত্য? যে ঘরের স্বপ্ন সে প্রতি সন্ধ্যায় দেখিয়াছে সেই ঘরে, সেই কাজলের কাছে সে রহিয়াছে, একি সম্ভব? সেই দীপালোকিত স্নিগ্ধ মুখখানি এত কাছে? রাত্রি হইলে কাজল জিজ্ঞাসা করিল—'কই তুমি ঘুমোচ্ছ না যে, বললে যে ভালো আছ?'

'এই যে এবার ঘুমোই'—বলিয়া শঙ্কর চোখ বুজিল। তন্দ্রাও আসিল। যখন জাগিল তখন কত রাত্রি জানে না। দেখিল কাজল তাহার মাথাটী কোলে লইয়া বসিয়া রহিয়াছে। আর দুচোখ বহিয়া জল পড়িতেছে।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল—'কাজল, কাঁদছ কেন?'

কাজল উত্তর দিল না, শঙ্কর আবার কহিল—'কি দুঃখ তোমার, কাজল? নিশিদা তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে।'

এবার কাজল উত্তর দিল, বলিল—'বাসে সত্যি, কিন্তু ও যেন ঝড়ের মত এসেছে, আবার কবে ঝড়ের মত চলে যাবে।'

শঙ্করের বুকের মধ্যে তোলপাড় বাধিয়া গেল। কিছু বলিতে সাহস করিল না। তারপর কাজল হঠাৎ তাহার মুখখানা বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—'মাণিক আমার, কেন আসনি এতদিন আমি যে রোজ পথ চেয়ে থাকতাম।'

শঙ্কর মনে মনে ডাকিল—'নিশিদা, নিশিদা।' ইচ্ছা হইল মুখ সরাইয়া লয়, কিন্তু পারিল না, চুপ করিয়া রহিল।

কাজল আবার কহিল—'চল, আমায় কোথাও নিয়ে চল। চল কাল রাত্তিরেই যাই। আমার কিছু টাকা আছে'। যেদিন না থাকবে, ভিক্ষে করে তোমায় খাওয়াব, এমন করে ভেসে ভেসে আর পারি না।'

এবার শঙ্কর উঠিয়া বসিল। 'কি বলছ এসব তুমি?

কাজল স্তব্ধ হইয়া গেল। তারপর আঁচলে চোখ ঢাকিয়া দ্রুত পদে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

সেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রাত্রি অন্ধকার, যেন এই প্রত্যাখ্যাতা পথভ্রষ্টা নারীর লজ্জায়, অপমানে, কলঙ্কে চারিদিক কালি হইয়া গিয়াছে। শঙ্করের ইচ্ছা হইল উঠিয়া যায়। কিন্তু উঠিয়া গিয়া কি বলিবে ঠিক করিতে পারিল না। এক একবার মনে পড়িতে লাগিল নিশিকান্ত সেই সন্ধ্যাবেলাতেই না তাহার কাছে অনেকক্ষণ বসিয়া, তাহাকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য অনেক মজার গল্প করিয়া গিয়াছে।

রাত্রি প্রভাত হইল। কাজল নিজের কাজ ও রোগীর সেবা যেমন করিত, তেমনি করিতে থাকিল। কেহই রাত্রির কোনো কথা তুলিল না।

সেদিন বেলা হইলে নিশিকান্ত যখন আসিল, শঙ্কর তাহাকে বলিল সে ভালো হইয়া গিয়াছে। সেই দিনই ভাত খাইবে, এবং সেই দিনই নৌকায় ফিরিতে চায়। নিশিকান্তের ইচ্ছা ছিল শঙ্কর আর একদিন কাজলের কাছে থাকে। কিন্তু দেশে ফিরিবার আর দুই দিন মাত্র বাকি, তাই বিশেষ আপত্তি করিল না। সেও দ্বিপ্রহরে কাজলের কাছে খাইল। কিছু পরে শঙ্করকে বলিল—'তুই এবার এগো, শঙ্কু, আস্তে হাঁটবি ত, আমি পথে ধরে নেব।'

এবার নিশিকান্তের যাইবার পালা। উঠিবার বেলায় একখানা দশ টাকার নোট কাজলের হাতে গুঁজিয়া দিয়া কহিল—'শঙ্কুকে রাখবার খরচপত্র—"

সে শেষ না করিতেই কাজল নোট ফিরাইয়া দিয়া কহিল—'কোনো দরকার নেই, বিশেষ কিছু খরচ হয়নি।'

নিশিকান্ত বিদ্রূপ করিয়া কহিল—'একি কাজল বিবির টাকায় অরুচি হল কবে থেকে—'

'রুচি অরুচি কি বোঝ তুমি? এবার যাও তুমি, বন্ধু হয়ত অনেক পথ এগিয়ে গেল—' বলিয়া কাজল দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

নিশিকান্ত তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া গাহিল—'লোহারি বাঁধনে বেঁধেছে কাজল, দাসখৎ লিখে দিয়েছি হায়—"

তারপর একবার প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া নিজের পথ ধরিল। বিদায়ের বেলা কাজল কিছুক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিত। কিন্তু এবার ফিরিয়া দেখিল—কাজল সেখানে নাই। উচ্চৈস্বরে নিশিকান্ত কহিল—'সাবধানে থেকো, কাজল। পারি যদি ত বর্ষাকালে হয়ে যাব।'

শঙ্কর ও নিশিকান্ত দেশে ফিরিয়া কয়েক মাস কাটাইয়াছে। বর্ষা আসিবার আর বেশী দেরী নাই। দু'একটী প্রয়োজনীয় জিনিস আগে হইতেই কিনিয়া রাখিতে হইবে। এসব লইয়া পরামর্শ করিতে শঙ্করের বাড়ীতে আসিয়া নিশিকান্ত দেখে শঙ্কর ঘরের মধ্যে মন দিয়া বই পড়িতেছে।

নিশিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল 'কি বই ও?'

শঙ্কর নিশিকান্তকে দেখিতে পায় নাই। তাড়াতাড়ি বাইবেল-খানি বন্ধ করিয়া চলিল—'ও একটা বই, কি মনে করে, নিশিদা?'

নিশিকান্ত সে কথার উত্তর দিল না, বলিল—'তুই বুঝি খুব পড়তে ভালোবাসিস্, আচ্ছা 'বিদ্যাসুন্দর' আছে তোর কাছে?'

'না, নিশিদা, কি মনে করে এলে?'

নিশিকান্ত রাগের ভান দেখাইয়া বলিল—'তোর কাছে কি আসতেও নেই রে? ফিরে অবধি ত ডুমুরের ফুল হয়েছিস। আর ত বেরোবার দেরী নেই আমাদের। দুই একটা জিনিস কিনতে টিনতে হবে, একদিন নীলগঞ্জে চল।

শঙ্কর কহিল—'নিশিদা আমি আর তোমার সাথে ফিরব না—কদিন থেকে মনে করছি তোমায় বলব।'

নিশিকান্ত কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিয়া উত্তর দিল—'ফিরবি না কিরে? তোর ভালো লাগে না? আর এখানে করবিই বা কি?'

শঙ্করের ভয় হইতেছিল নিশিকান্তের কাছে তাহার সঙ্কল্প না থাকে। তাই কিছু জোর দিয়াই বলিল—'ও কাজ আমি পেরে উঠব কিনা জানি না, তা ছাড়া আমার খাতকদের কাছ থেকে টাকা আদায়ও কিছু করা দরকার, দেশে না থাকলে এ সব হয় না।'

নিশিকান্ত কখনও কোথাও হার মানে নাই। শঙ্কর তাহাকে নিজে হইতে একেবারে ছাড়িবে এ তাহার কল্পনার অতীত। কিন্তু শঙ্করের কথায় যে দৃঢ়তা ছিল তাহা স্মরণে থাকায় বলিল—'তবে একটা বছর দেশে কাটা, টাকা কড়ি আদায় কর। কিন্তু পারবি না কি, বেশ ত পারছিলি। পরের বৎসর আবার যাবি। এক বছরের জন্ম একটা লোক আমি জোগাড় করে নেব এখন।'

তারপর অন্য অনেক কথা হইল। উঠিবার সময় নিশিকান্ত বলিল—'গানের অভ্যাসটা রাখিস, তোর বেশ গলা আছে।' ফিরিবার কিছু পূর্ব্ব হইতে নিশিকান্ত শঙ্করকে গাহিতে শিখাইতেছিল।

নিশিকান্তের যাইবার দিন আসিল। তাহাকে বিদায় দিয়া ঘাট হইতে ফিরিবার সময়ে শঙ্করের মনে হইল যেন তাহার পৃথিবী শূন্য হইয়া গিয়াছে। মা, বাবা, কাজল, নিশিদা—একে একে সবাই কোথায় গেল। আঁধার রাত্রিতে নদীর বুকে দেখা নৌকার মত এরা কোন্ আঁধারে মিলাইয়া গেল। সর্ব্বোপরি নিশিদা—

সে বেদনা বুঝিবার মত লোক কি আছে সংসারে? সত্যিকার বন্ধু ইচ্ছা করিয়া বিদায় দিয়াছে কি কেহ? সে স্নেহে দান নাই প্রতিদান নাই, জয় নাই পরাজয় নাই, আহ্বান নাই প্রত্যাখ্যান নাই। এই অপরিচিত শত্রুময় জগতে দুটী পুরুষের এক সঙ্গে পথযাত্রা—শেষ কি হইয়া গেল সবই?

বাঁচিয়া থাকিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। খত ফিরাইয়া দিবার পর যে কয়েকটী খাতক বাকি ছিল, শঙ্কর তাহাদের বাড়ীতে যাইতে আরম্ভ করিল। বেশী দেনা মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডলের। মৃত্যুঞ্জয় শঙ্করকে দেখিয়া আদর আপ্যায়ন করিল এবং টাকার কথা তুলিতেই বলিল—'ও সম্বন্ধে উমেশ জানে। সে মাসখানেক পরে ফিরবে। মনে হয় যেন একবার বলেছিল যে প্রায় সমস্ত টাকাটা তোমার মাকে দেওয়া হয়েছে।'

শঙ্কর এখন এ সব কিছু কিছু বুঝিত, বলিল—'কিন্তু খতের পিঠে ত কোন উশুল নেই।'

মৃত্যুঞ্জয় হাসিয়া উত্তর দিল—'তোমরা বাবা একালের ছেলে; সব

কাগজে কলমে চাই, আমরা পরস্পরকে কত বিশ্বাস করতাম। কতবার বিনা খতে তোমার বাবার কাছ থেকে টাকা এনেছি, তারপর সুদশুদ্ধ ফেরৎ দিয়েছি, কিন্তু সেদিন কি আছে আর ?'

শঙ্করের বেড়ানো হইতে লাগিল বটে—কিন্তু টাকা ঘরে আসিল না। সৃষ্টিধর এ সব জানিত তাই উচ্চ সুদে ছাড়া টাকা দিত না। তাহার কিছু লাভ হইয়া গেলেই বাকি টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিত না। কিন্তু এসব খত তাহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে নেওয়া, সুদও তামাদি বাঁচাইবার জন্য দু-এক টাকা ছাড়া নেওয়া হয় নাই।

কয়েকদিন পরে একদিন দ্বিপ্রহরে ফিরিয়া আসিয়া শঙ্কর দেখে তাহার জন্য রান্নাবান্না কিছুই হয় নাই। যে প্রতিবেশিনী তাহার জন্য রাঁধিয়া দিত, মনে করিল তাহার বুঝি অসুখ হইয়াছে। সেখানে গিয়া দেখিল বুড়ী খাইয়া দাইয়া শুইয়া আছে।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল—'কি মাসী, ব্যাপার কি ? মাসী কহিল—'সে অনেক কথা।'

শঙ্কর ভিতরে ঢুকিয়া বসিতে যাইতেছিল। বৃদ্ধা কহিল—'ঐখানেই দাঁড়াও, বাবা, আমি বাইরে আসছি।'

তারপর বাহিরে আসিয়া চুপি চুপি কহিল—'পাড়াময় রটে গেছে তুমি খেৃস্তান, গরু খাও, আচ্ছা, বাবা একথা কি সত্যি ?

সে কথার উত্তর না দিয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল—'রটেছে ত, কিন্তু রটালো কে, মাসী ?'

তাহার প্রশ্নের সদুত্তর না পাইয়া বৃদ্ধা কিছু অপ্রসন্ন সুরেই উত্তর দিল—'কি জানি, বাবা, আমি কারো কোনো কথাতে নেই। মিথ্যে যদি হয়, পঞ্চায়েৎ কর।'

শঙ্করের গা জ্বলিতেছিল। বাড়ীতে আসিয়া নিজেই রান্না করিল। পঞ্চায়েৎ ডাকিবার জন্য কোনো উৎসাহই প্রকাশ করিল না।

কিন্তু সমাজচ্যুত হইয়া গ্রামে বাস করা অত সহজ নয়। পাড়ায় বিবাহে, শ্রাদ্ধ-শান্তিতে কেহ আর তাহাকে ডাকে না। কেহ কথা বলে না, কেহ বাড়ীতে আসে না। কাহারো বাড়ীতে গেলে যেন

তাহারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়ে। এমনি সময়ে একদিন অনেক রাত্রিতে মৃত্যুঞ্জয় তাহার সহিত দেখা করিতে আসিল। শঙ্কর জাগিয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয়কে দেখিয়া বাহির হইয়া আসিল। মৃত্যুঞ্জয়ের খতের তামাদির এক বৎসর এখনো বাকি। তাহার বড় ছেলে উমেশও ফেরে নাই, ফিরিলেও শঙ্কর তাহার দেখা পায় নাই। টাকাও কিছু সে পায় নাই।

শঙ্কর কহিল—'এত রাত্তিরে আপনি?'

মৃত্যুঞ্জয় চুপে চুপে কহিল—'চল, বাবা, তোমার ঘরের মধ্যে।'

তারপর ঘরে আসিয়া কহিল—'পাড়া না ঘুমুলে কি আসতে পারি—তবু না পথে হরিশের সাথে দেখা। বললাম, যুধিষ্ঠিরের মায়ের অসুখ দেখতে যাচ্ছি।'

শঙ্কর হাসিয়া ফেলিল,বলিল—'এত ভয় যখন,তখন এলেন কেন?'

মৃত্যুঞ্জয় কোনো উত্তর দিল না। জিজ্ঞাসা করিল—'আচ্ছা, বল বাবা, তুমি কি খ্রেস্তান?'

'না, আমি খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইনি। কিন্তু খ্রীষ্টে আমি বিশ্বাস করি।'

'ঠাকুর দেবতা মানো?'

'যতদিন ধর্ম্মত্যাগ না করি, ততদিন দেশাচার, কুলাচার মেনে চলতে আপত্তি নেই আমার, কিন্তু আমি ঠাকুর দেবতা বিশ্বাস করি না।'

ইহাই যেন মৃত্যুঞ্জয় আশা করিয়াছিল, বলিল—'তবেই-ত, বাবা, তুমি খ্রেস্তান, এখন উপায় কি?'

শঙ্কর বলিল—'কিসের উপায়, আমি ত কারো কাছে থেকে কিছু চাইনি।'

মৃত্যুঞ্জয় বলিল—'চাওনি ঠিক, কিন্তু এর পরে যে তোমার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে না, তার মানে কি? কি রকম দিন কাল ত জান। সৃষ্টিধরের ছেলে তুমি, তুমি ভুললে আমরা ত ভুলতে পারিনে। আমি বলি তুমি পঞ্চায়েৎ ডাকো। সেখানে আমার কথার উপর কথা কইবে এমন সাহস কারো নেই। তারপর একটা যা কিছু প্রাশ্চিত্তির করলে ঠিক হয়ে যাবে। আমি থাকলে তোমায় মারে কে?'

শঙ্কর তেমনি ধীর স্বরে কহিল—'আমি পঞ্চায়েৎও ডাকব না, প্রায়শ্চিত্তও করব না, আপনাদের ভয় নেই, এদেশ আমি ছেড়ে যাব।'

মৃত্যুঞ্জয় এতটা ভাবিতে পারে নাই। বলিল—'তবে উঠি, কিন্তু কথাগুলি ভেবে দেখো, বাবা।'

শঙ্কর কহিল—'দাঁড়ান একটু।' তারপর একটী কাঠের বাক্স খুলিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের খতখানি বাহির করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে দিয়া বলিল,—'এইটী নিয়ে যান।'

মৃত্যুঞ্জয়ের ইহাতে যেন বিস্মিত হইবার কিছু ছিল না, বলিল—'ও সেই খতখানা, তা দাও, বাবা, এত তাড়াতাড়ি কিছু ছিল না, তা দেখ, প্রাশ্‌চিত্তির না করলেও চলতে পারে।'

শঙ্করের আর সহিতে ছিল না, বলিল—'এবার যান, আমি শুতে যাব। তবে আপনাকে বলে রাখি যে খ্রীষ্টান যে হইনি তার একমাত্র কারণ আমার মার তাতে অমত ছিল এবং সেইজন্য হবও না কোনোদিন। কিন্তু তা সত্বেও খ্রীষ্টধর্ম্মই আমার ধর্ম্ম।'

শেষের কথাগুলি শঙ্কর উত্তেজনাবশেই বলিয়াছিল। ইদানীং মনের শান্তির জন্য সে অনেক সময়েই বাইবেল পড়িত বটে, কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মে বাস্তবিক সে অতদূর অগ্রসর হয় নাই। মৃত্যুঞ্জয় চলিয়া গেলে তাহার মনে আসিল উত্তেজনার পরিবর্ত্তে গভীর নৈরাশ্য। মনে পড়িতেছিল যে সে একদিন ভাবিয়াছিল ইহাদের জাগাইবে, ইহাদের সমবেত শক্তিকে পশ্চাতে রাখিয়া যাহারা যুগান্তের অত্যাচার, ঘৃণা ও স্পর্দ্ধার উপর আসন মেলিয়া আজ এত উপরে উঠিয়াছে, তাহাদের টানিয়া আনিয়া ধূলায় লুটাইয়া দিবে। কিন্তু ভদ্রলোকের অত্যাচারের মূলে তবু যাহোক একটা বিশ্বাস আছে, কিন্তু আপনার জন এরা, এদের মনও কি ভগবান সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সারারাত্রি সে ঘুমাইতে পারিল না। এক একবার মনে হইল যেন জ্বর আসিয়াছে। দু-একবার বাতি জ্বালাইয়া বাইবেল পড়িতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনো শান্তি মনে আসিল না, শেষ রাত্রিতে এক একবার একটু তন্দ্রা আসিল। জাগিয়া দেখে ভোর হইয়াছে। বাহিরের

প্রভাতের বায়ুর স্পর্শ যেন স্বপ্নলব্ধ কাজলের চুম্বনের মত স্নিগ্ধ। দেহমন জুড়াইয়া গেল। সহসা মনে হইল সে খ্রীষ্টকে জীবনে পায় নাই, তাহার কারণ খ্রীষ্টকে সে চাহে নাই। চাহিয়াছে স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি, অত্যাচার হইতে মুক্তি। কাজলকে সে যে রাত্রির আঁধারে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছে—কিন্তু সেই কাজল ত সকাল 'সন্ধ্যা তাহার বুকের মধ্যে। আর যিনি চিরদিন সাথে রহিয়াছেন, এ আশ্বাস দিতে পরপার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, সেই খ্রীষ্ট, তিনিই দূরে রহিবেন—ইহার কারণ তাহার নিজের ব্যাকুলতার অভাব ছাড়া আর কিছু হইতে পারে ?

সেদিন অপরাহ্নে শঙ্কর নীলগঞ্জে গিয়া একখানি ছোট নৌকা কিনিল। একজনে চালাইতে পারে। সেটা নিজেদের ঘাটে বাহিয়া আনিয়া যখন পৌঁছিল তখন রাত্রি। নিজের উপযোগী বিছানা ও তৈজসপত্র কিছু নৌকাতে সেই রাত্রিতেই উঠাইয়া রাখিল। পরদিন ভোরে বাড়ীতে তালা দিয়া চাবি লইয়া সেই বৃদ্ধার কাছে আবার গেল।

বৃদ্ধা উঠানে গোবরের ছড়া দিতেছিল। শঙ্কর কহিল—'এই যে মাসী, তোমারও যে খুব ভোরে ওঠা অভ্যাস। আমি কিছুদিনের জন্য দেশ ছেড়ে যাচ্ছি। বাড়ীর চাবিটা তোমার কাছে রইল। কিছু ভয় করো না, এবার দেখো আর কেউ কিছু তোমাকে বলবে না।'

বৃদ্ধা চাবি লইল, বলিল—'কোথায় যাচ্ছ ?' শঙ্কর হাসিয়া কহিল—'জানি না।' 'কবে আসবে ?' 'তাও জানি না।'

তারপর 'এবার আসি মাসী'—বলিয়া বৃদ্ধাকে প্রণাম করিয়া শঙ্কর ঘাটে আসিল। সেখানে গাড়ু হাতে দুইটী পাড়ার বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া ছিল, শঙ্করকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

বাতাস ছিল। শঙ্কর ছোট একখানি রঙীন পালও কিনিয়াছিল। তাহাই খাটাইয়া দিল। নৌকা ছুটিতে আরম্ভ করিল।

বৃদ্ধ দুটী মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল। তারপর শুনিল শঙ্কর উচ্চকণ্ঠে গাহিতেছি—'ও মন তোর ভাবনা কি ?
খ্রীষ্ট তোর রথের সারথি'।

এবার একজন আর একজনকে কহিল—'বলেই ত ছিলাম, মৃত্যুঞ্জয় মিথ্যা বলবার লোক নয়।'

৺রাখালচন্দ্র সেন

ফাশিস্‌মো

১

আফ্রিকার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে যে-ছুইটি মাত্র স্বাধীন রাজ্য এখনও আত্মরক্ষা করছে তার মধ্যে অন্যতম--ইথিওপিয়া অথবা আবিসীনিয়া আজ বিশেষ বিপন্ন। ফাসিষ্ট্‌ ইটালির সাম্রাজ্য-বিস্তারের জালে আবিসীনিয়া সম্প্রতি জড়িয়ে পড়েছে—পূর্ব্ব আফ্রিকার এই কোণে খণ্ডযুদ্ধ বোধ হয় এখন অনিবার্য্য, এবং ইটালির সামরিক সজ্জা ও শক্তি যে ইথিওপিয়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের পক্ষে বিশেষ ভয়ের কারণ তারও সন্দেহ নেই। অসহায় আবিসীনিয়ার প্রতি সহানুভূতি নানা-দিকে প্রকাশ পাচ্ছে; বিশেষতঃ প্রাচ্য জাতিদের মধ্যে এই মনোভাব নিশ্চয়ই স্বাভাবিক। এই উপলক্ষে সম্প্রতি আমাদের দেশে মুসোলীনি-প্রীতি অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। বহুদেববাদ আমাদের মজ্জাগত—তাই একই নিঃশ্বাসে মুসোলীনি, হিট্‌লার, লেনিন্‌, ষ্টালিন্‌, কামালপাশা, রেজা খাঁ, সুন্‌-ইয়াৎ-সেন্‌, মহাত্মা গান্ধী সকলকেই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে আমাদের বাধে না। কিন্তু সমসাময়িক ইতিহাসে যে-বিভিন্ন মতবাদ ও চিন্তাধারার প্রতীক হিসাবেই ব্যক্তিবিশেষের স্থান প্রধানতঃ নির্দ্ধারিত হচ্ছে, অনেক সময় আমরা ব্যক্তিত্বের মোহে মুগ্ধ হয়ে তাদের প্রতি উদাসীনই থাকি। আবিসীনিয়ার ব্যাপারে ইটালির যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তার সঙ্গে ফাশিস্‌মো বা ফাসিজ্‌ম্‌-এর নিগূঢ় সম্বন্ধ ও অঙ্গাঙ্গি যোগ বিদ্যমান রয়েছে একথা ফাসিষ্ট্‌ চিন্তা ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যার পরিচয় আছে সেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবে।

ফাসিষ্ট্‌ প্রভাব শুধু ইথিওপিয়ার ব্যাপারে সীমাবদ্ধ নয়, বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক সঙ্কটেরও একটি প্রধান কারণ ফাসিষ্ট্‌ রাষ্ট্রগুলির বৈদেশিক নীতি। যে-তিনটি মহাশক্তির আচরণে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা

সম্প্রতি অনেক বেড়েছে, তার মধ্যে ইটালি ফাশিস্‌মোর জন্মভূমি, জার্ম্মানির নাৎসিদলকে ফাসিষ্ট পর্য্যায়েই গণ্য করা হয়, এমন কি জাপানের শাসকদেরও ফাসিষ্ট্ ভাবাপন্ন বলা যেতে পারে। অবশ্য এই তিনটি জাতিই নিজেদের বঞ্চিত মনে করে; আধুনিক জগতে কর্ত্তৃত্বের যে-ব্যবস্থা ও ঐশ্বর্য্য ভাগ-দখলের যে-বন্দোবস্ত রয়েছে এমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড কিম্বা ফ্রান্সের তাতে আপত্তির কোন কারণই নেই। কিন্তু জাপান, জার্ম্মানি ও ইটালি তা' নিয়ে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। কিন্তু অন্যায় ব্যবস্থা কিম্বা অসহ্য দুরবস্থা এই রাষ্ট্রত্রয়ের আস্ফালনের একমাত্র কারণ নয়। পৃথিবীতে বঞ্চিত জাতির অভাব নেই, তাদের অধিকাংশই শান্তভাবে জীবন যাপন করে। মহাশক্তিদের মধ্যেও মহাযুদ্ধের পর রাশিয়াকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল অথচ আভ্যন্তরিক সংগঠনে মনোনিবেশই সোভিয়েট্-রাষ্ট্র যুক্তিসঙ্গত বলে' মেনে নিয়েছে। লোকসংখ্যার দ্রুতবৃদ্ধি জাপান, জার্ম্মানি ও ইটালির রাজ্যবিস্তার-প্রচেষ্টার কারণ রূপে নির্দ্দেশ করা হয় কিন্তু একদেশের জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে গেলে অন্য দেশবাসী-দের তার ভার বহন করতে হবে এ যুক্তিও নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত বলা চলে না। প্রাক্-ফাসিষ্ট্ যুগের জার্ম্মানিও ভের্সাইএর ব্যবস্থার শত প্রতিবাদ-সত্ত্বেও সন্ধি ভঙ্গ কিম্বা যুদ্ধের আয়োজন করে নি। আসল কথা, অস্ত্রশক্তির উপাসনা ফাশিস্‌মো গৌরবকর ও মঙ্গলজনক বলে'ই সর্ব্বদা প্রচার ক'রে এসেছে এবং বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘকে উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করে ফ্যাসিষ্ট্ রাষ্ট্রগুলিই সম্প্রতি আন্তর্জ্জাতিক সমস্যাকে জটিলতর করে তুলছে।

উপনিবেশ প্রসারের চেষ্টা কিম্বা আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে সামরিক মনোভাব কিন্তু ফাশিস্‌মোর প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়; ফাসিজ্‌মের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্ব থেকে ইতিহাসে এদের দেখা পাওয়া যায়। ফাসিষ্ট্ মত-বাদের আসল বিশেষত্ব খুঁজতে গেলে রাষ্ট্রের নূতন স্বরূপ কল্পনা এবং সমাজের আর্থিক সমস্যা সমাধানের নবপ্রচেষ্টার কথাই প্রথমে বিচার করা উচিত। ইয়োরোপ এমন কি সমস্ত জগতের আধুনিক ইতিহাস

ফরাসী-বিপ্লব ও পণ্যোৎপাদন-পদ্ধতির বিশাল পরিবর্ত্তনের সময় থেকে আরম্ভ করা হয়। গত দেড়শ' বছরের ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করলে আমরা তু'টি চিন্তাস্রোতের পরিচয় পাই। তার মধ্যে একটির আরম্ভ অষ্টাদশ শতকের উদারনীতিতে এবং তার পরিণতি বর্ত্তমান গণতন্ত্রের আদর্শে। অন্যটিকে সোশ্যালিজ্‌ম্‌ বা সমাজতন্ত্র আখ্যা দেওয়া হয়; তার মধ্যে অনেক শাখাপ্রশাখা আছে—সেগুলি সোশ্যাল ডিমোক্রাসি এবং সাম্যবাদ বা কমিউনিজ্‌ম্‌ এই তুই পৃথক মতবাদে ভাগ করা চলে। উদারনীতি ও গণতন্ত্র, সোশ্যাল ডিমোক্রাসি ও সাম্যবাদ আধুনিক ইতিহাসের এই বিশেষ চিন্তার ধারাগুলি আজকের দিনে অপেক্ষাকৃত পুরাতন। এদের তুলনায় ফাশিস্‌মো অত্যাধুনিক—এর বয়স পনের বছরের বেশী নয়। ফাসিষ্ট্‌দের প্রধান দাবী এই যে তাদের নূতন আন্দোলন ও নববিধান ইতিহাসের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে। ইয়োরোপের ইতিহাসে রেনেসাঁস, প্রটেষ্টান্ট্‌ ধর্ম্মসংস্কার, ফরাসীবিপ্লব ইত্যাদির সমতুল্য স্মরণীয় ঘটনা হিসাবে ফাশিস্‌মোর আবির্ভাবকে দেখতে হবে—ফাসিষ্ট্‌দের এই দৃঢ় বিশ্বাস। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শৃঙ্খল থেকে পৃথিবীকে মুক্তি দিয়ে ইতিহাসের নূতন যুগ নাকি আরম্ভ হচ্ছে—বিংশ শতাব্দী উনবিংশ শতকেব পুরাতন ধারণাগুলিকে বর্জ্জন করে' নূতন আদর্শে গড়ে উঠবে, ফাসিষ্ট্‌ মতবাদের এই হ'ল গোড়ার কথা।

থিওরি হিসাবে ফাশিস্‌মোর কিছু পরিচয় এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রথমেই একটু বিপদ আসে—গণতন্ত্র এবং সাম্যবাদ যেমন সুস্পষ্ট ও সুচিন্তিত, ফাসিষ্ট মতবাদে তার অনুরূপ শৃঙ্খলা পাওয়া যায় না। এর কারণ বলা হয় যে ফাসিজ্‌ম্‌ কর্ম্মপ্রধান, সুসম্বদ্ধ থিওবি গঠন তার লক্ষ্য বা কাজ নয়। আর একটি কথাও স্মরণযোগ্য—জাতীয় ভাবের উপর ভিন্ন ভিন্ন দেশের ফাসিষ্ট্‌ আন্দোলন নির্ভর করে বলে' তাদের পার্থক্য বেশী চোখে পড়ে; ইটালির বেলা যে কথা প্রযোজ্য জার্ম্মানির সম্বন্ধে তার সমস্তটা না খাটতে পারে। তবুও ফাশিস্‌মোর সকল দেশেই একটা বিশিষ্ট রূপ আছে এবং মতবাদ হিসাবে তার

বর্ণনা অসম্ভব নয়। ইটালীয় দার্শনিক জেন্টিলে ফাশিস্‌মোর বিবরণ দিয়েছেন, তিন বছর আগে মুসোলীনি পর্য্যন্ত ইটালির এক বিশ্বকোষে এর মূল ধারণাগুলির পরিষ্কার ব্যাখ্যা করেছেন। জার্ম্মানিতে হিট্‌লার তাঁর আত্মজীবনীতে নিজের চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন, ভ্যান ডেয়ার ব্রুক্‌, ষ্টাপেল্‌, রোজেনব্যর্গ প্রমুখ নাৎসি প্রচারকদের লেখারও কোন অসদ্ভাব নেই। এইভাবে নানা আলোচনার মধ্য দিয়ে ফাশিস্‌মোর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পেয়েছে, আবান্তর নানান কথা বাদ দিয়ে তাদের দিকেই আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে।

২

ঐতিহাসিক পরম্পরার দিক থেকে দেখতে গেলে ফাশিস্‌মোর প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল সোশ্যালিজমের বিরুদ্ধাচরণ। মুসোলীনি অবশ্য প্রথম জীবনে চরমপন্থী সোশ্যালিষ্ট্‌ হিসাবেই খ্যাতিলাভ করেন এবং ইটালীর ফাসিষ্টেরা পুনর্গঠিত শ্রমিক সঙ্ঘগুলিকে নিজেদের করায়ত্ত করবার পর রাষ্ট্রের নূতন ব্যবস্থাবিধিতে তাদের স্থান অস্বীকার করে নি। এ কথাও সত্য যে হিট্‌লার নিজের দলকে ন্যাশনাল্‌ সোশ্যালিষ্ট নামে অভিহিত করেছেন এবং নাৎসিদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের ধনতন্ত্র বা ক্যাপিটালিজমের শত্রু মনে করে। কিন্তু ফাসিজম্‌ যে সম্পূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রের পরিপন্থী এ বিশ্বাস বর্জ্জন করবার কোন বৈধ কারণ নেই।

ইটালি ও জার্ম্মানি উভয় দেশেই সোশ্যালিজম্‌ প্রচারের পথ রুদ্ধ করাই ফাসিষ্ট আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং সে কাজে অন্ততঃ সাময়িক সাফল্য লাভই এখন পর্য্যন্ত ফাসিজমের প্রধান কৃতিত্ব বলে' গণ্য হচ্ছে। দুই দেশেই সোশ্যালিষ্টদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ ও তাদের ক্ষমতার উচ্ছেদ সাধন ফাসিষ্ট ইতিহাসের সব চেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। জাপানে সোশ্যালিজম্‌ ও শ্রমিক-আন্দোলনকে পদদলিত করাই ফাসিষ্ট-ভাবাপন্ন শাসকদের লক্ষ্য—জাতীয়তার মূলমন্ত্র জাপানে এজন্যই প্রচণ্ডভাবে প্রচারিত হচ্ছে। পৃথিবীর অন্যত্র যে যে দেশেই ফাসিষ্ট আন্দোলন মাথা তুলেছে সর্ব্বত্রই এই একই উদ্দেশ্য দল গঠনের ভিত্তি হয়ে

দাঁড়িয়েছে। ইংল্যাণ্ড, আয়র্ল্যাণ্ড, ফ্রান্স, পর্টুগাল, অষ্ট্রিয়া ইত্যাদি সকল দেশের ফাসিষ্টদের সমস্ত বাহ্যিক পার্থক্য সত্ত্বেও প্রধান মিল এইখানে।

শুধু আচরণেই এই সোশ্যালিষ্ট-বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে এও নয়—বিশ্বাস ও মতগত পার্থক্যও এখানে উল্লেখযোগ্য। মার্ক্সবাদের গোড়ার ধারণাগুলি ফাসিষ্টেরা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে। মার্ক্সের মতে প্রলেটেরিয়াট্ বা মজুর শ্রেণীই ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনের মূল উপাদান—সুতরাং সামাজিক প্রগতি এ যুগে সেই শ্রেণীর সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের উপরেই নির্ভর করবে। ফাশিস্‌মো এ বিশ্বাসকে পরিহার করেছে—ফাসিষ্টেরা কার্য্যতঃ নিম্নস্তরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও অবস্থাপন্ন কৃষকদের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করে। মার্ক্সের প্রধান কথা ছিল এই যে সমাজ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত এবং শ্রেণীগত স্বার্থের সঙ্ঘাত অবশ্যম্ভাবী; এই সঙ্ঘাতের ফলে শ্রেণীভেদ লুপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রেণীসঙ্ঘর্ষই এই ইতিহাসের মূলসূত্র হ'তে বাধ্য। ফাশিস্‌মোর বক্তব্য এর বিরোধী—জাতীয় ঐক্যই আদর্শ ও আসল সত্য, এই জাতিগত স্বার্থের মধ্যে শ্রেণীস্বার্থ লোপ পেয়ে সামঞ্জস্যের রূপ গ্রহণ করে। মার্ক্স ইতিহাসকে এক বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন—সেই দৃষ্টি-ভঙ্গীকে ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা বলা হয়; এতে আর্থিক ব্যবস্থা ও যে শ্রেণীগত পার্থক্য তার উপর নির্ভর করছে তাই ইতিহাসের মূলসূত্র বলে' কল্পিত হয়েছে। ইতিহাসের এই আর্থিক ভিত্তিকে ফাশিস্‌মো প্রমাদ বলে' গণ্য করে। ফাসিষ্ট মতে জাতিই (রেস্ বা নেশন্) হচ্ছে ইতিহাসের প্রধান উপাদান। জাতীয় চরিত্র ও প্রবৃত্তির স্থান আর্থিক বিধি-ব্যবস্থা ও সামাজিক অবস্থার চেয়ে ঢের উঁচুতে এবং রাষ্ট্র বা ষ্টেট শ্রেণী বিশেষের আধিপত্যের যন্ত্র নয়, রাষ্ট্রের একটা নৈতিক স্বরূপ এবং বিশিষ্ট সত্তা আছে। বস্তুতঃ মার্ক্সের সকল মতামতের ভিত্তি ডায়ালেক্‌টিক্ জড়বাদের মধ্যে। এই দার্শনিক মত ফাসিজ্‌ম সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছে—নানা জাতীয় আদর্শবাদ বা ভাববাদই ফাশিস্‌মোর অবলম্বন।

এখানে অবশ্য কথা উঠতে পারে যে ফাসিষ্টেরা নিশ্চয়ই মার্ক্সবাদের

পরিপন্থী, কিন্তু সোশ্যাল্ ডিমোক্রাসির নিরীহতর মতামতের সঙ্গে তাদের বিরোধ কোথায় ? ফাশিস্‌মোর সঙ্গে সোশ্যাল ডিমোক্রাসিরও মিলন কিন্তু সম্ভবপর নয়। মতবাদের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সাম্যপন্থার মতন সোশ্যাল্ ডেমোক্রাটদেরও আদর্শ হচ্ছে উৎপাদন-পদ্ধতির সকল উপাদানেই সর্ব্বসাধারণের স্বত্বাধিকার। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারে কিন্তু ফাশিস্‌মোর অবিচলিত আস্থা আছে। তাই সমাজতন্ত্রের সকল শাখার যেখানে মূলগত ঐক্য, সমাজের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থায় সেই সাধারণ স্বত্বের আদর্শের বেলাতেই ফাশিস্‌মোর সঙ্গে এ সমস্ত মতামতের দুস্তর পার্থক্য। কর্ম্মক্ষেত্রেও সোশ্যাল্ ডিমোক্রাসির ফাসিষ্ট আমলে কোন স্থান নেই। স্বতন্ত্র শ্রমিকদল গঠন, স্বাধীন শ্রমিক সঙ্ঘগুলির অস্তিত্ব, সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ আদর্শ সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য, ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রথাকে আক্রমণ, এর মধ্যে কোনটিই ফাসিষ্টদের মনোমত হতে পারে না। মার্ক্স‌পন্থীরাই ফাশিস্‌মোর ঘৃণিত শত্রু হ'লেও আদর্শনিষ্ঠ সোশ্যাল্ ডেমোক্রাটদেরও ফাসিষ্টদের কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করবার নেই। ফাসিজম্ সকল প্রকার সোশ্যালিজমেরই সম্পূর্ণ বিরোধী।

৩

ফাসিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতির সঙ্গে সাম্যবাদীদের আচরণে যে সামান্য সদৃশ্যটুকু লক্ষ্য করা যায় তা' নিতান্ত বাহ্যিক। বিপ্লবে বিশ্বাস, নূতন ধরণের বিরাট দল সংগঠন, বিপ্লবের পর একনায়কত্ব স্থাপন অথবা ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ প্রভৃতি বিষয়ে ফাশিস্‌মো ও সাম্যতন্ত্রের মিল দেখা যায় বটে কিন্তু সে মিল মোটেই গভীর নয়। উদ্দেশ্য, আদর্শ ও বিশ্বাসের বেলায় এই দুই চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পরস্পরের বিশেষত্ব বজায় রেখে সোশ্যালিষ্ট্ ও ফাসিষ্টের মধ্যে মিলন সম্ভব নয়।

কিন্তু গত দেড়শ' বছরের ইতিবৃত্তে প্রধান স্থান নিয়েছে উদারনীতি ও গণতন্ত্রের প্রসার; আধুনিক ইতিহাসকে সম্পূর্ণ ভাবে দেখতে গেলে এদের তুলনায় সোশ্যালিজমের প্রভাব নিশ্চয়ই সামান্য। ফরাসী-বিপ্লবের পর থেকে নিয়মতন্ত্রমূলক শাসনপদ্ধতি ও ডিমোক্রাসির

প্রতিষ্ঠাই যুগধর্ম্ম ব'লে' গণ্য হয়েছে। ডেমোক্রাটিক্ মতবাদ অনেক ক্ষেত্রেই সোশ্যালিষ্ট্ আদর্শকে গ্রহণ করে নি কিন্তু প্রায় সকল দেশেই বর্ত্তমান শতাব্দীর সূচনায় গণতন্ত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখনও বোধ হয় তার প্রভাব অন্য সকল মতবাদের থেকে প্রবলতর। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক মনোভাব অস্বীকার করা ফাশিস্‌মোর প্রথম বৈশিষ্ট্য হ'লেও এ বিশ্বাসে বিশেষ নূতনত্ব নেই।

গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতিবাদ ও উদারনীতি পরিহার ফাশিস্‌মোর দ্বিতীয় বিশেষত্ব এবং সেই বৈশিষ্ট্য প্রথমটির তুলনায় অপ্রধান হ'লেও রাষ্ট্র ও সমাজের নূতন পরিকল্পনা হিসাবে এর একটা বিশেষ দাবী আছে। ফাসিষ্টেরা যখন নবযুগ প্রবর্ত্তনার কথা বলে তখন তারা গণতন্ত্রের অবসানের উপর খুব জোর দেয়। ফরাসীবিপ্লবের পর থেকে পৃথিবী যে-পথে চলেছে তার শেষ নাকি ভ্রান্তি ও ধ্বংসের বিভীষিকায়; তার প্রকোপ থেকে ফাশিস্‌মো মানুষকে উদ্ধার করবার ব্রত নিয়েছে। বিংশ শতকে সোশ্যালিজ্‌মের মতন গণতন্ত্রও পরিত্যাজ্য এ কথা ঘোষণা করতে ফাসিষ্ট্‌দের ক্লান্তি নেই।

গণতান্ত্রিক নিয়মপদ্ধতিকে অবহেলা ও অগ্রাহ্য করবার উদাহরণ ফাসিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাসে ক্রমাগতই পাওয়া যায়। সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন এবং শাসনযন্ত্র অধিকারের পর বিরোধীদলের স্বাধীনতাহরণ ফাসিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতির অপরিহার্য্য অঙ্গ, সুতরাং নিয়মতন্ত্রের শত্রু হিসাবেই ফাসিষ্টদের গণ্য করতে হবে। এক্ষেত্রেও শুধু আচরণ নয়, মতবাদ ও বিশ্বাসেও ফাশিস্‌মো গণতন্ত্র ও উদারনীতির থেকে স্বতন্ত্র। অল্প বিশ্লেষণেই একথা প্রতিপন্ন করা সম্ভব।

সংখ্যাধিক্যের কর্ত্তৃত্বের অধিকারই গণতন্ত্রের প্রধান কথা। জনসমষ্টির সাধারণ ইচ্ছাকে রুসো ন্যায্যতঃ সমাজের শাসকশক্তি হিসাবে স্বীকার করেছিলেন, সেই সাধারণ ইচ্ছা নির্দ্ধারণ করবার বৈধ উপায় অবশ্য সংখ্যাধিক্যের মত গ্রহণ। এই মূলসূত্র নির্ভর করছে এ বিশ্বাসের উপর যে সকল মানুষেরই রাষ্ট্রীয় অধিকার সমান এবং বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে সেই অধিকার সম্পূর্ণ স্বীকার করাই প্রগতির পথ।

এই ধারণাগুলিকে ফাশিস্‌মো যে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করছে এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। ফাসিষ্ট মতানুসারে সকল মানুষের সমান রাষ্ট্রীক অধিকার এবং সংখ্যাধিক্যের মতে রাজ্যশাসন অন্যায় ও অমঙ্গলজনক, তাতে জাতি বা সমাজের কল্যাণের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় আর দেশের প্রকৃত ইষ্টসাধনের জায়গা নেয় নানাবিধ স্বার্থের অনুসন্ধান ও সজ্ঘাত। এইভাবে শ্রেণী বা ব্যষ্টির বিরোধের ফলে সমষ্টির প্রভূত অমঙ্গল সাধন অবশ্যম্ভাবী। অতএব গণতন্ত্রের মূলসূত্রই ভ্রান্ত, তাকে বর্জ্জন করাই উচিত।

জনমতের প্রতিনিধি হিসাবে কোন পরিষদের শাসনব্যাপারে পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব এইজন্য ফাসিষ্টেরা স্বীকার করে না। পার্লামেণ্ট-জাতীয় প্রতিষ্ঠান হয় অক্ষম, নয় অনর্থের হেতু; দেশের শাসনভার তার উপর ন্যস্ত করা মূর্খতার পরিচয় ভিন্ন কিছু নয়। অবশ্য মুসোলীনি ইটালির পার্লামেণ্টকে সংস্কার করলেও তার উচ্ছেদ-সাধন করেন নি; আর হিট্‌লার মাঝে মাঝে জার্ম্মান জনগণকে ভোটের সাহায্যে তাঁর প্রতি আস্থা প্রদর্শনের সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে সংখ্যাধিক্যের প্রভুত্বের অধিকার কিম্বা রাজ্যশাসনে প্রতিনিধিসভার কর্ত্তৃত্ব এর কোনটিই ফাশিস্‌মোর অঙ্গ নয়। জনমতের প্রতিভূ কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে শাসকদের দায়িত্ব স্বীকার কিম্বা জবাবদিহি দেবার কোন প্রয়োজনও ফাসিষ্ট মত গ্রহণ করে না—অবশ্য যখন শাসকেরা ফাসিষ্টদলের অন্তর্গত হ'ন তখনই এ স্বাধীনতার কথা ওঠে।

যে-উদারনীতি ইংল্যাণ্ড ও এমেরিকায় গড়ে উঠেছে তার মূল কথা হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দাবী। এই মতানুসারে সকল লোকেরই কতকগুলি জন্মগত অধিকার আছে—স্বমত প্রকাশের স্বাধীনতা এ-জাতীয় অধিকারের দৃষ্টান্ত। ব্যক্তির স্বতন্ত্র অধিকারগুলিকে ফাশিস্‌মো কিন্তু স্বীকার করে না। ফাসিষ্ট মতে সমাজকে সমষ্টিরূপে কল্পনা করা হয়;—সমাজ ও সমাজের প্রতিভূ রাষ্ট্রের মঙ্গল তাই শুধু কথার কথা নয়, সেই মঙ্গল সাধনের অন্তরায় হ'লে ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব্ব করাই উচিত। এইভাবেই উদারনীতির মূলবিশ্বাসগুলিও ফাশিস্‌মো কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে।

ফাসিষ্টেরা অনেক সময় বলে যে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এক জাতীয় বিশ্বাসেরই প্রকারান্তর। উভয়েই ব্যক্তিত্ববাদের প্রকাশ, সমাজের পৃথক অস্তিত্ব ও প্রাণকে অস্বীকার করে' উভয় মতই তাকে শুধু ভিন্ন ভিন্ন লোকের একত্রে অবস্থান হিসাবে দেখেছে। এমন কি সাম্যবাদও শেষ পর্য্যন্ত ব্যক্তির স্বার্থ ও অধিকার স্বীকারে পর্য্যবসিত হয়। রাষ্ট্র ও সমাজের পরিকল্পনা ফাশিস্‌মো নূতন ভাবে করতে চেয়েছে। মুস্কিল হয় শুধু এইখানে যে সংখ্যাধিক্যের মত এবং শ্রেণীস্বার্থের ধারণা ছেড়ে দিলে সমাজের মঙ্গল ও সমষ্টির কল্যাণ নির্দ্ধারণের উপায় কি থাকে? এ প্রশ্নের শুধু একমাত্র উত্তর ফাশিস্‌মোর পক্ষে সম্ভব—সে উত্তর, ফাসিষ্ট ইচ্ছার কাছে সকলের আত্মসমর্পণ।

৫

উদারনীতি, গণতন্ত্র, সোশ্যাল ডিমোক্রাসি, সাম্যবাদ এ সমস্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার অর্থ কি এই যে ফাশিস্‌মো যন্ত্রযুগ ও ফরাসীবিপ্লবের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাতে মানুষকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়? গত দেড়শ' বছরে যে-সমস্ত ধারণা ক্রমে ক্রমে জয়যুক্ত হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ত' সকল সময়েই শোনা গেছে—ফাসিজম্ কি শুধু সেই প্রাচীন প্রতিকূলতার পুনরাবৃত্তি? ফাসিষ্টেরা এ-কথা স্বীকার করে না—তাদের মত এ-আন্দোলনে নূতন উদ্যম, এর মধ্যে নবজীবনের প্রেরণা রয়েছে। ফাশিস্‌মো পুরাতন ব্যবস্থার পুনঃস্থাপনা নয়, প্রগতির রথে সময়োপযোগী নবযুগের সূত্রপাত এর লক্ষ্য।

ফাসিষ্ট মতবাদ এইজন্যে সযত্নে পুরাতন যুগের ধারণাগুলির থেকে নিজের পার্থক্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফরাসীবিপ্লবের আগে ইয়োরোপে প্রায় সর্ব্বত্র স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের প্রাদুর্ভাব ছিল, তখনকার রাজারা ভগবংদত্ত অধিকারে রাজ্যশাসন করবার দাবী করতেন। এ-অধিকার ফাশিস্‌মো স্বীকার করে না, রাজতন্ত্রের দিকেও তার কোন বিশেষ পক্ষপাতিত্ব নেই। ইটালিতে রাজসিংহাসন রক্ষার কারণ রাজতন্ত্রে বিশ্বাস নয়—সাময়িক সুবিধা ও ইটালির বিশেষ অবস্থাই

মুসোলীনির এ-নির্দ্ধারণের মূলে রয়েছে। অবস্থার বিপর্য্যয়ে নাৎসিরাও কাইজারবংশকে সিংহাসনে ফিরিয়ে আনতে পারে কিন্তু সেকালের সে-রাজভক্তি ও রাজতন্ত্রে বিশ্বাস অন্ততঃ হিটলারের অনুচরদের বিশেষত্ব নয়। রাজতন্ত্র ছাড়া আর একটি বৈশিষ্ট্য সেকালের সমাজে উল্লেখযোগ্য ছিল—উত্তরাধিকারসূত্রে আভিজাত্যপ্রথা দেশের শীর্ষস্থান তখন অধিকার করত। ফাসিষ্ট মতবাদ গণতন্ত্রের বিরোধী হ'লেও এ-জাতীয় পুরাতন অভিজাত্যে তার বিশেষ আস্থা নেই। অভিজাতশ্রেণীর পুরাতন মর্য্যাদা এবং সেকালের ফিউডাল্ বিধিব্যবস্থা ও দাবীগুলির সমর্থন ফাশিস্মোর মধ্যে পাওয়া যায় না। তৃতীয়ত ; মধ্যযুগে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান-গুলির যে-আধিপত্য ছিল, ফাসিষ্টেরা তারও পুনরুত্থানের বিরোধী। ফাশিস্মো ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে শিথিলতা ও ঔদাসীন্য ফাসিষ্টদের চিহ্ন নয় ; কিন্তু চার্চ্চের প্রভুত্ব ও স্বতন্ত্র প্রভাব বিস্তার তাদের মনঃপূত হতে পারে না। ফাসিজমের প্রকৃত ধর্ম্ম ফাশিষ্ট ষ্টেট্ পূজা। রাষ্ট্রের একটা নৈতিক রূপ ও স্বতন্ত্র জীবন আছে, ধর্ম্ম ও নীতিতে বিশ্বাস ব্যক্তিগত রুচির কথা নয়, জাতির জীবনে জাতির একটা বিশেষ ধর্ম্ম ও তদুপযোগী ঐতিহ্য থাকা প্রয়োজন—ফাসিষ্ট মতামত এসব বিশ্বাসের সমর্থক। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কিম্বা কোন প্রবল প্রতাপান্বিত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান ফাসিষ্টদের কাম্য জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী। ইটালিতে ক্যাথলিক্ ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে জাতীয় জীবন থাকতে পারে না কিন্তু ফাসিষ্ট রাষ্ট্রশক্তি রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চের উপর বিশেষ আস্থাবান বা নির্ভরশীল নয়। জার্ম্মানিতে নানাভাবে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানগুলিকে নাৎসিদলের করায়ত্ত করার চেষ্টা চলেছে। ফাশিস্মোর থিওরি অনুসারে রাষ্ট্র ব্যক্তি ও সমাজের সমস্ত জীবন ব্যাপ্ত করে বিরাজিত হবে—অতএব সেখানে পূর্ব্বকালের চার্চ্চপ্রতিপত্তির স্থান কোথায়?

গত শতাব্দীর প্রারম্ভে ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশে যে রোমান্টিক ভাবুক ও ধর্ম্মনিষ্ঠ দার্শনিকদের উদয় হয়েছিল, তাদের মধ্যযুগের প্রতি আকর্ষণ এবং গণতন্ত্র'ও সমাজতন্ত্র-বিরোধের সঙ্গে ফাসিষ্ট মতবাদের

সুতরাং পার্থক্য আছে। উনবিংশ শতকের কোন কোন লেখককে ফাসিজমের অগ্রদূত বলে অভিনন্দন করা হয় বটে—কিন্তু ফাসিষ্ট আন্দোলন বর্ত্তমান যুগের বিশেষ অবস্থা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে, তার আসল লক্ষ্য মধ্যযুগে প্রত্যাবর্ত্তন নয়, তার প্রকৃত উদ্দেশ্য আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজের অস্তিত্ব রক্ষা। ধনতন্ত্রের উদয় ও বিকাশের যুগে ডিমোক্রাসিতে অশেষ সুবিধা ছিল—এখন সমাজতন্ত্রাভিমুখী বিপ্লবের হাত থেকে ধনিক কর্তৃত্ব রক্ষার প্রচেষ্টা অনেক দেশে ফাশিস্‌মো নামক অভিনব মতবাদের সৃষ্টি করেছে। একমাত্র জাপানের বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে ফাশিস্‌মোর কয়েকটি বিশেষত্বের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগোপযোগী ধারণার অস্তিত্বও দেখতে পাওয়া যায়।

৫

ফাশিস্‌মোর তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা উপরে আলোচিত হয়েছে—সকল প্রকার সোশ্যালিজমের বিরুদ্ধাচরণ, গণতন্ত্র ও উদার নীতি বর্জ্জন এবং মধ্যযুগের ধারণা ও প্রতিষ্ঠানের থেকে এর পার্থক্য। এ-বিশেষত্বগুলির প্রত্যেকটি শুধু অন্য মতবাদের থেকে ফাসিজমের স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। কিন্তু এ প্রসঙ্গে ফাসিষ্টদের আরও কয়েকটি বিশ্বাসের উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রথমেই ফাসিষ্টদের নেতৃত্বের ধারণার কথা মনে পড়ে। মানুষে সকলে সমান না, সকলের সমানাধিকার কিছু বাঞ্ছনীয় নয়, সংখ্যাধিক্যের আধিপত্য অমঙ্গলের আকর। জাতি ও দেশের পক্ষে প্রধান প্রয়োজন উপযুক্ত নেতার। নেতার আবির্ভাব হ'লে সকলের কর্ত্তব্য তাঁর নির্দ্দেশ অনুসারে কর্ম্মে আত্মনিয়োগ। এইজন্য জার্ম্মানিতে হিটলারের হাতে সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি ন্যস্ত হয়েছে, এইজন্যই ইটালিতে উচ্চৈঃস্বরে বলা হচ্ছে—মুসোলীনির ভুল কখনও হতে পারে না।

কিন্তু জাতির নেতা সম্পূর্ণ একক নন—তিনি বিশ্বাসীদের প্রতিভূ মাত্র, তাঁর পশ্চাতে সুসম্বদ্ধ পার্টি বা দল বিরাজ করছে। ফাশিস্‌মোর প্রধান অবলম্বন আসলে এই দল—নেতা শুধু এর মুখপাত্র ও অধ্যক্ষ।

ফাসিষ্টদের দলসংগঠন তাদের আধুনিকত্বের পরিচায়ক, এ-ব্যাপারে তাদের পদ্ধতি সাম্যবাদীদের অনুকরণ বলেই সন্দেহ হয়। আধুনিক কালের এ-জাতীয় সম্প্রদায়ের তুলনায় সাধারণ গণতান্ত্রিক দেশের দলগুলি যে নিতান্ত দুর্ব্বল ও অক্ষম সে সম্বন্ধে কোন দ্বিধার অবকাশ নেই। মুসোলীনি কিম্বা হিটলারের ব্যক্তিত্বই যে ইটালি বা জার্ম্মানির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত। অন্ততঃ হিটলার যে অনেক সময় নেতা হয়েও ক্রীড়নক মাত্র তা' মনে করা অযৌক্তিক নয়।

নেতা ও দলের সম্মিলিত প্রভাবে দেশে একাধিপত্য স্থাপন ফাশিস্‌মোর উদ্দেশ্য। এই একনায়কত্ব জাতির ঐক্য ও মঙ্গল সাধনের জন্য। সাম্যবাদীদের অধিনায়কত্বের সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে ফাসিষ্ট্ ব্যবস্থা সাময়িক নয়, এ প্রথা শুধু যুগ থেকে যুগান্তরে পৌঁছবার সহায় না—এই হল চিরকালের আদর্শ ও সর্ব্বোত্তম বিধি। ফাসিষ্টেরা তাই ভবিষ্যৎ সামাজিক ব্যবস্থা কল্পনার মধ্যেও গণতন্ত্রের ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোন স্থান নির্দ্দেশ করে না। ফাসিষ্ট রাষ্ট্র totalitarian বা সমগ্রগ্রাসী—তার এই বিশেষত্ব শুধু সাময়িক না, ফাশিস্‌মোর আদর্শে এ চিহ্ন চিরকালের জন্য। কিন্তু তাই বলে দেশের শাসনযন্ত্রে যে লোক-মত প্রকাশের কোন উপায় একেবারেই থাকবে না তা' নয়। জনসাধারণের কর্ত্তৃত্ব ও প্রভুত্বের অধিকার অস্বীকৃত হ'লেও তাদের সহযোগিতা আবশ্যক। বিশেষতঃ শ্রমিকদের সম্পূর্ণ পদানত রাখা সম্ভব না। শ্রেণীগত পার্থক্য ও স্বার্থের সজ্ঘাতও ফাসিষ্ট মতবাদে একেবারে অগ্রাহ্য হয় নি। এই সব নানা কারণে ইটালিতে নূতন ভাবে রাষ্ট্রগঠনের প্রচেষ্টা চলেছে। শ্রমিক ও ধনিকদের পৃথক পৃথক সঙ্ঘ গঠিত হচ্ছে—তাদের সহযোগিতায় দেশের সকল ব্যবসা পরিচালিত হবার কথা। তবে বিরোধ উপস্থিত হ'লে ষ্টেটের মধ্যস্থতা অবশ্যই মানতে হবে; রাষ্ট্রশক্তি যে সে ক্ষেত্রে কোন দিক নেবে তা' অনুমান করা শক্ত নয় কিন্তু ফাসিষ্টেরা বলে যে রাষ্ট্র ও তার কর্ম্মচারীরা শ্রেণী-স্বার্থের উপরে উঠতে পারে। দেশের শাসনযন্ত্রও অসাক্ষাৎ ভাবে

এই সঙ্ঘগুলির নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর খানিকটা নির্ভর করবে। এইরূপ নূতন ব্যবস্থাকে Corporative state আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতে করে' ধনিক কর্ত্তৃত্ব খর্ব্ব বা ব্যক্তির সম্পত্তিতে অধিকার হ্রাসের কোন সম্ভাবনাই নেই।

নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা, নূতন আদর্শে দল গঠন, সমগ্রগ্রাসী একাধিপত্য এবং শাসনযন্ত্রসংস্কার—এ সকলেরই মূল উদ্দেশ্য হ'ল জাতির ঐক্য-বোধ বিস্তার ও মঙ্গল সাধন। দেশ বা জাতির মঙ্গল কিসে সে-কথা নির্দ্ধারণের ভার অবশ্য ফাসিষ্ট্‌ সম্প্রদায়ের উপর—তা' নিয়ে বাদানু-বাদের স্বাধীনতা এখানে নেই। জনসাধারণের মধ্যে এ-বিশ্বাস সংক্রামিত করতে হবে যে নেতা ও দল এবং তাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী রাষ্ট্র-শক্তি জাতির মঙ্গল ভিন্ন আর কিছুই করছে না। এ বিশ্বাস প্রচারের উপায় ফাশিস্‌মোর প্রসার ও তদনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা। জাতীয়ত্ব-বোধকে এত প্রবল করতে হবে যে সে-ঐক্যের পরিপন্থী সমস্ত কিছুকেই বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। পরিপূর্ণ অকুণ্ঠ অন্ধ ন্যাশনালিজম্‌ তাই ফাসিষ্টদের কাম্য—এর প্রতাপ যত বেশী হবে ততই জনসাধারণের মধ্যে ফাসিষ্ট কর্ত্তৃত্বের দৃঢ় প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা বেশী। জাতীয় ভাবের এই রূপ আজ জাপানে এত প্রকট বলে'ই জাপান ফাশিস্‌মোর এত নিকটে এসে পড়েছে।

জাতীয়তাবোধের পুষ্টিসাধনের প্রধান উদ্দেশ্য আসলে আভ্যন্তরিক শ্রমিক-অসন্তোষের হ্রাস। ফাসিষ্ট মতে শ্রেণীবিদ্বেষ জাতিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় মাত্র অথচ শ্রমিকদের সম্পূর্ণ ভাবে পদদলিত করাও সম্ভব নয়। এ বিপদ থেকে উদ্ধারের দুটি উপায় আছে—এক, জাতীয় ঐক্যবোধকে এমন ভাবে উদ্বুদ্ধ করা যাতে জনসাধারণ স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরব ও মঙ্গলের জন্য স্বেচ্ছায় দুঃখ ও অভাব বরণ করে নেবে। যুদ্ধের সময় এ-মনোভাব সর্ব্বত্র দেখা যায়; প্রশ্ন শুধু এই যে এ-উচ্ছ্বাস ক্ষণিক উত্তেজনা থেকে চিরন্তনের পর্য্যায়ে তোলা যায় কি না। দ্বিতীয় উপায়,—ধনতন্ত্রের কোন কোন দিক সংশোধন—যার ফলে শ্রমিক ও নির্ধনদের আস্থা ও আশাভরসা ফিরিয়ে আনা যায়।

এজন্যই ধনিকপ্রবরদের রাষ্ট্রকর্ত্তৃত্বের অধীনে আনা, কৃষকদের সাহায্য ও সন্তোষ সাধন, ধ্বংসোন্মুখ নিম্নস্তরস্থিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবিকা-নির্ব্বাহের পথপ্রদর্শন ইত্যাদি প্রচেষ্টার উদ্ভব। দুঃখের কথা এই যে ইটালি ও জার্ম্মানিতে এখনও পর্য্যন্ত এ সদিচ্ছা বিশেষ সাফল্যলাভ করেছে বলে জানা যায় নি। ইটালিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ গত বার বছরে ঠিক অন্যদেশের মতনই চলেছে; জার্ম্মানিতেও ধনিকশ্রেণীর প্রতিপত্তি বিশেষ কিছু কমেছে বলে' জানা যায় না। ধনরত্ন বজায় রেখে জনসাধারণের অবস্থা উন্নত করবার এক উপায় অবশ্য রাজ্য বিস্তার—এইজন্য উপনিবেশ স্থাপন ও রাজ্যজয়ের ইচ্ছা ফাশিস্‌মোর এক প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেক ফাসিষ্ট্ রাজ্যের অবশ্য প্রসারের বিশেষ লক্ষ্য ও দিক আছে কিন্তু বিভিন্ন উদ্যমগুলি একই গোলের অন্তর্গত। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রে ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত এমন শক্তি আছে, এই দেশগুলির সম্বল ও সঞ্চয় এত বেশী যে এখানে রাজ্য-বিস্তারের এখন প্রয়োজন নেই, ফ্যাসিজ্‌ম-ও অনেকখানি অনাবশ্যক। ইটালি, জার্ম্মানি ও জাপানের কিন্তু আভ্যন্তরিক অবস্থা এখন এমন যে সেখানে ফাশিস্‌মোর বিশেষ স্থান আছে এবং এ রাজ্যগুলির নির্দ্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যাবার সর্ব্বদা একটা প্রচণ্ড প্রলোভন রয়েছে। এই ঝোঁককে মুসোলীনি সমর্থন করেন এই বলে যে বর্ত্তমান ব্যবস্থাতে কতকগুলি দেশ বঞ্চিত ও নিগৃহীত হচ্ছে—তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভ করবার একটা দাবী আছে। তাঁর যুক্তিতে বিপদ এই যে ন্যায় অন্যায় বিচার করার উপায় আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে দুর্ল্ভ, যদি প্রতি জাতি নিজের দাবীর নিজেই বিচার করে, তাহালে মতভেদেরও অবসান হবে না, যুদ্ধবিগ্রহও চিরকাল মানুষের সাথী থেকে যাবে।

এ প্রসঙ্গে ফাসিষ্টেরা বলে' থাকে যে যুদ্ধ সত্য সত্যই চিরন্তন, তাকে ছাড়িয়ে যাবার উপায় মানুষের নেই। শুধু তাই নয়, ফাসিষ্ট্ মতানুসারে এতে দুঃখিত হবার কিছু নেই—সংগ্রামস্পৃহা মঙ্গলজনক ও উন্নতির সহায়ক। যুদ্ধ ভিন্ন মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তি কখনও স্ফূর্ত্তি পায় না—দেশ ও জাতির জন্য প্রাণবিসর্জ্জনে প্রবৃত্ত হওয়া মানবচরিত্রের শ্রেষ্ঠ

বিকাশ। যুদ্ধের প্রতি বিরাগ ব্যক্তির পক্ষে কাপুরুষতা, জাতির পক্ষে বার্দ্ধক্য ও অসুস্থতার চিহ্ন। জেনীভার রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্বন্ধে তাই ফাসিষ্টদের অবজ্ঞার অন্ত নেই এবং সকল দেশেই এই অবজ্ঞা সাধারণতঃ এখন ফাসিষ্ট মনোভাবেরই পরিচায়ক। জাপান ও জার্ম্মানি লীগ্‌ ত্যাগ করেছে, ইটালিও আজ তাদের অনুসরণ করতে প্রবৃত্ত। মাঞ্চুকুয়োর বেলায় জাপান ও ভের্সাই-সন্ধি লঙ্ঘনের সময় জার্ম্মানি রাষ্ট্রসঙ্ঘকে অবহেলা ও অমান্য করেছে। ইটালি কর্ফু দ্বীপের ব্যাপারে বহুদিন আগে ও সম্প্রতি আবিসীনিয়ার গোলযোগে সেই একই মনোভাব দেখিয়েছে। অবশ্য যুদ্ধের নৈতিক উপকারই যে শুধু ফাসিষ্টদের মুগ্ধ করে তা নয়। বঞ্চিত মহারাষ্ট্রগুলি নিজেদের অবস্থা উন্নত করতে স্বভাবতঃই ইচ্ছুক; আর যুদ্ধের সম্ভাবনা কিম্বা যুদ্ধ এসে পড়লে জাতীয় ঐক্যের নামে আভ্যন্তরিক বিরোধ চেপে রাখা যে বেশী সহজ হয়ে আসে এবিষয়েও কোন সন্দেহ নেই।

৬

জাতীয়তাবোধ যখন ফাশিস্‌মোর একটি প্রধান অঙ্গ, তখন বিভিন্ন ফাসিষ্টদের মধ্যে পার্থক্য, এমন কি তাদের স্বার্থের সঙ্ঘাত পর্য্যন্ত কিছু বিচিত্র নয়। তাই অষ্ট্রীয়ায় নাৎসি দলের সঙ্গে অন্য ফাসিষ্টদের সংঘর্ষ হয়, আর ইটালি ও জার্ম্মানি, কি ইটালি ও জাপান পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধভাবও পোষণ করতে পারে। এইজন্যই আবার ইটালির ফাসিষ্ট্‌ ও জার্ম্মানির নাৎসি ঠিক সব ব্যাপারে একমত না। এই দুই দেশের আন্দোলন দুইটির স্বতন্ত্র বিশেষত্ব সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। কিন্তু আসলে এদের চিন্তার গভীর মিলই উল্লেখযোগ্য, পার্থক্যগুলি চমকপ্রদ হলেও তাদের ঐতিহাসিক মূল্য কম।

ইটালীয় ফাসিষ্ট্‌দের নিজস্ব সম্পদের মধ্যে প্রধান হ'ল রোমান সাম্রাজ্যের স্মৃতি ও রোমান সভ্যতার উত্তরাধিকারিত্বের গৌরব। মুসোলীনির অনুবর্ত্তী দলের দৃঢ় বিশ্বাস যে ইতিহাসে ইটালির জন্য নেতার আসন নির্দ্দিষ্ট রয়েছে; পুরাকালে রোমান রাজ্য, মধ্যযুগে

পোপের আধিপত্য, তারপরে রেনেসাঁস্, উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় পুনরুত্থানের পথপ্রদর্শন, বর্ত্তমান শতকে ফাশিস্‌মোর সৃষ্টি—এ সকলই সভ্যতার ইতিহাসে ইটালির দান। সেকালের রোমের পদাঙ্ক অনুসরণ তাই আজকের ইটালির বাঞ্ছিত পন্থা। সাম্রাজ্যবিস্তারের ইচ্ছা এতে আরো প্রবল হয়েছে। মুসোলীনির আস্ফালন ও সকল দেশকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান এ মনোভাবের হাস্যাস্পদ ফল হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। ফাশিস্‌মো নামটি পর্য্যন্ত প্রাচীন রোমের রাজশক্তির প্রতিভূদণ্ডগুচ্ছ থেকে গৃহীত। পক্ষান্তরে জার্ম্মান নাৎসিদের বিশিষ্ট বিশ্বাস হচ্ছে নর্ডিক জাতির শ্রেষ্ঠত্ব। গত শতকে চেম্বারলিন্ নামক ঐতিহাসিক ঘোষণা করিয়াছিলেন যে নর্ডিক টিউটন্‌রা নাকি বিধাতার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। এই নর্ডিকেরাই আসল খাঁটি আর্য্য বলে এখন দাবী করা হচ্ছে। জার্ম্মানেরা তাদের প্রধান বংশধর—এখন জার্ম্মান রক্তের বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে পারলেই জার্ম্মানি জগতের মুকুটমণিরূপে শোভা পাবে। রেস্ সম্বন্ধে এ ধারণা নাৎসিরা এখন সোৎসাহে প্রচার করছে। এতে জার্ম্মানির পুরাতন য়িহুদি-বিদ্বেষে ঘৃতাহুতি পড়েছে। য়িহুদিরা জার্ম্মান জাতির বিশুদ্ধতা নষ্ট করে, তাদের নীতি ব্যবহার চরিত্র চিন্তা সমস্তই কলুষিত এ কথা হিট্‌লার উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেছেন। তার উপর তারা বিদেশী, আর্থিক জগতে নাকি সব অত্যাচারের তারাই মূল, এমন কি মার্ক্সবাদ তাদেরই গূঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধির উপায় মাত্র। য়িহুদি-বিদ্বেষ ছাড়া অন্য ব্যাপারেও নাৎসিদের জাতি সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা প্রকাশ পায়। সকল জার্ম্মানকে এক রাষ্ট্রের মধ্যে আনতে হবে, অতএব হিট্‌লারি আমলে সাগরপারে উপনিবেশ স্থাপন অপেক্ষা মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপে বিস্তার লাভের ইচ্ছাই বেশী, কারণ তাতে বিদেশী জার্ম্মানদের পিতৃভূমিতে পুনপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। ধর্ম্মের বেলাও সেই জাতির বৈশিষ্ট্য মাথা তুলছে; ফলে জার্ম্মান ক্রিশ্চান্ বলে খৃষ্টধর্ম্মের এক নূতন সংস্করণ বেরিয়েছে—তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে কোন কোন নাৎসি বিশুদ্ধ জার্ম্মান দেবতা হিসাবে ওডিন্, থর ইত্যাদি সেকালের দেব-দেবীর পূজা প্রবর্ত্তন করতে উদ্যত হয়েছে।

৭

এই জাতিগত বিভিন্নতার ফল সুবিস্তৃত হ'লেও তাদের বাদ দিয়ে ফাশিস্‌মোর মূলসূত্রের ব্যাখ্যাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল। ফাসিজ্‌মের আবির্ভাবের কারণ ও তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা এখানে অবান্তর—তবু শেষ করবার আগে সে বিষয়ের উল্লেখ করছি।

ফাসিষ্ট্‌দের অভ্যুদয়ের পিছনে দীর্ঘ ইতিহাস আছে। প্রতি দেশে সে ইতিবৃত্ত অনেকখানি বিভিন্ন। কিন্তু তার মধ্যে কোন ঐক্য খুঁজতে গেলে স্বীকার করতেই হবে যে সে-আন্দোলনের মূল কারণ স্থানে স্থানে সোশ্যালিষ্ট্‌ আধিপত্য স্থাপনের আশু সম্ভাবনা। ধনতন্ত্রের আত্মরক্ষার প্রয়াস হিসাবেই ফাশিস্‌মোকে এখন ঐতিহাসিকেরা ব্যাখ্যা করছেন। তবে সব দেশে এ আন্দোলনের সাফল্য সমান সম্ভব নয়। যেখানে গণতন্ত্র বহুকাল সুপ্রতিষ্ঠিত, যে দেশে উদারনীতি জনমতের মজ্জাগত হয়ে পড়েছে, সেখানে ফাশিস্‌মোর প্রয়োজন না হওয়াই স্বাভাবিক। অনেকে মনে করেন যে ফাসিষ্ট্‌ মতবাদ ধনতন্ত্রের প্রথম যুগের অবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা মাত্র। সেইজন্যই নাকি ফাসিষ্টেরা কৃষক ও নিম্নস্তরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর এত সদয়। অর্থাৎ অল্পলোকের হাতে আর্থিক ক্ষমতা এসে পড়ার যে-একটা ঝোঁক ধনতন্ত্রে আছে, ফাশিস্‌মো তাকে বিনাশ করে' পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়ে আনতে চায়। এ কথা বিস্তর শোনা যায় অবশ্য, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ইটালি ও জার্ম্মানির আধুনিক অভিজ্ঞতায় এদিকে কোন ফল পাওয়া গেছে বলে' মনে হয় না। অতীত অবস্থাতে ফিরিয়ে আনা নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য।

ফাশিস্‌মোর আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক কতকগুলি অপরিহার্য্য বিপদ আছে। বিভিন্ন দেশের ফাসিষ্ট্‌দের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ তার মধ্যে অন্যতম। দ্বিতীয়তঃ ফাসিষ্টদের আর্থিক কর্ম্মপদ্ধতি দুর্ব্বল—বিশেষ ক'রে ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের সঙ্ঘাত দূরীকরণ সহজ কাজ নয়। জনগণের উপর নির্ভর করে ফাসিষ্টদল গঠিত হয় বলে তাদের বহুকাল ধরে হাতে রাখার সমস্যাও সুকঠিন, জন সাধারণকে রাষ্ট্রিক কর্তৃত্ব থেকে বরাবরের মতন

বঞ্চিত করাও দুঃসাধ্য। যোগ্য নেতা সকল সময়ে পাওয়া যাবে কিম্বা নানাজাতীয় নানাবিধ লোকের সমষ্টিতে যে দলের গঠন তার একপ্রাণতা যে নষ্ট হবে না একথা অনেকেই বিশ্বাস করবে না। এই সব কারণেই মনে হয় যে ফাশিস্‌মো আধুনিক সমস্যার চিরন্তন সমাধান নয়, এমন কি সর্ব্বত্রই যে এ-প্রথা গণতন্ত্রের স্থান অধিকার করবে তারও কোন স্থিরতা নেই।

শ্রীসুশোভন সরকার

শব্দ ও অর্থ

শব্দ ও অর্থের আলোচনা করিতে অগ্রসর হইলে প্রথমেই আশ্চর্য্য লাগে এই যে যে-শব্দ প্রথমে কেবল মাত্র কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বস্তুকে নির্দ্দেশ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত তাহা ক্রমে সেই নির্দ্দিষ্ট বস্তুর সহিত সম্বন্ধটী সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া কালে প্রায় অর্থ সম্বন্ধে ইচ্ছাগতি হইয়া উঠে। সর্ব্ববিষয়ে মানুষের ধারণা প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ভাবাবলীর পারম্পর্য্য ও সম্বন্ধ রক্ষার ভার পড়িয়াছে শব্দের উপর। কারণ অর্থের অনুপাতে শব্দ প্রায় অচল। শব্দের এই আপেক্ষিক জড়তায় মানুষের কিন্তু একটী পরম উপকার সাধিত হইয়াছে—শব্দ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ বাধ্য হইয়া জাগতিক সকল ব্যাপারের শ্রেণীবিচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মানুষের সমস্ত জ্ঞান ও বুদ্ধি আসলে তাহার শ্রেণী-বিচারের ক্ষমতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাই মনে হয় শব্দ ব্যবহার করিতে না শিখিলে মানুষের বুদ্ধি-বিকাশ অন্ততঃ আমাদের পরিচিত পন্থায় হইত না।

শব্দের যে অর্থব্যত্যয় কিছুমাত্র সম্ভব ইহা হইতেই বুঝা যায় যে শব্দ কখনও বক্ষ্যমাণ বস্তু বা বিষয়ের প্রত্যক্ষ পরিচায়ক নহে। বাস্তবিক পক্ষে বক্ষ্যমাণ বস্তু অপেক্ষা বক্তার সহিতই শব্দের সম্বন্ধ নিগূঢ়তর। পূর্ব্ব প্রবন্ধে Croceর প্রদত্ত ভাষার যে সংজ্ঞার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইতেই ইহা প্রতীয়মান হইবে। শব্দদ্বারা বক্ষ্যমাণ বিষয়ের যতটা পরিচয় পাওয়া যায় তদপেক্ষা অধিক পরিচয় পাওয়া যায় শব্দের প্রয়োগকর্ত্তা বক্তার ;—তাই প্রযোক্তা ভেদে শব্দের ভিন্নার্থদ্যোতকতাও অবশ্যম্ভাবী। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে শব্দ সর্ব্বত্র সম্পূর্ণরূপে বক্ষ্যমাণ-বস্তুনিষ্ঠ (objective) হইলে তাহার অর্থব্যত্যয় কখনও সম্ভব হইত না। কারণ সম্পূর্ণরূপে objective হইতে হইলে এক একটী শব্দ এক একটী মাত্র বস্তুর সংজ্ঞায় পর্য্যবসিত হইবে। কিন্তু শব্দের অভিধা সর্ব্বত্রই শ্রেণীবাচক, ব্যষ্টিবাচক নহে

(পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লিখিত Bergsonর মত অনুসন্ধেয়)। শব্দের সহিত অনন্তর (immediate) সম্পর্ক বক্তারও নহে, বস্তুরও নহে। বক্তার মনে বক্ষ্যমাণ বস্তু সম্বন্ধে যে Vorstellung (ভাবচ্ছবি) উদ্ভূত হইয়াছে কেবল তাহারই সহিত শব্দের অনন্তর সম্পর্ক। সর্ব্বত্রই অর্থব্যত্যয়ের মূলে এই ব্যক্তিনিষ্ঠ ভাবচ্ছবি বা Vorstellung.। মানব মনে কোন বিষয় সম্বন্ধে Vorstellung কতকগুলি পরিমিত সংখ্যক সমজাতীয় বস্তুর প্রত্যক্ষানুভূতি ব্যতিরেকে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই ; কিন্তু এই Vorstellung মানবচিত্তে একবার অধিকার স্থাপন করিতে সমর্থ হইলে তাহা উত্তরোত্তর বস্তুনিরপেক্ষ হইয়া অধিকতর মাত্রায় স্বস্থ ও স্বাধীন হইয়া উঠিবে। এই অবস্থায় শব্দার্থ এক বস্তু হইতে অপর বস্তুতে স্থানান্তরিত হইতে পারে।

শব্দ ও অর্থের মধ্যে সেতুস্বরূপ এই Vorstellungএর কথা বিস্মৃত হইয়া Wundt (Sprache, vol. II, p. 445) বলিয়াছেন যে শব্দ ও অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ উত্তরোত্তর ঘনীভূত হয়।* Guentert (Grundfragen der Sprachwissenschaft p. 68) এসম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। তাঁহার মতে শব্দ সর্ব্বত্রই মানুষের মননশক্ত্যুদ্দীপক যন্ত্র মাত্র। Guentert আরও বলেন যে শব্দরূপী এই যন্ত্র দ্বারা Vorstellung কখনও প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবান্বিত হইতে পারে না। পূর্ব্ব প্রবন্ধে কিন্তু দেখান হইয়াছে যে একথা সত্য নহে।

এই সম্পর্কে Wundtএর আর একটি কথার বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, "Abstrakte Begriffe in diesem Sinne sind demnach Begriffe, deren wesentliches Vorstellungssubstrat nur noch in dem Worte besteht" (Ibid. p. 484)। অর্থাৎ মুখ্যতঃ শব্দকে আশ্রয় করিয়াই বস্তুবিরহিত গুণবাচক (abstract) বিষয় সম্বন্ধে মানুষের ধারণা গড়িয়া উঠে। Wundtএর

* Zwischen den Laut-und Bedeutungsformen allmaehlich fester werdende Association.

এই কথা হইতে প্রতীয়মান হয় যে তিনি মনে করেন, পশু, পক্ষী, জল, হাওয়া প্রভৃতির Vorstellung তত্তৎসম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষানুভূতি আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে, কিন্তু abstract বিষয় সম্বন্ধীয় Vorstellungএর মূলে তজ্জ্ঞাপক শব্দ ভিন্ন আর বিশেষ কিছু নাই। Wundtএর এই কথা সত্য হইলে শব্দ যে কেবলমাত্র energeia নহে তাহা প্রমাণ করিবার কোন আবশ্যকতাও আর থাকে না। কিন্তু Wundtএর এই কথা সত্য বলিয়া মনে হয় না, কারণ abstract ও concreteএর মধ্যে সাধারণতঃ যে পার্থক্য করা হইয়া থাকে, মানবীয় অনুভূতির পক্ষ হইতে বিচার করিলে সে পার্থক্য অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হইবে না। হ্রাস, বৃদ্ধি, সৌন্দর্য্য, স্বাধীনতা এইগুলিকে আমরা সাধারণতঃ বলি গুণবাচক (abstrct) এবং মনুষ্য, পশু, জল, হাওয়া ইত্যাদি হইল বস্তুবাচক (concrete)। এই দুইটী শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য আপাতদৃষ্টিতে এতই সুস্পষ্ট যে ইহাদের অন্য কোন প্রকার শ্রেণীবিভাগ যে সম্ভব তাহাও আমাদের মনে হয় না। কিন্তু একথা অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে আদিম মানবের শ্রেণীবিভাগপদ্ধতি (অর্থাৎ চিন্তাপ্রণালী) অস্মদীয় পদ্ধতির অনুরূপ ছিল না। উপরন্তু আধুনিক সুবিদিত চিন্তাপ্রণালীর দ্বারাও উভয় শ্রেণীর সীমা নির্দ্দেশ করা এক প্রকার অসম্ভব। যখন বলা হয় "ঐ মানুষটী" তখন শব্দ সাহায্যে মনোমধ্যে যে ধারণাটী উদ্দীপিত করিবার চেষ্টা করা হয় সেটীকে concrete বলা যাইতে পারে। কিন্তু যখন বলা হয় "মানুষ" তখন যে ধারণাটী উদ্বুদ্ধ হয় সেটী abstract। 'মানুষ' কথাটী দ্বারা মনুষ্যজাতীয় কোন এক বা একাধিক জীবকে উদ্দেশ করা হয় না; তদ্দ্বারা উদ্দিষ্ট হয় সমস্ত মানব জাতির মধ্যে যে গুণসমষ্টির সমাবেশ দেখা যায়—সেই গুণসমষ্টি এবং এই সমগ্র গুণ সমষ্টির অন্তর্গত কতকগুলি বিশেষ গুণের সমাবেশে এক একটী বিশেষ মানুষ (concrete)। কাজেই দেখা যাইতেছে যে পরিমাপক গুণাবলীর সংখ্যার উপরেই abstract ও concreteএর পার্থক্য নির্ভর করে,—অনুভূতি পক্ষে এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে বাস্তব কোন ভেদ নাই।

Abstract ও Concreteএর মধ্যে এই প্রকার শ্রেণীগত পার্থক্য অস্বীকার করিলেও কিন্তু Wundtএর উত্থাপিত প্রশ্নের কোন সমাধান হইল না। প্রথমেই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে Vorstellung ব্যতিরেকে শব্দপ্রয়োগ সম্ভব নয়। কিন্তু abstractএর Vorstellung কোথা হইতে কিরূপে আসিবে? Concreteএর সহিত তাহার শ্রেণীগত পার্থক্য নাই সত্য, কারণ দেখান হইয়াছে যে পরিমিত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইলে abstract আপনা হইতেই concreteএ পরিণত হয়; কিন্তু তথাপি concreteএর পটভূমির উপর abstractএর Vorstellung প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কি? এই বিষয়ে সন্দিহান হইয়াই Wundt বলিয়াছেন কেবল শব্দমাত্র আশ্রয় করিয়া abstractএর Vorstellung উদ্বুদ্ধ হয়।

কিন্তু Vorstellung যে সর্ব্বত্র concreteএর উপর প্রতিষ্ঠিত একথা বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। যাহা কিছু প্রত্যক্ষভাবে অনুভূতিগোচর হয় তাহাই Vorstellungএর উদ্বোধক হইতে পারে। এখন কেবলমাত্র concrete বস্তুই যে প্রত্যক্ষভাবে অনুভূতিগোচর হয়, তাহা নহে, দুইটী concreteএর বৈপরীত্যও সমভাবে অনুভূতিগোচর হইয়া থাকে। এই বৈপরীত্য যে abstract সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, সুতরাং তাহাকে আশ্রয় করিয়া abstractএর Vorstellungও উদ্বুদ্ধ হইতে পারে। অর্থাৎ সুন্দর ও কুৎসিতের বৈপরীত্য আশ্রয় করিয়া সৌন্দর্য্য ও কৌৎসিত্যের Vorstellung গড়িয়া উঠিতে পারে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে শব্দ কি সর্ব্বত্রই Vorstellungএর পূর্ণ প্রতিচ্ছবি? বিভিন্ন ভাষায় সমার্থক যত শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে তাহা নহে। কিন্তু সমপর্য্যায়ের শব্দাবলীর নিরুক্তি পর্য্যালোচনা করিয়া যে পরিমাণ বৈষম্য ও তারতম্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে Vorstellung-সমূহের মূলেও যে সেই পরিমাণ বৈষম্য ও তারতম্য বর্ত্তমান ছিল এরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত হইবে না। কারণ শব্দ সর্ব্বত্রই বিবিধ বৈচিত্র্যযুক্ত Vorstellungএর উদ্বোধক যন্ত্র মাত্র; ইহার এক একটী বিশিষ্ট স্থানে

আঘাত করিয়া শব্দ শুধু সেই অংশটী মাত্র নহে, সমগ্র চিত্রটীই জাগাইয়া তুলে। হয়তো উভয় ক্ষেত্রেই Vorstellung সম্পূর্ণ অভিন্ন (ইহা অবশ্য তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া হইতেছে, কারণ সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন দুইটী Vorstellung কল্পনা করা অসম্ভব), কিন্তু শব্দ তাহাদের বিভিন্ন অংশে আঘাত করিয়া তাহাদের মধ্যে আপাতবৈষম্যের সৃষ্টি করিবে। Vorstellungএর পটভূমির বিস্তৃতিই আসলে শব্দের অর্থ-ব্যত্যয়ের মূল কারণ। Vorstellungএর পটভূমি যদি আয়তনহীন বিন্দুমাত্রে পর্য্যবসিত হইত তাহা হইলে শব্দের অর্থব্যত্যয় কখনও সম্ভব হইত না।

উল্লিখিত পন্থায় বস্তুবাচক (=বিশেষ্য) সকল শব্দের উদ্ভব হইতে পারে; কিন্তু গুণবাচক (=বিশেষণ) শব্দসমূহের প্রয়োগ কিরূপে ভাষায় প্রচলিত হইয়াছিল সে প্রশ্নের সমাধান এতদ্দ্বারা হইল না। এতৎ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রারম্ভেই কিন্তু বলিয়া রাখিতে হইবে যে বস্তু ও গুণের মধ্যে আসলে প্রকৃতিগত কোন বৈষম্য নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে, অনুভূতির ক্ষেত্রে গুণ ও বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব, কারণ গুণশূন্য কোন বস্তুর কল্পনা করিতে মানুষ অসমর্থ। গুণ কাহাকে বলিব? এ সম্বন্ধে Kantএর নির্দ্দেশ অতি সুস্পষ্ট। তিনি বস্তুর (Gegenstand) এক একটি বিশেষ অবস্থাকেই (Zustand) গুণ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। Kantএর এই সারগর্ভ নির্দ্দেশটুকু বর্ত্তমান আলোচনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

গুণকে বস্তু হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নহে; কিন্তু বিবিধ গুণ বস্তুবিশেষকে আশ্রয় করিতে পারে, এবং বিবিধ বস্তু একটী বিশেষ গুণের বাহন হইতে পারে। যদি a, b, c হয় গুণ এবং x, y, z হয় বস্তু, তবে a (x, y, z) এবং x (a, b, c) এইরূপ অবস্থা সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে। মনুষ্যের যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহা সাধারণত ax, by, cz ইত্যাদি প্রকারেরই হইবে, কিন্তু a (x, y, z) এবং x (a, b, c) কিছুমাত্র সম্ভব হইলেও তাহার একদিক হইতে

a, b, c, এবং অপর দিক হইতে x, y, zএর Vorstellung মানব মনে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইবে। অর্থাৎ একটী বিশিষ্ট গুণ (=অবস্থা) একটী মাত্র বিশিষ্ট বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে ঐ বিশেষ গুণটীকে কখনই ঐ বিশেষ বস্তু হইতে পৃথক করিয়া কল্পনা করা যাইত না। কিন্তু একটী বিশিষ্ট গুণ যদি বিভিন্ন বস্তুতে বর্ত্তমান থাকে তবে গুণ ও বস্তুর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক সত্ত্বেও গুণটীকে বস্তু হইতে পৃথক্ ভাবে কল্পনা করা সম্ভব হইবে। অনুরূপ পন্থায় বিভিন্ন গুণ হইতে পৃথক করিয়া নির্গুণ বস্তুর উপলব্ধি কিন্তু সম্ভব নহে, কারণ অনুভূতি-পক্ষে বস্তু গুণসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

পুরানো কথা

(পুনরাবৃত্তি)

যথাসময়ে বিজাপুর রওয়ানা হলাম। আমাকে যাঁরা গাড়ীতে তুলে দিতে ষ্টেশনে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন N. I. A'র মুনশী মহাশয়, লালশঙ্কর ভাই। তিনি ট্রেন ছাড়বার সময় চুপিচুপি আমাকে উপদেশ দিলেন, "তুমি যত শীগ্‌গীর পার জজ্ হয়ে যেও, তাতে ঢের কম হাঙ্গামা পোহাতে হবে। কালেকটারী করা তোমার মত মেজাজী মানুষের পোষাবে না।" আমি ভাল মন্দ কিছুই বললাম না। বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, সসম্ভ্রমে নমস্কার করে বিদায় নিলাম। জজ্ হওয়ার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। চাকরী যদি করতেই হয়, চিরদিন কালেকটারীতে থেকে প্রজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখব এই ছিল আমার মতলব। তখন ত জানতাম না, বুঝতামও না, যে চাকরীতে নিজের ইচ্ছা বলে একটা জিনিসের কোন মূল্যই নেই। লালশঙ্কর ভাই সত্যি অতি চমৎকার লোক ছিলেন। প্রথম বার তাঁর কাছ থেকে একটু দূরে দূরে থাকতাম, তিনি অত কমিশনার-ঘেঁষা মানুষ ভেবে। কিন্তু যখন দ্বিতীয় বার আহমদাবাদে যাই তখন তিনি পেনশন নিয়েছেন। আর ইজার কোর্ত্তা পরে আমলাদের পেছনে ধাওয়া করতে হত না। আহমদাবাদে যত সৎকর্ম্ম, যত সার্ব্বজনিক কাজ, সবের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। সেবার আমি তাঁর যথার্থ স্বরূপ চিনলাম। আমার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হল। কত রকমে তিনি যে আমাকে ঋণী করলেন তার ইয়ত্তা নেই।

লীলী সাহেবের যথার্থ ডান হাত ছিলেন আর এক ভদ্রলোক। তাঁর নামটা আর করব না, কিন্তু ভদ্রলোক অসাধারণ মানুষ ছিলেন। পনের টাকার কেরাণীগিরি থেকে নিজ গুণে, চড়ে উঠেছিলেন, যত দূর ডেপুটী-কালেকটারের চড়া সম্ভব। উন্নতির চরম সীমায় তিনি ওঠেন নিজের বড় সাহেবের উপর গোয়েন্দাগিরি করে। এই বড় সাহেবটীও

সেকালের একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। তাঁরও নাম করে আজ কোন ফল নেই। ভদ্রলোক বড় সাহেব হলেও অর্থের প্রতি তাঁর মমতা সাধারণ পাহারাওয়ালার মতই ছিল। কিন্তু তাতে কি এসে যায়। তাঁর দান খয়রাতের গল্প আজও অনেকে করে থাকে। ক্লাইবের দিনে আমলাবর্গের, Nabob-দের, রজতপ্রীতির কথা ইতিহাসে পড়েছেন। সেই নবাবের দল কিছু একশ বছরে সমূলে লোপ পায় নেই। উনিশ শতকেও এমন অনেক বড় সাহেব ছিলেন, যাঁরা লোকের কাছে রাজা, নবাব, আমীর ইত্যাদি আখ্যা পেয়েছিলেন। তাঁরা যেমন দুহাতে অর্থ সঞ্চয় করতেন, তেমনই দরাজ হাতে আবার সে টাকা ছড়াতেন। এই সব আমীর-সাহেবদের বাগান-ফোয়ারা-বিবিখানা সংবলিত প্রাসাদতুল্য বাড়ী আজও বোম্বাইএর স্থানে স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। সিপাহী বিদ্রোহের পরে যখন কোম্পানীর রাজত্ব উঠে গেল, তখন ধীরে ধীরে হাকীমদেরও চাল চলন বদলাতে আরম্ভ হল; কিন্তু পুরানো হাকীমদের সরাতে কিছু বেগ পেতে হয়েছিল আমাদের নূতন সরকারকে। এই দুর্নীতি দমনের কাজে যে সমস্ত নেটিব আমলা কর্ত্তাদের বিশেষ রকমের সাহায্য করেছিলেন, তার মধ্যে মুখ্যতম ছিলেন আমার আহমদাবাদের বন্ধুটী। সাধারণ লোকে তাঁকে বাঘের মতন ভয় করত। আমাদের মত চুনোপুঁটী হাকিমদের ত তিনি একরকম অভিভাবকই ছিলেন! আমাদের বাঙ্গলা ভাড়া করে দেওয়া, ঘোড়া কিনে দেওয়া, ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা পাস করিয়ে দেওয়া, এ সব কাজে তিনি আমাদের মুরুব্বী ছিলেন। আমাকেও যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন তিনি। তবু তখনকার দিনে তাঁকে ভালবাসতে পারি নেই। আজ বুড়ো বয়সে বুঝতে পারি যে তাঁর দেহে সেই যুগের দোষগুলোও যেমন ভরা ছিল, গুণও তেমনই পূর্ণমাত্রায় ছিল। এক কথায় তিনি একজন কর্ম্মী পুরুষ, মস্ত লোক, ছিলেন। লালশঙ্কর ভাইয়ের মত তিনি ত ব্রাহ্ম ছিলেন না! তাই তাঁর কোন শুচিবাই ছিল না। তখনকার আবহাওয়াই অন্য রকম ছিল। ম্যাক্স ওয়েল জন বুলের কথা কি লিখে গেছেন, পাঠকের মনে আছে ত!

ইংরেজ বাপ ছেলেকে কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠাবার সময় এই বলে না কি আশীর্ব্বাদ করতেন, "দেখিস বাছা পয়সা রোজগার করিস। ধর্ম্মপথে থেকে পারিস ত খুব ভাল কথা, কিন্তু পয়সা আনাই চাই।" ইংরেজ বাপই যে একলা ছেলেকে এই আশীর্ব্বাদ করতেন, তা আমি বিশ্বাস করি না। সে যুগে অনেক দেশের অনেক ছেলেই এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে কাজ করতে বেরোতেন। যাক গে, আমার বন্ধুটীর কথা বলি। তিনি আমাকে সর্ব্বদা বলতেন, "You must always be discreet। সর্ব্বদা অগ্রপশ্চাৎ ভেবে কাজ করবে।" ষ্টেশনে বিদায় দেবার সময় সাবধান করে দিলেন, "My boy ! Beware of the Deccani tongue-waggers." চমৎকার কথা নয়? যারা একদিন সারা ভারতবর্ষকে নিজের মুঠোর ভেতর প্রায় ভরেছিলেন তাঁরা tongue-waggers ই বটে। আর একটী লোকের নাম করে আহমদাবাদের কথা শেষ করব। আমি যখন প্রথম চাকরী নিলাম তখন যে কটী তরুণ গুজরাতীর সঙ্গে আলাপ হল, তার মধ্যে একজন ছিলেন বর্ত্তমান কংগ্রেস-নেতা ভুলাভাই দেশাই, তিনি তখন এডভোকেট পরীক্ষার জন্য পড়ছেন। অসাধারণ বুদ্ধিমান ছেলে, আর যাকে বলে keen as mustard (সর্ষের মত ঝাঁঝালো)! তাঁর ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল হবে তা তখনই বুঝতে পেরেছিলাম।

আগেই বলেছি যে আমার ঠিক এই সময়ে বিজাপুর যাওয়ার নানা রকম সাংসারিক অসুবিধা ছিল; তবু বিজাপুরের মতন একটা পুরানো রাজধানী দেখবার আগ্রহও মনে খুব জেগেছিল। কেবলই মনে করতাম যে এইবার সব সেকেলে মুসলমান খানদানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবে। গুজরাতে সে রকম সাবেক ঘরানার মুসলমান বড় একটা দেখি নেই। যা দুই একজন দেখেছিলাম তাঁদের চালচলন ধরণ-ধারণ একেবারে গরাসীয়া রাজপুতদের মত। আর আহমদাবাদ শহরের মুসলমান বড়লোক যাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল, তাঁদিকে বিশেষ ভাল লাগে নেই। তাঁরা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করে এমন ব্যাপার দাঁড় করিয়েছিলেন, যে আহমদাবাদ আঞ্জুমান-ই-

ইসলামের সেক্রেটারী হয়েছিলেন বৃদ্ধ লালশঙ্কর ভাই—জাতে নাগর ব্রাহ্মণ। তাই বিজাপুর যাওয়ার আগে ঘুরে ঘুরে কেবলই এই কথা মনে হত যে এইবার সত্যি বনেদী ঘরের মুসলমান ছেলেদের সঙ্গে ভাব হবে, আর তাদের প্রাণে একটা নূতন উৎসাহের সঞ্চার করবার সুযোগ পাব। বাস্তবিক উনিশ শতকের শেষের দিকে ভারতের মুসলমান জাতটা এত নিরুদ্যম ভগ্নোৎসাহ ও মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল যে তাদের সংস্পর্শে এলেই আমার মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে যেত। মনে হত, এ জাত আবার না জেগে উঠলে ভারতে মহাজাতি সংগঠনের চেষ্টা বৃথা।

তাই চাকরীর শেষ পর্য্যন্ত যখন যেখানে সুবিধা পেয়েছি মুসলমান সমাজকে একটু সামনে ঠেলে দিতে চেষ্টা করেছি। শ্রীরামচন্দ্রের সেতু-বন্ধনে কাঠবিড়ালীও ত সাহায্য করেছিল। আজ মুসলমান সম্প্রদায় নূতন জীবনের সন্ধান পেয়ে আনন্দে অতি-মাত্রায় অধীর হয়েছেন। এতে অ-মুসলমান অনেকেই বিরক্ত। কিন্তু আমার কেবলই মনে হয় যে আমার স্বপ্ন সত্য হয়েছে, আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অতি সামান্য প্রচেষ্টা-গুলো আজ সার্থক হচ্ছে।

সত্যিকার বিজাপুর দেখলাম আমার স্বপ্নের আদিল-শাহী বিজাপুর থেকে একেবারে আলাদা। বিজাপুর শহর ও তার আশপাশ যেন একটা মহা শ্মশানের মতন। চারিদিকে ক্রোশের পর ক্রোশ কেবল পাথরের স্তূপ আর পোড়ো বাড়ী। তার মাঝখানে সগর্ব্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে মহম্মদ আদিল শাহের সমাধি, গোল গুম্বজ। রেলে আসতে আসতে বহুদূর থেকে নজরে পড়ে এই প্রকাণ্ড গুম্বজ। আপনারা অনেকেই এই সমাধি-মন্দিরের ছবি দেখেছেন, তাই আমি এর বর্ণনা করে আপনাদের বিরক্ত করব না। তবে এইটুকু বলি যে গুম্বজের পাদমূলে যে balconyটা চারিদিকে ঘুরে গেছে সেটা এত চওড়া যে দুতিন খানা মটরগাড়ী পাশাপাশি তাতে স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। এই গুম্বজের আর এক নাম বোল গুম্বজ, কেন না balconyতে কোনও একটা আওয়াজ হলে বেশ মিনিট দুই ধরে বার বার তার প্রতিধ্বনি

হয়। নানা রকম লোকে সেই balconyতে উঠে গান গেয়ে বাজনা বাজিয়ে ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা আনন্দে কাটিয়ে দিত। আবার বেশী মার্জ্জিত-রুচি কেউ কেউ তার ভেতরে পিস্তল ছুড়ে আমোদ করতেন। গুম্বজের ভেতরে অনেক জায়গায় পিস্তলের গুলির দাগ দেখেছিলাম। মহম্মদ আদিল শাহের অদৃষ্ট!. এই সমাধির বাইরে যে নকারখানা বা দেউড়ী ঘর আছে সেইখানে আগে সাহেবদের ডাক বাংলা ছিল। সেকালের কোন বিচক্ষণ হাকীমের হুকুমে এ সুব্যবস্থা হয়েছিল,তা আমি জানি না। তবে কার্জ্জন সাহেব বছর খানেক আগে যখন বিজাপুরে এসেছিলেন, তখন এক কলমের খোঁচায় এই অতি বিসদৃশ ব্যাপার খতম করে দিয়ে গেছলেন। মহম্মদ শাহের স্মৃতির অবমাননা সুরু করেন কিন্তু তাঁর আপন সন্তান আলী আদিল শাহ। বাপের উপর টেক্কা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই আলী নিজের জন্য এমন এক বিশাল সমাধি-মন্দির তুলতে আরম্ভ করেছিলেন যে তার চূড়ার ছায়া গিয়ে পড়বে গোল-গুম্বজের চূড়ায়। কিন্তু বেচারার ইচ্ছা পূর্ণ হল না। আলী রোজার দোতলা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই আলী ইহলোক ত্যাগ করলেন। সেই অসম্পূর্ণ ইমারতের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খিলানগুলোর মাঝে সমাধিস্থ হলেন আলী আদিল শাহ। আজও সেই রোজার খিলানের বহর দেখলে আন্দাজ করা যায় যে ইনি কি বিশাল সমাধি-মন্দিরই ফেঁদে-ছিলেন। বিজাপুরের ইমারতগুলোর প্রধান সৌন্দর্য্য আমার যা চোখে লাগত সেটা তার বিশাল গঠন। নইলে কারুকার্য্য, খোদাই বা mosaic বা জালির কাজে বিজাপুরের বাড়ীগুলো আহমদাবাদের কি দিল্লী-আগ্রার ইমারতের কাছেও লাগে না। এক চিনি-মহলের ভেতরে শুনতে পাই সর্ব্বত্র চিনেমাটির বিচিত্র রঙীন টালি বসান ছিল, কিন্তু ক্রমশঃ সেগুলো হস্তান্তরিত হয়ে দূর বিদেশে চলে গেছে। আমার সময়ে আর প্রায় ছিল না। কে নিয়েছিলেন বা কাকে কত দাম দিয়ে ছিলেন সে সব অপ্রিয় প্রসঙ্গের আলোচনা করে, কোন লাভ নেই। আরশ মহল বলে আর এক সেকেলে প্রাসাদ ছিল তাতেও ত আরশের (শ্বেত পাথরের) চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান ছিল না! সে সব পাথরই বা

কে নিলে! আমাদের নেবব্-সাহেবদের আমলে যাকে বলে পুকুর-চুরী কত যে হয়ে গেছে তার কি গুণতি আছে!

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বাস করতেন "দুই বোন" বলে এক জোড়-গুম্বজের একটার তলে। এই "দুই বোন"ও ছিল এক প্রাচীন সমাধি-মন্দির। এর মেজের নীচে ছিল বিখ্যাত উজীর খাওয়াস খান ও তাঁর মুরশিদের কবর। আর উপরে আমরা খানাপিনা নাচগান করতাম। একটা সভ্য জাতের পক্ষে কি করে এটা সম্ভব হয়েছিল আজ বোঝা শক্ত! বিজাপুরের মজাই এই ছিল যে আমরা সবাই বাস করতাম, কাছারী করতাম, সাবেক ইমারতগুলোর ভেতর। যতদূর মনে আছে, আমার সময়ে নূতন একেলে বাঙ্গালা বা কাছারীবাড়ী একটাও ছিল না। বাদশাহী আমলে যে বাড়ীগুলো বাসস্থান কি আদালত ছিল, সেগুলো কাজে লাগানোতে হয়ত কোনও দোষ নেই, কিন্তু কর্ত্তাদের কোনও বাছবিচার ছিল না। সমাধিমন্দির এমন কি মসজিদ পর্য্যন্ত সরকারী কাজে লাগানো হয়েছিল। ডাকঘর ছিল পুরানো বোখারী মসজিদে। অবশ্য এ সব হতে পেরেছিল এই জন্য যে বিজাপুরে বনেদী ঘরের মুসলমান প্রায় কেউ ছিলেন না। আদিল শাহীর পতনের পর ধীরে ধীরে সবাই নিজাম রাজ্যে বাস করতে চলে গেছলেন। কার্জ্জন লাট সাহেবকে লোকে যাই বলুক না, তিনি ভারতবর্ষের সাবেক ঐতিহাসিক ইমারতগুলোকে বাঁচাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে গেছেন। একথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। বিজাপুরে এসেও তিনি আদিলশাহী ধর্ম্ম-মন্দিরগুলোকে অবমাননা হতে রক্ষা করবার কড়া ব্যবস্থা করে গেছলেন। গোলগুম্বজের দেউড়ীবাড়ীর কথা আগেই বলেছি। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবও "দুই বোন" হতে বিতাড়িত হলেন। ডাকঘরও বোখারী মসজিদ হতে স্থানান্তরিত হল।

এ সবই sentimentএর কথা। তবে sentimentএর কি কোনও মূল্য নেই! আমার নিজের একটা গল্প বলি শুনুন। একবার আমরা একদল ছোট বড় হাকীম অজন্তা-গুহা দেখতে গেছলাম—সাতজন সাহেব ও আমি। প্রাচীন ভারতের চিত্রকলা দেখতে দেখতে ক্ষুধার উদ্রেক

হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল তাই দুই তিন বাক্স ভরে ভোজ্য-পানীয় সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল। কয়েক ঘণ্টা ধরে গুহাগুলো ঘুরে ফিরে শ্রান্ত হয়ে টিফিন করতে বেরিয়ে এলাম। এক গুহার দুয়ারের কাছে চাদর বিছিয়ে চাকরেরা টিফিন সাজিয়েছিল। রাশি রাশি খাদ্যের স্তূপ! কিন্তু আমার দেখেই কেমন হঠাৎ গা ঘিন ঘিন করে উঠল। মনে হতে লাগল, কি পাষণ্ড আমি, কতকগুলো বিদেশী বিধর্ম্মীর সঙ্গে জুটে আমার ধর্ম্মমন্দিরের অপমান করছি। দাঁড়িয়ে উঠলাম। উঠে আস্তে আস্তে বললাম, "আমি এখানে খাব না, তোমরা খাও।" সে বেচারারা হতভম্ব হয়ে আমার মুখের পানে তাকালে। তারা বুঝতেও পারলে না যে কেন আমি হঠাৎ এরকম বে-রসিকের মতন ব্যবহার করছি। চারিদিক থেকে "Why, man?", "What nonsense!" ইত্যাদি রব উঠল। আমি অগত্যা আমাদের দলের সবচেয়ে প্রবীণ Wকে একপাশে নিয়ে গিয়ে বললাম, "W—আমাকে বৌদ্ধ বিহারের সামনে এইসব মদ মাংস খেতে বোলো না; তোমরা আরম্ভ কর, আমি কিছু রুটী মাখন নিয়ে গিয়ে অন্যত্র খাই।" সে ভদ্রলোক তখনও বুঝতে পারে না। বললে, "কেন? তুমি ত বৌদ্ধ নও! আর এই গুহাগুলোও ত এখন ধর্ম্ম-মন্দির নয়, এখানে ত যে যা খুশী করে!" আমি বললাম, "তা হোক গে W, আমার মুখে এখানে খাবার উঠবে না, আমাকে মাপ কর। নিজের দেশের, জাতের, অপমান আমি এমন করে করতে পারব না।" W গম্ভীরভাবে আমাকে বললেন, "All right, Dutt, I understand." ফিরে গিয়ে ধীরে ধীরে সবাইকে বললেন "এখানে খাওয়া হবে না। চল নীচে নেমে গিয়ে খাওয়া যাক।" আর কেউ কোন কথাই বললেন না। বোধ হয় বুঝলে যে একটা কিছু অন্যায় কাজ করা হচ্ছিল। তার পরে সকলে মিলে মহা হাল্লা করে নদীগর্ভে এক স্বাভাবিক পাথরের চাতালের উপর বসে টিফিন টুকরীগুলি খালি করা গেল। কিন্তু সত্যি কথা বলি, আমি নিজে সেদিন হ্যামস্যাণ্ডুইচ ও কোল্ডচিকেন খেয়ে কিছু আনন্দ পাই নেই। মনটা কেমন হয়ে গেছল।

যাকগে, sentiment করে কাজ কি! বিজাপুরের যে অংশটায় আমরা থাকতাম ও কাছারী করতাম সেটার নাম আর্ক কেল্লা (citadel)। আমি যে বাড়ীতে থাকতাম তার নাম আনন্দ-মহল। বাদশাহী আমলে সেই বাড়ীর দালানে নাচগানের আসর বসত। দালানটা প্রকাণ্ড, কত প্রকাণ্ড তা আপনাদিকে বুঝিয়ে বলা শক্ত। তবে একটা আন্দাজ করে দিতে পারি। সামনে তিনটে খিলান, মাঝের খিলানটার বহর প্রায় ৬০ হাত, পাশের দুটো প্রত্যেকটা ৩০ হাত। এই দালান হতে একদিকে একটা ছোট দরজা দিয়ে ঢুকতে হত আমার আবাসে। অন্যদিকে সেই রকম আর এক দরজা দিয়ে ঢুকতে হত আমার কাছারীতে। মাঝখানটায় সামনের দিকে নীচের তলাটা ছিল আমাদের ক্লাবের বিলিয়ার্ড ঘর ও লাইব্রেরী। তার উপর দুই তলায় থাকতেন জজ্ সাহেব। সমস্ত বাড়ীটা চোরকুটরী ও খুপরীতে এমনই ভরা ছিল যে দেখে লোকের তাক লেগে যেত। কি কাজে লাগত এই খুপরীগুলো! লোকে বলত মহম্মদ আদিল শাহ নাকি লুকোচুরী খেলতেন তাঁর প্রণয়িনী রম্ভাবাই-এর সঙ্গে এইখানে। এই মহম্মদ-রম্ভার প্রেম বিজাপুরের ইতিহাসের একটা বড় মিষ্টি জিনিস। এদের কত ছবি তখনকার দিনে কিনতে পাওয়া যেত। আবার এই আনন্দ-মহলেই নাকি উজীর কমাল খাঁ খুন হয়েছিলেন। গল্পটা আপনাদিকে বলি। প্রথম আদিল শাহ ইউসুফ ছিলেন জাতে তুর্কী, ধর্ম্মে শিয়া, কিন্তু তিনি সব রকমে উদারহৃদয় মানুষ ছিলেন। তাঁর প্রধানা বেগম ছিলেন এক মরাঠী হিন্দু মহিলা। যখন ইউসুফ আর্ক-কেল্লা তৈরী করেন, তখন কেল্লার ভেতর রেখে দিয়েছিলেন এক প্রাচীন হিন্দু মন্দির। সে মন্দির আমার সময়েও ছিল। শোনা যায় যে পরবর্ত্তী কোন কোন বাদশাহ সেই মন্দিরে পূজা দিতেন। ইউসুফের সেনানী ও আমলা-বৃন্দের ভেতর অনেকেই ছিলেন সুন্নী। তাঁর মৃত্যুর পর সুন্নী উজীর কমাল খাঁ ষড়যন্ত্র করলেন যে বালক সুলতান ইসমায়েলকে মেরে নিজে সিংহাসনে বসবেন। কিন্তু ইসমায়েলের মা—ইউসুফের মহারাষ্ট্রীয়া মহিষী—সময়ে সব জানতে পেরে এক তুর্কী সৈনিক পাঠিয়ে কমালকে

খুন করালেন। রাজ্য বেঁচে গেল। লোকে বলত যে এই কমাল খাঁর প্রেতাত্মা আনন্দ-মহলে ঘুরে ঘুরে বেড়াত অন্ধকার রাত্রে। ভাগ্যক্রমে আমাদের নজরে কোন দিন পড়ে নেই সে প্রেতাত্মা। তবে, এই বিজাপুর জায়গাটাই এমন ছিল যে কেবল মনে হত যেন প্রেতাত্মার সংসর্গেই বাস করছি। আর্ক কেল্লার মধ্যের রাস্তাগুলো প্রায় সারাদিনই থাকত কেমন নিঝুম, নির্জ্জন। কখন কখন এমনও দেখেছি যে দিনে দুপুরে দুতিন ঘণ্টা ধরে বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়ে একটা লোকও যাওয়া আসা করলে না। আনন্দ-মহলের লাগা আর এক প্রাসাদ, গগনমহল। তার হাতার মধ্যে ছিল আমাদের ক্লাবের টেনিস খেলার জায়গা। গগনমহলের তিনটী দেওয়াল মাত্র দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভেতরে নাকি কাঠ কাঠরার অনেক কারুকার্য্য ছিল। লোকে বলে যে সে সব মারাঠারা ভেঙ্গে নিয়ে গিয়ে তাদের সাতারার রাজবাড়ীতে লাগিয়েছিল। মারাঠারা ভাঙ্গাচোরা লণ্ডভণ্ড করার কাজ বড় একটা করত না। তবে গগন-মহলের উপর তাদের একটা বিশেষ রকমের বিদ্বেষ থাকার কথা। কেন না এই মহলেই সুলতানের দরবারে পান আতর নিয়ে বিখ্যাত সেনাপতি আফজল খান বেরিয়েছিলেন ছত্রপতি শিবাজীকে ধরে আনতে। গগন মহলের সুমুখে খাড়া রয়েছে সুন্দর সুদৃশ্য এক খিলান। তার আকার বিশাল, প্রায় চৌষট্টি হাত চওড়া! খিলান আর ইমারতটার মাঝে কি ছিল তা এখন বোঝবার উপায় নেই।

আফজল খানের কথা বলতে মনে হল যে আমরা আফজল ও শিবাজীর ব্যাপারটার যে বর্ণনা ইংরেজী ইতিহাসে পড়ি সেটা অনেকাংশে রচা কথা। "বুসাতীন ও সলাতীন" বলে বিজাপুরের এক নিজস্ব ইতিহাস আছে। তাতেও এ ব্যাপারের উল্লেখ আছে। তার থেকে এ কথা মোটেই মনে হয় না যে সমস্ত দোষটা শিবাজীর স্কন্ধে চাপান যায়। যাই হোক, রাজায় রাজায় যুদ্ধ ত আর ten commandmentsএর নীতি অনুসারে চলে না! সুতরাং আফজল শিবাজীকে ফন্দী করে ধরবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন কি না, তার বিচার আজকের দিনে নিষ্ফল। কেন না, আজ আমাদের চোখে আফজল খান ও

শিবাজী, প্রতাপসিংহ ও মানসিংহ, আকবর ও আওরঙ্গজেব সবাই নমস্য ব্যক্তি, সবাই আমাদের ভারত-গগনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক !

বিজাপুর শহর হতে খানিক দূরে আফজলপুর বলে এক গ্রাম আছে। সেই গ্রামের কাছে এক পুকুর পাড়ে ঘন বনের ছায়ায় দেখা যায় সারি সারি ছেষট্টিটা কবর। গড়ন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় সবগুলিই স্ত্রীলোকের সমাধি। কিম্বদন্তী যে সেনাপতি আফজল খানের ছেষট্টি জন বেগম ছিলেন, শিবাজীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে সেনাপতি জানতে পারেন যে আসন্ন যুদ্ধে তাঁর মরণ নিশ্চিত, তাই তিনি স্বহস্তে বেগমদিকে বধ করে তাঁদের দেহ কবরস্থ করে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিম্বদন্তী সত্য কিনা বলা শক্ত। তবে এ রকম ব্যাপার তখনকার দিনে ত ঘটত ! আমি যে মুসলমান বন্ধুর মুখে গল্পটা শুনেছি তিনি বিজাপুরেরই লোক, জুমা মসজিদের পুরোহিত বংশে তাঁর জন্ম।

আগে বলেছি যে বিজাপুরের ইমারতগুলোর বিশেষত্ব তাদের বিরাট design। এইটাই সাধারণ নিয়ম। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। ইব্রাহিম শাহের সমাধিমন্দির আকারে বৃহৎ হলেও নানা রকম সূক্ষ্ম খোদাই কাজে ভরা। কিন্তু যারা আহমদাবাদের রাণী সিপ্রীর মসজিদ কি আবুর দিলবাড়া মন্দির, কি আগ্রা ফতেহপুর সিক্রীর বিখ্যাত ইমারতগুলো দেখেছেন, তাঁদের ইব্রাহিম রোজা দেখে মন উঠবে না। কিন্তু গোল-গুম্বজের বিশাল ধূসরবর্ণ কায়া, তার মাথার উপরকার প্রকাণ্ড সাদা-সিধে আরব গড়নের dome, তার কারুকার্য্য-বিহীন মস্ত মস্ত দেওয়াল যে দেখবে তারই মন শ্রদ্ধায় ভরে যাবে। উত্তর ভারতের ক্ষীণকটি ইন্দো-সারাসেনিক গুম্বজের সঙ্গে খোদাই, mosaic, খুচরো সাজ-সজ্জা শোভা পায়, কিন্তু আসল সারাসেনিক গুম্বজের স্বভাবিক গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। বিজাপুরে এটা খুব বুঝেছিলাম।

তবে এই বিজাপুরেই আবার দুটী এমন সুন্দর ইমারত আছে, যা দৈর্ঘ্যে অতি বড় কাঠ-খোট্টা আরবেরও চোখ জুড়িয়ে যাবে। একটী হচ্ছে আমাদের আনন্দ মহলের পাড়ারই মক্কা মসজিদ্। ঠিক যেন

খেলা ঘরের বাড়ী, চারিদিক ঝক্ ঝক্ করছে, ছোট্টটি, কিন্তু কি চমৎকার! লোকে বলত যে আগেকার দিনে বেগম্-শাহজাদীরা এই মসজিদে প্রার্থনা করতে আসতেন। কেউ কেউ আবার বলত যে এই মসজিদ্ আদিলশাহী রাজত্বের চেয়েও পুরানো, হিন্দু রাজাদের আমলে কোন ভগবদ্ভক্ত পীর্ রাজার অনুমতি নিয়ে এটা তুলেছিলেন।

অন্য ইমারতটী হচ্ছে মেহতর মহল। নাম মহল বটে, কিন্তু সত্যি একটী মসজিদের সিংহদ্বার মাত্র। কিম্বদন্তী যে এক মেথরের অর্থে এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মহলটী তৈরী হয়েছিল। ইমারতটী বাহিরে থেকে দেখতে যেমন চমৎকার, ভেতরের খোদাই কাজও সেই রকম অপরূপ ও বিচিত্র। কিছুকাল আগে এর একটী মিনার ভেঙ্গে পড়ে গেছল। কার্জ্জন লাটের শুভাগমন উপলক্ষে কর্ত্তারা এক নূতন মিনার তৈরী করিয়ে তার জায়গায় বসিয়ে দিয়েছিলেন। আমি ত আনাড়ী মানুষ, যখন দেখলাম নূতন পুরানোতে কোন তফাতই ধরতে পারলাম না। কিন্তু স্বয়ং লাট বাহাদুরেরও না কি তাক্ লেগে গেছল। ভারতবর্ষের প্রাচীন শিল্পকারীগরীর ধারা আজও একেবারে শুকিয়ে যায় নেই। তবে প্রায় চাপা পড়ে গেছল আর কি!

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

কবিতাগুচ্ছ

যাত্রিণী

তুমি যাত্রিণী।
তোমার যাত্রা পথে ছিল আমার কুটীর,
তাই হলে হঠাৎ অতিথি আমার ঘরে
আর পাঁচজনের মতই শুধু দুদিনের পান্থ।
কমা মাত্র, পূর্ণচ্ছেদ নও।

হায়রে লোলুপ কল্পনা!
ভাবলাম তুমি অভিসারিণী,
এসেছ সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে
আমার গলায় দিতে মালা।
মালাও একটা দিয়েছিলে, কণ্ঠে নয় হাতে।

ফুলের নয়, রুদ্রাক্ষের।
দিলে দীক্ষা, বাসরের নয়, সন্ন্যাসের।
সে রুদ্রাক্ষ শুকো ফলের নয়,
ঝল্‌মলে তারায় তারায় গাঁথা; বাঘের জোড়া নখের মত
আছে তাতে একটি চন্দ্রকলার দোলক।

তুমি আমার ভৈরবিণী।
ছিলেম বৈষ্ণব, হলাম শাক্ত।
ছিলুম অশ্রুল ভক্ত, হয়েছি এবার বীরাচারী।
চক্ষের শ্রাবণ ফুরাল, উজানে গেলাম জ্যৈষ্ঠের খরায়।
জলাগুলো হ'ল মরুভূ, পেল শ্মশান-বৈদগ্ধ্য।

বংশীধারীর বাঁশি এখনো শুনি,
যেন অন্ধকারের ঝিল্লীরব।
শ্রীরাধিকার তনু-জ্যোৎস্না
আজ এই জোনাকির কণা-ছড়ানো তমিস্রা,
নিভ্‌ছে জ্বলছে আলোকের অন্তিম নিঃশ্বাসের মত।

মহাকাল ধূলি-লুলিত-বপু ভূতল শয়ানে।
রুদ্রাণী তাঁর বক্ষে দাঁড়িয়ে আলুল-কুন্তলা।
অন্ধকার ঘনিয়েছে মুক্ত কেশীর অলকদামে,
অন্ধকার উঠ্‌ছে ফণা মেলে ধূর্জ্জটির অঙ্গ-ভুজঙ্গে,
হয়েছে পুঞ্জীভূত তাঁর জটাকুণ্ডলীতে।

তোমার সে মালাখানি জড়িয়েছি আমার মাথায়।
ইন্দুলেখা পড়েছে ঝুলে আমার ললাটে।
আমার এই জীবন,—আদ্যন্তরহিত মহাকাল।
তুমি চলেছ এই বুকের উপর দিয়ে,—যেন জঙ্গমা স্থিতি।
তোমার বুকে দোলে আমার বহু স্মৃতির নৃমুণ্ডমালা।

শ্রীস্মৃতিশেখর উপাধ্যায়

চল্লিশ

সকালবেলা বাংলা খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে হঠাৎ তারিখটা চোখে পড়লো,
তেইশে শ্রাবণ, আমার জন্মদিন।
আমার অজ্ঞাতসারেই মন চট্‌ কোরে হিসেব সেরে বললে,
চল্লিশ পার হয়ে গেল।
'চল্লিশ' শব্দটা বার বার কানের ওপর আছড়ে পড়তে লাগলো,
লোহার হাতুড়ি পেটার বিশ্রী কর্কশ আওয়াজ যেন।

সেই সঙ্গে স্মরণে এলো, জাম-সাহেবকে নিয়ে বিলেতী সাংবাদিকের রসিকতা,
ফরটি এণ্ড ফ্যাট্‌।
চট্‌ কোরে মনে ঘা লাগলো,
আমারও ত নিজেকে নিয়ে খেলা করার দিন শেষ হয়ে গেছে।
আমার এখন কোমরে চাই কোমর বন্ধ, চোখ চশমা-নির্ভর,
চুল পাতলা হয়ে চাঁদিতে চাঁদ দিচ্ছে উঁকি।
জীবনের ক্ষেত্রে ভাগীদার হয়ে স্ত্রী এসে জুড়ে বসেছেন,
আর সে ক্ষেত্রের পরিসরকে আরো সংকীর্ণ করেছে ছেলেমেয়েরা।
আমার এখন স্পোর্টস্‌ম্যানশিপের সুযোগ কোথা ?
আমি ত দস্তুর মতো সংসারী।
অথচ আমি যে এমন সংসারী হব,
তাদের ক্যাপটেন সম্বন্ধে একথা ভাবা কি আমার টীমের পক্ষে সম্ভব ছিল ?
তাদের চোখে আমি ছিলাম তারুণ্যের প্রতিরূপ,
পরার্থনিষ্ঠার অবতার,
নবযুগের নবীনতন্ত্রে দেশমাতৃকার পূজার একনিষ্ঠ পুরোহিত।
এই নিয়ে তুচ্ছ করেছি পিতৃহৃদয়ের নিভৃত-লালিত আশা,
ভেঙ্গে দিয়েছি তাঁর বুক,
মায়ের চোখে বহিয়েছি অবিরাম অশ্রু,
শান্তির সংসারে ডেকে এনেছি ঝঞ্ঝার সর্ব্বনাশ।
তবু মনে হয়েছে ঠিক করছি,
আমার পিতৃ পিতামহ জন্মভূমিকে যেভাবে ঠকিয়ে এসেছেন,
আমি দিচ্ছি মাত্র তার বিলম্বিত প্রতিদান।
ক্রমে ক্রমে দেখতে হোল পিতার তিরোধান,
হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়ের করুণায় পৈতৃক ভূসম্পত্তির হস্তান্তর,
ভাইয়ের অধোগতি, বোনের অবাঞ্ছিত বিবাহ,
বিপর্য্যস্ত জননীর সংসারত্যাগ,
ও তীর্থাবাসে আমরণ পরান্নযাপিত জীবন।

তবু আমার চৈতন্য হয়নি ;
খ্যাতি ও লাঞ্ছনার নাগরদোলায় দোল খেতে খেতে ভেবেছি,
এই যে প্রবল ঘূর্ণি, এ কখনও নিষ্ফল হয় ?
থামার সময় ত এলো বলে ;
আর সেই থামার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাবো
দেশ জোড়া শান্তি, স্বাধীন ব্যবস্থায় আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির বিস্তৃত সম্ভাবনা,
ক্ষুধার হিংসার পরশ্রীকাতরতার চরম অবসান।

থামলো দোলা—সফল হোল না স্বপ্ন,
বাস্তবের সংঘাতে গেল টুকরো টুকরো হয়ে।
দেখি, স্বাধীনতার আশা আকাশের তারার মতোই সুদূর,
ক্ষুধার অন্ন বেশী দুর্ল্লভ,
হিংসার লেলিহান জিহ্বা সর্ব্বত্র উদ্যত,
পরশ্রীকাতরতার অন্তর্লীন প্রবাহ দিগন্ত-বিসর্পিত।
মেকি গৌরব গেছে ঝরে',
খাঁটি লাঞ্ছনার ভীম ভ্রুকুটিতে দেশ স্তম্ভিত।
আমার যারা সাথী ছিল তাদের কেউ দিল প্রাণ,
কেউ হয়েছে উন্মাদ, কেউ বা জীবন-পথে পঙ্গু ;
অন্যেরা রয়েছে অপেক্ষায়
ভাবসাগরে নতুন বেগে জোয়ার লাগার।

আমিই সুধু সরে এসেছি
একটি জোড়া কাঁকণ-পরা হাতের মায়ায়
যে-কাঁকণ আমিই পরিয়েছি বেড়ির জায়গায়
যে-বেড়ি সে পরেছিল আমাকে বাঁচাতে গিয়ে
গুপ্তচরের সযত্নে পাতা যাঁতিকল থেকে।
কী নির্য্যাতনই না সে সহ্য করেছে আমার মুখ চেয়ে নীরবে।
মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে এসে সে দিয়েছে আমাকে গৃহ,
দিয়েছে সন্তান, দিয়েছে তৃপ্তি ;

সুধু কেড়ে নিয়েছে আমার যৌবনের উন্মাদনা, আমার স্বচ্ছন্দগতি।
তাকে ছেড়ে আমি আজ খঞ্জ, অসহায়।

আবার ত ডাক আসবে একদিন,
দেশের হৃদয় হবে মথিত,
স্বার্থের সাধ-কোরে-গড়া সৌধগুলি পড়বে ভেঙে ভূমিকম্পে,
মিলনের অন্তরায় হবে দূরীভূত,
আমার সঙ্গীরা হবে দিশারী নেতা অতীত কীর্ত্তির গরিমায়,
কেবল আমিই থাকবো পিছিয়ে পড়ে'
পতিপ্রাণা স্ত্রীর বাধ্য স্বামিটি হয়ে'।

আজ আমার জন্মদিনে আমি তাই এই কামনা করি,
সেদিন যখন আসবে
আমার ছেলেমেয়েরা মানে না যেন তাদের মায়ের মানা,
তুচ্ছ করে যেন আমার অনিচ্ছা,
ছিড়ে ফেলে সংসারের জট-পাকানো জাল,
ও যোগে দেয় যেন সেই উন্মত্ত আবর্ত্তে
আমাদের গোপনতম ইচ্ছার প্রকৃততম প্রতীক হয়ে'।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

আবির্ভাব

ভেবেছিলুম শেষ হয়ে গেছে মন-দেওয়া-নেওয়ার পালা ;
হাজার মরণের ঢেউ পেরিয়ে জীবন এসে নিবৃত্তি পেয়েছে সমে ;
এমনি কোরেই বাকী কালটা কেটে যাবে।
নারীর সঙ্গে ব্যবহার হবে আন্তরিক কিন্তু অনাবিষ্ট,
থাকবে না আর মনকাড়াকাড়ির টাগ-অব-ওয়ার, মানভাঙাভাঙির
জোয়ার-ভাঁটা।

মানবো না কোনো সমাজে-গড়া চাল-চলন,
মানবো সুধু আমার নিঃস্পৃহ অন্তরের গহনোদ্ভূত স্বতঃ-উৎসারিত
প্রেরণাকে অকুণ্ঠ অসঙ্কোচে,
যার ফলে হয়ত আমার দুর্নামের দুন্দুভি বেজে উঠবে ঘোর রবে,
তবু বিচলিত কোরবে না আমাকে ;
ভেবেছিলুম, জীবন-নাট্যের চতুর্থ অঙ্কে এসে-পৌঁছেছি সেই ঢালু পথে,
যাতে আর কোনো চড়াই-উৎরাই নেই—
এমন সময় ঘটলো তোমার আবির্ভাব।

এ আবির্ভাবে তোমায় আমায় নতুন দেখা নয়,
নতুন কোরে দেখা ; অপূর্ব্ব সে নতুনত্ব।
সেই একটি পরমক্ষণ যখন তুমি ডাকলে আমায় নিতে তোমার
বন্ধুত্বের উপহার,
তার মাদকতা আমি ভুলি কি করে ?
কতদিন ত এর আগে দেখা হয়েছে,
কত গল্প কত তর্ক, কত বেড়িয়ে বেড়ানো,
তবু সে-পরিচয় কখনো সামাজিকতার শিষ্ট সীমা ডিঙিয়ে
তীব্র অনুভূতির নিবিড়তায় জমাট বাঁধে নি।

সেদিন তুমি আমায় ডাক দিয়েছিলে তোমার আকস্মিক বিপর্য্যয়ে ;
এমন একজন কাউকে তখন তোমার দরকার,
যার কাছে তোমার আঘাত-পাওয়া হৃদয়ের গোপন ব্যথাটি মেলে
ধরতে পারো।
তোমার ব্যর্থ-প্রেমের কাহিনী তুমি আমায় শোনালে,
শোনালে তোমার মানসিক সংগ্রামের সুবিস্তীর্ণ ইতিহাস ;
আমার কাছে উদ্‌ভাসিত হোল তোমার অন্তর-লোকের শক্তি ও মাধুর্য্য,
মূঢ়তা ও দুর্ব্বলতা,
উচ্চাবচ-সমন্বিত সাগর-গিরি-শোভিত সে এক মহাদেশ।

তোমার এ নির্ভরতায় আমি কৃতার্থ হলুম,
তার উন্মাদনায় আমার জীবনে ঘটলো রূপান্তর।
মনে হোল, এই একটি বিদ্যুৎ-গর্ভ সময়-কণার প্রত্যভিঘাতে বিশ্বের জীবন দ্বিখণ্ডিত হয়েছে,
পুরাতন পড়ে আছে পরিত্যক্ত নির্মোকের মতো।
অতীতের ভস্মাকীর্ণ চিতাগ্নি থেকে উজ্জীবিত হচ্ছে নূতন ফিনিক্স্,
সৃষ্টি-রহস্যের নব পর্য্যায়,
যার প্রথমারম্ভের আমি যেন সদ্যঃতম দ্রষ্টা।
কামনার বহ্নিশিখা উঠলো আবার উগ্রতেজে দেদীপ্যমান হয়ে;
মন তার অভ্যস্ত প্রশান্তি ভুলে গিয়ে, লোভাতুর আগ্রহে,
তোমার পাশে পাশে ঘুরে বেড়ায়।
এর হীনতায় আমি লজ্জিত, এর আবেগে আমি পরাজিত।
বেশ বুঝতে পারি তোমার মর্ম্মের পূজাবেদীতে যে দেবতা প্রতিষ্ঠিত,
সে আমি নই;
তোমার কাছে আমি সুধু তার স্তবগানের সহৃদয় শ্রোতা।
ভয়ে ভয়ে ভাবি, যেদিন আমার নীচাশয়তা তোমার চোখে পড়বে ধরা—
কিন্তু নিষ্কামতার আদর্শ যে আজ আমার কাছে অর্থহীন,
জীবনগতি যে মোড় ফিরেছে।
এখন আমি প্রতিদিন এই সাধনা করি
কবে আমি সেই শক্তি পাবো,
যেদিন দৃপ্তকণ্ঠে আমার মনের কথা তোমার মনের দ্বারে আঘাত কোরবে,
যাতে হয় তোমাকে পাবো,
নয় তোমাকে হারাবো,
চিরদিনের মতো।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

সম্পাদকী

এই বৎসর ডব্ল্যু-বি য়েট্‌স্‌-এর সপ্ততিতম জন্মোৎসব। কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে যে এই আত্মসন্ধানী মহাকবির পরীক্ষা-নিরীক্ষার পালা আজও শেষ হয়নি; মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি যে-পরিণতির উদ্দেশে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলেন, সেখানে তিনি এখনো অনাগত। এই অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে তাঁর আশা ও বিশ্বাস, তাঁর আত্মীয় ও বন্ধু, তাঁর স্বদেশ ও সভ্যতা, সে-সমস্তই একে একে ক্ষয়, অপচয় ও মৃত্যুর বশ্যতা স্বীকার করেছে; কেবল বদলায়নি তাঁর অভীপ্সা, শুধু হার মানেনি তাঁর রূপকারী বিবেক, সুদীর্ঘ জীবনের অসংখ্য দুঃখ-দৈন্যকে ছাপিয়ে, তাঁর স্বাবলম্বন ক্রমাগতই পরাকাষ্ঠার দিকে এগিয়েছে। অথচ য়েট্‌স্‌ রোমান্টিক নামেই খ্যাত; এবং সেই খেয়ালী দলের কাছে আকস্মিক উন্মাদনার মূল্য আজন্ম অভ্যাসের চেয়ে বেশি, তাঁদের কর্ম্মপ্রবৃত্তি ততটা সাধনার অনুকূল নয়, যতটা প্রেরণার মুখাপেক্ষী, আত্মজ্ঞানকে দাবিয়ে অহঙ্কারকে বাড়াতে তাঁরা সকলেই সিদ্ধহস্ত। অবশ্য এ-নিয়মের ব্যতিক্রমেই রোমান্টিক সাহিত্য উৎকর্ষে পৌঁছেছে; এবং নিঃসম্পর্ক নৈমিষে চিরনির্ব্বাসিত থাকতে চাননি ব'লেই ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ্‌ মহাকবি। কিন্তু কোনো আন্দোলনের বিচারে তার মুখ্যপাত্রদের বাদ দেওয়াই বিধেয়; এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মতে সার্ব্বজনীন নিয়ম কবিকল্পনা মাত্র, যা বাস্তব, সে হচ্ছে একটা ঝোঁক, একটা অনির্দ্দিষ্ট সমষ্টির অনিশ্চিত ঐকাচরণ। এ-সিদ্ধান্ত অন্যায় ঠেকলেও অন্তত এটা অবিসংবাদিত যে উনিশ শতকের শেষ কবিরা আর ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ্‌-কীর্ত্তিত নিরুদ্বেগ স্মৃতির সাহায্যে কাব্য লিখতেন না, উপস্থিত অভিজ্ঞতার উচ্ছৃঙ্খল প্রকাশই তাঁদের সাহিত্যসেবার মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। আর্নল্ড্‌-এর শুচিবায়ু এই সঙ্কল্প থেকেই উদ্ভূত; পেটর্‌-এর ইন্দ্রিয়াসক্তি এই অভিমতেরই নব সংস্করণ; ওয়াইল্ড্‌, ডাউসন্‌, জন্‌সন্‌ ইত্যাদির বিসদৃশ জীবননাটিকা এই প্রকৃতিবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। কারণ

অভিজ্ঞতা কোনোকালেই স্বাধিকারে সমাদর পায় না, অপূর্ব্বতাই তাকে মর্য্যাদা জোগায়; এবং ঐকান্তিক ধ্যান-ধারণার দ্বারা সামান্যকে অলৌকিক ক'রে তোলা যেহেতু শ্রম- ও সময়-সাপেক্ষ, তাই প্রত্যেক যুগের অধীর স্বল্পমেধারাই অন্তম অসারতার প্রতিকারে অসাধারণের আশ্রয় খুঁজেছে।

সৌভাগ্যক্রমে গত শতাব্দীর শোকাবহ উপসংহার য়েট্স্ স্বচক্ষে দেখেছিলেন। পূর্ব্বোক্ত অভিজ্ঞতাবিলাসীদের সংসর্গে বেড়ে উঠে, তিনি কেবল সাহিত্যিক বস্তুতন্ত্রেই আস্থা খোয়াননি, হাক্স্‌লি-স্পেন্সর্-এর বৈজ্ঞানিক জড়বাদেও তাঁর নির্ভর ঘুচেছিলো। কারণ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের কল্যাণেই আমরা বস্তুজগৎকে চিনি, এবং সেই ইন্দ্রিয়জ্ঞানই যখন তাঁর বন্ধুদের সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছিলো, তখন য়েট্স্ অভিজ্ঞতাকে তো উপেক্ষা করলেন বটেই, এমন-কি সেই অভিজ্ঞতা যে-বস্তুর প্রতিবিম্ব, সে-সম্বন্ধেও তাঁর সন্দেহ জাগলো। কিন্তু বস্তু অবজ্ঞেয় হলেও অগ্রাহ্য নয়; এবং য়েটস্ যদিও বর্ক্লি-র দেশেই জন্মেছিলেন, তবু সেই নিরাধার দার্শনিকের বিরুদ্ধে স্যাম্যুয়েল্ জন্‌সন্-এর ক্লেশকর প্রতিবাদ তিনি ভোলেননি। কাজেই তিনি আসলে বস্তুকে উড়িয়ে দিলেন না, প্রয়োগাদির সাহায্যে প্রমাণ করলেন যে অতিবস্তুও বস্তুর মতোই সত্য, এবং মানুষ যদি পৃথিবীর বাসিন্দা হতে পারে, তবে ভূত-প্রেত, অপ্সর-গন্ধর্ব্ব, দেব-দেবী প্রভৃতির ক্ষেত্রেও ছুৎমার্গ অচল। তবু যে আমরা তাদের মানতে অনিচ্ছুক, তার কারণ বিশ্বচরাচরের সম্পূর্ণ উপলব্ধি আমাদের নেই; এবং প্রত্নতত্ত্ব নখদর্পণে না এলে আমরা যেমন প্রাক্কালীন অস্ত্র-শস্ত্রকে লোষ্ট্র ভেবে, অন্যমনে ফেলে দিই, তেমনি বিদেহ নগরের সাক্ষাৎ পরিচয়েও আমাদের চোখ ফোটে না অবিদ্যারই অনুগ্রহে। কিন্তু অজ্ঞান কেবল অশরীরী-সম্পর্কেই অন্ধতা আনে না, প্রত্যক্ষও সমান দুর্জ্ঞেয়; সেখানেও ইন্দ্রিয়লব্ধ বিগ্রহের মধ্যে বিগ্রহাতীতকে না খুঁজে, অভিজ্ঞতা-নামক পাষাণপ্রতিমা নিয়ে আমরা মাতি খেলায়। কিন্তু বিজ্ঞানের দম্ভ আঁকড়ে থাকলে আর চলবে না; অভিজ্ঞতার করাঘাতে মনের দরজা খুলতে খুলতেই বলতে হবে যে সে-আগন্তুক যে-দেশের দূত, তার

আক্রমণ যদিও মারাত্মক, তবু তার অভিপ্রায় অবেদ্য, অভেদ্য, অনর্থময়। এর পরে অদ্বিতীয় অভিজ্ঞতা মূল্যহীন, বরং অতিসাধারণই বরণীয়; কারণ তার সম্বন্ধে আর কিছু না বুঝলেও, অন্তত এইটুকুর খবর আমরা রাখি যে মর্ত্যধামে তাকে ফিরে ফিরে পাঠিয়ে মানুষের ভাগ্যবিধাতা তার প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দেখাচ্ছেন। কিন্তু বিধাতা-শব্দের ব্যবহারে হয়তো য়েটস্-এর আপত্তি আছে; কেননা অদৃষ্টের পরিকল্পনায় তিনি কোনো বিরাট পুরুষের শরণ নেননি। তাঁর অনুসারে বৈদান্তিক ব্রহ্মের মতো একটা স্বতোবিরোধী উদ্বাস্তু চৈতন্য স্বভাববশে দানা বেঁধে মাঝে মাঝে ব্যক্তির আকার ধরে ব'লেই, তিনি মানুষের স্খলন-পতন-ত্রুটি কোনো রকমে সয়ে যান। সেইজন্যেই নাটকেও তিনি চরিত্রচিত্রণে উদাসীন, তাঁর রঙ্গরচনায় প্রাধান্য পায় চরিত্রগত আবেগ, আবেশ ও অনুভূতি।

এতক্ষণ যা বকলুম, তাতে প্লোটাইনাস্-এর প্রভাব কতখানি জানি না; কিন্তু লাইব্‌নিৎস্ ও কাণ্ট্-এর এই উৎকট সংমিশ্রণ যে দর্শন বা কাব্যবিবেচনা নয়, তা আমার কাছেও সুস্পষ্ট। তবু য়েট্‌স্-এর মতো সংযতবাক্ লেখকের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় খানিকটা দুর্বোধ্যতা অনিবার্য্য, এবং দর্শনের পরিভাষার মতো সাহিত্যের সাঙ্কেতিকও যত গর্জ্জায়, তত বর্ষায় না। উদাহরণ হিসেবে 'পিওর পোয়েট্রি' নামক কাব্যকৈবল্যের উল্লেখ করা যেতে পারে; এবং অলস মনে পড়লে য়েট্‌স্-এর অনেক কবিতাতেই সেই অমানুষিক লক্ষণ ধরা পড়বে। কিন্তু নিরপেক্ষ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কাব্য রচনায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, অন্তত ইংরেজী সাহিত্যে, বিরল হলেও, তাঁর লেখায় সুইন্‌বর্ন্-এর মঞ্জুল বাক্‌সর্ব্বস্বতা নেই; অর্থহীন অনুলাপের সাহায্যে তিনি পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করতে চান না; তাঁর কাব্যের ইন্দ্রজাল সুপরিস্ফুট চিত্রকল্পের প্রসাদ। য়েট্‌স্-এর সাহিত্যসাধনা যখন সুরু হয়, তখনও ব্রাউনিং জীবিত, মেরিডিথ্ বুদ্ধিজীবীদের ইষ্টদেবতা, ফ্রান্সিস্ টম্‌সন্-এর প্রসিদ্ধি রুচিবাগীশদের মধ্যে বাড়ছে। তৎসত্ত্বেও তাঁদের পদাঙ্ক এই কবিযশঃপ্রার্থীকে টানেনি। হয়তো 'কৃচ্ছ্রসাধনের মোহ' তাঁকে কিশোর বয়সেই মজিয়েছিলো;

এবং তিনি প্রাক্তন সংস্কারের কল্যাণেই বুঝেছিলেন যে সাহিত্যসৃষ্টিতে ব্যাসকূট সহজসাধ্য, আপাত-প্রাঞ্জলতাই প্রাণপাত পরিশ্রমের ফল। নয়তো উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আলেখ্যশিল্পের প্রভাব তিনি এড়াতে পারেননি; এবং প্রথম জীবন সেই পৈত্রিক বিদ্যাভ্যাসে কাটিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে ভালো ছবি বাগার্থের অতীত, প্রকৃতির প্রতিভূ হওয়া তার ব্যবসা নয়, সে অব্যক্তের প্রতীক, আপন গঠনসৌষ্ঠবের গুণে দ্রষ্টার কল্পনাকে অসীমে পাঠানোতেই তার চরিতার্থতা। সেইজন্যেই 'রাইমার্স্ ক্লাব্'-এর উদ্যোক্তা হিসেবে তরুণ য়েট্স্ যে-কাব্যাদর্শ প্রচারের ব্রত নেন, তার মধ্যে নিরাকার প্রত্যয় আদর পায়নি, তার পৃষ্ঠপোষণে বিদ্যাভিমানীর আত্মরতি জাগেনি, তার অনধিকার চর্চ্চায় দার্শনিকের অন্নজল ঘোচেনি; সে-কাব্য আশাপথ চেয়েছিলো শুধু সঙ্গীতপ্রিয় শ্রোতার আর সঙ্গতিপ্রেমিক দর্শকের। অবশ্য সে-কবিতার মর্ম্মানুসন্ধানও পণ্ডশ্রম নয়; কিন্তু সে প্রতীক, তার অর্থগৌরব পাঠকদের ইচ্ছাধীন। তাহলেও য়েট্স্-এর প্রতীকপূজা মালার্মে-র অনুবাদ নয়। তাঁর 'ট্রেম্লিং অফ্ দি ভেল্'-উপাধেয় আত্মজীবনীর নামকরণে সেই কবির প্রতিধ্বনি যদিও অভিপ্রেত, তবু ফরাসী প্রতীকীরা য়েট্স্-এর থেকে পৃথক। অন্তত মালার্মে-র চক্ষে স্বপ্নই একমাত্র সত্য ছিলো, এবং দৈনন্দিন সংসারকে তিনি এমনি অবান্তর ভাবাতেন যে মানুষী ভাষায় আত্মোপলব্ধির প্রকাশকে ব্যর্থ জেনে, তিনি প্রায়ই বলতেন, কবি-প্রতিভার চূড়ান্ত বিকাশ শাদা কাগজের নিষ্কলঙ্ক মৌনিতায়। এ-মতে য়েটস্-এর সমর্থন নেই; এবং তিনি বস্তুকে অস্থায়ী বিশেষণ দেন বটে, কিন্তু স্বপ্নকে ততোধিক অবিনশ্বর মনে করার হেতুও তাঁর অবিদিত। সুতরাং যে-ভাষা বস্তুর পদসেবী, তার সঙ্গে স্বপ্নেরও কোনো বিবাদ নেই। আসলে য়েট্স্-এর ভাষা অতিশয় সাবলীল এবং চিরপরিবর্ত্তনশীল, তার নিগড়ে ভাব কখনো পঙ্গু হয় না। শব্দব্রহ্মের সহজ সৃজনীশক্তির উপরে তাঁর আস্থা অগাধ; এবং তিনি যেহেতু বর্ণনায় যত্নবান নন, ব্যঞ্জনার প্রয়াসী, তাই তাঁর কাব্যের অর্থ বা বিষয়বস্তু অনেকের কাছে রহস্যাবৃত ঠেকলেও, সে-কাব্যের আবেদন

সার্ব্বভৌম। কারণ জাতিগত সংস্কৃতি ব্যতিরেকেও যখন বিদেশীরা পরদেশী সাহিত্যের মানে বোঝে, তখন সাহিত্যের অর্থ নিশ্চয়ই সার্থকতার নামান্তর। কিন্তু এই ধরণের সাহিত্যরস অনেক সময়ে শুধু বিলাসিতার অনুপান জোগালেও, স্বভাবসৌন্দর্য্যের অনটনে যেমন পূর্ব্বপুরুষের পরিশীলন-সম্পদই উত্তরপুরুষের অবজ্ঞাভাজন, তেমনি য়েট্‌স্-এর কবিতাও সার্ব্বজনীন অনুকম্পার অধিকারী শুধু স্বসমুত্থ রূপের জোরে।

কিন্তু রূপ আর কলাকৌশল বিভিন্ন প্রকৃতির; এবং শেষোক্তের অভাবে শিল্পসেবা যদিও বিড়ম্বনা, তবু রূপের আশীর্ব্বাদেই ললিত কলা কারুকার্য্যের অগ্রগণ্য। কারণ কলাকৌশলের শেষ উপকরণের উপযুক্ত ব্যবহারে; উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে উৎপাদক ও খাদকের যে মানসিক কোনো সম্বন্ধ থাকতে পারে, এমন সন্দেহও তাকে বিচলিত করে না; অবাধ্য উপাদানকে বশে এনে, তার কাঠামোয় রচয়িতার স্বকীয়তা ফুটিয়ে তোলার ভার রূপের উপরে ছেড়ে দিয়ে, সে যথাসম্ভব যান্ত্রিক উপায়ে নির্ম্মিত সামগ্রীর দোষনিরাকরণেই ব্যস্ত। সেইজন্যেই কলা-কৌশলের উন্নতিকল্পে অভ্যাস ও উৎকৃষ্ট উদাহরণ যথেষ্ট, কিন্তু রূপের পরিপুষ্টি সমগ্র জীবনযাত্রার মুখাপেক্ষী। চারিত্র্য আর ব্যক্তিস্বরূপের মধ্যে হর্বর্ট্ রীড্ যে-বৈলক্ষণ্য দেখেছেন, আমার মতে রূপ আর কলা-কৌশলের মাঝেও সেই ব্যবধান বর্ত্তমান। কলাকৌশল চারিত্র্যের অভিব্যক্তি আর রূপ ব্যক্তিস্বরূপের; এবং চরিত্রগুণ একবার অর্জ্জন করলে তাকে হারানো যখন শক্ত, তখন কলাকৌশল শিল্পসৃষ্টিতে সংহতি ও স্থৈর্য্যই আনে, প্রাণসঞ্চার রূপের কাজ। উপরন্তু চারিত্র্য অনুকরণের ফল; আত্মীয়-বন্ধুর উপদেশ, প্রতিবেশের শাসন ও কুলসংক্রমণ, এই তিনের ঘাত-প্রতিঘাতই মানুষকে চরিত্রবান করে। কিন্তু ব্যক্তিস্বরূপ জন্মায় আত্মজিজ্ঞাসার উদ্যোগে। অতএব তার সঙ্গে অভিজ্ঞতার সম্পর্ক নিকট; কারণ অভিজ্ঞতা আত্মজিজ্ঞাসার সহচর, ব্যক্তিগত উপলব্ধির সঙ্গে চিরপ্রথার বিরোধ না-বাধলে প্রতর্কের সুযোগ আসে না। তাহলেও ব্যক্তিস্বরূপ অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি নয়, বরং তাকে অভিজ্ঞতার

নিকষ বলাই বাঞ্ছনীয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিস্বরূপও একটা প্রতীক, ব্যক্তির প্রবর্দ্ধমান সত্তাই তার পটভূমি, দৈনিক অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে, একটা অবিচ্ছিন্ন বিশ্বব্যাপী দর্শনে উপনীত হওয়াই তার উদ্দেশ্য; এবং সেইজন্যেই চারিত্র্যের মতো কৃপণ বা দ্বৈপায়ন উপাধি তাকে সাজে না; দৈবাগত সম্পত্তি খোয়ালেও তার যেহেতু প্রাণসংশয় ঘটে না, তাই পান্থশালাকে দুর্গে পরিণত করার প্রলোভন বা প্রয়োজন তার নেই; সে আনন্দ পায় চলে, স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপ্তি বাড়ানোই তার বৈশিষ্ট্য। এ-কথা য়েট্স্‌ও জানেন, এবং সেইজন্যেই সাধনার চেয়ে সিদ্ধিতেই তাঁর আগ্রহ; কেবল অনবদ্য কলাকৌশলে তাঁর সাধ মেটেনা, তিনি প্রতিনিয়ত খোঁজেন রূপের পরিপক্বতা। কিন্তু রূপ আর জীবন হরিহরাত্মা। কাজেই য়েট্স্‌-এর সাহিত্যসেবা শুধু গ্রন্থাগারে আবদ্ধ থাকে না; সমাজে ও সংসারে, রাষ্ট্রনীতিতে ও হিতৈষণায়, প্রচারকার্য্যে ও সংগঠনে নিজের প্রতিভা ও প্রজ্ঞার নিষ্কুণ্ঠ বিতরণে তিনি তাঁর ব্যক্তিতার সীমা বারম্বার পেরিয়ে যান। ফলে তাঁর ক্ষুদ্রতম কবিতার অমৃতলোকে আধুনিক মন ও বর্ত্তমান যুগই চিরন্তন মূর্ত্তি পায়নি, নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীও সেই মায়ামুকুরে অক্ষয় রেখায় চিত্রার্পিত। ডব্লু-বি য়েট্স্‌ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিদের সগোত্র, উপরন্তু তাঁর মহান্‌ হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য্য তিনি এখনো নিঃশেষ করেননি; তাই তাঁর দীর্ঘ আয়ু ও সবল স্বাস্থ্য সকল শিল্পানুরাগীরই একান্ত কাম্য।

* * * *

দুর্ভাগ্যবশত শুধু য়েট্স্‌-জয়ন্তীর উল্লেখ ক'রেই এধারকার সম্পাদকীতে ছেদ টানা যাবে না। গত দু মাসের শোকসংবাদও বিস্তর। জর্জ্‌ রাসেল্‌ (এ-ই) ও আঁরি বার্ব্যুস্‌-এর তিরোধানে কেবল য়ুরোপীয় সাহিত্যেরই ক্ষতি হলো না, এই দুই দিক্‌পাল নক্ষত্রের অস্তগমনে ঘনায়মান পশ্চিমাকাশের অন্ধকারও হয়তো বাড়লো; এবং দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আকস্মিক মৃত্যু তাঁর বন্ধুদের পক্ষে যেমন অরুন্তুদ, তাঁর দেশবাসীর পক্ষে তেমনি অপ্রতিকার্য্য

এঁদের বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার যোগ্যতা আমার নেই; কারণ এক এ-ই বাদে এঁরা কেউই স্বভাবসাহিত্যিক ছিলেন না। এমন-কি এ-ই-ও কবি হিসেবে যতই প্রশংসনীয় হোন না কেন, তাঁর প্রতিভার প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি শিল্পোত্তর ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সুকুমার কলায় এঁদের চেয়ে স্মরণীয় ব্যক্তি থাকুন বা না-থাকুন, অকৃত্রিম মানবধর্ম্মের গুণে এঁরা প্রত্যেকেই সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনের অধিকারী; এবং সে-গুণ আধুনিক জগতে এতই দুর্ল্লভ যে সঙ্কীর্ণ বৈদগ্ধ্যের সাধুবাদ ছাড়াও এঁরা মানুষের কৃতজ্ঞ অন্তরে অমরতা পাবেন।

পুস্তকপরিচয়

কৌলজ্ঞান নির্ণয় and Some Minor Texts of the School of Matsyendra Natha.—Edited by Prabodh Chandra Bagchi, M. A., D. es lettres (Paris). Lecturer, Calcutta University. (Metropolitan Printing and Publishing House Ltd. Calcutta,)

An Introduction to the Adhyatma Ramayana—by Prabodh Chandra Bagchi, reprinted from Calcutta Sanskrit Series No XI (Metropolitan Printing and Publishing House, Calcutta).

নেপালের দরবার হইতে সংগ্রহ করিয়া ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচি মহাশয় এই চারখানি হিন্দুতন্ত্র গ্রন্থ (কৌলজ্ঞাননির্ণয়, অকুলবীরতন্ত্র, কুলানন্দতন্ত্র ও জ্ঞানকারিকা) বাহাত্তর পৃষ্ঠাব্যাপী ইংরাজী ভূমিকা ও গ্রন্থ চতুষ্টয়ের ইংরাজী সংক্ষিপ্তসার সহ প্রকাশ করিয়াছেন। চারিখানি গ্রন্থই মৎস্যেন্দ্রনাথের নামের সহিত জড়িত—কোনখানাই মৎস্যেন্দ্রনাথের স্বরচিত নয়। সম্ভবতঃ মৎস্যেন্দ্র প্রবর্ত্তিত তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মধ্যে মৎস্যেন্দ্রনাথের যে সকল শিক্ষা দীক্ষা প্রচলিত ছিল, পরবর্ত্তী যুগে তাহাই এই সকল গ্রন্থের আকার ধারণ করিয়াছে। ডাঃ বাগ্‌চি বলেন যে তাঁহার বিশ্বাস কৌলজ্ঞান নির্ণয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি (যাহা তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল) তাহার বয়ঃক্রম প্রায় ৮০০ বৎসর (the middle of the 11th Century A. D.)। অন্য তিনখানি তন্ত্রগ্রন্থ অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত এবং কৌলজ্ঞান নির্ণয়ের নিশ্চয় পরবর্ত্তী।

একখানি মাত্র হস্তলিখিত পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া ডাঃ বাগ্‌চিকে এই গ্রন্থ সম্পাদন করিতে হইয়াছে। একে প্রচুর লিপিকর প্রমাদ, তাহাতে আবার গ্রন্থগুলি অপসংস্কৃতে রচিত—ইয়োরোপের মধ্য যুগের যেমন Dog-Latin, গ্রন্থকার ব্যাকরণ বিষয়ে নিরঙ্কুশ। সেইজন্য 'সুশব্দবাদী'দের অবজ্ঞা করিয়া তিনি 'অর্থশরণতামাশ্রিত্য' রচনায় প্রবৃত্ত। অতএব corrupt readingsএর অন্ত নাই। সেইজন্য অনেক স্থলে মূলের অর্থগ্রহণ কঠিন।

মৎস্যেন্দ্রনাথ কে এবং কোন যুগের লোক? তাঁহার সম্পর্কে নানা প্রদেশে প্রচলিত কিম্বদন্তীসমূহ এবং গ্রন্থমধ্যে রক্ষিত "পৌরাণিক" বিবরণসকল ডাঃ বাগচি সযত্নে সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদিগের ভিত্তি এত দুর্ব্বল যে তাহার উপর সিদ্ধান্ত-গঠন দুর্ঘট। ডাঃ বাগচি মৎস্যেন্দ্রকে নবম শতকের শেষে ফেলিয়াছেন এবং লুই পাদের সহিত অভিন্ন বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ বঙ্গের সমতটে তাঁহার জন্ম এবং গোরক্ষনাথ তাঁহার শিষ্য ছিলেন। কামরূপে নাকি তাঁহার শিক্ষার প্রভাব খুব বিস্তৃত ছিল—

কামরূপে ইদং শাস্ত্রং যোগিনিনাং গৃহে গৃহে।

ইহাও অসম্ভব নয় যে তিনি জাতিতে কৈবর্ত্ত ছিলেন এবং পরে তান্ত্রিক সাধনায় 'সিদ্ধ' হইলে ব্রাহ্মণ পদবীতে উন্নীত হন। ইহার অধিক তাঁহার বিষয়ে নিঃসংশয়ে জানা কঠিন।

ডাঃ বাগচি বলিতেছেন—

When the Kaulajnana was compiled the Kaula School seems to have had already a fairly long history, as on several occasions the different Schools and the names of their teachers are given in the texts.

এ কথা ঠিক কিন্তু তিনি যে বলিতেছেন it may be held that there is some truth in the tradition which associates Hathayoga with Matsyendra, ইহার ভিত্তি কি ?

ভূমিকায় ডাঃ বাগচি হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রের সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন, এবং মৎস্যেন্দ্রের যোগিনী কৌলের সহিত কোন কোন বৌদ্ধতন্ত্রের সান্নিধ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্র উভয়েরই এক বুনিয়াদ (common basis) এবং তাহার সহিত চীনাচার ও তীব্বতীয় Tantricism-এর গাঢ় সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধে এখনও সম্যক্ আলোচনার সময় আসে নাই। এখনও ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে সংগ্রহকার্য্য চলুক—নেপাল, চীন, তিব্বত, কাশ্মীর, উত্তরাখণ্ড, মধ্যদেশ, দাক্ষিণাত্য সকল স্থান হইতে উপকরণ সংগৃহীত হউক। অবশেষে এমন এক synthetic geniusএর উদয় হইবে যিনি সকলের সমীকরণ করিয়া চরম সিদ্ধান্তের চূড়ায় আরোহণ করিবেন—ইতিমধ্যে ডাঃ বাগচির কথাই ঠিক্ কথ—

But that is a subject which cannot be properly treated in the present state of our knowledge of the Tantras.

এই প্রসঙ্গে একটা কথা পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিই—বাগচি মহাশয় নিশ্চয়ই জানেন কিন্তু সাধারণ পাঠকের হয়ত ইহা অবিদিত। তন্ত্রকে পাশ্চাত্যেরা যতটা অর্ব্বাচীন ভাবেন তন্ত্র তত অর্ব্বাচীন নয়। তন্ত্রের দুই মূর্ত্তি এবং উহার নির্দ্দিষ্ট মার্গও দুই। একটি দক্ষিণ মার্গ (white) এবং অন্যটি বাম মার্গ (black)। ভবভূতির মালতীমাধবে আমরা এই দ্বিবিধ মার্গেরই পরিণত আকারের সাক্ষাৎ পাই। 'সৌদামিনী' দক্ষিণ মার্গের সিদ্ধ সাধিকা এবং কাপালিক 'অঘোর ঘণ্ট' বামাচারী। দক্ষিণ মার্গের হিন্দু তন্ত্রগ্রন্থে (এবং অল্পবিস্তর বামমার্গের গ্রন্থেও) বেদান্তের ও (শুধু হঠযোগ নয়) রাজযোগেরও অনেক মূল্যবান কথা পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সংগ্রহেও আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার এবং ষট্চক্র-ভেদ বিষয়ে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে।

ব্রহ্মস্থানে যৎ কমলং চতুঃষষ্টীদলান্বিতম্।
তত্রৈব মনসা রোধ্য লক্ষয়েদ্দীপশিখান্ ব্রতী।

পাঠক 'কৌলজ্ঞানের পঞ্চম পটল পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে আরও অনেক পাইবেন।

দধিমধ্যে যথা সর্পিঃ কাষ্ঠে চাগ্নিঃ স্থিতো যথা।
পুষ্পে গন্ধস্তিলে তৈলং বৃক্ষে ছায়া সমাশ্রিতা॥
মন্ত্রমধ্যে যথানন্দং দীপে প্রভা সমাশ্রিতা। * * *
নিশ্চিতং নিশ্চলং সাম্যং নির্দ্বন্দ্বং চ নিরাকুলম্॥
ভবেন্তু ভোক্তো নরাণাঞ্চ দ্বন্দ্বভাববিবর্জ্জিতম্॥ * * *
গুণত্রয়বিনির্ম্মুক্তং সদা নির্ব্বাণলক্ষণম্। * * *
ধর্ম্মাধর্ম্মং যদা ত্যক্তং ক্ষিপ্রং মুক্তন্তি মানবাঃ।

—এ সকল নিছক বেদান্ত। কৌল কি? ডাঃ বাগচির ভূমিকা হইতে এ সম্পর্কে কিছু নূতন আলোক পাওয়া গেল—

কুলং শক্তিরিত প্রোক্তমকুলং শিব উচ্যতে।
কুলেঽকুলস্য সম্বন্ধঃ কৌলংমিত্যভিধীয়তে॥
ইতি তন্ত্রোক্তং শিবশক্তি সামরস্যং বা কৌলম্।

'সহজ' 'সহজিয়া' শব্দ ভ্রষ্ট তান্ত্রিকের গর্হাসূচক—ইদানীং উহার সহিত কামিনী ও বারুণীর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ—

বামে রামা রমণকুশলা দক্ষিণে পানপাত্রম্।

'কৌলজ্ঞানে' মৎস্য, মাংস, মুদ্রা এই তিন মকারের উপদেশ পাওয়া যায় কিন্তু অন্য দুই মকার (মদ্য ও মৈথুনের) উল্লেখ দেখা যায় না। মৎস্য ও মাংস সম্ভবতঃ mystic phraseologyরূপে ব্যবহৃত—fish ও flesh নহে। বস্তুতঃ কৌলজ্ঞানে 'সহজ' সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত। সহজ তিনি—যিনি উপাসক ও উপাস্যের একত্বে সুস্থিত—

কৌলমার্গে দ্বয়ো সন্তি কৃতকা সহজ্যা তথা।
কুণ্ডলী কৃতকা জ্ঞেয়া সহজা সমরসে স্থিতা॥

অকুলবীর এই সহজানন্দ অনুভব করেন—

সহজানন্দং চ কেবলম্।

সে আনন্দ কিরূপ?

ভাবাভাবোবিনির্ম্মুক্তঃ উদয়াস্ত বিবর্জ্জিতঃ
স্বভাবমতিমৎশান্তং মনো যস্য মনোময়ঃ।

সেই জন্য মনে হয় ডাঃ বাগচি কর্ত্তৃক সম্পাদিত এই তন্ত্র চতুষ্টয় দক্ষিণ মার্গীয় —বাম মার্গীয় নহে।

অধ্যাত্ম রামায়ণ বৈদান্তিক ও রাম ভক্তের পক্ষে উপাদেয় গ্রন্থ। এগ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে কয়েকস্থানে মুদ্রিত হইয়াছে বটে কিন্তু কিন্তু এপর্য্যন্ত ইহার কোন নির্ভুল ও critical সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। Calcutta Sanskrit Series এতদিনে সে অভাব পূর্ণ করিল। এজন্য ঐ seriesএর পরিচালক সংস্কৃতানুরাগীর ধন্যবাদভাজন। মূল গ্রন্থের মুখবন্ধ স্বরূপ ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি ৭৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি ইংরাজী ভূমিকা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ঐ ভূমিকায় অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। বিশেষতঃ ভূমিকার তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ পর্ব্বাধ্যায়ে ডাঃ বাগ্‌চি অধ্যাত্ম-রামায়ণে উপদিষ্ট অদ্বৈত বেদান্তের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা সংক্ষিপ্ত হইলেও সারগর্ভ।

অষ্টম পূর্ব্বাধ্যায়ে ডাঃ বাগচি বাল্মীকি রামায়ণের সহিত অধ্যাত্ম রামায়ণের তুলনা করিয়াছেন এবং কি কি বিষয়ে অধ্যাত্ম রামায়ণে আদি কবির বিবরণ অনুসৃত হয় নাই তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সঙ্গে মহাভারতের বনপর্ব্বে যে রামায়ণ বিবৃত আছে তাহার সহিত অধ্যাত্ম রামায়ণের তুলনা থাকিলে ভাল হইত। ভক্তকবি তুলসীদাস তাঁহার 'রামচরিত মানস' রামায়ণের কয়েকস্থলে বাল্মীকির অনুসরণ না করিয়া অধ্যাত্মরামায়ণের অনুসরণ করিয়াছেন। ডাঃ বাগচীর ভূমিকায় ঐ সম্বন্ধে আলোচনা দেখিলে আমরা প্রীত হইতাম।

অধ্যাত্ম রামায়ণে মায়াসীতার উল্লেখ আছে। এ সম্পর্কে ডাঃ বাক্‌চি লিখিতেছেন—

Rama foretells Sita that Ravana will come to her in the form of Bhiksu and instructs her that she should remain inside the cottage leaving her shadow outside and that she should then live in the fire unseen for a year. They would be united after the death of Ravana. **It is also the illusive Sita whom Ravana carries away.

সম্ভবতঃ ডাঃ বাগ্‌চির ধারণা যে, মায়াসীতা অধ্যাত্ম-রামায়ণকারের সৃষ্টি। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই কূর্ম্মপুরাণে মায়াসীতার উল্লেখ আছে—

সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়াসীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা॥
পরীক্ষসময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদনীনয়ৎ॥

চৈতন্যচরিতামৃতে এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। চরিতামৃতে আরও দেখিতে পাই, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব দক্ষিণভারতে তীর্থ দর্শনোপলক্ষে যখন মাদুরায় উপস্থিত হন তখন এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। সে ব্রাহ্মণ মহা রামভক্ত। তাহার মহা দুঃখ ছিল যে, রাবণ সীতাদেবীকে স্পর্শ করিয়াছিল—

জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে ইহা কর্ণে শুনি॥

মহাপ্রভু তাহাকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন

স্পর্শিবার কার্য্য আছুক না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ॥
রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া-সীতা পাঠাইল॥

কিন্তু ব্রাহ্মণের তাহাতে স্বস্তি হইল না। মাদুরা হইতে মহাপ্রভু রামেশ্বর আসিলেন। সেখানে দেখিলেন, ব্রাহ্মণ-সভায় কূর্ম্মপুরাণ পাঠ হইতেছে। তাহাতে মায়াসীতার প্রসঙ্গ শুনিয়া সেই পুরাতন পুঁথির পত্রটি মাগিয়া লইয়া পুনরায় মাদুরা আসিয়া সেই ব্রাহ্মণকে দেখাইলেন।

বিপ্র সভায় শুনে তাঁহা কূর্ম্মপুরাণ।
তার মধ্যে আইল পতিব্রতা উপখ্যান॥
মায়া সীতা নিল রাবণ শুনিল ব্যাখ্যানে।
শুনি মহাপ্রভু হৈলা আনন্দিত মনে॥
প্রতীতি লাগি পুরাতন পত্র মাগি লইল।
পত্র লঞা পুন দক্ষিণ মথুরা আইল॥

ইহা হইতে দেখা যায় যে, চৈতন্যযুগের পূর্ব্বেও দক্ষিণ ভারতে উচ্চবর্ণের মধ্যে রামভক্তের অভাব ছিলনা। ডাঃ বাগ্‌চির ধারণা যে রামাইত সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক রামানন্দই রামসীতার উপাসনা প্রবর্ত্তন করেন (রামানন্দের জন্মকাল ১৩৫৬ বিক্রম সংবৎ—১৩০০ খৃঃ)

The Ramaite sect was founded by Ramananda who introduced for the *first time* the worship of Rama and Sita. ** His disciples who mostly belonged

to the lower castes were all worshippers of Rama. The only mode of worship with them was Japa or the repetition of the name of Rama.

তিনি আরও বলেন যে অধ্যাত্ম রামায়ণের রচনাকাল খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী যে সময় রামাইত মত ব্রাহ্মণ সমাজে প্রবেশ লাভ করিতেছিল এবং এজন্য রামভক্ত তুলসীদাসের বিশেষ কৃতিত্ব। (তুলসীদাসের সময় খৃষ্টীয় ১৫৩২—১৬২৩)

The followers of Ramananda were all non-Brahmins and it was probably through the activities of Tulasidasa that the Rama cult was introduced amongst the Brahmins. The Adhyatma Ramayana seems to have been composed in this period, perhaps a little earlier than the time of Tulasidasa, about the 15th cent. when the Ramaite cult was being introduced in the Brahmanical fold.

এ সকল কথার অনুমোদন করা যায়না। আমরা দেখিয়াছি চৈতন্যযুগের পূর্ব্ব হইতেই দক্ষিণদেশে ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে রামভক্তের অভাব ছিলনা। উত্তর ভারতের ত' কথাই নাই। এমনকি চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত মুরারি গুপ্ত রামোপাসক ছিলেন। চরিতামৃতে দেখিতে পাই চৈতন্য-আজ্ঞায় মুরারি একবার রামোপাসনাস্থলে কৃষ্ণউপাসনা আশ্রয় করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সফল হয় নাই। মহাপ্রভু বলিতেছেন,—

প্রাতঃকালে আসি মোর ধরিয়া চরণ।
কান্দিতে কান্দিতে কিছু করে নিবেদন।
রঘুনাথ পায়ে মুঞি বেচিয়াছি মাথা।
ছাড়িতে না পারি রাম মনে পাই ব্যথা।
শ্রীরঘুনাথ চরণ ছাড়ন না যায়।
তোমার আজ্ঞাভঙ্গ হয় কি করি উপায়।

আর রামনাম সঙ্কীর্ত্তন? তুলসীদাসের জন্মের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে চৈতন্যদেব কৃষ্ণনামের সহিত রামনাম গান করিয়া বেড়াইতেন।

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥

পদ্মপুরাণেও দেখিতে পাই, শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—

রাম রামেতি রামেতি রাম রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে।

এই সকল এবং অন্যান্য কারণে ডাঃ বাগচি অধ্যাত্মরামায়ণের কাল নির্দ্দেশ করিতে যে সকল যুক্তির উপন্যাস করিয়াছেন তাহা আমার নিকট সুযুক্তি বলিয়া মনে হয় না। তিনি অধ্যাত্ম রামায়ণকে পুরাণ শ্রেণী ভুক্ত করিতে নারাজ। তিনি বলেন রামভক্তিকে যখন "প্রেমলক্ষণা" বলা হইয়াছে (তস্মাৎ রাঘব সদ্ভক্তি স্তুয়ি মে প্রেমলক্ষণা) এবং যখন প্রেমভক্তি চৈতন্যের অনুচরগণ কর্ত্তৃকই ষোড়শ শতাব্দীতে প্রথমতঃ প্রচারিত হয়, তখন "Our text could not have been composed much earlier than this period—" বিশেষতঃ অধ্যাত্মরামায়ণে যখন বৃন্দাবনের নাম আছে। বৃন্দারণ্যে বন্দিতবৃন্দারকবৃন্দং বন্দে রামং। বৃন্দাবনের নাম ভাগবতেনাই কি?

বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণঃ প্রাবিশৎ গীতকীর্ত্তিঃ।

লীলাশুক বিল্বমঙ্গলের কর্ণামৃতের কথা কে না জানে! মহাপ্রভু দক্ষিণ ভ্রমণ কালে সযত্নে এই কর্ণামৃতের নকল করিয়া আনেন এবং গম্ভীরায় অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত এই কর্ণামৃত আস্বাদন করিতেন। এই কর্ণামৃত অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহাতে বৃন্দাবনের নাম তো আছেই, অধিকন্তু বিল্বমঙ্গলের মুখে আমরা প্রেমধর্ম্মের পরিপূর্ণ আস্বাদ পাই—

তীর্থযাত্রা কথা প্রভু সকল কহিলা।
কর্ণামৃত ব্রহ্মসংহিতা দুই পুঁথি দিলা॥

আমার ধারণা অধ্যাত্মরামায়ণ পুরাণ শ্রেণীর গ্রন্থ। যে যুগে ঐ গ্রন্থচক্র (cycle) প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, অধ্যাত্মরামায়ণ সেই যুগের রচনা। এযুগ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ শতকের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী। পুরাণযুগের গ্রন্থ বলিয়াই ইহার আরম্ভ ষট্-সংবাদিনী কথায় এবং পুরাতন রীতি অনুযায়ী ইহার সবিশেষ মাহাত্ম্য খ্যাপন, (ডাঃ বাগ্‌চি যাহাকে special sanctity বলিয়াছেন)। খুব সম্ভবতঃ অন্যান্য পুরাণের ন্যায় পরবর্ত্তী যুগে সেই আদি অধ্যাত্ম রামায়ণ নবীকৃত (new reduction) হইয়াছিল। সেই সময় অর্ব্বাচীন প্রসঙ্গের সন্নিবেশ ঘটা আশ্চর্য্য নয় (বাগ্‌চি মহাশয় যাহার উপর নিভর করিয়া অধ্যাত্ম রামায়ণের আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন)। এই নূতন সংস্করণেও পরবর্ত্তী কালে প্রক্ষিপ্তের যোগ অসম্ভব নহে। বিশেষ অনুধাবন সহকারে সংস্কৃত মূল আলোচনা করিলে হয়ত এখনও ঐ প্রক্ষিপ্তের আবিষ্কার করা যাইতে পারে। আশা করি ডাঃ বাগ্‌চি এ বিষয়ে মনোযোগ দিবেন।

আধ্যাত্ম রামায়ণের লক্ষ্য বৈদান্তিকভাবে বাল্মীকির রামায়ণের পুনর্গঠন এবং অসঙ্কোচে শ্রীরামচন্দ্রের ব্রহ্মত্ব খ্যাপন। বাল্মীকি রামায়ণের কয়েকস্থলে শ্রীরামচন্দ্রকে 'ত্রৈলক্যনাথ, অনাদিনিধন বিষ্ণু' ইত্যাদি বলা হইয়াছে। ডাঃ বাগ্‌চি দুএক স্থলের মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। বালকাণ্ডে দেখা যায়—পরশুরাম কৃতবীর্য্য ও জড়ীকৃত হইলে রামচন্দ্রকে বলিতেছেন—

অক্ষয্যং মধুহন্তারং জানামি ত্বাং সুরেশ্বরম্।
ধনুষোঽস্য পরামর্শাৎ স্বস্তিতেস্তু পরন্তপ॥
ন চেয়ং মম কাকুৎস্থ। ব্রীড়া ভবিতুমর্হতি।
ত্বয়া ত্রৈলোক্যনাথেন যদহং বিমুখীকৃতঃ॥

—বালকাণ্ড, ৭৬।১৭, ১৯

কিন্তু, তাহা হইলেও শ্রীরামচন্দ্র আত্মবিস্মৃত। রাবণ বধের পর দেবতারা সমবেত হইয়া তাঁহার স্তুতি করিলে রামচন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আমি ত' মানুষ—দশরথের পুত্র—আমি কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছি—আমাকে বলুন।"

আত্মানং মানুষং মন্যে রামং দশরথাত্মজম্।
সোঽহং যশ্চ যতশ্চাহং ভগবান্ তদ্ ব্রবীতু মে॥

তখন দেবতারা বলিলেন,—

সীত'লক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুর্দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ।
বধার্থং রাবণস্যেহ প্রবিষ্টো মানুষীংতনুম্॥

—১১৯।২৭

"সীতা স্বয়ং লক্ষ্মী এবং আপনি ভগবান্ বিষ্ণু। রাবণ বধের জন্য মানুষী তনুতে প্রবেশ করিয়াছেন।"

অধ্যাত্ম রামায়ণকারের দৃষ্টিতে শ্রীরামচন্দ্র আত্মবিস্মৃত নহেন—সম্পূর্ণ সচেতন। তিনি, বুদ্ধ, সত্যসনাতন অদ্বয়। ব্রহ্মতত্ত্ব এবং রামায়ণের সমস্ত ঘটনা তাঁহার 'লীলাকৈবল্য মাত্র'।

ভূমিকায় যে সকল সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিতে চাই। ডাঃ বাগ্‌চি সঙ্কল্প শব্দের 'অনুবাদ করিয়াছেন— proposition। ইহা কি ঠিক্? নরনারায়ণো লোকে চরস্ত্যাবিতি মে মতিঃ। এখানে 'নরনারায়ণ' সেই বিখ্যাত নর ও নারায়ণ ঋষি—কিন্তু বাগ্‌চি মহাশয়ের অনুবাদ—You are the Narayan in the form of man। ত্বয়েব সর্বমখিলং ত্বয়ি নীন্ম কিঞ্চন—ইহা বেদান্তের প্রসিদ্ধ 'ব্যতিরেক'। ডাঃ বাগ্‌চির অনুবাদ এই—All this exists when you are ignored but nothing of it exists when you are known। অবিদ্যাকৃতদেহাদিসঙ্ঘাতে প্রতিবিম্বিতা—সঙ্ঘাত = organism। বাগ্‌চি মহাশয়ের অনুবাদ 'when the চিৎশক্তি reflects itself in the material world created by অবিদ্যা'। বেদান্তের জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি দশা সুপরিচিত—স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ উপাধির উপঘাতে একই চিন্মাত্র বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ রূপে প্রতিভাত হন। ইহা ব্যষ্টি-উপাধি লক্ষ্য করিয়া। যখন সমষ্টি-উপাধি লক্ষ্য করা হয় তখন চিদাকাশের সংজ্ঞা হয় বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ভ ও সূত্রাত্মা। এই প্রসঙ্গের অবতারণায় ডাঃ বাগ্‌চি একটু অনবধান প্রদর্শন করিয়াছেন— তিনি বলিয়াছেন বিশ্ব-সাক্ষ্য = The witness of the world, তৈজস-সাক্ষ্য = The witness of the functions এবং প্রজ্ঞা-সাক্ষী = The witness of the consciousness.

এই সকল ক্ষুদ্র ত্রুটী বিচ্যুতি আমরা আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে বিদূরিত হইবে। মোটের উপর ডাক্তার বাগ্‌চির এই ভূমিকায় অনেক জ্ঞাতব্য এবং শিক্ষণীয় বিষয় আছে এবং ইহা সুধী সমাজে সমাদৃত হইবার যোগ্য।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

The Chinese Renaissance—By Hu Shih. (The University of Chicago Press).

সান্ ইয়াৎ সেনের পরই চীন দেশের নেতাদের মধ্যে হু শি-র নাম ও খ্যাতির। বর্ত্তমান কালের চৈনিক নবজীবনের মূলে রয়েছে তাঁরই প্রতিভা। দর্শন, সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বে তাঁর দানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চীন যুবকের আধুনিক মনোভাবের জন্য যদি কোন একটি ব্যক্তিকে দায়ী করা সম্ভব হয়, তবে তাঁকেই করতে হবে। দর্শনে তিনি Deweyর শিষ্য, সাহিত্যে তিনি মুক্তিবাদী ও রিয়্যালিষ্ট, ভাষায় তিনি ডিমক্র্যাট। সর্ব্বসাধারণের কথিত ভাষায় (pei-hua) তিনি নানান রকমের পুস্তক-প্রবন্ধ লিখে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যকার ব্যবধান ঘুচিয়েছেন। শিক্ষাতত্ত্বে, সমাজ-সংস্কারেও

তিনি অগ্রণী। নিজে খ্রীষ্টান, আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত হয়েও স্বদেশের কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাবান। বিদেশীরা হুশিকে পূর্ব্ব-পশ্চিমের সমন্বয়ের প্রতীক হিসেবেই দেখেন। এমন লোকের বক্তৃতাগুলি যে উচ্চশ্রেণীর হবে তাতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে!

তাঁর ভাষায় তাঁর মূল বক্তব্য উদ্ধৃত করছি:

If I have any thesis to present, I want my readers to understand that cultural changes of tremendous significance have taken place and are taking place in China, in spite of the absence of effective leadership and centralised control by a ruling class, and in spite of the deplorable necessity of much undermining and erosion before anything could be changed. What pessimistic observers have lamented as the collapse of Chinese Civilisation, is exactly the necessary undermining and erosion without which there could not have been the rejuvenation of an old civilisation. Slowly, quietly, but unmistakably, the Chinese Renaissance is becoming a reality. The product of this rebirth looks suspiciously occidental. But, scratch its surface and you will find that the stuff of which it is made is essentially the Chinese bedrock which much weathering and corrosion have only made stand out more clearly—the humanistic and rationalistic China resurrected by the touch of the scientific and democratic civilisation of the new world."

উদ্ধৃতাংশে হু শি-র বিনয় এবং উন্নতিবাদ বড়ই উপাদেয়।

বইখানি উৎকৃষ্ট। কিন্তু আমার খারাপ লেগেছে। পড়তে পড়তে আমার মন সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠেছিল। মনকে সজাগ করবার ক্ষমতাটাই লেখকের গুণ। কিন্তু বিমর্ষ হয়ে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়াটা কি পাঠকেরই দোষ?

হু শি-র বক্তব্যে আমার ভীষণ আপত্তি আছে।

(১) নবজীবনের সঙ্গে economic ঘটনার কোন যোগসূত্র আছে কি থাকতে পারে বইটা পড়ে কোন সন্দেহ পর্য্যন্ত হয় না। অথচ চীনের এই জাগরণ যে আর্থিক শোষণ ও দৈন্যের জন্যই হয়েছে সকলেই জানেন। এই বিষয়ে Tang Leang-Li র বিশ্লেষণ হু শি-র অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ও বিশ্বাসযোগ্য।

(২) যদিও হু শি বলেছেন যে চৈনিক নবজাগরণ চৈনিক কৃষ্টির 'প্রস্তর-শয্যার' ওপরই সংঘটিত হয়েছে তবু হু শি-র ব্যাখ্যা পড়ে ও মনোভাব দেখে মনে হয় যে তাঁর ধারণা যে সে জাগরণ কেবল পশ্চিমী সভ্যতারই উত্তেজনায়। সামাজিক বিবর্ত্তনের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ঘাটিত হলে এমন কৃতজ্ঞতা ও অতিভক্তির প্রয়োজন থাকত না। পশ্চিমী সভ্যতার দিগ্‌বিজয় সম্বন্ধে হু শি একেবারে নিঃসন্দেহ—যেন সেটা প্রকৃতির নিয়ম।

(৩) আধুনিকতাতেও হু শি-র বিশ্বাস নিতান্ত প্রগাঢ়। বইখানির কোন ছত্রে valuationএর চিহ্ন নেই। আধুনিকতা বলতে তিনি বিজ্ঞান ও সাধারণতন্ত্রই বোঝেন। তাঁর মতে পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক মনোভাব চীনাদের পক্ষে গ্রহণ করা নিতান্তই সহজ—কারণ চীনারা বরাবরই rationalistic, এবং গত তিন শত বৎসরের critical scholarship-এর চর্চায় নিতান্তই মানবিক এবং ইহজাগতিক হয়ে

উঠেছে। সাধারণতন্ত্রেও হু শি-র বিশ্বাস ঐ ধরণেরই। সামুরাই ছিল বলে পশ্চিমী সভ্যতার সারাংশ গ্রহণ করতে জাপান যেমন তৎপরতা দেখিয়েছে তেমনি তৎপরতা অভিজাত-সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের অভাবে চায়না দেখাতে পারেনি বলে হু শি-র মনে আফ্‌শোষ আছে। কিন্তু আফ্‌শোষ পুষে বসে থাকবার লোক তিনি নন, তাই popular speechএর সাহায্যে জনগণকে জাগাচ্ছেন।

আমাদের দেশেও প্রায় সমগ্র নব-পরিশীলনের একটি উৎস এখনও বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথ Gilbrt Murrayর পত্রের উত্তরে একটি খোলা চিঠি লিখেছেন। পশ্চিমী সভ্যতার দান, বিজ্ঞানের দোষ-গুণ, পূব-দেশের বিশেষতঃ ভারতের ঐতিহ্য এবং নতুন-সংস্কার গ্রহণ করবার শক্তি ও তার সীমা, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের আদান প্রদান—এই সব বিষয়ে আলোচনা তিনিও করেছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ প্রফেসর নন, এবং তিনি চিঠিই লিখেছেন, পাঠ্যপুস্তক লেখেন নি। সেইজন্য তাঁর চিঠিতে systemএর অভাব আছে। কিন্তু পড়ে যেন সন্দেহ হল, পত্রলেখকই ঠিক বলেছেন, যেন তাঁর বোঝবার ক্ষমতা আরো বেশী, পূর্ব্ব-পশ্চিমের সম্বন্ধ তিনিই ধরেছেন, বিজ্ঞানের সীমা তিনিই নির্দ্ধারণ করেছেন, যেন তিনিই a better humanist। (Open Letters—East and West. International Institute of Intellectual Co-operation Paris 1935).

(৪) বইখানিতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিদ্বেষ রয়েছে। ৮৫ পৃষ্ঠায় পাঁচ দফা আপত্তি রুজু হয়েছে। পর পর লিখছি—

Celibacy, mendicancy, ascetism and self sacrifice and suicide, abstruse mythology and metaphysics, hair-splitting differentiations, most selfish and anti-social scheme of salvation, and for what end? Forsaking of the family and desertion of all one's duties to the state—

এ-সবই চৈনিক মনোভাব ও মানবধর্ম্মের প্রতিকূল। কি করে চীন-সভ্যতা এই বিষ উদ্গীরণ করল তার বর্ণনাও আছে। প্রধান উপায় হল সনাতন—কণ্টকেনৈব কণ্টকম্।

"The native religion of Taoism, which rose in the centuries after the gradual invasion of Budhism, was a revival of the old Sinitic religion of the people under the influence of the impact of Budhist ideas and practices. First unconsciously, and then fully consciously, Taoism undertook to kill its foreign rival by imitating every feature of it."

অর্থাৎ দেশী অবতার তৈরী হল—লাওৎসে—তারপর এয়ী, ধর্ম্মসূত্র, স্বর্গ-নরক কিছুই বাদ গেল না—তবে সবই স্বদেশী—Buy Chinese। অবশ্য তাও-এর সঙ্গে অত্যাচার এবং অত্যাচারের সঙ্গে Zen-ধর্ম্মও মিশেছিল;—মেস্‌মেরিজমের সঙ্গে আর্সেনিকের মতন। Zen-ধর্ম্মও নাকি খাঁটি দেশী, অর্থাৎ অ-ভারতীয়? চীনের দার্শনিক ইতিহাসে কিন্তু উল্‌টো কথাই পড়েছি। Arthur Waleyর "The Way and its Power" একটি উৎকৃষ্ট ও প্রামাণিক গ্রন্থ। তাও-ধর্ম্মের অন্য ব্যাখ্যা এতে রয়েছে। Waley সাহেবের মতে তাও-ধর্ম্মে বিদেশী বিশেষতঃ ইরাণী, গ্রীক ও

ভারতীয় প্রভাব আছে। তৃতীয় শতাব্দীর ধর্ম্মগ্রন্থে ভারতবর্ষের ভৌগলিক ও পৌরাণিক উল্লেখ রয়েছে। তাঁর সিদ্ধান্ত হল এই :

I see no reason then to doubt that the Chinese technique of self-hypnosis may have been supplemented in the third century, particularly towards its close by hints from abroad. But we are not at present in a position to prove that this was so." (পৃঃ ১১৫)

Holy mountain-men' ঋষি এবং যোগাসন ব্যতীত অন্য কোন ভারতীয় পদ্ধতির সাথে যোগের চিহ্ন Waley লক্ষ্য ও নির্দ্দেশ করেন নি। তাও-ধর্ম্মের এই সামাজিক-ব্যাখ্যা বড়ই নতুন।

অবশ্য হু-শিও একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। কে ঠিক কথা বলেছেন জানি না। আমার ভারতীয় অভিমান হয়ত আছে—কিন্তু সেটা হু শি-রই ভারতবর্ষের হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি আক্রোশ-প্রসূত। পশ্চিমী-সভ্যতার প্রতি অমন শিশুসুলভ বিশ্বাস না থাকলে ঐ প্রকারের যুক্তি লেখা যায় না। তবে হু শি আমেরিক্যান শ্রোতার কাছেই বলেছিলেন—এই যা কথা!

পুনরায় লিখছি—বইখানি খুবই ভাল—কিন্তু আমার মোটের উপর ভাল লাগল না। যে-টুকু ভাল লেগেছে সেটুকু হল তাঁর সমাজ-তত্ত্ব সাধনা ও শিক্ষা, যদিও সেটি আমেরিক্যান পণ্ডিতের সমাজতত্ত্ব—অর্থাৎ classificatory, synthetic নয়। হু শি-র বিনয় চৈনিক-বৈদগ্ধ্যেরই উপযুক্ত। তাঁর মতন কৃতী ও যোগ্য ব্যক্তির বর্ণনায় নিজের নামের উল্লেখ পর্য্যন্ত নেই দেখে খুশী না হয়ে থাকা যায় না।

পরিচয়ের পাঠকবর্গকে তৃতীয় অধ্যায়টি পড়িতে অনুরোধ করছি। তাতে সাহিত্যিক-বিপ্লবের একটি চমৎকার বর্ণনা আছে। সেই সঙ্গে Scrutinyতে Richardsএর ঐ বিষয়ের প্রবন্ধটি যদি মনোযোগ সহকারে তাঁরা পড়েন তা হলে অন্যান্য উপকারের মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর বিচিত্র দান সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার উপকারটিও সংসাধিত হবে।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

The Rock– By T. S. Eliot (Faber and Faber).

Murder in the Cathedral—By T. S. Eliot (Faber and Faber).

এ যুগ যে বিশেষজ্ঞের যুগ, সে কথা আজ সবাই জানে। চিকিৎসার প্রয়োজনে তাই আজ আমরা ভৈষজতত্ত্বজ্ঞ হাতুড়ের কাছে যাই না অথবা আই, এস্, সি পড়ে, সত্যেন বোসের পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক বই পড়বার ধৃষ্টতাও রাখিনা। এ যুগধর্ম্ম আমরা আজ প্রায় সব কাজেই পালন করি—এক সাহিত্য ছাড়া। সাহিত্য বিষয়ে অনেকেরই ধারণা যে জনগণমনই সাহিত্যিকের সাধনা—লক্ষ্য। এ ধারণা পোষণে অবশ্য অনেক লেখকও সহায়তা করেন। ফলে দৈনিক সংবাদপত্রের পাঠক হয়ে ওঠে কবিতার দুর্ব্বিনীত পাঠক। মুদ্রাযন্ত্রের মাহাত্ম্যে দৈনিক পত্রের অর্ব্বাচীন

অপব্যবহারের জয়জয়কার যেখানে সে ক্ষেত্রে যদি কবিকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হয় তাতে আশ্চর্য্য কি? তাছাড়া উঁচ্‌কপাল না হয়ে কাব্যের যথাযথ আবেদন পাঠকমনে পাঠানো আজ সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক শিক্ষা-প্রসারে নাট্যশালা ও সিনেমার অজ্ঞরুচি সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক তথা বিজ্ঞাপনদাতাদের হাতে ভাষার অপব্যবহার প্রভৃতি কারণে ভাষা হয়েছে বাজারের ঘষা পয়সা। কথাগুলো যেন শেওলাধরা, ধরলে পিছ্‌লে পড়ে যায়। কাব্যের আবেদনে তাই আজ কবিকে ও পাঠককে ভাবিত করার প্রয়োজন। এলিয়টের মতো সত্য কবিকে তাই বিশেষজ্ঞ কবি হতে হয়েছে।

তাই এলিয়টের কবিতা সম্বন্ধে সাধারণের মতামত হাস্যগ্রাহ্যমাত্র। তাঁর ভাষা-সংক্ষেপ, স্থান-সঙ্কোচ, উদ্দেশ, ইঙ্গিত অনেকের বিভীষিকা হলেও তার সার্থকতা অবিসম্বাদী। কিন্তু বিদগ্ধজনের সংখ্যা ভারতবর্ষের বাইরেও খুব বেশী নয়, এবং এলিয়টের সাধারণগম্য হওয়ার বাসনা তাঁর নিজেরই স্বীকৃত। এলিজাবিথান্‌ নাটকের এই দুমুখী আবেদন বরাবর এলিয়টকে লুব্ধ করেছে। অতি সুকুমার বিদগ্ধ পাঠকের কাছেও যাঁর আবশ্যিক আবেদন সেই নাট্যকার সাধারণ নাট্যামদীব সময় হরণেও পটু। নাটকীয় রূপ তাই এলিয়টের কলমকে বহুকাল ধরে টান্‌ছে। তাঁর উচ্চাশা নাটকের উভবল রূপের একাধারে আপাতবোধ্যতা এবং সূক্ষ্ম সৌকুমার্য্যের সামঞ্জস্য করা।

তাঁর সে উচ্চাশা কতটা পূর্ণ হলো, তা এখানে বসে' সঠিক বোঝা শক্ত। কারণ নাটকের সাফল্য অনেকটা ও অনেক সময়ে রঙ্গমঞ্চে মূর্ত্তিলাভের অপেক্ষা রাখে, বিশেষ করে' যদি কোনো নাঠক পরিদৃশ্যই হয় তাহলে'। এবং The Rock অন্তত সেই শ্রেণীর নাটক।

এলিয়টের পক্ষে এই সাফাই বোধ হয় এবার দরকার। পরিচিত এই কবির লেখা এবারে পড়তে গিয়ে শেষে বল্‌তে হয়—নাটক দুটি ফরমায়েসী লেখা। আর বাস্তবিকই তাই। প্রথমটিতো গির্জ্জাসাহায্য কল্পে লেখা, দ্বিতীয়টিও ক্যাণ্ট্যর্‌বেরি উৎসবের জন্য লেখা। শুধু তাই নয়, The Rockএর লেখা আগাগোড়া অন্যদের দ্বারা সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত।

এই সব আপাতজ্ঞাতব্য কথাই মনে হচ্ছে, তার দ্বারাই বোঝা যাচ্ছে যে বই দুটি যাকে বলে উত্‌রায়নি। এলিয়ট আজ পর্য্যন্ত যা লিখেছেন তা সব সময়েই মহাকাব্য না হোক্‌, সুপাঠ্য কবিতা হয়েছে, কিন্তু তাঁর ধর্ম্মমত এইবার তাঁর সাহিত্যিক বিচ্যুতির কারণ হলো। গদ্য সমালোচনায় তাঁর ধর্ম্মমত কিছুকাল ধরে' অনেকের পক্ষে অসহ্য রকম স্পষ্ট হচ্ছিলো, এবারে সে স্পষ্টতা তাঁর সাহিত্যিক শক্তিকে দূষিত করলো।

আর নাটকদুটির ব্যর্থতার কারণ শুধু ধর্ম্মমতই নয়। গ্রীক নাটকের কোরাস্‌ এবং টিউডর্‌ ময়্যালিটি ও ক্রনিক্‌ল্‌প্লের প্রতি অত্যধিক প্রীতিও এলিয়টের ব্যর্থতার গৌণ কারণ। গৌণ কারণই বটে—তাই সোফোক্লিসের কোরাসের বদলে দেখি রকের কোরাস্‌ হলো গির্জ্জার কণ্ঠস্বর, যে কণ্ঠস্বর আমাদেরকে প্রস্তুত করবে রকের আগমনের মাহাত্ম্য বুঝতে। কিন্তু সে মাহাত্ম্য বোঝা শক্ত। মনে যখন অনুষঙ্গ নষ্ট

হয়ে' গেছে তখন শুধু আলঙ্কারিক আর্ত্তনাদ কি করে' ধাপে ধাপে মাহাত্মাপথে নিয়ে যাবে? তাই, উদাহরণত, প্রথম কোরাসে পাঠকের হৃদয় রকের কিম্ভূত কিমাকার পদধ্বনি শুন্‌তে চঞ্চল হয় না—চঞ্চল হয় হয়তো দু' একটি পূর্ব্বপ্রত্যাশিত লাইনে—

Perpetual revolution of configured stars,
Perpetual recurrence of determined seasons—
অথবা　I journeyed to London, to the timekept city,
Where the River flows, with foreign flotation.

কিন্তু এলিয়টের কাব্যের এ বিস্ময়করতা আর এবার শেষ পর্য্যন্ত অভিভূত করে না। আলোর অনুষঙ্গ এলিয়টের একটা মুখ্য জাদুকাঠি। সেই আলোও এবারে প্রচারকের কাব্যেতর হাতে হয়ে' উঠেছে ব্যর্থ, মাটীর স্তূপ রকের আড়ালে মোহন্ত মহারাজের পটভূমি মাত্র। পুরোনো যেসব আলঙ্কারিক কৌশল আগে এই ভাবুক মনস্বীর লেখাকে মনস্পর্শী করে' তুল্‌তো, এবারে সে সব অলঙ্কার প্রয়োগও প্রচারকার্য্যে ব্যর্থ। পুনরাবৃত্তি এলিয়টের হাতে অসামান্য সার্থকতা পেতো, এবারে সে পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও টমাস্ বেকেটের মাহাত্ম্য বোঝা শক্ত। উদাহরণ স্বরূপ শুধু Rockএর শেষ কয়েক লাইনই ধরা যাক্—

And where we dwell, there is no Temple. For the Lord
God the Almighty, and the Lamb,
They are the temple. And the lamp thereof is the Lamb
And there with us is night no more, but only
Light
Light
Light of the Light.

অথবা ধরা যাক এই নূতন রীতির লাইন্ কটি—

Sweet and cloying through the dark air
Falls the stifling scent of despair ;
The forms take shape in the dark air :
Puss-purr of leopard, footfall of padding bear,
Palm-pat of nodding ape, square hyaena waiting
For laughter, laughter, laughter. The Lords
　　　　of Hell are here.

They curl round you, lie at your feet,
　Swing and wing through the dark air.
O Thomas Archbishop, save us, save us, save
　　yourself that we may be saved ;
Destroy yourself and we are destroyed.

তাঁর ভাবুক সমালোচনা দিয়ে এলিয়টের মতামতের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি। গির্জ্জা বা ধর্ম্ম যে আমাদের জীবনের লক্ষ্যহীন বিচ্ছিন্নতাকে গ্রন্থিবদ্ধ না করলে আমাদের শান্তি নেই, সে কথার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করি। বোঝা শক্ত

এলিয়টের তীক্ষ্ণদৃষ্টির ভ্রান্তিবিলাস। গ্রীক্ কোরাস্, এলিজাবিথান্ আদিম নাটক, নিজের অসামান্য গদ্য ও পদ্য লিখনের ক্ষমতা থাকলেও পুণ্য ধর্ম্মপ্রচার নাটক লেখা শক্ত, সেটা যে তিনিও বোঝেন না, সে কি তাঁর ধর্ম্মোৎসাহে এ নাটক দুটির ফরমায়েস গ্রহণ করাতেই প্রমাণ নয়? তাঁর এই লিখতে আর ফরমায়েসের বন্ধনে এবং ইতিহাসের বাঁধা পথে চলতে যাওয়া কি তাঁর ব্যক্তিগত ধর্ম্ম সাধনারই অঙ্গ?

এলিয়টের কাব্যপ্রতিভার লক্ষণ অবশ্য এ দুটি বইয়ে প্রচুর। কোরাস্গুলি তাঁর শিল্পকৌশল ও গভীরতার পরিচয়। ছন্দোময় পদ্যরীতির আশ্চর্য্যরূপও এবার নানাভাবে এলিয়টে পেলুম। এবং মধ্যে মধ্যে পেলুম সেনেকার বাক্-চাতুর্য্য ও এলিজাবিথান্ অমিত্রাক্ষরের ওজস্বী শক্তি। কিন্তু যিনি ইংরেজি Anabasis লেখেন, যাঁর লেখা Gerontion, Waste Land, Ash-Wednesday প্রভৃতির মতো কাব্য, তাঁর পক্ষে এ সব নৈপুণ্য তো স্বাভাবিক মাত্র। আশ্চর্য্য করে বরং তাঁর চরিত্রগুলির অস্পষ্টতা—বিশেষ করে' Murder in the Cathedral-এ এবং তাঁর ঘটনা-সংঘাতে মনকে নাড়া দেওয়ার অভাব। আর ক্ষুব্ধ করে তাঁর উৎসাহাধিক্য। হয়তো সেনেকার আবৃত্তি ও নাট্যের প্রথা'র সমর্থনে তাঁর হলো এবার মাত্রাজ্ঞানের অভাব। অতি দীর্ঘ স্যার্মন্টি না হলে' কি করে' বইয়ের পাতা ভরে আর কি করেই বা নাহলে' নাইটদের বক্তৃতার প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ অতিকথনে নষ্ট হয়? আর বিষয় যে আমাদের বিরূপ করেছে তাও নয় কারণ অনুরূপ বিষয়ের নাটক আমাদের ভালো লাগে। ইয়েট্সের The Resurrection বা Calvary আমাদের মুগ্ধই করে। এবং New Tstament তো আমাদের কাছে মহাকাব্য।

তাই মনে হয় নাটকে এলিয়টের যা কর্ত্তব্য ছিলো এবং করবার ইচ্ছা ছিলো তা পাওয়া এখনো ভবিষ্যতের হাতে। আর তাই Sweeney Agonistes-কেই শুধু সেই ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাস বলে' ভাবতে হয়।

বিষ্ণু দে

পুরাণ-প্রবেশ—শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু প্রণীত (এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক কলিকাতা হইতে প্রকাশিত)।

বাঙ্গালাদেশে বেদ অপেক্ষা পুরাণের চর্চ্চা অধিক হইয়াছিল। বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আঠারখানি পুরাণের অনেক পুঁথি সংগৃহিত হইয়াছে। নবদ্বীপ পাব্লিক লাইব্রেরীতে ও গোস্বামীদের বাড়ীতে বৈষ্ণব পুরাণগুলির অনেক পুঁথি দেখিয়াছি। শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশের বোধ হয় কূর্ম্ম পুরাণের প্রচলন ছিল না। "রাবণ মায়াসীতা হরণ করিয়াছিলেন" এই কথা বলিয়া শ্রীচৈতন্য এক রামভক্ত ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। পরে রামেশ্বর তীর্থে আসিয়া তিনি

> বিপ্রসভায় শুনে তাঁহা কূর্ম্ম পুরাণ।
> তার মধ্যে আইল পতিব্রতা উপাখ্যান॥

মায়াসীতা নিল রাবণ—শুনিল ব্যাখ্যানে।
শুনি মহাপ্রভু হৈলা আনন্দিত মনে॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, ২।৯ ১৮৫-১৮৬।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালাদেশে ভাগবতের আলোচনা চলিতেছে। তাই শ্রীচৈতন্যের জন্মের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কুলীন গ্রামবাসী মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ সমাপ্ত করেন দেখিতে পাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণখানি হয়তো বাঙ্গালাদেশেই রচিত হইয়াছিল। কেননা ঐ পুরাণে দেখা যায় যে মেয়েরা শাঁখা পরিতেছে বিবাহের রাত্রে 'বাসর শয্যা' হইতেছে। মনসাকে জগদ্গৌরী বলা হইয়াছে। হুগলী জেলার নারিকেলডাঙ্গা গ্রামে ঐ নামে মনসার এক মন্দির আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্র, মগধ ও সুবঙ্গের (শ্রীহট্ট) কথা যত আছে অন্যদেশের কথা তত নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে রাধার মহিমা ঘোষণা করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই পুরাণের প্রভাবেই জয়দেব ও বড়ু চণ্ডীদাস যথাক্রমে সংস্কৃতে ও বাঙ্গালায় লীলাগান রচনা করিয়াছেন।

বাঙ্গালাদেশে অনেককাল ধরিয়া পুরাণের পঠন-পাঠন হইলেও, পুরাণগুলির তুলনামূলক ঐতিহাসিক বিচার অতি অল্পই হইয়াছে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাঙ্গালীদের মধ্যে এ বিষয়ে প্রথম পথপ্রদর্শক। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "বিশ্বকোষে" পুরাণগুলির বিবরণ দিয়াছেন ও বিচার করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বৃদ্ধবয়সে পুরাণের আলোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে আমরা বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর পুরাণের ক্যাটালগ নামক মূল্যবান পুরাণ আলোচনার গ্রন্থ ও বিহার উড়িষ্যা রিসার্চ্চ সোসাইটীর জর্ণ্যালের ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত একটী প্রবন্ধ পাইয়াছি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর সুবিমল সরকার পুরাণ হইতে ভারতীয় আর্য্যগণের প্রাচীনতম সামাজিক অবস্থা বিষয়ে গবেষণা করিয়াছিলেন। অবাঙ্গালীদের মধ্যে উইলসন্ সাহেব সর্ব্বপ্রথমে পুরাণের বিচারাত্মক আলোচনা করেন। আধুনিক কালে পার্জ্জিটার সাহেব পুরাণ হইতে ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া দুইখানি বই লিখিয়াছেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে Wilhbald Kirfel নামক জার্ম্মান গবেষক Das Purana Pancalaksana নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

পুরাণের আধুনিক বা প্রাচীন গবেষকদের মধ্যে কেহই পুরাণে বিবৃত রাজাদের কালনির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন নাই। পার্জ্জিটার সাহেব ঐ সব রাজাদের বিবরণকে tradition বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় আলোচ্য গ্রন্থে রাজাদের কালনির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি পুরাণের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতেই যুগ ও মন্বন্তরের কালবাচক বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক মাপকাঠি বাহির করিয়াছেন। তাঁহার এই আবিষ্কার মিশরের প্রাচীন চিত্রলিপির পাঠোদ্ধারের ন্যায় বিস্ময়কর ও মানবীয় সভ্যতার ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাসে যুগান্তরকারী। এতকাল পুরাণের কোন ঐতিহাসিক আলোচনা সম্ভবপর হয় নাই —কেননা কোন্ ঘটনা কোন্ রাজার সময়ে ঘটিয়াছিল, জানা গেলেও, সেই রাজা

কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন, জানিবার উপায় ছিল না। বিভিন্ন বংশের রাজা ও ঋষিদের পর্য্যায়ও সুষ্ঠুভাবে নির্ণীত না হওয়ায় কে কাহার সমকালীন তাহা জানা যাইত না। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় কাল ও পর্য্যায় নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি রাজাদের কালনির্ণয় করিয়া পুরাণের আলোচনার ও নূতন গবেষণার পথ করিয়া দিয়াছেন।

বসু মহাশয় যে সমস্ত যুক্তি-বলে কালের পারম্পর্য্য আবিষ্কার ও নির্দ্ধারণ করিয়াছেন সেগুলি সংক্ষেপে বলিবার উপায় নাই। যাঁহারা এ বিষয়ে কৌতুহল বোধ করিবেন তাঁহাদিগকে মূলগ্রন্থ পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। কাল-নির্ণয় করিয়া তিনি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। চৌদ্দটী মন্বন্তরের সময় তাঁহার মতে এইরূপ—

(১) স্বায়ম্ভুব ৫৯৫৮—৫৫৯৯ খৃঃ পূঃ, (২) স্বারোচিষ ৫৫৯৯—৫২৪২ খৃঃ পূঃ, (৩) ঔত্তমি ৫২৪২—৪৮৮৫ খৃঃ পূঃ, (৪) তামস ৪৮৮৫—৪৫২৮ খৃঃ পূঃ, (৫) রৈবত ৪৫২৮—৪১৭১ খৃঃ পূঃ (৬) চাক্ষুষ ৪১৭১—৩৮১৪ খৃঃ পূঃ (৭) বৈবস্বত ৩৮১৪—৩৪৫৭ খৃঃ পূঃ (৮) সাবর্ণি ৩৪৫৭—৩১০০ খৃঃ পূঃ (৯) দক্ষ ৩১০০—২৭৪৩ খৃঃ পূঃ (১০) ব্রহ্ম ২৭৪৩—২৭৪৩—২৩৮৩ খৃঃ পূঃ (১১) ধর্ম্ম ২৩৮৩—২০২৯ খৃঃ পূঃ (১২) রুদ্র ২০২৯—১৬৭২ খৃঃ পূঃ (১৩) দেবসাবর্ণি বা রৌচ্য ১৬৭২—১৩১৫ খৃঃ পূঃ (১৪) ভৌত্য ১৩১৫—৯৫৮ খৃঃ পূঃ। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে বৈবস্বত মন্বন্তরের পর ঐ প্রকার কালগণনা-রীতি পরিত্যক্ত হইয়াছিল। স্বায়ম্ভুব মনু বংশ বা প্রিয়ব্রত বংশের পর্য্যায়কাল তিনি গড়ে ২৪০২ বৎসর ধরিয়া লইয়াছেন ও ঐ বংশের প্রথমপুরুষ স্বায়ম্ভুব মনুর সময় ৫৯৫৮ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ধরিয়া ৪৯ অধস্তন পুরুষ প্রচেতাগণের কাল ৪৭৯৬ খৃঃ পূঃ ঠিক্ করিয়াছেন। বৈবস্বত মনুর সময় ৩৮১৪ খৃঃ পূঃ, তৎপরে ইক্ষ্বাকু বংশ।

বসু মহাশয় চিকিৎসাশাস্ত্র ও মনস্তত্ত্বের বিশেষজ্ঞ হইয়াও ঐতিহাসিক বিচারে যেরূপ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর। এই গ্রন্থখানি রচনা করিবার জন্য তাঁহাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া একাগ্রচিত্তে পুরাণ পড়িতে হইয়াছে। তাঁহার কোন সিদ্ধান্ত দু'এক কথায় উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না। তবে তাঁহার নিকট হইতে আলোক পাইবার আশায় দু'একটী সংশয় প্রকাশ করিতেছি।

বসু মহাশয় ৪৮ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন, "বৈবস্বতমনুর পর হইতেই মনুগণনা রহিত হইয়াছে"। অথচ সমস্ত পুরাণ একবাক্যে বলিতেছে যে এখন বৈবস্বত মন্বন্তরই চলিতেছে। অধিকাংশ পুরাণেই লিখিত আছে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে নৈমিষারণ্যে বসিয়া ঋষিগণ পুরাণ শ্রবণ করিয়াছিলেন। বসু মহাশয়ের মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ১৪৫৮ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ঘটিয়াছিল। ঐ সময় তো দেবসাবর্ণি বা রৌচ্য মন্বন্তরে পড়ে।

আলোচ্য গ্রন্থে একটি কল্পেরই হিসাবনিকাশ দেওয়া হইয়াছে মনে হইল। অথচ মৎস্যপুরাণের ৫৩ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে কল্প ত্রিশটী, এবং বিভিন্ন কল্পের ঘটনা লইয়া বিভিন্ন পুরাণ রচিত হইয়াছে। কল্প শব্দ ঠিক্ কি ভাবে পুরাণকারেরা ব্যবহার করিয়াছেন তাহার সমাধান হওয়া উচিত।

বসু মহাশয় মন্বন্তরকে কাল্পনিক কাল বলিয়াছেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে আছে প্রতি মন্বন্তরে প্রলয় হয়; কিন্তু শ্রীধরস্বামী মন্বন্তরে প্রলয় স্বীকার করেন না। এ বিষয়ে গ্রন্থকারের কি অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করে।

আলোচ্য গ্রন্থের ৫৯ পৃষ্ঠায় আছে "ভার্গব জামদগ্ন্য পরশুরাম ১৯শ যুগে। ইহাকেই বায়ুপুরাণ অবতার বলিয়াছেন।...২১ যুগের পরশুরাম অবতার নহেন।" বসু মহাশয়ের চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরূপ গোস্বামী নামক domiciled Bengalee পুরাণ-সমূহের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া মধ্যযুগের উপযোগী তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ লঘুভাগবতামৃতে বলেন যে পরশুরাম অবতারকে "প্রান্তঃ সপ্তদশে কেচিদ্ দ্বাবিংশোন্যে চতুর্যুগে।" কিন্তু বসু মহাশয়ের নির্ণীত ১৯ বা ২১ যুগের সঙ্গে পূর্ব্ব প্রচলিত ১৭ বা ২২শ যুগের পরশুরামের সমাধান কিরূপে হইবে?

বসু মহাশয় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অনুসারে পুরাণ, মহাপুরাণ ও উপপুরাণের পার্থক্য দেখাইয়াছেন। আবার ১৬৪ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন—"পুরাণ ও উপপুরাণের লক্ষণ একই প্রকারের"। আমরা জানি উপপুরাণ কম প্রামাণ্য। কোন পুরাণের অংশ বিশেষ লইয়া তাহার পরিবর্দ্ধনেই কি উপপুরাণের সৃষ্টি হয় নাই? ভাগবত মহাপুরাণও বটে, বৈয়াসিকী সংহিতাও বটে। আমার মনে হয় অধুনা প্রচলিত আঠারখানি পুরাণের মধ্যে তিনটী বিভাগ করা যায়। (১) পঞ্চলক্ষণ পুরাণ—Wilhbald Kirfel "Das Purana Pancalaksana" গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে সমস্ত মহাপুরাণের ৳৹ অংশ মাত্র পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত। (২) দ্বিতীয় যুগে পঞ্চলক্ষণকে বাড়াইয়া দশলক্ষণ করা হয়—বিশেষতঃ ভাগবতের জন্য। (৩) গরুড়, অগ্নি ও নারদ পুরাণকে বিশ্বকোষ করিবার চেষ্টা হয়। অগ্নি পুরাণে (১।১৪।১৭) পঞ্চ লক্ষণ ব্যতীত শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ছন্দঃ, অভিধান, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র, ন্যায়, বৈদ্যক, গান্ধর্ব্ব, ধনুর্বেদ, অর্থশাস্ত্র ধরা হইয়াছে। বসু মহাশয় পুরাণ ও মহাপুরাণের মধ্যে ভেদ টানিয়াছেন—আমি এই ভেদ স্বীকার করিতে পারিলাম না। তিনি ১৬৪ পৃষ্ঠায় ইংরাজীতে মহাপুরাণের যে লক্ষণ দিয়াছেন উহা অনুসারে ভাগবত মহাপুরাণ হয় না; কেননা ভাগবতে arts and sciences of the people নাই।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের B & O Research Societyর journalএর ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় পুরাণকে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। যথা (১) Encyclopaedia of literature—গরুড়, অগ্নি, নারদ, (২) তীর্থ ও ব্রত—স্কন্দ, পাদ্ম, ভবিষ্য; (৩) with two revisions apparent—ব্রহ্ম, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত; (৪) Historical Brahmanda, Lost Vayu and Visnu; (৫) Sectarian—লিঙ্গ, বামন, মার্কণ্ডেয়; (৬) Old Purana revised out of existence—বরাহ, কূর্ম্ম, মৎস্য। কোন একটি নীতি অবলম্বন করিয়া এই শ্রেণী ভেদ করা হয় নাই বলিয়া ইহা বিজ্ঞানানুমোদিত নহে। লিঙ্গ, বামন ও মার্কণ্ডেয়কে sectarian বলিয়া অন্যগুলিকে রেহাই দেওয়ার কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। With two revisions and many revisions ভাল শ্রেণীভেদ,

কিন্তু অন্য পুরাণগুলি সম্বন্ধে বলা যায় না যে revision হয় নাই। পৌরাণিক সাহিত্যের ক্রম বিকাশের স্তরনির্ণয় হিসাবে নিম্নলিখিতরূপ বিভাগ করা যায় কিনা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। সর্ব্বাগ্রে পুরাণ পঞ্চলক্ষণ বিশিষ্ট ছিল, পরে দ্বিতীয় স্তরে দশলক্ষণ, তৃতীয় স্তরে মহাকোষ ও চতুর্থ স্তরে ব্রত ও তীর্থ। প্রচলিত পুরাণগুলির মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে এই চারি স্তরেরই ছাপ কিছু কিছু পড়িয়াছে। বসু মহাশয় "পুরাণ প্রবেশে" পঞ্চ লক্ষণের দুইটী লক্ষণ—মন্বন্তর ও বংশানুচরিত লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ দুইটীই হইতেছে' পুরাণের চাবিকাঠি। আমার মনে হয় তিনি হারাণো চাবিকাঠি খুঁজিয়া পাইয়াছেন ও পুরাণের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিয়া অনুসন্ধিৎসুগণকে পুরাণে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিয়াছেন।

"পুরাণ প্রবেশ" বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকারের চরিত্রের দৃঢ়তা ও বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি আমাদের সাহিত্যের গৌরব অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। চরিত্রের দৃঢ়তার কথা উল্লেখ করিলাম এইজন্য যে এই জাতীয় গ্রন্থ কেহ লিখিলে তিনি সাধারণতঃ তাহা দুইটী কারণে ইংরাজীতেই প্রকাশ করেন—প্রথম, গবেষণামূলক বাঙ্গালা বই পড়িবার ও কিনিবার লোকের অভাব, দ্বিতীয়, বাঙ্গালা ভাষায় লিখিলে বিশ্বের বিদ্বজ্জন সমাজে নিজের পাণ্ডিত্য প্রচারের দেরী হয়। বসু মহাশয় বাঙ্গালায় এই বই প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। তবে সেই সঙ্গে ইহাও বলা প্রয়োজন যে তাঁহার মূল্যবান আবিষ্কার বিদেশীয় পণ্ডিতগণের নিকট প্রচার করিবার জন্য ও এবিষয়ে আলোচনার সুবিধার জন্য বইয়ের মূল সিদ্ধান্তগুলি যুক্তিবিচারসহ ইংরাজীতে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

যুক্তবেণী—শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত (প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস)।
বাড়ি বদল—শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত।
অন্তরঙ্গ—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত।
মূর্ত্তপ্রশ্ন—শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স.)।
অদৃশ্য সঙ্কেত—শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রণীত (রসচক্র)।

যুক্তবেণী একখানি উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস। গ্রন্থকারের মনোভাব কতকটা এই যে এই প্রকারের সাহিত্য শুদ্ধ রসসৃষ্টিতে পর্য্যবসিত হওয়া উচিত নয়; সাহিত্যের সাহায্যে জাতির গঠন বাঞ্ছনীয়। আমাদের সামাজিক ও ধর্ম্ম জীবনে অনেক গলদ আছে, আর সেই মিথ্যা মোহ ও ভ্রান্তি বশেই নরনারীর মিলন সম্পূর্ণ ও পবিত্র হয় না। মোটের উপর উপন্যাসখানি একটি আদর্শবাদী চিত্র। সাহিত্যের মানদণ্ডে উপন্যাসখানি বিশেষ সার্থক না হলেও তার উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব অস্বীকার করা যায় না। একটি আদর্শ পরিবার কিরূপে স্ত্রী পুরুষের অযথা সন্দেহে, ও মান অভিমানে নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছিল, বইখানিতে তারই কাহিনী আছে। শেষভাগে জননীর পূত চরিত্র, গুরুর প্রভাব ও আশ্রমিক ধর্ম্ম, নষ্টপ্রায় জীবনগুলির

সমন্বয় সাধন করেছে। কিন্তু জ্যোৎস্না ও রঞ্জনের চরিত্র আমাদের কাছে বিশেষ রকম দুর্ব্বল মনে হয়েছে। বোধহয় আধুনিক জীবনের, স্বেচ্ছাকৃত গ্রন্থিগুলি কতদূর জটিল ও অভিমানপ্রসূত তাই দেখাবার জন্য তিনি চরিত্র দুটিকে স্থূল ও হৃদয়াবেগ-সর্ব্বস্ব করেছেন।

বাড়ি বদল একখানি সুখপাঠ্য উপন্যাস। এতদিন বুদ্ধদেববাবু কয়েকটি নিবর্থক আধুনিক সমাজের ছবিই এঁকেছেন, কিন্তু এই মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের খণ্ড ইতিহাসের চিত্র স্বতঃই আমাদের মনে রেখাপাত করেছে। নানা বয়সী নানা রকমের চরিত্র এই পুস্তকের বৈশিষ্ট্য সাধন করেছে। প্রত্যেকটিকে আমাদের জীবন্ত মানুষ বলে ভ্রম হয়। বাড়ি বদল বইটির গল্পাংশ সহজ ও সাবলীল।

বুদ্ধদেববাবু আমাদের দিনানুদৈনিক, জীবনপ্রবাহের কয়েকটি বাস্তবচিত্রের সুন্দর সমাবেশ দেখিয়েছেন। আদর্শবাদিনী বিধবা ভ্রাতৃজায়া সুধাময়ী, অধ্যয়ন-লিপ্সু কিশোর পুত্র অমল, দেবর মনোরঞ্জন, জা মহাকালী, প্রত্যেক চরিত্রটিকে আমাদের পরিচিত মনে হয়। জা মহাকালীর স্বার্থপরতায় নিপীড়িত হয়ে এবং সংসারের কুৎসিত আবহাওয়া থেকে অমলকে রক্ষা করবার জন্য অমলের বন্ধু, অরুণের সাহায্যে অন্যত্র বাড়ি বদলের উদ্যোগ করেন। এইটুকুই আখ্যানবস্তুর মধ্যে মনোরঞ্জনের স্নেহপ্রবণা কিশোরী কন্যা 'ছোকানুর' জ্যাঠাইমার প্রতি অভিমানটি যেন সরল অনুভূতি সম্পন্ন প্রাণের বিকাশ। স্ত্রীর হাতে মনোরঞ্জনের অস্তিত্ব লোপের বিপত্তিও আমাদের কাছে কৌতুকপ্রদ ও হাস্যকর।

অচিন্ত্যকুমারের যে উপন্যাসগুলি আমরা পড়েছি তা থেকে অন্তরঙ্গ স্বতন্ত্র ধরণের। বইখানিতে নূতনত্ব আছে বলেই মোটের উপর আমাদের ভালো লেগেছে। আখ্যানবস্তু অতি অল্প পরিসর। চরিত্রও বেশি নেই। গল্পাংশও জটিল নয়। বনমালীবাবু, কন্যা অনুভার যক্ষারোগ চিকিৎসার জন্য, মৃত পুত্রের বন্ধু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিমাদ্রির হাতে রোগিণীর ভার দেন। অবশেষে হিমাদ্রি অনুভাকে তার পিতার মতকে তুচ্ছ করে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য নিয়ে যায়। এই গল্পের পরিণতি। হিমাদ্রির মনোভাব সরল ও সুন্দর, রোগিণী তার কাছে গবেষণার বিষয়। রোগের কুৎসিত অশুচিতা থেকে মুক্ত করে, নীরোগ জীবনের স্পৃহা উদ্বোধনই করাই হ'ল বৈজ্ঞানিকের আন্তরিক প্রয়াস। বইখানিতে কোথাও ভাববিলাসিতা নেই। যেমন অনেক বইতে এ রকম ক্ষেত্রে এসে পড়ে। যখনই হিমাদ্রি বুঝতে পারলে, যে তার বলিষ্ঠ সঙ্গ ও নির্ভীক আশ্বাসবাণী ভিন্ন রোগিণীর জীবন-স্পৃহা ক্ষীণায়মান হয়ে পড়বে তৎক্ষণাৎ সে আপনার স্বার্থ পসার সব ত্যাগ করে রোগিণীকে অকুণ্ঠ-ভাবে আপনার সাহায্য দান করেছে।

অনুভার বন্ধু বিনীতা বন্ধুর রোগশয্যার পাশে বসে হিমাদ্রিকে আকর্ষণ করবার ইচ্ছায় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল, আবার বাড়িতে ডেকে লঘু হাস্যচ্ছলে ডাক্তারকে স্বাধিকারভ্রষ্ট করতে চেষ্টা করা বড়ই বিসদৃশ লেগেছে। এছাড়া পিতা বনমালীর চরিত্রও সুসঙ্গত মনে হয় না। হিমাদ্রির সঙ্গে তার পূর্ব্বের ও পরবর্ত্তী ব্যবহারের বৈষম্য আছে। কন্যার প্রতি তার আচরণ কোমল ও সস্নেহ নয়; বরং বিপরীত, রূঢ় ও নিষ্ঠুর। হয়ত বা অচিন্ত্যবাবুর মতে বিনীতার চরিত্র নারীজনোচিত হবে;

কিন্তু আমাদের মনে হয় এই খণ্ডচিত্রটি অস্বাভাবিকতা-দোষে দুষ্ট। রোগী ও চিকিৎসকের মধ্যে যে নিঃস্বার্থ অন্তরঙ্গ ভাবটি ফুটে উঠেছে, তাতে বৈজ্ঞানিকের অধুনা-বিরল আদর্শবাদের পরিচয় পাই।

মূর্তপ্রশ্ন একখানি দীর্ঘ উপন্যাস। বইয়ের ঘটনাস্থল প্রথমাংশে নায়ক অমূল্যর পল্লীগ্রাম দিগ্‌গজপুরে, শেষ অংশ আশ্রয়দাতা নরেন্দ্রবাবুর কলিকাতার বাসগৃহে। অমূল্যের পিতা হারাণ চাটুয্যের দাদা তারিণী গ্রামের কূটবুদ্ধি চাণক্যবিশেষ। স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা ও যাবতীয় কুৎসিৎ মনোভাবে এই সমাজের শিরোভূষণটি অগ্রণী। নিরপরাধ ভাইয়ের সংসার নষ্ট করে দিয়েও, তাঁর তৃপ্তি হয়নি। ছোট-ভায়ের অনুগত গ্রামের আর একটি খাঁটিমানুষ শঙ্কর মুখুজ্জের নামে কুৎসিত অপবাদ রটিয়ে তাঁকেও গ্রামছাড়া করবার চেষ্টা করেন। অবশেষে অমূল্য তার ছাত্রের পিতা নরেন্দ্রবাবুর কাছে কলিকাতায় আশ্রয় পেলে। তারপর যা হবার তাই হল, অর্থাৎ নরেন্দ্রবাবুর কন্যা বিদ্যুতের প্রতি তার একটা বিশেষ রকম আকর্ষণ দেখা গেল। এদিকে গ্রামে শঙ্করবাবু কন্যা ইন্দু ও স্ত্রীকে নিয়ে অমানুষিক নির্য্যাতনে পীড়িত হতে লাগলেন। শেষকালে তারিণীর প্ররোচনায় দুর্বৃত্ত দ্বারা ইন্দুর অপহরণ, ইন্দুর উদ্ধার ও প্রাণরক্ষার চেষ্টায় অমূল্যর নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ এবং ইন্দুর অন্তিম শয্যার পার্শ্বে বিদ্যুতের উপর নরেন্দ্রবাবু কর্ত্তৃক অমূল্যর অমূল্য ভারার্পণ, সবচিত্রগুলি দ্রুত নিশেঃষিত হয়েছে। গল্পাংশটি এতই জটিল যে ধৈর্য্য রাখা বিপদ। অত্যন্ত নাটকীয় ভাব বেশি পরিমাণে আছে। পল্লীসমাজের চিত্র অতি পুরাতন। একসঙ্গে, নির্য্যাতন ও আত্মত্যাগ, সবল ও দুর্ব্বলের সমাবেশ। একদিকে সবাই অদ্ভুত রকমের ভাল, অপরদিকে প্রতিপক্ষ শয়তানের সামিল। এক কথায় সস্তার আদর্শবাদ।

সৌভাগ্যক্রমে উপন্যাসের এযুগ কেটে গিয়েছে। স্থানে স্থানে গৃহস্থ চিত্র পল্লীদৃশ্য মন্দ হয়নি কিন্তু গ্রন্থকারের মূর্ত্তপ্রশ্নে কি উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে চেয়েছেন তা আমাদের কাছে মূর্ত্তপ্রশ্নই থেকে গেল। ঘটনা-পরম্পরাও যেমন অসংলগ্ন গ্রন্থকারের চিন্তাধারাও তেমনি অপ্রাসঙ্গিক।

অদৃশ্য সঙ্কেত অতি বৈচিত্র্যহীন প্রেমের উপন্যাস বা বড় গল্প। এই বইটিতে, প্রচলিত নভেলের প্রত্যাশিত ধারারই পরিচয় মেলে। অবশ্য আমাদের এ ধারণা পূর্ব্বোক্ত পুস্তকের দ্বারাই পরিপুষ্ট। গল্পটির সারাংশ এই। শ্রীপতিবাবু তাঁর কন্যা লেখাকে উচ্চশিক্ষিতা করবার অভিলাষে কলেজে পড়তে দেন। সেখানে সহপাঠী রণজিতের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। সেই পরিচয় ক্রমে মায়ের সহায়তায় প্রগাঢ় ভালবাসায় পরিণত হল। এদিকে রক্ষণশীল পিতা কন্যার অসবর্ণ বিবাহে ঘোরতর আপত্তি করেন। অবশেষে তাঁরই ইচ্ছায় আলাপিত বন্ধুপুত্র বিমানের সঙ্গে লেখার বিবাহ সংঘটিত হল। বিবাহের পূর্ব্বে রণজিতের প্রতি লেখার অনুরক্তির কথা বিমান ভাল করেই জানত। তাই লেখাকে করতলগত করে বিমান স্ত্রীর সহিত যে আচরণ সুরু করলে তাকে পাশবিক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। লেখা তার অধিকারগত হলে তার স্বভাবসিদ্ধ চরিত্রের অধঃপতন নূতন করে আরম্ভ হলো। বাপ মায়ের সঙ্গে মেয়ের ও স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর ইচ্ছাশক্তির দ্বন্দ্বটাই আখ্যান ভাগের

ভিত্তি। এই যে পারস্পরিক বিরোধ ও ব্যক্তিগত আচরণের ওপর তারই প্রতিক্রিয়া এগুলিকে আরও শোভন করে অঙ্কিত করা যেত; কিন্তু গ্রন্থকার যে ভাবে চিত্রিত করেছেন, তা সম্পূর্ণ নাটকীয়। বইখানি পড়ে মনে হল কয়েকটি আদিম প্রবৃত্তির এরূপ অশোভন প্রকাশ রুচিসঙ্গত নয়; তবে বইখানির ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী এই ত্রুটীপূরণের সহায়ক।

শ্রীছায়া দেবী

Patterns of Culture—by Ruth Benedict (Routledge).

নৃতত্ত্বে সংস্কৃতির একটি বিশেষ স্থান আছে। নৃতত্ত্ববিদগণের নিকট সভ্য জাতির সংস্কৃতি যেমন দামী, আদিম জাতির সভ্যতাও তেমনি দরকারী। এই বিভিন্ন সংস্কৃতির জ্ঞানের দ্বারা তাঁরা এদের পরস্পরের মধ্যে সংযোগ ঠিক করেন এবং একটির সংস্পর্শে অপরটি কতটা লাভবান হয়েছে তাও দেখাতে সমর্থ হন। সময় সময় এরূপ দেখা গিয়েছে যে একটি জাতি তাদের সংস্কৃতির আমূল পরিবর্ত্তন করে অন্য জাতির সভ্যতা গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছে কিন্তু এই চেষ্টা প্রায়ই সফল হ'তে পারে নি। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য মানুষের সমাজের মেরুদণ্ড এবং এর আমূল পরিবর্ত্তন সমাজে বিশৃঙ্খলতা আনে কারণ এক জাতির সভ্যতা বা সংস্কৃতি অপর একটি জাতির উপর সমভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না এবং এই স্বধর্ম্মচ্যুতির ফলে জাতি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। মাঝে মাঝে এও দেখা যায় বটে যে এক সংস্কৃতির মানুষ অপর একটি সংস্কৃতির পরিবেষ্টনের মধ্যে বেশ খাপ খেয়ে গিয়েছে কিন্তু তার কারণ সে বাল্যাবধি একটি ভিন্ন সংস্কৃতির রীতি নীতি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সেই সংস্কৃতিই আয়ত্ত করেছে এবং তার নিকটও নিজের সংস্কৃতির রীতি নীতি ও প্রচলিত পদ্ধতিগুলি অদ্ভুত লাগে। যা হোক কোন একটি বিশেষ মানুষ ভিন্ন সংস্কৃতি আয়ত্ত করতে পারে বলেই যে একটি জনসঙ্ঘ অপর জাতির সংস্কৃতি আয়ত্ত করতে পারবে এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

প্রত্যেক সংস্কৃতির মধ্যে একটি বিশেষত্ব আছে। এবং এই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা মানবজাতিকে ভাগ করা যায়। সাধারণতঃ মানুষের জাতিবিভাগ বাহ্যাকৃতির দ্বারা করা হয় কিন্তু সংস্কৃতির দ্বারা মানবজাতিকে যেরূপ নিখুঁতভাবে ভাগ করা যায় তা অনেক সময় বাহ্যাকৃতির দ্বারা সম্ভবপর হয় না; উদাহরণ স্বরূপ ইউরোপীয় জাতিগুলিকে ধরতে পারি। যদিও এদের শারীরিক গঠনের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে তবু এদের জাতিগত সংস্কৃতি একেবারেই বিভিন্ন। একই সমাজের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ বন্ধন থাকে তা কেবল একই সংস্কৃতির মধ্যে বাস বলেই সম্ভবপর হয়। যদিও মানুষের বিশ্বাস তারা একই দেশে বাস করে এবং তাদের সকলের মধ্যে একই রক্ত প্রবাহমান বলে তাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা আছে, তবু মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে স্থিরভাবে চিন্তা করলেই আমরা দেখতে পাই যে সত্যিকার বন্ধন তাদের সংস্কৃতি। কারণ প্রচলিত চিন্তাধারা যেটি তারা পুরুষানুক্রমে আয়ত্ত করে, সেটি তাদের সকলের মধ্যেই এক এবং এই একই সংস্কারের মধ্যে মানুষ হ'য়ে

তাদের সকলের মন একই ধরণে গড়ে ওঠে এবং অজ্ঞানিতভাবে একের সহিত অন্যের যোগ নিবিড় হয়।

জাতিমাত্রেরই একটি নিজস্ব সংস্কৃতি আছে এবং এই সংস্কৃতি তারা পুরুষানুক্রমে আয়ত্ত করে। প্রত্যেক সাংস্কৃতিক লক্ষণটি এই জাতিগত সংস্কৃতির একটি অংশমাত্র। এই জন্য কোন একটি কিংবা কতকগুলি সাংস্কৃতিক লক্ষণ দ্বারা যখন আমরা কোন জাতি সম্বন্ধে বিচার করি তখন আমরা এই ভুল করি যে আমরা জাতির সংস্কৃতির কেবল মাত্র একটি দিকই দেখতে পাই। অনেক সময় আবার আমরা এই লক্ষণ-গুলিকেও সঠিকভাবে দেখতে পাই না, তার কারণ আমাদের নিজেদের একটি জাতিগত সংস্কৃতি আছে এবং সেই সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে আমরা অন্য জাতির সংস্কৃতিকে পর্য্যবেক্ষণ করি। ফলে আমরা আগাগোড়াই একটি ভুল জিনিষের অবতারণা করি। সত্যিকারের কোন সংস্কৃতিকে বুঝতে হ'লে আমাদের খুব সতর্ক ভাবে নিজেদের গোঁড়ামী ত্যাগ করে তাদের রীতি, নীতি, প্রচলিত প্রথা এবং তাদের সকল অনুষ্ঠানগুলিই সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ করতে হবে। এইগুলির মধ্যেই আমরা তাদের সংস্কৃতির মূল ভিত্তির খোঁজ পাব এবং একবার এই অনুষ্ঠানগুলির সঠিক কারণ বুঝতে পারলে আমাদের নিকট তাদের কার্য্যাবলী খুব সরল হ'য়ে পড়বে।

সামাজিক রীতি, নীতি ও চিরাচরিত প্রথা কিরূপভাবে একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলে লেখিকা তা তিনটি বিভিন্ন আদিম জাতির সভ্যতার সাহায্যে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। প্রথমে তিনি নিউ মেক্সিকোর জুনি ইণ্ডিয়ানদের একটি বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। জুনিরা মাতৃকুলজাতি এবং তারা খুব উৎসবপ্রিয়; প্রত্যেকটি উৎসবই কোন একটি বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে সম্পন্ন করা হয়। অনুর্ব্বর উপত্যকায় বাস করার দরুণ জল এদের নিকট বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং সেইজন্য সমস্ত উৎসবেই জলদেবতাকে একটি বিশেষ স্থান দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানগুলিতে কতকগুলি নির্ব্বাচিত সম্প্রদায় পৌরহিত্য করে এবং তাদের স্থান অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে অনেক উপরে। এই সমস্ত উৎসবে দীক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া কেউই যোগদান ক'রতে পারে না; সেইজন্য প্রত্যেক ছেলেকেই পাঁচ থেকে নয় বৎসরের মধ্যে দীক্ষা দেওয়া হয়। এই সময় তাদের অনেক রকম কষ্ট সহ্য করতে হয়। দীক্ষিত হওয়ার পর তাদের একটি শ্রেণিভুক্ত করা হয়। এই সমস্ত শ্রেণীতে তাদের সংযম, ত্যাগ ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যাবলী শিক্ষা দেওয়া হয়। যারা এই সমস্ত কার্য্য সঠিকভাবে শিক্ষা করে এবং শ্রেণীর বৃদ্ধ ব্যক্তিদের নিয়ম মানে তাদের এক শ্রেণী থেকে অপর শ্রেণীতে তুলে দেওয়া হয়। এইরূপে তারা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে গিয়ে পৌঁছায়। সকলেই এই শ্রেণিভুক্ত হওয়ার জন্য খুব চেষ্টা করে, কারণ এই শ্রেণীই সকলের নিকট সম্মান পায় এবং সমাজে এর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সকলেরই সর্ব্বোচ্চ শ্রেণিভুক্ত হওয়ার সাধনার ফলে জুনিদের সংস্কৃতির মধ্যে সংযম ও ত্যাগের দিকটা খুব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে।

পূর্ব্ব নিউগিনির ডবুয়ানরাও মাতৃকুল জাতি কিন্তু তাদের সংস্কৃতি একেবারে বিভিন্ন প্রকারের। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব খুব প্রবল এবং এদের ধ্রুববিশ্বাস যে একজনের ক্ষতি না করে অন্যের কোন প্রকার উপকার

হ'তে পারে না। সেইজন্য বিদ্বেষ এবং অবিশ্বাস এদের সমস্ত রীতি নীতির মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক ডবুয়ানের মনের বিশ্বাস যে তার চারপাশে যে সমস্ত লোক রয়েছে তারা সকলেই ডাইনী বা যাদুকর এবং তাদের হাত থেকে উদ্ধার পেতে যাদুবিদ্যার আশ্রয় ছাড়া উপায় নেই; সেইজন্য তাদের সমাজে কিংবা কোন ব্যক্তিবিশেষের কোন ক্ষতি হ'লেই তারা মনে করে যে এটি কোন একটি ব্যক্তির যাদুবিদ্যার ফলেই ঘটেছে। এই অবিশ্বাসের ফলে তারা বড় দল গড়তে পারে না এবং ছোট ছোট দল বেঁধে বাস করে কিন্তু এক দলের সহিত অন্য দলের কোনরূপ সদ্ভাব থাকে না এবং একে অন্যকে খুব হীনচোখে দেখে। নিজেদের দলের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ থাকায় প্রত্যেকেই দলের বাইরে বিয়ে করে কিন্তু তাতেও দুদলের মধ্যে সদ্ভাব জন্মায় না কারণ গোষ্ঠীর মধ্যে পিতার কোন স্থান নেই এবং তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তার দলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়। ছেলে মেয়েরা মায়ের দলে মানুষ হয় এবং বড় হ'য়ে এই দলের লোক বলেই পরিগণিত হয়। জুনি সংস্কৃতির মধ্যে যেমন ধর্ম্ম ও অনুষ্ঠানের দিকটা দেখা যায় এদের মধ্যে তেমনি যাদুবিদ্যার দিকটাই প্রবল। সেইজন্য জুনিরা ত্যাগী ও সংযমী এবং ডবুয়ানরা বিদ্বেষী এবং অবিশ্বাসপরায়ণ।

আমেরিকার উত্তর পশ্চিম উপকূলে যে সমস্ত আদিম জাতি বাস করে তাদের মধ্যে একমাত্র কোয়কিউটল্ জাতির সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমরা বিশেষভাবে অবগত আছি। কোয়কিউটলরা পিতৃকুল জাতি এবং তারা ছোট ছোট দলবদ্ধ হ'য়ে বাস করে। আদিম জাতির পক্ষে তারা খুব সমৃদ্ধ কারণ সামুদ্রিক মৎস থেকে তারা জীবন ধারণ করে এবং এর তেল বিক্রী করে যথেষ্ট পয়সা উপার্জ্জন করে। সেই জন্যই কৃষিকার্য্যের কোন দরকার বোধ করে না। এদের সংস্কৃতির মধ্যে দুটি ভাগ আছে—একটি লৌকিক এবং অপরটি অলৌকিক; প্রতি বৎসরকেও সেইজন্য দুইটি বিশেষভাগে ভাগ করা হয়। গ্রীষ্মকালে সামাজিক অনুষ্ঠান এবং শীতকালে ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হয় এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলের কর্ত্তারা আধিপত্য করেন।

সমস্ত কোয়াকিউটল্ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর প্রাধান্য করা এবং এইটিই তাদের সংস্কৃতির মূলসূত্র। এইরূপ প্রাধান্য অন্যান্য সংস্কৃতির দিক দিয়ে দেখলে খুব বিসদৃশ লাগে কিন্তু তাদের সমস্ত সংস্কৃতির অনুষ্ঠানগুলি বিশদভাবে পর্য্যালোচনা ক'রলে এগুলির কারণ খুব সরল হ'য়ে পড়ে। এখানে আমরা তাদের সংস্কৃতির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব খুব সহজেই বুঝতে পারব।

> "I am the great chief who makes people ashamed.
> I am the great chief who makes people ashamed.
> Our chief brings shame to the faces.
> Our chief brings jealousy to the faces.
> Our chief makes people cover their faces by what
> he is continually doing in this world,
> Giving again and again oil feasts to all the tribes." (P. 190)

এই তিনটি বিভিন্ন স্থানের আদিম জাতির সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশদভাবে জেনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটির সংস্কৃতির মূল ভিত্তি একেবারেই পৃথক। যদিও

দুইটি জাতির কতকগুলি সাংস্কৃতিক লক্ষণ এক তবু উদ্দেশ্য একবারেই বিভিন্ন; সেই জন্য কয়েকটি সাংস্কৃতিক লক্ষণ দ্বারা জাতি বিচার করা যে সম্পূর্ণ অচল সে সম্বন্ধে আর কোন মতদ্বৈধই থাকতে পারে না। এই তত্ত্বগুলিই লেখিকা আমাদের নিকট খুব স্পষ্ট করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন।

শ্রীজ্যোৎস্নাকান্ত বসু

Selected Poems—By R. C. Trevelyan.

Selected Poems—By Elizabeth Daryush.

Selected Poems—By Hugh Macdiarmid.

(Macmillan's Contemporary Poets)

Trevelyan ইংলণ্ডের আধুনিক বিখ্যাত কবিদের অন্যতম। এই ক্ষুদ্র চয়নিকাতে তাঁর কবি-প্রতিভার একটি বিশিষ্ট দিক পাঠকের কাছে সুনির্দ্দিষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়। প্রকৃতির সান্নিধ্যে মানব তাহার সহজ ও সরল জীবনধারার মধ্যে সম্যক আনন্দ ও পরিস্থিতি লাভ করিতে পারে—এইটি হইতেছে কবির মনের একটি সদা জাগ্রত অনুভূতি। নানা কবিতার মধ্যে এই ভাবটি পরিস্ফুট। তন্মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য Sleep, The Figtree, Wood এবং A Winter Sunset। মানুষের জীবন দুঃখ ও নৈরাশ্যময় এবং চিরপরিবর্ত্তনশীল। সুখ অন্বেষণের চেষ্টার অবধি নাই। কিন্তু সুখ চিরদিনই আলেয়ার মত নিকটে আসিয়াই বহুদূরে চলিয়া যায়। ইহার প্রতিবিধান, কবির মতে, সম্মুখে যে সুখ সম্পদ ও সৌন্দর্য্য পাওয়া যায় তাহাই গ্রহণ করা (Happiness)। শাস্ত্রগ্রন্থাদি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের স্তূপ মানব-মনকে বিক্ষিপ্ত করে, শান্তি দিতে পারে না। Time নামক শেষ কবিতাটি বিশেষ রূপে এই ভাবে অনুপ্রাণিত। Books কেবলমাত্র Dusty sepulchres wherein the thoughts of dead men lie embalmed (Figtree)।

The Oaks and The Caterpillars, The Wood প্রভৃতি কবিতাগুলি পড়িয়া মনে হয় ইংরাজী কবিতায় আবার nature poetry নবভাবে স্থান করিয়া লইতেছে। Cloudsএ কবি বলিতেছেন—

> Their shapes change, imperceptively flowing from form to form,
> With each form a new mood,
> With each mood a new remorseful envy.
> Their passion and grandeur make me ashamed of Man's littleness.
> I long to forget it for ever,
> And share in that life of measureless form and energy.
> But alas, there is no road thither.

এই শেষ পদটিতে পূর্ব্বতন nature poetryর সহিত খুবই স্পষ্টভাবে আধুনিক nature poetryর পার্থক্য রহিয়াছে। কবি কখনই নিজের সত্তা ভুলিয়া Wordsworthএর মত প্রকৃতির সহিত মিশিয়া যাইতে পারেন না।

Krishna and Radha কবিতাটি ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সম্পূর্ণ কাব্যের স্তরে পৌঁছিয়াছে এবং রাস-পঞ্চাধ্যায়ের গূঢ় রহস্য অতি মধুর ও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করিয়াছে।

Elizabeth Daryushএর কবিতাগুচ্ছ Throw away the flowers নামক গীতি-কবিতা লইয়া আরম্ভ হইয়াছে। বস্তুতঃ এইটি সমস্ত কবিতাগুলির মূলসূত্রটি ধরাইয়া দেয়।

Throw away the flowers,
the tender songs ;
attune your powers
to eternal wrongs ;
have but hopeless hard
rebellion for bard.

কবির মন communistic ভাবে পরিপূর্ণ; মানব-আত্মার দুঃখ ও দারিদ্র্যের চিন্তায় কবির মন উদ্বেলিত হইয়া উঠে; তাই তিনি গাহিয়াছেন—

Ah, this is not enough, I cry—
... ...
I too on action's stormy sea
Am fain to fight and further me,
To make that heaven my home (III)

ভাব-বিলাসের মোহ কাটাইয়া সমগ্র মানবতার জন্য দুঃখ বরণ করিতে সাহস ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে জগতের স্তূপীকৃত গ্লানি ও পুঞ্জীভূত জড়তার ধ্বংস হইতে নব সৌন্দর্য্য জাগিয়া উঠিবে এবং অসঙ্কোচে বলিতে পারা যাইবে

Blow celestial wind
Of warmth and stress,
Wake the world's loath mind
To loveliness,

এবং

Breathe, avenger vast,
Our troubles high ;
Bend and scourge and blast
And beautify. (LIV)

আজকালকার নারী প্রগতির দিনে কবি (নিজে নারী হইয়াও) নারী ও পুরুষের আদর্শ সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া নিজের ভাব ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন—

The woman I'd revere would be
* * *
a soul burning to bless
its circle, spent for cheer,
a life-giver, thoughtless

how its own life appear,
whether itself may seem
a fair or formless gleam.

এবং

The man I'd love
* * *
would be more than a tame
measured glow without flame,
one who'd be now and then
o'ercharged with primal power,
a furied, a sudden
flash in oppression's hour,
wrath's lightning, rightly hurled,
the dread of wrong's dark world.

সমগ্র কবিতা-সঞ্চয়নটি দুইরূপে প্রকাশ পাইয়াছে—কতকগুলি sonnet আর অন্যগুলি songs। Sonnetsগুলি traditional form বজায় রাখিয়াছে। Songs গুলি ভাবে ও ভাষায় অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে।

Huge Macdiarmid স্কচ কবি। তাঁহার অনেক কবিতাই স্কচ dialectএ লেখা। মানে বুঝিবার সুবিধার জন্য Glossary দেওয়া আছে। কিন্তু পড়িতে পড়িতে মন মোহিত হয়। Dialectএ কবিতা লেখা তখনই সার্থক হয় যখন ভাষার মোহে মন আকৃষ্ট হয়। ভাবের দিকে নজর দিবার ইচ্ছা থাকে না। নানা বিচিত্র formএ কবিতাগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে।

প্রকৃতির অপরূপ লীলার সহিত কবির মন নানা ভাবে সাড়া দিয়াছে। ধরিত্রীর প্রতি গভীর, ভালবাসায় কবির মন উদ্বুদ্ধ এবং বৃষ্টিধারা, চন্দ্র তারকা, জলরাশির ঝরঝর শব্দ, নরনারীর প্রেম কাব্যের বিষয়বস্তু হইয়াছে।

দশ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজী কবিতা সভ্যতাগ্রস্ত সহরের ও কোনও বিশেষ group mindএর কবিতা হইয়া উঠিয়াছিল। এখন এই সব কবিদের রচনা পড়িয়া মনে আশ্বাস পাওয়া যায় যে কাব্য-সরস্বতী মুক্তি পাইয়া স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রকৃতির লীলাভূমিতে, সাধারণ নরনারীর প্রেমের ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে বিরত হন নাই।

শ্রীমণিভূষণ ভট্টাচার্য্য

সমাজ ও সাহিত্য—কাজী আবদুল ওদুদ প্রণীত। মোসলেম পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পুস্তকখানি নানা বিষয়ে নানা সময়ে লিখিত প্রবন্ধের সমষ্টি। গ্রন্থকার সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত গ্রন্থ "নব পর্য্যায়" পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "এতে মনের জোর, বুদ্ধির জোর, কলমের জোর এক সঙ্গে মিশেছে।" আলোচ্য প্রবন্ধগুলিতেও এই জোর পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। কিন্তু জোর ছাড়াও আর এক পদার্থ আমরা পুস্তকের পত্রে পত্রে দেখিতে পাইতেছি,

তাহা দরদ। আর সে দরদে সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র নাই। তাহা উদার, মুক্ত মহাকাশের মত উদার। লেখক স্পষ্ট কথা বলিতে কোথাও দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার স্পষ্ট কথার ভাষা এত সংযত, এমন ভব্য ও মার্জ্জিত, যে তাহা পড়িয়া কাহারও মনে ব্যথা লাগিতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে প্রবন্ধটী পড়িলে ইহা বেশ বোঝা যায়। কাজী সাহেব বঙ্গীয় হিন্দুমাত্রেরই শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমকে অসহিষ্ণু ইত্যাদি বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু প্রবন্ধের উপসংহারে এই কথা লিখিয়াছেন, "ভারতের হিন্দু-মুসলমানের কয়েক শতাব্দী ব্যাপী রেশারেশি দ্বেষাদ্বেষিও কালে হয়ত অর্থশূন্য কিন্তু অতি অদ্ভুত ঘটনা ব'লে মানুষের মনে হবে। তখন জ্ঞানী ও শক্তিমান বঙ্কিমচন্দ্রকে মানুষ ভালবাসতে পারবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁর অসহিষ্ণুতা হবে তাদের জন্য পরম কৌতুকাবহ।" এর পরে কি আর কোনও বাঙ্গালীর মনে ক্ষোভ থাকিতে পারে? আর এক স্থলে (৫৪ পৃঃ) ওদুদ সাহেব বঙ্কিমের এই বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, "এদেশের যেসব মুসলমান গরু খায় তারা নরাধম।" কিন্তু প্রত্যুত্তরে কোনরূপ কঠিন কথা না বলিয়া কেবল লিখিয়াছেন, "মানব প্রকৃতির সহিত তাঁর পরিচয় কত গভীর। কিন্তু তবু কেন সঙ্কীর্ণ হিন্দুত্বের অভিমান তাঁর ভিতরে এত প্রবল তা আমি বহু ভেবেও তেমন সুমীমাংসায় পৌঁছুতে পারি নি।"

লেখকের বিচারশক্তি কিরূপ প্রবল, তিনি কিরূপ তার্কিক, তাহার পরিচয় আমরা পাই "রামমোহনের বিরুদ্ধপক্ষের বক্তব্য" নামক প্রবন্ধে। সে প্রবন্ধে তিনি প্রতিপক্ষের তর্কগুলি একে একে অকাট্য যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন; কিন্তু "মানুষের চরিত্রের বিচার এত হাল্কাভাবে করতে যাওয়া হাস্যকর, বিশেষ ক'রে প্রতিভাবানের চরিত্রের বিচার।" "সত্য ও কল্যাণের প্রেরণায় এমন চির-অনুপ্রাণিত প্রতিভাকে ধর্ম্ম-প্রতিভা না বলা কেবল মধ্যযুগীয় মনোভাবের পক্ষেই তেমন অশোভন নয়"—এর চেয়ে বেশী কঠিন কথা বিরুদ্ধপক্ষকে কিছু শোনান নাই, একি কম বাহাদুরী!

"মোহাম্মদ আলী" প্রবন্ধ মৃত মৌলানা সাহেবকে অর্পিত শ্রদ্ধাঞ্জলি। এখানেও লেখক মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন "মোহাম্মদ আলী যে শুধু মুসলমানকে ভাল-বাসতেন তা নয়; জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে তাঁহার সমস্ত দেশবাসীকেও তিনি কম ভাববাসতেন না। কিন্তু সেই বৃহত্তর প্রেম বিকশিত করে তুলবার অবসর তিনি হয়ত পান নাই। তাঁর নিকটবর্ত্তী মুসলমানের দুর্দ্দশা হয়ত তাঁকে সারাজীবন আকুল করে রেখেছিল বেশী—।" আপন সম্প্রদায়কে লেখক এই সূত্রে যাহা বলিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য, "মোহাম্মদ আলীর সুবৃহৎ চিত্তে rationalism ও nationalsim-এর যে বীজ লুক্কায়িত ছিল তাকেই মহীরুহে বর্দ্ধিত করে তোলা তাঁকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের আজ হয়ত সবচাইতে বড় কাজ।"

আশী পৃষ্ঠায় লেখক এই Nationalism ও Rationalism সম্পর্কে নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "তবু আমি হচ্ছি মোটের উপর একজন সাহিত্যিক—সংস্কারক ঠিক নই। * * * একালের ভারতবাসী আমরা, মুসলমান সমাজে জন্মেছি, সেই নানা বন্ধনে বদ্ধ মানুষ কেমন করে' স্বাভাবিক মানুষের পর্য্যায়ে উন্নীত

হতে পারে, মনে হয়, তাই হয়ত একটুখানি ফুটেছে বা ফুটতে চাচ্ছে আমাদের লেখায়।" এই "জ্ঞান ও প্রেম" প্রবন্ধে অনেক সার ও সত্যকথা লেখক সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। পাঠক পড়িয়া দেখিবেন। দুই একটী বাক্য উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। "আপনি বলেছেন প্রাচ্যের অতীত মরে' ভূত হয়ে গেছে * * * কিন্তু আপনার কথার ত্রুটী এইখানে যে বাস্তবিকই প্রাচ্য মৃত নয়, মৃত হলে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ অমন জমত না।" "আপনি মোল্লা-পুরোহিতের নিশ্চিহ্ন ধ্বংস চেয়েছেন কিন্তু চাইলেই কি ধ্বংস হয়? * * * কতকগুলো মোল্লা-পুরোহিত না হয় কোতলই করলেন, কিন্তু যে অজ্ঞতার জলাভূমিতে মোল্লা-পুরোহিত গজায় তার ধ্বংস যদি না করতে পারেন তবে মোল্লা-পুরোহিতের উপর খাপ্পা হয়ে লাভ? * * * তবু আপনাদের মোল্লাদের বিরুদ্ধে প্রচার আমি অশ্রদ্ধার চোখে দেখি না। বেশ, করুন। শুধু এই বলতে চাই ওতে বেশী কাজ হবে না।" "শুধু আমার প্রার্থনা—আপনার বা আপনাদের এই চলবার সঙ্কল্প প্রবল হোক সক্রিয় হোক। মতামত মানুষের খুব বড় জিনিস নয়, বড় জিনিস হচ্ছে সেই মতামত সার্থক করবার জন্য তার আয়োজন।"

"পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধটী পাঠক ইতিপূর্ব্বে এই পত্রিকাতেই পড়িয়াছেন। মুসলমান ভারতের নেতা ইকবালের রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে আমাদের সঙ্কোচ হয়। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করিতেও আমরা ইচ্ছা করি না। তবে আজ সুদূর পশ্চিমে যে মুসলিম জননায়ক এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির ভাগ্য পরিচালনা করিতেছেন, ইকবাল সাহেবের স্থান যে তাঁহার উর্দ্ধে নহে, ইহা নিশ্চিত। গ্রন্থকার একথা স্পষ্ট না বলিলেও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। স্বয়ং ইকবালও আর কামালপাশা বা আধুনিক তুর্কীকে এক পাশে সরাইয়া শুধু প্রাচীন গ্রন্থের উপর নির্ভর করিতে পারিতেছেন না। কেন না সম্প্রতি তিনি লিখিয়াছেন—"Most Muslim countries to day * * * are mechanically repeating old values, whereas the Turk is on the way to creating new values." ওদুদ সাহেব বলিতেছেন—"মুসলিম জনগণের সামনে এই যে দুই পথ তার বিচিত্র পাথেয় নিয়ে উন্মুক্ত হয়েছে এর কোন্‌টি শেষ পর্য্যন্ত তাদের অবলম্বন হবে সে উত্তর আজ দেওয়া সম্ভবপর নয়।" আমরা আশা করি মুক্তি ও স্বাধীন চিন্তার পথই তাঁহারা অবলম্বন করিবেন, আর স্বদেশবাসী হিন্দু খৃষ্টান পার্শীকেও তাঁহাদের পথের সাথী করিয়া লইবেন।

রাষ্ট্রনীতির কথা ছাড়িয়া দিয়া আর একটা কথা বলি। ইকবাল সাহেব ভারতের একজন প্রথিতনামা কবি। অথচ আমরা বাঙ্গালীরা তাঁহার কবিতা সম্বন্ধে প্রায় কিছু জানি না। আশা করি ভবিষ্যতে একদিন আমরা কবিবর ইকবালের কাব্যকলা সম্বন্ধে বঙ্গ ভাষায় বিস্তৃত আলোচনা কাজী সাহেবের নিকট হইতে পাইব। বর্ত্তমান উর্দ্দু সাহিত্যের চিন্তার ধারার সহিত সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় অশেষ মঙ্গলের কারণ হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। ফারসী কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধেও এই কথা প্রযুজ্য। এক দিন ছিল যখন অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালীই ফারসী

লিখিতে পড়িতে জানিতেন। কিন্তু সে দিন ত আর আজ নাই। এখন ইংরেজীর সাহায্যে আমাদিগকে হাফেজ রুমীর সহিত পরিচিত হইতে হয়। কাজীসাহেব প্রমুখ লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙ্গালী মুসলমান সাহিত্যিকগণ যদি বাঙ্গলা ভাষায় সুফী সাধকদিগের কবিতার আলোচনা করেন ত ভাষাও সমৃদ্ধ হয়, আর হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একটা cultural বোঝা পড়াও অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া যায়। নহিলে আজ যাহা অবস্থা তাহাতে আলোচ্য পুস্তকেরও অনেক স্থল শিক্ষিত হিন্দু পাঠক বুঝিবেন না। আমাদের মধ্যে কয় জন গাজ্জালি বা ইব্‌নেরোশদের নাম শুনিয়াছেন! কয় জনেরই বা হাফেজ বা রুমীর চিন্তার ধারা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা আছে! এই সূত্রে আমাদের আরও একটী বক্তব্য আছে। তাহাও এখানে বলি। একদিন বাঙ্গলা ভাষার উপর ফারসীর প্রভাব যথেষ্ট ছিল। ক্রমশঃ নানা কারণে সেই প্রভাব তিরোহিত হইয়া সংস্কৃতের প্রভাব একান্ত প্রবল হইয়া পড়িল। কালে তার উপর আসিয়া উপস্থিত হইল সাহেবী বিকৃতি, ফলে আজ বাঙ্গলার বড়ই দুর্দ্দশা। এ দুর্দ্দিনে আবার সে যদি বাল্য-সখী ফারসীর অঞ্চল ধরিতে পারে ত তাহা অশেষ মঙ্গলের হেতু হইবে। বাঙ্গলা ভাষাকে ধীরে ধীরে এই পথে চালান বঙ্গীয় মুসলমান লেখকগণের আজ কর্ত্তব্য। তাঁহারা ক্রমাগত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার না করিয়া ফারসী শব্দ ও ফারসী ইডিয়ম যদি পুনরায় বঙ্গভাষায় চল করেন তাহা হইলে ভাষার শ্রী ফিরিয়া যাইবে। ইহাতে দোষ কিছুই হইবে না, কেন না, একদিন ত "আমারে দাও মা তহবিল দারী আমি নিমক হারাম নই মা শঙ্করী।" 'রামজীর কুদরতে মোহিম হইল ফতে গালিব হইল নিমকহারাম।' "দাউদ আপনার দরোবস্ত সেনাগণ উত্তর পশ্চিম ভাগে পাঠাইয়া স্থানে স্থানে মুরচাবন্দি করিয়া সত্য সাবধানে রহিয়াছে।" এ সবই বাঙ্গলায় সাহিত্য বলিয়া গণ্য হইত। উত্তর ভারতে আমরা দেখি যে উর্দ্দু ও হিন্দী মূলতঃ এক ভাষা হইলেও রাষ্ট্রনীতিক কারণে আজ দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্গদেশে সে খেলা খেলিয়া লাভ কি।

আলোচ্য প্রবন্ধসমূহের মধ্যে প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে 'রামমোহন রায়' নামক প্রবন্ধকে। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে পুস্তকের সেরা প্রবন্ধ 'বাঙ্গলা সাহিত্যে জাতীয়তার আদর্শ'। অবশ্য এই দুই প্রবন্ধের যোগ আছে। রামমোহন রায় বাঙ্গলার জাতীয় জীবনের সূচনা করার পর তাঁহার স্বজাতীয় সাহিত্যিকগণ এক জনের পর এক জন কি করিয়া সেই জাতীয় আদর্শকে খর্ব্ব করিয়াছিলেন তাহাই শেষোক্ত প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়। "এই সব হিন্দু সমাজ-তাত্ত্বিকদের সমস্ত চিন্তার মূলে রয়েছে এক শোচনীয় দায়িত্বহীনতা"—ইহাই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। লেখক বলিতেছেন যে "হিন্দুর মতো একটা সুপ্রাচীন সভ্যজাতির ইতিহাসে গৌরবজনক অনেক কিছু যে থাকবে এ যেমন স্বাভাবিক তেমনি সঙ্গত, তবু একালের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু চিন্তানায়কদের আত্ম-প্রশংসা যে রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে ও যে ফল ফলিয়েছে তা বুঝতে চেষ্টা করা একালের বাংলার জিজ্ঞাসুদের জন্য নানা কারণেই অবশ্যকর্ত্তব্য।" এই আত্মগৌরব বোধ হইতে ধীরে ধীরে স্বদেশপ্রেম কিরূপে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল তাহা ওদুদ সাহেব অতি

সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন। তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন যে উনবিংশ শতাব্দীর এই সাহিত্যরথীদের অনেকেরই practical বা কার্য্যকরী স্বদেশ-প্রেমের যথার্থ ধারণা ছিল না। আমাদের মনে হয় যে বাঙ্গালী জনসাধারণও সে কথা বুঝিত। সেই জন্যই সুরেন্দ্রনাথের মত সাম্প্রদায়িকবুদ্ধিহীন রাষ্ট্রনেতা জনগণের মন এত সহজে অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। গ্রন্থকার সুরেন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জনের নাম কোথাও করেন নাই। সম্ভবতঃ এই কারণে যে তাঁহারা বাগ্মী, সাহিত্যিক নহেন। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে "উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার প্রায় সমস্ত কর্ম্ম ও চিন্তা-নেতাই জাতীয় জীবনে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন অনুভব করেছেন, বলা যেতে পারে। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন জাতীয় জীবনে প্রকৃতই কার্য্যকরী হবার জন্য যে খুব বড় রকমের হওয়া চাই—হয়ত আমূল—সে বোধ জেগেছে দুইজনের ভিতরে—রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ।" কিন্তু রবীন্দ্র প্রতীভাকেও তিনি কার্য্যকরী মনে করেন না। 'ভূদেবের স্বস্তি, বঙ্কিমচন্দ্রের উগ্রতা, কেশবচন্দ্রের ভাবোন্মত্ততা, বিবেকানন্দের খেয়ালিত্ব, জাতীয় জীবনের জন্য এ-সমস্তরই অপকারিতা সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন; কিন্তু তিনি যে কবি, মানুষের ও প্রকৃতির সভায় চির আনন্দময় গায়ক, এই বোধ কর্ম্মীর যোদ্ধবেশ গ্রহণে বারবার তাঁর ভিতরে কুণ্ঠা এনে দিয়েছে।

লেখক যে কেবলই খুঁত ধরিয়াছেন তাহা নহে প্রবন্ধের শেষভাগে আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য দুইটী কর্ম্মের কথা বলিয়াছেন; যাহাতে আমাদের জাতীয় জীবন "সুব্যবস্থিত" "বীর্য্যবন্ত" ও "সত্যাশ্রয়ী" হইবে। ওদুদ সাহেবের সূচনার মধ্যে উগ্র বা উত্তেজক কিছুই নাই বলিয়া হয়ত কাহারও কাহারও ভাল লাগিবে না, কিন্তু প্রবন্ধটী সারগর্ভ কথায় ভরা, তাই আমরা সকলকেই যত্নপূর্ব্বক পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

রাজা রামমোহনের জীবন ও চরিত্র আলোচনা—পুস্তকের প্রথম প্রবন্ধ—সুলিখিত ও সুপাঠ্য। আমাদের সমালোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া সে প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে পারিতেছি না। দুই একটী কথা যাহা লেখক বলেন নাই তাহাই বলিতেছি। রামমোহন বেদান্ত হইতে একমেবাদ্বিতীয়ম মন্ত্রটী লইয়াছেন বটে কিন্তু তাহার অর্থ করিয়াছেন ইসলামী মতানুযায়ী। কারণ বেদান্তে ওই মন্ত্রের অর্থ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জগৎ ব্রহ্মই, অপর কিছুই নহে। রাজা উহার অর্থ করিয়াছেন, এক আল্লা বই দ্বিতীয় আল্লা নাই। রামমোহন পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী ছিলেন কিন্তু সুফী সাধকগণকে তাহা বলা যায় না, কারণ তাঁহারা বরাবর বলিয়াছেন যে ঈশ্বর যেমন মসজিদেও আছেন, তেমনই নসরানীর গির্জ্জাতেও আছেন, অগ্নি-পূজকের অগ্নিশালাতেও আছেন, পৌত্তলিকের মন্দিরেও আছেন। সুতরাং রামমোহন তাঁহার আইকনোক্লাজম্ সুফীদের নিকট হইতে পান নাই, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। তেমনই সুফীদের অদ্বৈতবাদ রামমোহনকে কোনও রূপে স্পর্শ করে নাই। কারণ বৈদান্তিক ও সুফী দুইজনেই বিশ্বাস করিতেন যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। অথচ রামমোহন এ কথা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম দ্বৈতবাদ। আমাদের মনে হয় যে রামমোহনের ধর্ম্মমত প্রধানতঃ কোরাণ শরীফ ও মোতাজেলা সম্প্রদায়ের মতামতের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু শাস্ত্রের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের যোগসূত্র ধরিয়াছিলেন রামমোহনের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ।

আলোচ্য পুস্তকের ভাষা সম্বন্ধে আমাদের কেবল এইটুকু বলিবার আছে যে তাহা স্থানে স্থানে যথেষ্ট প্রাঞ্জল হয় নাই। যতদূর প্রাঞ্জলতা আমরা ওদুদ সাহেবের মত লেখকের কাছে আশা করি ততটা সর্ব্বত্র পাই নাই।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

Little Man, What Now—By Hans Fallada. (Putnam)

পুস্তক-প্রকাশ-প্রণালী ও মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতি যেমন একদিকে উপন্যাস রচনার হার উত্তরোত্তর বাড়িয়ে চলেছে তেমনি আর একদিকে অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য্যের আকস্মিক পরিচয়ে অভিভূত হয়ে পড়বার মত সুযোগ হারাচ্ছে পাঠক-সম্প্রদায়। প্রণিধানের অযোগ্য সাহিত্যের কথা ছেড়ে দিয়েও মনে হয় আজকালকার অধিকাংশ রচনা হচ্ছে উত্তেজনা-পূর্ণ সংসার-যাত্রার চিত্রন অভিব্যক্তি মাত্র—যার সঙ্গতি নিঃশেষ হয়ে যায় ব্যস্তবাগীশ বর্ত্তমানের চিত্তরঞ্জনে। লিপিবদ্ধ বর্ণনার সহিত আপন হৃদয়স্থিত বেদনা বা আনন্দের মিল পেলেই পাঠক অতি সাধারণ উপন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার মুদ্রণ-সংখ্যা বাড়িয়ে দেয় কিন্তু কালের কষ্টিপাথরে ওঠবার পূর্ব্বেই সে সব রচনার সার্থকতা অবসন্ন হয়ে পড়ে। তখন নূতন ঢঙের কথাশিল্প নূতনতর বৈজ্ঞানিক বুলিতে অঙ্গ ঢেকে সাহিত্যের হাটে প্রবেশ করে। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-সৃষ্টি পূর্ব্বেও যেমন বিরল ছিল আজও তেমনি থেকে গেছে। আত্মকাহিনী বা সমর-সাহিত্য যেমন শিল্পের হাটে নূতনতর ভঙ্গিমা এনেছে, বোয়ারের 'পাওয়ার অফ এ লাই'র মত সুন্দরের সেই অনাড়ম্বর অবগুণ্ঠিত সঙ্গতি তেমনি আর বড় একটা দেখা যায় না। গল্স্ওয়ার্দ্দি বা মানের রচনার মত সুবৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে বিধৃত সর্ব্বাঙ্গীণ রূপ-সৃষ্টি সেকালে বিরল ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু তেমনি বর্ত্তমান সময়ে রূপ-কথার সেই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি আর হয় কই।

আলোচ্য বইখানিতে উপরিউক্ত কোন গুণেরই সন্ধান পাইনি কিন্তু অকিঞ্চিত-করের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের প্রকৃষ্টতর প্রকাশ পূর্ব্বে দেখিনি। এই যদি সাহিত্যের নব ধারার পূর্ব্বাভাস হয়, হৃদয় আশান্বিত হয়ে ওঠে। কোন নিবিড় সৌন্দর্য্য বা নিগূঢ় সত্যের ইঙ্গিত এতে নেই। ঘটনাপরম্পরা সমস্যাশূন্য লঘুগামী, আদর্শ দাম্পত্য প্রেমের মত মামুলী। ইংরাজীতে অনুবাদ সুতরাং ভাষাও লাবণ্যহীন। এমন কি নন্দন-তত্ত্বের প্রচলিত বিশ্লেষণ-প্রথা অপ্রযোজ্য বলে মনে হয়। গল্পের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া ব্যতীত পরিচয় প্রদানের আর কোন উপায় নেই।

নাৎসী শক্তির অভ্যুদয়-কালীন জার্ম্মানীর সাধারণ গৃহস্থালীর মধ্যে দৈন্য-দশার অবধি নেই। পিনেবার্গ অল্প-বেতন-ভোগী কেরাণী যুবক। বুনী শ্রমিকের কন্যা। প্রণয়ের সূচনা হলো সমুদ্র-বক্ষে, জল-ক্রীড়ায়। তারপর যখন প্রণয়ী-যুগল সন্তানরোধের উপায় অনুসন্ধানে চিকিৎসকেরই শরণাপন্ন হলো, প্রকাশ হয়ে পড়লো কুমার সম্ভাবনা। বুনী হাতের ওপর হাত রেখে বল্লে "ওগো, দুঃখ কর কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে—বইতে পারবো আমি এ ভার।" প্রেমের এই অপরিমেয় আত্মত্যাগের আভাস পেয়েও ছেলেটি চলে যাচ্ছিল বিদায় নিয়ে—

এমন সময় সহসা শরতের এলোমেলো বাতাস এসে তার চিত্ত দিলে দুলিয়ে। ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসে বল্লে "আচ্ছা বিয়ে করলে কেমন হয়?" মেয়েটি মাটিতে বসে পড়লো—বিপুল পুলকে তার হৃদয়ের সহস্র দীপ জ্বলে উঠলো চোখের ভেতর, বল্লে সে, "ওগো সত্যি?" পর মুহূর্ত্তে সংযত হয়ে মাথা নাড়লে "কি দরকার? আমি ঠিক হয়ে যাব—তবে যদি বোঝ ছেলের বাপ থাকা ভাল—" পিনেবার্গের মনে সে সমস্যা জাগেনি। বুনীকে তুলে ধরে বল্লে—"চলো যাই।"

অনাদি-কালের জীবন-রহস্যের পরম্পরায় এমনি করে আর একটি গ্রন্থি পড়লো। অভাব-পীড়িত দাম্পত্য পথের প্রথমভাগে কলিও ওঠে ফুলও ফোটে কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই সস্‌প্যানের প্যানপ্যানানি হয়ে ওঠে বাস্তব ও প্রচণ্ড সত্য। বুনী বুদ্ধিমতী, তাই ক্ষুদ্র সংসারের স্নিগ্ধ অঙ্গনে কলহের তরঙ্গ তোলে না। কৃচ্ছ্র সাধনার মধ্যে যেটুকু পরিতৃপ্তি সংগ্রহ করে নিয়েছে তারই চক্রবালের মধ্যে রেখেছে আপন স্বপ্ন—স্ত্রীসুলভ চাহিদা।

জীবন-নির্ব্বাহের দাবী-পূরণে পিনেবার্গকে জলাঞ্জলি দিতে হয়েছিল আপন স্বাচ্ছন্দ্য। মনিব-কন্যা চির-অনূঢ়া—মনিব চাকুরির চার ফেলে জামাতা আহরণের চেষ্টায় সচেষ্ট, সুতরাং তাকে গোপন রাখতে হয়েছিল যে সে বিবাহিত। সে কম দুর্ভোগের কথা নয়—অসুবিধা প্রতিপদে। অবশেষে একদিন গ্রীষ্মের রবিবারে সমুদ্রের সান্ধ্য সমীরণে যখন কৃষ্ণাভ বৃক্ষ-শাখাগুলি হিল্লোলিত, দম্পতিযুগল মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হয়েছে, এমন সময় মনিব প্রবরের সপরিবারে আবির্ভাব। আসন্ন পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় বুনী মৃতকল্প; এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে পড়লো শাশুড়ীর আমন্ত্রণ। বের্‌লীনে নাকি উচ্চ বেতনের চাকুরী যোগাড় তাঁর ইচ্ছা-সাপেক্ষ। দুষ্ট-চরিত্রা মাতার আশ্বাস-বাণীতে পিনেবার্গের আস্থা ছিল না; কিন্তু উভয় সঙ্কটের মধ্যে স্ত্রীর নির্ব্বাচনই গ্রাহ্য করে নিলে।

মাতা-পুত্র-সংবাদে যে বাক্য-স্ফুলিঙ্গ উঠলো তাইতে বুনীর বুঝতে বিলম্ব হলো না যে নাড়ীর বন্ধন সত্য সত্যই ছিন্ন হয়েছে; কিন্তু ওষ্ঠ ও গণ্ড রঞ্জিত প্রৌঢ়াকে তার মন্দ লাগলো না। গৃহে মজুত ছিল আর একটি প্রকাণ্ড বিস্ময়। বিরাট আকৃতি এক পুরুষ—কৌতুকাতিশয্যে রসনা ও লোচন উন্মুখর; শীতের দিনে পরিধানে ফিন্‌ফিনে শার্ট—নাম জাকমান—শয্যার সম্পর্কে পিনেবার্গের পিতৃতুল্য। পুত্রবধূর প্রতি যত্নের আতিশয্য বয়োজ্যেষ্ঠাকে রীতিমত ঈর্ষান্বিত করে তুললো। এই নব সহরে অনাসৃষ্টি দেখে বুনী স্তম্ভিত হয়ে গেল; কিন্তু স্বামীর কাছে পর্য্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করলো না।

জাকমানের চেষ্টায় চাকুরী যোগাড় হলো বটে কিন্তু জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠলো পাশের ঘরের নৈশ মজলীসের কোলাহলে। হয়ত' বা কোন গভীর রাত্রে দীপালোকহীন ঘরে দুজনায় নিবিড় আলাপনে মগ্ন—প্রাণের স্পন্দন হয়ত' এক হয়ে গিয়ে সুদূর লোকে চলে গেছে—এমন সময় মা ঢুকলেন ভাড়ার তাগাদায়। তাঁকে ভুলিয়ে ভালিয়ে সরাতে না সরাতেই স্বয়ং কর্ত্তা ঢুকে পড়লেন, "ওহে দাও না আলোটা জ্বালিয়ে—আমাদেরই যে দাম্পত্য কলহ হয়েছে না হয় তোমাদের—" পিনেবার্গ চেঁচিয়ে বল্লে "বেরিয়ে যান"। কিন্তু কে শোনে। প্রকাণ্ড স্থূল হস্ত তখন বিছানা হাতড়াচ্ছে, ব্যস্ত। লেপের ভেতর থেকে অস্ফুট স্বর এলো "হাঃ ভগবান"—

তুমি ওদিকে—খুঁজে মরছ—ও লর্ড—এই নাও তিনশ' মার্ক। এক দিন খুব কামিয়েছি—দিয়ে দাও বেটির ক মাসের বাড়ী ভাড়া এক সঙ্গে—ওকে দেওয়ার চেয়ে তোমাদের দেওয়া ঢের ভাল। বাহির হতে রোরুদ্যমান কণ্ঠে ডাক এলো—"কোথায় তুমি?" মা আলুথালু বেশে পুনঃপ্রবেশ করে বল্লেন "রাস্তায় বেরিয়ে গেলে না ত?" পিনেবার্গ বল্লে "মা ভাড়ার কথাই হচ্ছিল—তুলে নাও নোটগুলি তোমার।" টাকা হাতে পেয়ে তিনি জাকমানের কথা ভুললেন। পিছনে ফিরতেই পালঙ্কের পার্শ্বদেশ হতে জাকমান বেরিয়ে এসে বলে উঠলো, "বাবাঃ মেয়েমানুষ বটে—তিন তিন শ' মার্ক অম্লান বদনে মেরে দিলে—দেখে আসি মজাটা—কি বলে?"

এমনি করে দিন কাটে। একদিন ঘটলো বিপর্য্যয়। পিনেবার্গের সহকর্ম্মী কেসলার রটিয়ে দিলো যে ফ্রাউ পিনেবার্গ নাকি দাম্পত্যপীড়িত ভদ্রলোকদের প্রমোদের ব্যবস্থা করে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। শাশুড়ীর অপরাধ বর্ত্তালো বেচারা বুনীর ওপর। পিনেবার্গ কেসলারের নাসিকা লক্ষ্য করে ঘুসী চালিয়েছিল এবং ব্যাপারটা অনেক দূর গড়াচ্ছিল; দৈবাৎ বন্ধু হিলবুট্ মধ্যস্থ হয়ে মিটিয়ে দিলে। বল্লে তারও ত' এক দূর সম্পর্কের খুড়ীমা সন্দেহজনক ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তা বলে কি তার দোষ?

অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠতে স্বামী স্ত্রী নূতন বাসা সন্ধান করে এক রাত্রি চুপি চুপি পালাতে গিয়ে জাকমানের কাছে ধরা পড়ে গেলো। তিনি কিন্তু কোন আপত্তি বা বিস্ময় প্রকাশ না করে বুনীর হাত থেকে সুট কেশটা নিয়ে মন্দ হেসে বল্লেন "তোমার কী এ অবস্থায় ভার বওয়া ভাল, চলো গাড়ীতে তুলে দিই।" তারপর স্বেচ্ছায় পাখী উড়িয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠে গিয়ে একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে গৃহিণীকে বল্লেন "ওগো তারা গেছে—আর তোমাকে ঈর্ষায় দগ্ধ হতে হবে না।"

ডিসেম্বর মাসটা কায়-ক্লেশে কেটে গেলো। নববর্ষে মাণ্ডেল ষ্টোর্সে এক নূতন নিয়ম জারি হলো যে প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে মাসিক বেতন হতে বিশ গুণের অধিক মূল্যের মাল বিক্রয় করতে হবে নতুবা বিতাড়ন অনিবার্য্য। প্রথম ক'দিন পিনেবার্গ হেসে খেলে বরাদ্দ টাকা তুলে দিলে। কিন্তু ক্রমে যখন প্রতিযোগিতার নেশা পেয়ে বসলো—প্রাণে ভয় ঢুকলো, মেজাজও চড়া হয়ে উঠলো। গণিকালয়ের মত খরিদ্দার শিকারের উগ্র পাশবিকতা তার সইলো না। স্নায়ুর দুর্ব্বলতা প্রবল হয়ে উঠলো। এদিকে এরই মধ্যে একদিন বুনীকে নিয়ে ছুটতে হলো হাসপাতাল।

কদিন পরে সেই সনাতন কুশ্রী, কুঞ্চিত রক্তবর্ণের মুখ ও ডুমুরের মত মাথার এক বাণ্ডিল নিয়ে যখন বুনী বেরিয়ে এলো, তখন ঝলমলে রৌদ্রে ঘর দোর ভরে গেছে। স্বামীর কোলে ছেলেকে দিয়ে লঘু পদে ঘরময় বেড়িয়ে নিলো—চট করে একটা হেলে পড়া ছবি সোজা করে দিলো—ফুলের টবের ওপর ঝুঁকে পড়লো—কবাট্ খুলে বন্ধ করে দিলো—তারপর স্বামীর গলা জড়িয়ে নিবিড় ভাবে বলে উঠলো "ওগো, সত্যি আমি কত সুখী।"

একদিন দৈবাৎ জাকমানের সঙ্গে পথে দেখা। বুনীর ছেলে হয়েছে শুনে তিনি দোকান উজাড় করে নিয়ে চল্লেন ফুল আর মিষ্টান্ন। পিনেবার্গ বল্লে "দেখুন

মশাই আগে থাকতে বলে রাখছি খোকার বয়স মাত্র তিন মাস—খেলা দূরের কথা সে না পারে দেখতে, না পারে শুনতে, দয়া করে পুতুলের দোকানে ঢুকে বসবেন না যেন। জ্যাকমান অন্যমনস্ক ভাবে বল্লে—"হ্যাঁ পুতুল তাইত'—ঠিক বাপের মত কথা—তা এ অঞ্চলে পুতুলের দোকান আছে না কী?" জাকমান ক্ষুদ্র সংসারটিতে গ্যাঁট হয়ে বসে নড়বার লক্ষণটিও দেখালেন না। বুনী সত্যসত্যই বিব্রত হয়ে পড়লো। একটিমাত্র ঘর। বল্লে "এবার আমার খোকাকে দুধ খাওয়াবার সময়—আপনি যান।" জাকমান আরও জেঁকে বসে বল্লেন "আমি দুধ খাওয়ানো কখনও দেখিনি, দেখবো—" পরদিন কাজের ভীড়ের মাঝে পিনেবার্গ দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে কাটালো কিন্তু বাড়ী এসে শুনলে জাকমানের ব্যবহারে ভদ্রতার কোন ব্যত্যয় হয়নি—উপরন্তু খোকাকে নিয়ে সে সারাক্ষণ খেলা করেছে। সন্ধ্যার সময় তিন জনে সিনেমা দেখে কাটিয়ে এল; তারপর জাকমান সেই যে উধাও হয়ে গেলেন আর দেখা নেই।

পিনেবার্গের সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হোল; বন্ধু হিলবুটের কর্ম্মচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে নিঃসহায় হয়ে পড়লো সে কর্ম্মক্ষেত্রে এবং তার মানসিক অশান্তি প্রকট হয়ে উঠলো সহকর্ম্মীদের দুর্ব্যবহারে। বুনী তার প্রাণের উদ্বেগ গোপন করে রাখে কিন্তু নেহাৎ অসহ্য হয়ে উঠলে না বলে পারে না যে মানুষকে যারা যন্ত্র বানায় তাদের সে কখনই ভোট দেবে না—দেবে কমিউনিষ্টকে।

একদিন তারা সত্যসত্যই পথে বসলো। অনাবশ্যক বলে পিনেবার্গ বহিষ্কৃত হলেন কর্ম্মক্ষেত্র হতে। অনাহার-ক্লিষ্টের নগ্নমূর্ত্তি অপেক্ষা বেকারের আশাহত অর্থহীন অস্তিত্ব অধিকতর নিষ্করুণ ও দুর্ব্বহ। বুনী সূচীকার্য্য করে যা কিছু উপায় করে তাইতে বেকার-জলপানি জুড়ে গ্রাসাচ্ছাদন চলে যায় কোনক্রমে, কিন্তু পরান্ন-জীবিকার অবমাননা পুরুষ-প্রকৃতিকে নিভৃতে নৃশংসভাবে হীন হতে হীনতর করে তোলে। বুনী তার নারীত্বের অপরিমেয় সৌন্দর্য্য দিয়ে স্বামীর হৃদয় ভরিয়ে রাখতে চেষ্টা করে; আত্মমর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখবার চেষ্টায় প্রাণপাত করে কিন্তু পেরে ওঠে না।

একদিন যেসময়ে অপরিচ্ছন্ন ভূষণের জন্য পিনেবার্গ জনসঙ্কুল পথে নিদারুণ-ভাবে লাঞ্ছিত হয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত গৃহাভিমুখে ধাবমান, বুনী কুটীরে শিশু পুত্রের সঙ্গে ক্রীড়ারত, এমন সময় জাকমানের পুনরাবির্ভাব হলো। তিনি মনে মনে দৃঢ়-সঙ্কল্প করে এসেছেন দ্বিধাবিরহিতভাবে ব্যক্ত করবেন আপন ঈপ্সিত কামনা। বুনীর কাছে হৃদয়ের দ্বার উন্মোচন করলেন ভিক্ষার ভাষায়। মুক্ত কণ্ঠে বল্লেন কারাগারের মেয়াদ কাটিয়ে সেদিনই ফিরেছেন, পিনেবার্গের পরিত্যক্ত ছোট্ট একটু স্থান পেলেই তাঁর পাপ জীবনের অবসান হয়। বুনীর স্বামীর অন্তঃকরণে তখন উত্তাপের বড় অভাব—অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হতে কৃতজ্ঞতা-বিজড়িত কণ্ঠে বিদায় দিল জাকমানকে।

গল্প এখানে শেষ হলো। আখ্যায়িকাটি ত্রিধামূর্ত্তি সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে কিন্তু চরিত্রত্রয়ের মধ্যস্থিত ব্যাস আজে বাজে দৈনন্দিন ঘটনা ও কথায় এত ঘনপল্লবিত যে সহজে আত্মপ্রকাশ করে না। প্রণিধান-অন্তে বইখানি মুড়ে রাখলে ধীরে ধীরে

সুস্পষ্ট সুগঠিত বুনী বেরিয়ে আসে শেষের কয়েকটি পৃষ্ঠা হতে, তখন প্রথম অধ্যায়ের বালিকার প্রত্যেক অঙ্গ-সঞ্চালনটিও অর্থসম্পন্ন হয়ে ওঠে—মমতা, সংযম ও শালীনতার নূতনতর প্রকাশ-ভঙ্গী হৃদয়ঙ্গম হয়। লেখকের মৌলিকতা হচ্ছে তিনি মৌনের আধারে নারী চরিত্রকে বাঙ্ময় করে তুলেছেন—বুনীর বহিঃপ্রকৃতি গৃহিণীপনায় উন্মুখর কিন্তু অন্তর গহনে যে মৃদুমন্দ সমীরণ বয়ে গেছে তার বর্ণনা ভাষায় ব্যক্ত না হয়েও পাঠকের অনুভূতিতে বিধৃত হয়। মদ্যপায়ী গাণিকাসক্ত জাকমান্ জীবনের সায়াহ্নকালে যখন প্রথম প্রকৃত নারীর সমীপ স্পর্শে আসে তখন তার বুভুক্ষু চিত্ত কিসের দুর্নিবার আকর্ষণে চঞ্চল হয়ে উঠতো বুনীর কোমল অন্তঃকরণ তা বুঝতো, কিন্তু একটি দীর্ঘশ্বাসেও ব্যক্ত করেনি সে কথা।

পিনেবার্গ দুর্ব্বল চিত্ত, ছাপোষা ভালমানুষ—নির্ম্মম নিষ্করুণ সংসারের বাত্যাঘাতে তৃণ-তুল্য ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, কিন্তু স্বামিত্বের বদ্ধমূল আভিজাত্য অনবনত অভ্রভেদী উচ্চ থেকে গেছে; অথচ চরিত্র চিত্রণে লেখক একটিও রেখা এই আইডিয়াটিকে ব্যক্ত করবার অভিপ্রায় টেনে আনেন নি।

পূর্ব্বেই বলেছি আখ্যায়িকাটি পারিপার্শ্বিক চরিত্রের দ্বারা পল্লবিত। লেখকের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ হয়ে পড়ে যখনই তিনি উপরিউক্ত চরিত্রত্রয় হতে দৃষ্টি উত্তোলন করে পরিবেষ্টনীর মধ্যে নিবদ্ধ করেন—ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন বর্ণনা তখন গল্পের ব্যাস হতে সরে গিয়ে স্বরূপ প্রকাশে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। লেখকের অভিপ্রায় হয়ত তৎকালীন জার্ম্মানীর সর্ব্বাঙ্গীণ রূপ সৃষ্টি করা; কিন্তু তাতেও তিনি কৃতকার্য্য হয়েছেন বলে মনে হয় না। হিলবুটের নগ্ন সম্প্রদায় হয়ত নূতন জার্ম্মানীর বিশিষ্ট অঙ্গ; কিন্তু বুনী যখন হাসপাতালে এবং পিনেবার্গ দুশ্চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত তখন অকস্মাৎ তাকে দিগম্বর-দলের ঘূর্ণিপাকে ফেলে লাভ কি হলো? আলোচ্য বইতে অসঙ্গত কথা ও আবাস্তর ঘটনার অভাব নেই। কিন্তু সাহিত্য সমালোচনায় ছিদ্রান্বেষণের মত সঙ্কীর্ণচিত্ততা পরিহার্য্য—আমার আনন্দ যে মূলতঃ রসপ্রতিপত্তির কোন বিক্ষেপ ঘটেনি।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

সুর ও সঙ্গতি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত (ভারতী ভবন)।

"সুর ও সঙ্গতি" রবীন্দ্রনাথ ও ধূর্জ্জটিপ্রসাদের কতকগুলি পত্র; সঙ্গীতের মূলতত্ত্ব নিয়ে অনেক কথাই এতে আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলি বই হয়ে ছড়িয়ে পড়ায় সঙ্গীত-রসিক মাত্রেই সুখী হবেন। এ পত্রগুলির কয়েকটি কথা ও মতামত আশ্রয় করে দুএকটি কথা, সমালোচক হিসেবে নয় গাইয়ে হিসেবে বলতে চাই। তাই এই প্রবন্ধটি বাণিজ্য-ধর্ম্মী নয় সাহিত্য-ধর্ম্মী।

সুরের জগতে আমরা চলি যুক্তির পথে নয়, উপলব্ধির পথে। কারণ সেখানকার সাধারণ বিশ্বাস এই যে অধিকাংশ যুক্তিই ব্যক্তিগত অতীত বিশ্বাসের কতকগুলি প্রথাসম্মত, সংস্কারবদ্ধ অপভ্রংশ। মানুষের যুক্তি চলে তার অন্তরের ধর্ম্ম

ও ভালবাসার পথে। সেই পথে গেলেই সুযুক্তি পাওয়া ও দেওয়া যায় এই আমাদের ধারণা। তাই চিঠির মতামত সমালোচনার মতামতের চেয়ে অনেক বেশী সত্যি, কারণ তার যুক্তির আবরণ থাকে না, যদিও নিজের কাছেই নিজের বিশ্বাস দৃঢ়তর করার চেষ্টায় উপমার স্বরবিস্তার থাকে। তাই বিশেষভাবে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত এবং সাধারণভাবে আর্ট সম্বন্ধে যে কথাগুলি এই পত্রগুলিতে বলা হয়েছে তার পরিমাণ কম হলেও অর্থভার অনেক।

অধিকাংশ জায়গায় এতে কলাবিৎকে বাদ দিয়ে কতকটা ব্যাকরণ-সম্মত abstract আলোচনাই বেশী। ললিতকলার আলোচনা অনেক সময় কলাবিৎকে বাদ দিয়েই হয়ে থাকে, কারণ সঙ্গীত ছাড়া অন্য কলাসৃষ্টি কলাবিতের ব্যক্তিগত সংস্পর্শ ছাড়াও অনেক কাল সজীব থাকে। কিন্তু গানের অস্তিত্ব কলাবিতের ব্যক্তিগত সংস্পর্শ ছাড়া অন্ততঃ আমাদের দেশে নেই, কখনও ছিলও না। এর মধ্যে কতকগুলি পত্রে গায়কের সৃষ্টি-কৌশল ও সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি সম্বন্ধে দুএকটি গভীর প্রশ্ন করা হয়েছে, তাই নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা ভাল।

রবীন্দ্রনাথের পত্রে অনেক আলোচনাতে বারবার এই প্রশ্নই রয়েছে যে এই জাতীয় সঙ্গীতে সৃষ্টির স্বাভাবিক পরিণতি কি এবং কোথায়? কারণ সমস্ত আর্টেরই একটা স্বাভাবিক পরিণতি আছে। গানেরও একটা স্বাভাবিক পরিণতি ও শেষ অবশ্যই আছে, কিন্তু সে পরিণতির ধারা অন্যান্য কলাসৃষ্টির ধরণে হওয়ার সম্ভাবনা কম। "নাদ-সঙ্গীতের" বিশিষ্ট পরিণতির আলোচনা করার আগে এই কথাটা একটু বোঝা দরকার। গান ছাড়া অন্যান্য ললিতকলার সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব নির্ভর করে দৃষ্টি-চেতনার ওপর। দৃষ্টির সাহায্যে আমরা যা কিছু গড়ে তুলি তা প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত পারিপার্শ্বিক থেকে পৃথক থাকে—তাই তার রূপ ব্যবধান-মূলক। তাই স্থপতি ও চিত্রশিল্পী নিজের সৃষ্টির পরিধি প্রথমে ঠিক করে নিয়ে তার পর রচনা আরম্ভ করেন। শ্রুতিচেতনার নিয়ম এর বিপরীত; পারিপার্শ্বিক থেকে পৃথকভাবে অবস্থান রক্ষা করার তার প্রয়োজন নেই। সেখানকার সৃষ্টি সমস্ত overlapping। সৃষ্টির এই একটা সমাধান-মূলক রূপ আছে যাকে দৃষ্টি-চেতনায় বা দৃষ্টির ভাষায় পাওয়া যায় না।

তবে গানের প্রথম ও গৌণ সম্পদ স্থাপত্যেরই, যদিও এই স্থাপত্য গতিশীল ও স্থিতিশীল দুইই। তার গঠন আছে, সৌষ্ঠব আছে—একটা পরিচিত স্বরূপ আছে। এই সম্পদ রাগের অথবা গানের শারীরিক সম্পদ, একে নকল করা চলে, আর একজনের কাছ থেকে শিক্ষা করে "আদায়" করাও চলে। রাগের এই সম্পদ নিয়েই সঙ্গীত শাস্ত্র ও ব্যাকরণ—এই সৃষ্টি-পদ্ধতির সঙ্গে স্থাপত্য ও চিত্রকলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে।

তার দ্বিতীয় ও মুখ্য সম্পদ সাহিত্যের, তাই ভাষা-সাহিত্যের ধরণে তার শব্দ আছে, বাক্য, বিশেষ্য, বিশেষণ আছে, ক্রিয়া আছে, ভাবসমৃদ্ধি আছে, গদ্য আছে, পদ্য আছে, দর্শন আছে। এই দিক দিয়ে চিত্তের ব্যাপ্তি ও উপলব্ধির গভীরতা কলাবিতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে। ব্যাকরণ একে আইনে বাঁধবার চেষ্টা করেননি—(শুধু বলেছেন যে এই তত্ত্ব যাঁর লাভ হয়েছে তিনি মোক্ষ লাভের অধিকারী)। এই

কথাটা বোঝানোর জন্যে সামান্য পারিভাষিক আলোচনা প্রয়োজন। মল্লার রাগে "মরেপ" তিনটি স্বরযুক্ত একটি তান, কথা বা শব্দ, এই তান একত্রে architectural design, ছবির রেখা, ও ভাষার শব্দ। এই রকম "নিধনিসা" "ধনিপ" "গমরেসা" ইত্যাদি অনেক শব্দ আছে, সেই শব্দগুলি বহুকালের সংস্কার আশ্রয় করে সঙ্কেত ও অর্থপূর্ণ হয়ে আছে। গানের ইমারত গড়ে তোলার দিকটা নকল করা যায় এবং সেটা ছবি আঁকার মত বটে, কিন্তু কণ্ঠের ভাষার অভিব্যক্তিকে সুন্দর স্বরূপ দিতে হোলে কথার আড়ত অথবা vocabulary থাকাই যথেষ্ট নয়। শব্দের সঙ্কেতকে গভীর করে তুলতে হোলে বা বিরাট-স্বরূপ দিতে হোলে চাই উপলব্ধ শক্তি। এই শক্তির দৈন্য অধিকাংশ গাইয়ের মধ্যে প্রকাশ পাওয়ায় সঙ্গীতের ওপর অশ্রদ্ধা হওয়া খুব আশ্চর্য্য নয়।

প্রতি রাগের সেইজন্যে একদিকে গঠন-প্রণালী আর একদিকে সাহিত্যে ব্যাপ্তি। প্রত্যেক রাগের একটা করে বিশেষ তান, কর্ত্তব অথবা significant form থাকে, যেমন বাগেশ্রীতে "মগরেসা নিধসা"। তারপর এর পাশে অন্যান্য তান বসিয়ে সৌষ্ঠব সৃষ্টি করা হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে ভাষাগত আন্তরিক অভিব্যক্তির জোরই বেশী থাকে সব সময়। তাই এর সঙ্গে ক্রমশঃ "ধনিধ", "পধনিধ" "মধনিসানিধ" এই রকম নানা "তান" যোগ করে যখন তা একত্রে আকৃতি ও প্রকৃতিতে সৌষ্ঠব ও সমতা লাভ করে তখন তাকে "সমে" শেষ করা হয়। এই রকম করে প্রতি "সমে" একটি sentence, idea, বহুবর্ণ চিত্র, ও স্বরসন্দর্ভ শেষ হচ্ছে—এটা রাগের আংশিক পরিণতি। কিন্তু এই আংশিক পরিণতি ক্রমাগত জড়ো করে চল্লেই সঙ্গীত, রাগ, বা রসসৃষ্টি হয় না। এই অংশের পরিণতি রাগের বৃহত্তর বহুব্রীহি* উপলব্ধিকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা চাই। এই রকম ভাবে প্রতি অংশ যখন সমগ্রতার প্রকৃতি আশ্রয় করে গড়ে ওঠে, তখন সেই সৃষ্টিকে শ্রুতি-ধর্ম্মী সৃষ্টি বলা যায়।—এ প্রসঙ্গ আবার পরে তোলা যাবে।

তাই গানের এই দুটি বিশিষ্ট ধারা। প্রথমটি pattern, form, অথবা design। একে ব্যাকরণ বলেছেন অলঙ্কার, যথা "বিশিষ্ট বর্ণসন্দর্ভম্ অলঙ্কারম্ প্রচক্ষতে"—এবং "গানক্রিয়োচ্যতে বর্ণঃ"। যেমন "সাগ, রেম, গপ" অথবা "সারেগ, রেগম, গমপ, মপধ, পধনি"—এই ধরণের সন্দর্ভ হোল অলঙ্কার। কিন্তু "যস্য নাস্তি স্বয়ম্প্রজ্ঞাঃ শাস্ত্রঃ তস্য করোতি কিম্"—তাই যাঁরা ব্যাকরণ আশ্রয় করে গান শিখলেন তাঁরা শুধু স্থাপত্য-সম্মত pattern নকল করে গেলেন—তাইতে গায়ক-সমাজে কলাবিতের চেয়ে মিস্তিরীর সংখ্যা অনেক বেশী হয়ে দাঁড়াল। এখন মল্লার গাইতে হোলে "মরেপ, নিধনিসা" সকলেই বলেন, কিন্তু প্রত্যেকের বলাই আলাদা হয়ে যায়। এরই মধ্যে কেউ বা ভয় দেখায়, কেউ বা ভয় পায়, কেউ বা জোচ্চুরী করে, কেউ ভণ্ডামী, কেউ অপমান করে, কেউ ভিক্ষে চায়, কেউ বা কাঁদে, কেউ অনুযোগ আবেদন এই সব করে। এই যে বিরাট পার্থক্য এটা উপলব্ধিগত পার্থক্য—এটা ধরা পড়ে কণ্ঠস্বরে, তার গতিতে, মিড়ে, কম্পনে, মুখের চেহারায়।

---

* বহুব্রীহি উপলব্ধি বলতে এই বোঝায় যে রাগের সমস্ত তান ছাড়িয়েও সঙ্গীতের একটা অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ আছে।

গানের এই ভাষার দিকটা সঙ্কীর্ণ ভাবে কাব্য-সঙ্গীতে স্থান পেয়েছে ; তাই তার form বা ইমারত ভাল না হলেও উপলব্ধির সাড়া পাওয়া যায়। এই আন্তরিকতা কাব্য-সঙ্গীতের প্রধান সম্পদ।

সঙ্গীতের উপলব্ধি যতই গভীর হয় কণ্ঠস্বর ততই শরীরের স্থূল বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে। আজ যদি হঠাৎ ভাল করে কানের ব্যবহার হয়, তাহলে বর্ত্তমান জগতের অধিকাংশ লোক নিজের কণ্ঠস্বরে চাতুরী, কৃত্রিমতা, দাম্ভিকতা, মূঢ়তা, আবেগ, লালসা ইত্যাদি শারীরিক বিকার শুনে নিজে শিউরে উঠ্‌বে। গায়ক এই ধরণের বিকার থেকে মুক্তি পেলে, তবে কলাবিৎ নামের ভবিষ্যৎ-অধিকারী হওয়ার আশা করতে পারেন। "নাদ-সঙ্গীতের" এই জায়গায় সব চেয়ে বড় সম্পদ ও বিপদ।

কাব্য-সঙ্গীতের এ অধিকার পাওয়ার আশা কম, এমন কি প্রায় অসম্ভব। কারণ মানুষের কথার ভাষার আরম্ভ স্থূল শারীরিক বৃত্তির স্তরে। শরীরকে আশ্রয় করেই তার সুখ দুঃখের কাহিনী। তাই রসনার গান আত্মাকে ক্রমাগত মনের স্তর থেকে শরীরের স্তরে টেনে আনে। এই টেনে আনাকে অবনতি বলে মনে করতে হবে যতক্ষণ এই অবনতি সম্বন্ধে শিল্পীর স্বাধীনতা নেই, কারণ স্বাধীন অবনতি অবনতিই নয়। যাঁরা একে অবনতি বলে মনে করেন না, তাঁরা এই গানের অনুশীলন অবশ্য করবেন। তবে গানের মধ্যেই যাঁদের জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ তাঁরা এই ভাষার আশ্রিত সুরকে নিয়ে আনন্দ পাবেন না।

আমরা গানের ভাষাতীত স্বরূপ আলাপকেই সবচেয়ে উঁচু বলে জানি। এই সঙ্গীতের নাম "অনিবদ্ধ সঙ্গীত"। সঙ্গীতের অপর, ভাষা ও ছন্দোবদ্ধ অবস্থার নাম "নিবদ্ধ সঙ্গীত"—যেমন ধ্রুপদ, ধমার, দ্রুত লয়ের খেয়াল। বিলম্বিত লয়ের খেয়াল "আলাপচারী", অর্থাৎ তার প্রকৃতি অধিকাংশে আলাপ বা অনিবদ্ধ সঙ্গীতের। অনেকে আপত্তি তুলবেন যে বিলম্বিত খেয়ালেও কথা ও তানের ব্যবহার হয়—অবশ্যই হয়, তবে সে কথার কোনও মানে থাকে না, এবং তালও নির্ব্বিকার অবস্থায় পায়ের তলায় মাটিতে পড়ে থাকে, দেয়ালের মত চারিদিক থেকে চেপে ধরে না।

ধ্রুপদকে নিবদ্ধ সঙ্গীতের অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ ও নীচু স্তরে ফেলায় অনেকে আহত হতে পারেন, কিন্তু উপায় নেই—ধ্রুপদ সত্যিই নিবদ্ধ সঙ্গীত অর্থাৎ ছন্দ তাল ও ভাষাবদ্ধ– সে তাল আটচল্লিশ মাত্রার চৌতাল হোলেও এই সংজ্ঞার কোনও ব্যতিক্রম হয় না।

ধ্রুপদের বিরাট বিপুলতা অনেকের মনেই সভয় শ্রদ্ধার সঞ্চার করেছে, কিন্তু সে-বিপুলতা নিতান্ত শারীরিক বিপুলতা, চিন্তা বা পরিকল্পনার বিপুলতা নয়। রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রে বাল্যকালে ধ্রুপদ শোনার কথায় এই বিপুলতার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তিনি যে-যুগে ধ্রুপদ শুনেছেন সেটা ছিল শারীরিক বিপুলতার যুগ— সে-যুগে কুস্তি, বড়মানুষী, দারোগা, ডাকাত এই সব বস্তুর ওপর লোকের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল, তাই তখনকার গাইয়ের ছিল "তাজখাঁর মত পাগড়ী, বাজখাঁর মত গলা, চৌবেজীর মত "সিদ্ধি" আর মিশ্রজীর মত মাংসপেশী *। তার সঙ্গে থাকত

---

* এই কথাগুলি আমার নিজস্ব নয়—আমার মাতুল ৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কথার পুনরুক্তি।

"পাখোয়াজ", তার ওপর মোটা আটার প্রলেপ, বাজাতেন বিরাট গালাপাট্টাধারী "মিরদঙ্গী"। ধ্রুপদের বিপুলতা ছিল এঁদের শরীরে, কণ্ঠে, ও যন্ত্রে বিশেষ করে যখন এঁরা "খাণ্ডার বাণী" ধ্রুপদ গাইতেন। এখন সেই ধ্রুপদ পাতলা গলায় গাইলে অজ্ঞ লোকে বলবেন "ঠুমরী হয়ে গেল"।

এ-যুগে এর পরিবর্ত্তন হয়েছে। এখনকার কলাবিৎ উচ্চকণ্ঠের শব্দকে "চৌকিদারী আবাজ" বলে থাকেন; শাস্ত্রমতে এই কথাই যে ঠিক তা রত্নাকরের "দুর্গায়ক লক্ষণ" দেখলে বোঝা যাবে।

তবে সবশুদ্ধ কি সঙ্গীতের উৎকর্ষ সাধন হয়েছে? এখনও হয় নি; একটা নতুন সৃষ্টি হওয়ার আগে যেমন সমস্ত এলোমেলো অগোছাল হয়ে পড়ে, এখন সেই অবস্থা। তার কারণ মানুষের চিত্তের সম্পূর্ণতায় সবদিক দিয়ে বাধা পড়েছে। সামাজিক জীবন ও বৈদগ্ধ্যের ভেতরকার অস্বাস্থ্যকর অবস্থা কলাসৃষ্টির ভেতর সবচেয়ে বেশী ফুটে ওঠে। তার জন্যে কলাবিৎকে দোষ দেওয়া ভুল।

বর্ত্তমান যুগে চিন্তার ধারা দৃষ্টিগত তাই লোকে গান দিয়ে গান বোঝে না— খানিকটা চিত্র, খানিকটা স্থাপত্য, খানিকটা সাহিত্য, খানিকটা norm অথবা ছুতোরের ফর্ম্মা, এই সব দিয়ে বোঝাতে হয়। কিন্তু এই কি সত্যিকার বোঝা?

আমাদের সংস্কার এ নয়। বৈদিক যুগ কিম্বা তারও বহু আগে থেকে আমাদের জ্ঞান ও সৃষ্টির ধারা ছিল শ্রুতি-ধর্ম্মী।* শ্রুতির ইন্দ্রিয়-চেতনা সমাধিপ্রকৃতি, অর্থাৎ যা দৃষ্টিতে অনেক, তাই শ্রুতি এক করে শোনে। যথা,— একটি তার যে এক সেকেণ্ডে তিনশ'বার কাঁপে, চোখ দিয়ে তা দেখা যায়, কিন্তু তাই শ্রুতি-চেতনার একটি মাত্র স্বর। এই একস্বরূপকে অনেক সূক্ষ্ম ভাগে ভাগ করে গানের মূর্খ বিশ্লেষণ-দৃষ্টি দার্শনিক বৈজ্ঞানিকের উদ্ভাবিত। বিশ্বপ্রকৃতির শ্রুতিগত উপলব্ধির abstraction হোল "সারেগামা", দৃষ্টিগত উপলব্ধির abstraction রেখা ও সংখ্যা, অর্থাৎ "১, ২, ৩, ৪"। তাই গানের symbolism নির্ভর করে শ্রুতি-চেতনার ওপর, গণিতের symbolism নির্ভর করে দৃষ্টি-চেতনার ওপর, রেখাচিত্র অথবা চিত্রকলারও তাই। তাই সুরকে যেমন বৈজ্ঞানিক "১, ২, ৩" ইত্যাদি সংখ্যার সাহায্যে বোঝবার চেষ্টা করেন, চিত্র-শিল্পী তেমনি গানকে ছবির লাইনে আঁকতে চান। এর কোনটাই সম্ভব নয়। যে ইন্দ্রিয়ের যা বিষয়, তাই দিয়ে তাকে বুঝতে হবে।

শ্রুতি-ধর্ম্মী সৃষ্টির মূলতত্ত্ব হোল সমগ্রতার উপলব্ধ স্বরূপ অনুসারে অংশে রূপ দেওয়া। তার আরম্ভ ব্যবধানে নয়, সমাধানে। অতীত কালের যে কোনও সৃষ্টি দেখলে আজও তা বোঝা যায়। সেকালের মন্দিরগুলির গায়ে ছোট ছোট মন্দিরা-কৃতি অঙ্গ দিয়ে সৌষ্ঠব সাধন করা হয়েছে। এই অংশগুলির প্রকৃতি সমগ্র মন্দিরেরই অনুরূপ। গানেও তাই হোত, প্রত্যেক স্বরসন্দর্ভ বা তান আজও রাগের সমগ্র স্বরূপের প্রকৃতির অনুসারী। মানুষকেও এই ভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। এই ভাবে আমাদের ছবিও ছিল শ্রুতিধর্ম্মী।

দৃষ্টি-ধর্ম্মী জ্ঞানের ও সৃষ্টির মূলতত্ত্ব হোল ঠিক এর উল্টো। তার আরম্ভ হোল

* এই সম্বন্ধে "উত্তরায়" ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করেছি। "শ্রুতি ও দৃষ্টি" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ব্যবধানে অর্থাৎ দৃষ্টিলব্ধ সূক্ষ্মতম অংশে। তার উদ্দেশ্য হোল সমগ্রকে অংশের রূপ দেওয়া, তাই তার পরিমাণ ও আকৃতি বৃহৎ হলেও প্রকৃতি ক্ষুদ্র থাকে—এর উদাহরণ আধুনিক বৃহৎ অট্টালিকা, যার অর্দ্ধেক ছেঁটে ফেলে দিলেও প্রকৃতি-গত বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় না। আবার এই পথের প্রদর্শক বৈজ্ঞানিক ব্রাহ্মণই বলেছেন এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ড protons এবং electrons-এর সমষ্টি মাত্র—তবে এখন সব মিলিয়ে কতকটা ধোঁয়ার আকার ধারণ করেছে, এই যা ভরসা।* এমনি করে বিরাট স্বরূপকে ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডীতে টেনে এনে বর্ত্তমান ব্যবধানমূলক দৃষ্টি চিন্তাশীল মনের সৃষ্টি।

এই পথে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের শারীরিক ও যান্ত্রিক বিরাটত্বকে সত্যিকার কল্পনার বিরাটত্ব বলে মানা হয়েছে। যেমন এক লক্ষ লোক এক সঙ্গে হাত তুল্‌লে কিম্বা পা ফেল্‌লে সেটা লোক সংখ্যার বিরাটত্ব বটে কিন্তু হাত কিম্বা পা ফেলার বিরাটত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থেকেই যায়। এই রকম সব দিক দিয়ে মানুষের চিন্তার unit অথবা প্রকৃতি ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর হয়ে চলেছে। সেই ভাবে একই নিয়মে এখনকার খেয়ালের তানে সর্ষের মত ছোট ছোট দানা।

রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রে "চলৎশক্তিহীন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের" সম্বন্ধে কয়েকটি কথায় বোঝা যায়, সাধারণ বাঙালীর মত হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বলতে তিনিও পশ্চিমের দরওয়ানের কথা ভেবেছেন। "হিন্দুস্থানী সঙ্গীত" শাস্ত্রীয় নাম নয়, ওটা "উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের" "দক্ষিণী" নাম। এর শাস্ত্রীয় নাম মার্গ সঙ্গীত—যদিও মার্গ-সঙ্গীত বলতে যা বোঝাত, তার সঙ্গে এর এখন অনেক তফাৎ, তবু প্রকৃতির তফাৎ নেই। আপাততঃ একে "নাদ-সঙ্গীত" বললে সব চেয়ে সুবিধে হয়—কারণ এই সঙ্গীতের সঙ্গে কোনও প্রাদেশিক ভাষার সম্বন্ধ নেই।

তবু "চলৎশক্তিহীন" কথাটার সম্বন্ধে সামান্য আলোচনার প্রয়োজন। রাগ-রাগিণীর নতুন সৃষ্টিই যদি "চলৎশক্তি" হয়, তাহলে "নাদ-সঙ্গীত" দ্রুত-উন্নতি লাভ করেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় যদি নতুন শব্দ বা ছন্দ বা গল্পের ছাঁচ ক্রমাগত সৃষ্টি না হয়, তাহলে কি বলা যায় যে বাংলা ভাষা চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েছে? সাহিত্যের ভাব-সমৃদ্ধি কি অভিধানের আয়তন বা শব্দের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে? ভাষার কাজ চিন্তা ও পারকল্পনার রূপ দেওয়ার সুবিধে করে দেওয়া, তাই ভাষার সত্যিকার ভাব-সমৃদ্ধি নির্ভর করে স্রষ্টা শিল্পীর ওপর। এখন যদি বলা যায় যে বাংলা ভাষা চলৎশক্তিহীন, কারণ তিন হাজার বছর আগেকার সংস্কৃত আজও অনেক ব্যবহার হয়—তবে "হিন্দুস্থানী সঙ্গীত চলৎশক্তিহীন" বল্‌তে ঠিক সেই বোঝায়। এ ভাষা যিনিই বোঝেন তিনিই জানেন যে রসনার ভাষার পরিবর্ত্তে কণ্ঠের ভাষা ব্যবহার করাই তার উদ্দেশ্য, মনের অবস্থা অনুসারে তার চেহারা ফুটে বেরোয়। তাই প্রত্যেকটা তান "সারিগামা" নয়, আন্তরিক অনুভূতির প্রকাশ। "সারিগামার" দরকার অনির্দ্দিষ্টকে সাধনায় নির্দ্দিষ্ট করে পাবার জন্যে। তা নৈলে এই অনুভূতির প্রকাশ বোঝার জন্যে রাগ-রাগিণীর নাম অথবা "সারিগামা" জানবার দরকার নেই।

* Eddington প্রণীত New Pathways in Science. 88 পৃঃ।

রবীন্দ্রনাথের আর একটি পত্রে আলাপ ও গানের আলোচনায় তিনি বল্‌ছেন, "আলাপ সম্বন্ধে আর্টের আদর্শে বিচার করা কঠিন, তার কারণ দৌড়তে দৌড়তে বিচার করতে হয়, ক্ষণে ক্ষণে তাতে যে রস পাওয়া যায় সেইটি নিয়ে তারিফ করা চলে কিন্তু সমগ্রকে সুনির্দ্দিষ্ট করে দেখব কি উপায়ে? তানসেনের গান হোক বা গোপাল নায়কেরই হোক তারা তো নিরন্তর বিস্ফারিত মেঘের আড়ম্বর নয় তারা রূপবান ··।" কিন্তু আলাপ নিতান্তই অরূপ নয়, তাতে কখনও স্থিতি কখনও গতি, যখন তখন সে ছন্দের রূপে ধরা দেয়। ঠিক এই ধরণে খেয়ালের সৃষ্টি, তার হিসেব মেলানোর তাগিদ্‌ নেই। কিন্তু এই যে গতি—এ গতি ভাষার বাধ্য-গতি নয়, এখানে দাঁড়ানোর জায়গা আছে, অবসর আছে। আর যদি দৌড়তে দৌড়তে বিচার করা অসম্ভবই হোত, তাহলে কাব্য, গল্প, সমস্ত ছাপার অক্ষরের সাহিত্য কি করে উপভোগ করা চলে? সেও ত ক্রমাগত দৌড় করাচ্ছে। আলাপ কালকে অতিক্রম করেও তাকে ভোগ করে, তাই সে কালের অতীত ও স্বাধীন। কণ্ঠের ভাষার দাঁড়াবার অধিকার আছে, রসনার ভাষা সে অধিকার থেকে বঞ্চিত, তাই রসনার বাধ্য-গতি—ভাষার সঙ্গে চল্‌তে তার নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

এই ধরণের গতিশীলতার পূর্ণ স্বরূপ বোঝার জন্যে ব্যবধান-বুদ্ধি অথবা analytical sense যথেষ্ট নয়—এর প্রধান উপায় সমাধান-বুদ্ধি অথবা integrating consciousness। বাংলা দেশের দক্ষিণে হাওয়াও গতিশীল—গায়ের ওপর দিয়ে বয়ে যায়, তার প্রত্যেকটি পরমাণুর দিকে মন দিয়ে আমরা তার পূর্ণ স্বরূপ পাই না। এই প্রবাহে সমস্ত চেতনা যখন এক হয়ে ভেসে চলে তখনই গতি স্থিতি-স্বরূপ হয়। আলাপও ঠিক এই ভাবে শুনতে হবে, যদি গাইবার মত লোক পাওয়া যায়। এই অন্যমনস্ক উপভোগের ভূমানন্দই কোনও সুদূর অতীতে গন্ধর্ব্ব-লোক থেকে ভেসে এসেছিল।

বইটি পড়ে অনেক জায়গায় দুঃখ পাওয়ার কারণ থাকলেও, মোটের ওপর আনন্দ লাভ করেছি, এই ভেবে যে বর্ত্তমান ব্যবধি-প্রকৃতি, দৃষ্টি-চিন্তাশীল, বাণিজ্যধর্ম্মী যুগেও সঙ্গীতের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা অভ্রস্পর্শী হয়ে আছে, নৈলে চিঠিগুলি লেখা হোত না।

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়

সংবাদপত্রে সেকালের কথা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত,

তৃতীয় খণ্ড (সাহিত্যপরিষদ)

আমার মনে হয় বাংলা দেশে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস লেখা সুরু হয় স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকেই। তার পূর্ব্বে বাঙ্গালী পণ্ডিতবর্গ দেশের অতীত গৌরব উদ্ধার করতে সচেষ্ট যে হন নি তা নয়। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম কে না জানে? হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁরই শিষ্য। তাঁদের কৃতিত্ব অবিসম্বাদিত, তাঁদের দান চিরস্মরণীয়, কিন্তু সে কৃতিত্ব ও দানের রূপকে ভারতীয় পরিশীলনের

অখণ্ড কিংবা ক্রমবিবর্ত্তমান রূপ বল্লে অতিরঞ্জন করা হবে। বিশ্বকোষী পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও বিভেদকারী বুদ্ধির প্রাধান্যে রাজা রাজেন্দ্রলালের সমগ্রশক্তি নিয়োজিত হল বিশ্লেষণ কার্য্যে। একমাত্র ব্যতিক্রম উড়িষ্যার খণ্ড ইতিহাসে। শাস্ত্রী মহাশয়ের অগাধ পাণ্ডিত্যের কোন বিগ্রহ নেই ; উপাদান পরীক্ষায়, কথোপকথনে এবং অনুপ্রেরণায় সে-পাণ্ডিত্য নিঃশেষ হল। কেন এমনটি হয় বিশ্লেষণ করলে আমরা পরবর্ত্তী যুগের বাঙালী ঐতিহাসিকদের দোষ গুণ বিচার করতে পারব।

রাজা রাজেন্দ্রলাল ও শাস্ত্রী মশাইএর পূর্ব্বাচার্য্য কেউ ছিল না, তাঁরাই উপাদান আবিষ্কার করেছেন, অতএব সে উপাদনের পরিচয় তাঁদের নিজেদেরকেই দিতে হয়েছে ; একটা কারণ। কিন্তু অন্য কারণও ছিল—এবং সেইটাই আমার মতে প্রধান। ইংরেজ আমাদের রাজা, আমরা তাঁদের দীন অধীন প্রজা। তাঁরা এমন ভাবে রাজ্য চালিয়েছেন যাতে সন্দেহ হয় যে গোটা কয়েক আচার ভিন্ন আমাদের একটা ইতিহাসও থাকতে পারে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন কিংবা দ্বিধা তাঁদের মনে ঘুণাক্ষরেও ওঠেনি। জন কয়েক ইংরেজ পণ্ডিত রাজ্য শাসনের জন্য আমাদের আচার ব্যবহার জানতে গিয়ে আবিষ্কার করে ফেলেন যে আমাদের একটা সভ্যতা ছিল, এবং সে সভ্যতা নিতান্তই দার্শনিক। অর্থাৎ দার্শনিকের জাত বলে রাজ্য-শাসন প্রভৃতি ব্যবহারিক জগতের সব কাজেই আমরা ছিলাম অপারগ অপদার্থ। আমাদের অনেক কৃতিত্বে বুদ্ধির নিদর্শন পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে বুদ্ধিও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের স্পর্শে দুষ্ট, কলুষিত। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে যাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলা যেতো, সেটা আমাদের ছিল না, কারণ, সেটা আমাদের প্রকৃতির প্রতিকূল। রাজেন্দ্রলালের পাণ্ডিত্য ও তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধির ব্যবহার হল ঐ অভিযোগের জবাবে। তাই তাঁর জীবনে এবং কর্ম্মে তিনি ছিলেন উগ্রভাবে positive এবং বুদ্ধিবাদী, য়ুরোপীয় বিজ্ঞান-পদ্ধতিতে অন্ধ বিশ্বাসী। টুলো পণ্ডিত তিনি রাখতেন, তাঁদের মত খণ্ডন করতে।

শাস্ত্রী মহাশয়ের টুলো পণ্ডিত রাখার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তাঁর মন যে প্রতিবাদী মন ছিল এ বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিতে পারি। তিনি অক্‌সফোর্ড কেম্ব্রিজে ইতিহাসের ট্রাইপস নিতে যাননি ; কিন্তু আধুনিক অক্‌সফোর্ড, কেম্ব্রিজের ডন্‌-এরা যে তাঁকে একদিনেই পরমাত্মীয় করে তুলতেন তা বলতে পারি। সেই উপাদানের প্রতি-উপাদান হিসেবেই দরদ, প্রমাণের প্রতি সেই নৈয়ায়িক তথা উকীলের মোহ তাঁর ঐতিহাসিক বুদ্ধির প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর প্রমাণনিষ্ঠা প্রতিপদে বাধা তুলত। তিনি যে কেন উকীল হন নি এ প্রশ্নটি তাঁর একটি উকীল বন্ধুর মনে প্রায় উঠত, আমি জানি। আর ঠিক এই কারণেই তাঁর কথাবার্ত্তা ছিল অত সারগর্ভ, অত মনোজ্ঞ, অত ইঙ্গিতপূর্ণ। কী না থাকত সে কথাবার্ত্তায় ? সাবধানী মনের কি এই পরিণাম ? য়ুরোপীয় বুদ্ধি চর্চ্চার গতি কি এই ভাবে নিজের মধ্যেই বিলুপ্ত হয় ? তার শেষ কি কথায় ? ভাটপাড়ার স্মৃতি আর নবদ্বীপের নব্যন্যায় কি মানুষের সৃজনী শক্তিকে পঙ্গু করে, তার সঙ্কলনবুদ্ধিকে বিফল করে ? এই কারণ ? না, রাজেন্দ্রলাল ও শাস্ত্রী মহাশয়ের মনের গোপন কোণের পশ্চিমী অভিযোগের বিপক্ষের মূক প্রতিবাদটি রূপান্তরিত হোলা পশ্চিমী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ঐকান্তিক

অবলম্বনে, পশ্চিমী ঐতিহাসিকবৃন্দের প্রতি স্পর্দ্ধায়, প্রতিযোগিতায়? কিংবা, এই দুজন মহাপণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের পিছনে কোন সামাজিক শক্তির আলোড়ন ছিল না বলেই তাঁরা কি কেবল পথ-নির্দ্দেশক হয়েই রইলেন? অথচ savant বলতে যা বোঝায় তার প্রতীক রাজা রাজেন্দ্রলাল ও হরপ্রসাদ ভিন্ন কাউকে বলা চলে না।

সে যাই হোক, স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে সমাজ-শক্তির অভাব আর রইল না। এ যুগের লেখকদের সম্বন্ধে আর বলা চল্‌ল না যে historical or scientific or legal conscience made cowards of them all। স্বদেশী আন্দোলন ঐতিহাসিক বিবেক-বুদ্ধিকে উল্টে দিয়ে ঐতিহাসিকদের অতিরিক্ত রকমের সাহসী করে তুললে, দেশের অতীত গৌরব সম্বন্ধে জগতের কাছে দাবী জানাতে। দেশাত্মবোধের দৌলতে তাঁরা হয়ত অবৈজ্ঞানিক হয়ে উঠলেন। কিন্তু লাভ হলো অন্য দিকে। তাঁদের দৃষ্টি হল প্রসারিত। প্রত্যেকেই এক একটি যুগের রূপ উদ্ঘাটন করতে ব্যাপৃত হলেন। সমগ্রতা-বোধটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি থেকে স্খলনের ক্ষতিপূরণ করলে।

অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বদেশী যুগের লেখক বলা চলে না, তাঁদের প্রতিষ্ঠা হল সেই যুগের পরেই। তাঁরা এক হিসেবে রাজা রাজেন্দ্রলাল ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উত্তরাধিকারী। অর্থাৎ তাঁদের বিশ্লেষণ-বুদ্ধি নিতান্ত প্রখর, উপদান সংগ্রহে তাঁদের আগ্রহ নিরতিশয়। কিন্তু দেশাত্মবোধ তখন সূর্য্যের খরতাপে জেগে উঠেছে। ঘুম থেকে সদ্য জেগে ওঠার মোহ ও আলস্য থেকে তাঁরা সহজেই মুক্ত হতে পারলেন। তাই যদুনাথ রাখালদাসের ইতিহাসে আমরা সঙ্কলন-বিকলন-বুদ্ধির একত্র পরিচয় পাই। এঁরা দুজনেই নিজের নিজের পথ কেটেছেন, কিন্তু পথ কাটার কাজে গন্তব্য ভুলে যান নি।

ব্রজেন্দ্রনাথ যদুনাথের শিষ্য। তাঁর সাধনাব ইতিহাসে বাঙলা দেশের ইতিহাস লেখার পর্য্যায়গুলি ধরা পড়ে। প্রথমে তিনি 'বেগম সমরু' বাঙ্‌লায় লেখেন। বিষয়বস্তুর আকর্ষণী শক্তি ছিল বোধহয় পুস্তকখানির সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। তিনি কিন্তু শীঘ্রই যদুনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। বেগম-সমরুর দ্বিতীয় সংস্করণে যদুনাথের প্রভাব বেশ টের পাওয়া যায়। তারপরই অর্থাৎ ১৩৩৯ ও ১৩৪০ সালে তিনি পুঁথিপত্র ঘেঁটে "সংবাদ পত্রে সেকালের কথা"র দুই খণ্ড প্রকাশ করলেন। সঙ্কলন ও সম্পাদনের জন্য যে সকল গুণাবলীর প্রয়োজন সবগুলিই পুস্তকদ্বয়ের প্রতি ছাত্রে বর্ত্তমান। কিন্তু ব্রজেন বাবু তাইতে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি, তাই বোধ হয় তিনি সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় নাট্যশালার ধারাবাহিক ইতিহাস লিখে যাচ্ছিলেন, কারণ শেষ বইটাও প্রকাশিত হয় ১৩৪০ সালে। নাট্যশালার ইতিহাসে বেগম-সমরুর লেখককে আমরা পুনরাবিষ্কার করি। যে সমগ্র-দৃষ্টি ব্যতীত ঐতিহাসিকের কাজ অসম্পূর্ণ থাকে তাকে ফিরে পেয়ে অন্ততঃ একজন পাঠক উল্লসিক হয়েছিল। ব্রজেন বাবুর তৃতীয় বইখানিতে অর্থাৎ নাট্যশালার ইতিহাসে উপাদান সংগ্রহের আগ্রহ ও উপাদান পরীক্ষার শক্তির কোন কমতি ছিল না। যেটা বেশী ছিল তারই উল্লেখ করলাম। ১৩৪২ সালে সংবাদপত্রে সেকালের কথার তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হোলো। প্রকৃতপক্ষে তৃতীয়কে প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট বলা চলে, এবং

তাই বলা হয়েছে। কারণ ইতিমধ্যে ব্রজেনবাবু বিস্তর নতুন নথিপত্র খুঁজে পান। তারই জোরে সেই সময়কার, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম ও বিবিধ বিষয়ে নানা তথ্য আবিষ্কার ও নতুন সিদ্ধান্তেও উপস্থিত হলেন। আমরা ঐ কালান্তরের একটা নক্সা পেলাম। এই তিন খণ্ডের জন্য প্রত্যেক বাঙালী তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। পশ্চিমী শিক্ষা-বিস্তারের আদি কল্পনায় ডেবিড হেয়ার ও রাজা রামমোহনের তুলনা-মূলক দান, ভারতীয় বর্ণমালার পরিবর্ত্তে রোমান বর্ণমালার প্রচলন সম্বন্ধে যুক্তিতর্ক, বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংবাদ পত্র, সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রের সূত্রপাত, ভূমিকম্পের বর্ণনা, ভাষার অভিব্যক্তি এবং বেশভূষার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে নানাপ্রকার জ্ঞানের এবং পুরাতন মিথ্যা সংস্কারকে দূর করবার নানা সুবিধা, তৃতীয় খণ্ডে বর্ত্তমান রয়েছে। বাঙলা কেন সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস যিনিই লিখবেন (কারণ ১৮৩০—৪০ সালে বাঙলাই ছিল বিদেশী সভ্যতার বীজ-ভূমি, বাঙলা থেকেই বীজ তুলে ভারতবর্ষের অন্যক্ষেত্রে রোপন করা হোতো), তাঁকেই এই তিন খণ্ড সমসাময়িক ইতিহাসের পৃষ্ঠা দেখতে হবে, তা তিনি যে বিষয়েই লিখুন না কেন। ইদানীংকার ভারতীয় কৃষ্টিধারার এমন Source-book ইংরেজী বা বাঙলা ভাষায় লেখা হয় নি।

কিন্তু এইখানেই আমার যা কিছু সামান্য আপত্তি। আপত্তি পেশ করতাম না, যদি না ব্রজেনবাবুকে ঐতিহাসিক বলে মেনে নিতাম, যদি তাঁর হাতেরই বেগম সমরু ও বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ইতিপূর্ব্বে আমাদের লোভী করে না তুলত। যুগ-বোধ তাঁর আছে, যেমন তাঁর আছে অনুসন্ধিৎসা, বিচার-বুদ্ধি ও পরিশ্রমের ক্ষমতা। তাঁর লেখার মধ্যে ইতিহাস লেখার দুটি পদ্ধতিরই পরিচয় মেলে, যেমন মেলে তাঁর আচার্য্য যদুনাথের লেখায়। অতএব আমার বক্তব্য এই, তিন খণ্ডেও তাঁর মহৎ কাজটি শেষ হয়নি—চার খণ্ডে, পাঁচ খণ্ডেও হবে না, যতক্ষণ তিনি নিজেই নিজের সংগৃহীত উপাদানের সমন্বয় না করেন। আমি জানি, অন্যে পারবে না, কারুর খাটবার ক্ষমতা নেই, কারুর অমন শিক্ষা নেই, দীক্ষা নেই। নক্সা চাই, কিন্তু ছবিও চাই। তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা বেশী। স্কলারশিপের দোহাইএ আজকালকার ঐতিহাসিকবৃন্দ হয়ে পড়ছেন বুদ্ধি-জগতের haberdasher, chapman দো দো আনা আজব চীজের ব্যাপারী। তাঁরা যত পারেন ব্যবসা চালান এবং ধনবান হোন, কিন্তু আমাদের দেশে এখন চাই এমন এক দৃষ্টিশক্তি যেটি কোন যুগের উপর পড়লেই সে যুগ জীবন্ত হয়ে উঠবে, বিশেষ বিলম্বিত হবে সামান্তের গলায়।

ঐতিহাসিক ব্রজেন বাবুর সম্বন্ধেই এত কথা লিখলাম। তাঁর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বলবার আমার অধিকার নেই। উপাদানের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে মতামত ও নতুন তথ্যের স্থান দেওয়া ব্যতীত বোধ হয় Source-bookএর অন্য সমালোচনাই হয় না, কেবল তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায়। আমি তাঁর শ্রেণীবিভাগ গ্রহণ করি, তাঁর সাজাবার ভঙ্গীকে তারিফ করি, এবং আমি নতুন পুঁথিপত্রের খবর দিতে অক্ষম। নিবেদনে যে কয়টি সিদ্ধান্ত তিনি লিখেছেন সেগুলির পিছনে যে যুক্তি আছে তা অগ্রাহ্য করা চলে না, কারণ সে যুক্তি হোলো ঘটনার তারিখ অবলম্বনে। এ যুক্তি

কোন ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি অশ্রদ্ধা-প্রসূত নয়, তাকে গ্রহণ করলে কারুর উপর অশ্রদ্ধাও আসেনা, কেবল বলা চলে গ্রহণ করলে অজ্ঞানতিমিরে ডুবে থাকার আনন্দের মাত্রা একটু কমে যায়। আর একটি কথা বইগুলির স্বত্ব সাহিত্যপরিষদকে ব্রজেন বাবু দিয়েছেন। অতএব কিনে পড়লে সাহিত্যপরিষদেরই উপকার করা হবে।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

Fascism, Doctrine and Institutions,—By Mussolini,
("Aridita" Publisher—Rome)

Fascism and the Social Revolution—By R. P. Dutt,
(International Publisher, New York)

রোম থেকে যে বইটি বেরিয়েছে তাতে আছে মুসোলিনির তিনটি প্রসিদ্ধ বক্তৃতা, আর আছে ফাশিষ্ট ইটালীয় রাষ্ট্রের একরাশ আইন কানুন। মুসোলিনির একটি বক্তৃতার বিষয়, "ফাশিজ্‌মের সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব (doctrine)"। বইটির মলাটের উপরেই Doctrine কথাটি জাজ্বল্যমান এবং তার পরেই লেখা লেখা আছে Institutions অর্থাৎ Doctrine নামক নিরাকার বস্তুটির বহিরঙ্গ প্রকাশ, মোটা বুদ্ধিতে যাকে আমরা ফাশিষ্ট ইটালির Constitution বল্‌তে পারি।

সে যাই হোক ফাশিজ্‌মের Doctrineটা কি? ফাশিজ্‌মের Doctrine? কথাটা শুনলেই মনে কি রকম ধোঁকা লাগে। ফাশিজ্‌ম্ যে একটা বেশ জবরদস্ত রকমের "কেজো" জিনিস এ বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র অবকাশ নেই। কিন্তু একটা জিনিস "কেজো" হলেই যে তার একটা Doctrine থাকতে হবে এমন কি মানে আছে? একদা রাগের মাথায় বিশুদ্ধ গায়ের জোরে মুসোলিনি একটা কাজ করে বসলেন। করেই তাঁর ভাবনা হ'ল, তাইত, এখন জগতের লোককে বলা যায় কি? প্রায় দু' বৎসর রাজনৈতিক গুণ্ডামি চালানোর পর ১৯২১ সালের আগষ্ট মাসে National Assemblyর অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে মুসোলিনি লিখলেন—

Italian Fascism now requires, under pain of death, or worse, of suicide, to provide itself with a body of doctrines. * * * The expression is rather a strong one, but I would desire that in these two months between now and the National Congress the philosophy of Fascism must be created (Mussolini, Letter to Bianchi).

কি রকম জোর তাগিদ দেখুন একবার! মাত্র দুটি মাসের ভিতরে একেবারে আনকোরা নতুন একটা "philosophy" তৈরী করতে হবে। এ যেন ভানুমতীর ঝুড়ি অথবা Whiteaway Laidlawর দোকান। যা ফরমায়েস কর, সঙ্গে সঙ্গে তাই বেরুবে। তা না হ'লে ফাশিজ্‌মেরই প্রাণসংশয়! হিট্‌লারও ঠিক এই কারণেই বলেছিলেন, Marxismকে শুধু গায়ের জোরে কাৎ করা চলবে না। একটা world theoryকে আর একটা world theory দিয়ে লড়্‌তে হবে। এ'বিষয়ে আর. পি. দত্ত বড় সুন্দর কথা বলেছেন; "It is obvious that no

world theory comes into existence in this fashion, but only a substitute for a world theory."

দত্ত মহাশয়ের মতে ফাশিজ্‌ম্‌ আসলে হচ্ছে ক্যাপিটালিষ্ট সমাজের ক্রমবর্দ্ধমান অন্তর্ব্বিরোধকে গায়ের জোরে বন্ধ করার প্রচেষ্টা। ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌ ধ্বংসের পথে পা বাড়িয়েছে। যৌবনকালে ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌ উৎপাদনের ও মননের ক্ষেত্রে প্রসারকেই নিরন্তর চেয়েছিল। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার ছিল তার আনন্দের বিষয়। দৃষ্টি তার প্রতিনিয়ত থাকৃত যন্ত্রের অনন্ত উৎকর্ষের দিকে, কায়িক শ্রমকে লঘুতর করে উৎপাদনকে বাড়ানোর দিকে। বিখ্যাত সংখ্যা-বৈজ্ঞানিক Sir George Knibbs পৃথিবীর উৎপাদন শক্তির পরিমাণ হিসাব করে বলেছিলেন পৃথিবীর বর্ত্তমান জনসংখ্যার চারগুণ মানুষের জীবন-যাত্রার ব্যবস্থা স্বচ্ছন্দে হতে পারে। যতদিন ক্যাপিটালিজ্‌মের অন্তর্ব্বিরোধ ঘন হয়ে ওঠেনি, ততদিন উৎপাদন-শক্তি বাড়ানোর ফলে রীতিমত লাভ হয়েছে। এই লাভের কিছু বখরা দিয়ে, "সমাজ সংস্কার" করে শ্রমিককে তুষ্ট রাখা গিছল। ফিউডালিজমের সঙ্গে সংগ্রামে শ্রমিকের সহায়তা পাওয়ার জন্যে যে পার্লামেণ্টীয় গণতন্ত্রের সৃষ্টি হয় তাকে লাভের দিনে লাভের অংশ দিয়ে বহুকাল জীইয়ে রাখা হয়েছিল।

কিন্তু উৎপাদন শক্তি যখন এমন বেড়ে উঠ্‌ল যে মানুষের বদলে যন্ত্র ব্যবহার করলে বেকারের সংখ্যাই বাড়ে, মাল কেনবার খরিদ্দার পাওয়া যায় না, তখন লাভের পিছুটানে ক্যাপিটালিজ্‌মের রথচক্র হ'ল অচল, ঘর সামলানোর দুঃসহ দায়ে জয়যাত্রার ঘট্‌ল সমাপন। ইতিমধ্যে পৃথিবীকে ভাগাভাগি করে ঔপনিবেশিক শোষণের পালায় অভিনেতৃবর্গের পরস্পরের ভূমিকা নিঃশেষে নির্দ্দিষ্ট হয়ে গেছে। এই সময় থেকে আরম্ভ হ'ল সাম্রাজ্যবাদের তাণ্ডব লীলা, ভাগাভাগির পরিবর্ত্তে কাড়াকাড়ি, মারামারি; যার ভাগে কাটা সৈনিকের ভূমিকা পড়েছে তার সেনাপতি হওয়ার দাবী, যে বা সেজেছে বিদূষক তার হঠাৎ তুগ্লক বা আলমগীর হওয়ার প্রচেষ্টা। শ্রীবৃদ্ধির দিনে যে প্রতিযোগিতা সকলকেই শ্রীযুক্ত করত শ্রীহীনতার দিনে দেখা গেল তাতে সকলেরই সর্ব্বনাশ। কাজেই প্রতিযোগিতার স্থলে প্রতিষ্ঠিত হ'ল একাধিপত্য (monopoly)। ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌ এখন ঘরে ফাইনান্স-ক্যাপিটালের মুষ্টিমেয় মালিকের একাধিপত্য, বাইরে নূতনতর সাম্রাজ্যবাদ যার এক মাত্র লক্ষ্য যুদ্ধ। মহাযুদ্ধের আগে থেকে ক্যাপিটালিজ্‌মের এই যুগ আরম্ভ হয়েছে। এই যুগের গোড়া থেকেই ক্যাপিটালিজ্‌মের ভাঙ্গনের দশা, জরার লক্ষণ তাতে সুস্পষ্ট, ধ্বংসের বীজ তার আনাচে কানাচে অঙ্কুরিত। উৎপাদন সীমাবদ্ধ করা, যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রতি নূতন আবিষ্কারে ভীত হওয়া আরম্ভ হয়েছে সেই সময় থেকেই। ধ্বংসপথ-যাত্রী অতি আধুনিক ক্যাপিটালিজ্‌মের যে সব লক্ষণ অনেকদিন থেকেই দেখা যাচ্ছে ফাশিজ্‌মে তারই পূর্ণ প্রকাশ। আর. পি. দত্তের কথায়—

"Fascism, in fact, is no peculiar, independent doctrine and system arising in opposition to existing Capitalist socity, Fascism, on the contrary, is the most complete and consistent working out, in certain conditions of extreme decay, of the most typical tendencies and policies of modern capitalism".

অর্থাৎ ক্যাপিটালিষ্ট গণতন্ত্রের সহিত ফাসিজ্‌মের চরিত্রগত কোন পার্থক্য নেই। গণতন্ত্রের মুখোস বজায় রেখেও আধুনিক ক্যাপিটালিজ্‌ম্ বহুদিন থেকেই অগণতান্ত্রিক হ'তে আরম্ভ করেছে। আধুনিক ক্যাপিটালিজ্‌মের নীতিসমুচ্চয়ের মধ্যেই ফাশিজ্‌মের পূর্ণ প্রকাশের বীজ সুস্পষ্টভাবে নিহিত। রুজভেল্ট ও ব্রুনিং গভর্ণমেণ্টকে ফাশিষ্ট-কল্প বা কাঁচা ফাসিষ্ট বলা যেতে পারে। ক্যাপিটালিজম্ গণতন্ত্রের ঠাট সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়ে ফাশিষ্ট রূপ গ্রহণ করবে কিনা, সেটা নির্ভর করে স্থানকালাপাত্রের উপর। তাতে করে' কোন সামাজিক বিপ্লব সূচিত হয় না। ফাশিজ্‌মের বিশেষত্ব বলে' যদি কিছু থাকে তা হচ্ছে বুর্জ্জোয়া শাসন বজায় রাখার জন্য অভিনব উপায় প্রয়োগে, নূতন সামাজিক ও রাজনৈতিক যন্ত্রের উদ্ভাবনে। নূতন উপায়ের স্বরূপটি হচ্ছে জাতীয় ঐক্যের নামে গুণ্ডামি ও ধাপ্পাবাজী করে' দল পাকিয়ে স্বাধীন শ্রমিক আন্দোলনকে নষ্ট করা এবং আইন প্রণয়ন করে পুলিশ ও মিলিটারির সাহায্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরোধকে 'উড়িয়ে' দিয়ে সহযোগিতার ও পিরীতের সঞ্চার করা। উৎপাদন শক্তির সঙ্গে ক্যাপিটালিষ্ট সমাজের ব্যবস্থা যতই বেখাপ হয়ে ওঠে ততই লাভ বজায় রাখার জন্যে ক্যাপিটালিজ্‌মের আবশ্যক হয় উৎপাদন-সঙ্কোচ। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে প্রতিযোগিতা বন্ধ করে তার স্থানে Monopolyর প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর Monopolyর কর্ত্তৃপক্ষ নিজেদের মধ্যে স্বেচ্ছায় বোঝাপড়া (voluntary agreement) করে যদি কাজ হাঁসিল করতে পারেন, ত রইল গণতন্ত্র, রইল পার্লমেণ্ট। এতে যদি কাজ হাঁসিল না হয় তবে পার্লমেণ্ট তুলে দেওয়া ছাড়া আর গতি থাকে না। তখন আবির্ভূত হয় ফাশিষ্ট রাষ্ট্র। প্রভেদ লক্ষ্যে নয়, উপায়ে। ফাশিজ্‌মের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব থেকেই আধুনিক ক্যাপিটালিজম্ সাম্রাজ্যবাদী একাধিপত্যে পরিণত হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দিকে তার অনিবার্য্য গতি প্রমাণিত হয়েছে। ফাশিজ্‌মের অধীনে শিল্পে ফাইনান্স-ক্যাপিটালিষ্টদের একাধিপত্য রাষ্ট্রের একাধিপত্যের রূপ নিয়ে জাতে উঠেছে ও অধিকতর কার্য্যকরী হয়েছে মাত্র। প্রতি সাম্রাজ্যবাদী ভূখণ্ডের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ঐক্যকে উগ্রতর ও ঘনিষ্ঠতর করা হ'চ্ছে—যথা, অটোয়া চুক্তি—এবং পুনরায় সাম্রাজ্যবাদী মহাসমরের জন্য ঘটা করে আয়োজন চলছে।

অনেকে মনে করেন ফাশিজ্‌ম্ একটা মধ্য শ্রেণীর বিপ্লব। ফাশিষ্ট আন্দোলন একটা প্রতিক্রিয়াশীল গণ-আন্দোলন। শ্রেণী-চেতনাহীন বস্তির শ্রমিক এর মধ্যে প্রচুর আছে। কিন্তু এর বেশীর ভাগ লোক, বিশেষতঃ নেতৃস্থানীয় লোক, উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে এসেছে। লোক ক্ষ্যাপানোর জন্যে ফাশিজ্‌মের কর্ত্তারা ক্যাপিটালিজ্‌মের বিরুদ্ধে অনেক গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে আন্দোলন চালিয়ে থাকেন এবং তাঁদের প্রোগ্রামের ভিতরেও অনেক তথাকথিত সোশ্যালিষ্ট উপাদান বা ভাব থাকে। এই ধরণের প্রোগ্রাম লোকের চোখে ধ'রে এবং পেটি বুর্জ্জোয়া বেকার যুবক, ঋণপ্রপীড়িত চাষী ও গুণ্ডা শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে ফাশিজ্‌ম যখন ক্ষমতা পায়, তখন এটা মনে করা স্বাভাবিক ফাশিজ্‌ম বুঝি বা ক্যাপিটালিজম্ ও সোশ্যালিজম্ উভয়কেই অতিক্রম করে' মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভিত্তিতে একটা নতুন কোন অর্থনৈতিক "ইজম্"। এটা খুবই ভুল কথা।

ফাইনান্স-ক্যাপিটালের কর্ত্তারাই টাকা দিয়ে ফাশিষ্ট আন্দোলন চালিয়ে থাকেন এবং তাঁরা জানেন যতদিন উৎপাদন যন্ত্রের অধিকার তাঁদের হাতেই থাকবে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির আইন অটুট থাকবে ততদিন রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ক্ষমতার মালিক আসলে তাঁরাই থাকবেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণী নূতন কোন রকমের রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে পারবে না। জার্মানিতে ও ইটালিতে ফাশিষ্ট আন্দোলন সফল হওয়ার পর ফাইনান্স-ক্যাপিটালের কর্ত্তারাই রাষ্ট্রের প্রভু হয়েছেন, গরম গরম "সোশ্যালিষ্ট" বুলির কোন সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না। আর. পি. দত্তের ভাষায়:—

"Fascism, in short, is a movement of mixed elements, dominantly petit bourgeois, but also slum-prolatarian and demoralised working class, financed and divided by finance capital, by the big industrialists, landlords and financiers, to defeat the working class revolution and smash the working class organisations.

ঘূর্ণায়মান শ্রমিক বিপ্লবের যুগে ফাইনান্স-ক্যাপিটাল বিশুদ্ধ সামরিক শক্তির সাহায্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মনে করে। সেইজন্য সে এমন একটা আন্দোলন চালাতে চায় যার কিছু গণ-ভিত্তি আছে। এই রকম দুটি আন্দোলন যুদ্ধের সময় থেকে ফাইনান্স-ক্যাপিটাল চালিয়ে এসেছে। একটির নাম সোশ্যাল ডিমোক্রেসী এবং তারই অর্দ্ধাঙ্গ কর্ত্তাভজা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং অন্যটির নাম ফাশিজ্‌ম্‌। অর্থাৎ সোশ্যাল ডিমোক্রেসী—সোশ্যাল ফ্যাশিজ্‌ম্‌। এই মতবাদের স্বপক্ষে দত্ত মহাশয় নাৎসি আন্দোলনের গোড়ার দিকে লিখিত জর্ম্মান ফাইনান্স-ক্যাপিটালের যে সব গোপনীয় চিঠি উদ্ধৃত করেছেন তা অমূল্য। শ্রেণী সংগ্রামে সোশ্যাল ডিমোক্রেসীর ভূমিকা সম্বন্ধে ফাইনান্স-ক্যাপিটালের ও কমিউনিজ্‌মের নির্ণয়ের আশ্চর্য্য মিল দেখে বাস্তবিকই অবাক্ হয়ে যেতে হয়। এমন ধারা একটি গোপনীয় চিঠি থেকে খানিকটা পাঠকদের অবগতির জন্যে উদ্ধৃত করে' দিচ্ছি:

"The problem of consolidating the bourgeois regime in post-war Germany is generally determined by the fact that the leading bourgeoisie, who have control of the national economy, have become too small in order to uphold this rule alone. They require for this rule, if they do not wish to rely on the extremely dangerous weapon of purely military force, an alliance with strata which do not belong to them socially, but which render them the indispensable service of anchoring their rule in the people, and thereby being the actual and final bearers of this rule. This last or "outermost bearer" of bourgeois rule was, in the first period of post-war consolidation, Social Democracy......

...As the old sluice mechanism by which the privileged and organised working class was "chained fast to the bourgeois state" through Social Democracy and trade union bureaucracy thus creating a split in the ranks of the working class and obviating the dangers of communism, can no longer be sufficiently restored, (owing to the general crisis of capitalism), the only possible means of saving bourgeois rule from this abyss is to effect the splitting of the working class and its tying to the state apparatus by other and more direct means. Herein lie the positive possibilities and the tasks of National Socialism.

অর্থাৎ শ্রমিকদের বিভক্ত করে তাদেরই একদলের সাহায্যে বুর্জোয়া শাসন বজায় রাখার জন্য ফাইনান্স-ক্যাপিট্যালের হাতে দুটি অস্ত্র আছে। যখন কিছু কিছু সুবিধা দান করে "বড়লোক" শ্রমিকদের হাত করে' কমিউনিজ্‌ম্‌কে ঠেকান যায় তখন সোশ্যাল ডিমোক্রেসী নামক প্রথম অস্ত্রই ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু যখন ক্যাপিটালিজ্‌মের চির সঙ্কট, শ্রমিকদের সুবিধা দেওয়া দূরে থাক্‌ তাদের মাহিনা কাটলে নিজের লাভ বজায় থাকে না তখন সোশ্যাল ডিমোক্রেসীকে সরিয়ে তার জায়গায় ফাশিজ্‌ম্‌ নামক অস্ত্র প্রয়োগ করা দরকার; কেননা জাতীয় মত্ততার মদ খাইয়ে, গরম গরম বক্তৃতা ঝেড়ে, সকল রকমে গণসাধারণের মনে ধাঁধা লাগিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে মারের চোটে বুর্জোয়া শাসন বজায় রাখতে হবে।

এই হচ্ছে ফাশিজ্‌ম্‌—প্রথম অবস্থায় একটা "reactionary mass movement" এবং পরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পাওয়ার পর একটা "terrorist dictatorship of big capital"। সামাজিক জরাকে, মৃত্যুকে, প্রতিক্রিয়াকে, সঙ্কোচকে চিরস্থায়ী করার পন্থাকে যদি একটা "ism" বলতে হয় তবে তা হচ্ছে ফাশিজ্‌ম্‌—আর. পি. দত্তের কথায় "organisation of social decay"।

মুসোলিনির নামে যে বইটি বেরিয়েছে তার পাতায় পাতায় দত্ত মহাশয়ের বিশ্লেষণের জলন্ত প্রমাণ। মুসোলিনির মুখে খালি বড় বড় গালভরা কথার ছড়াছড়ি, "duty," "heroism," "greatness of the nation," "the conception of the State as an absolute," "the will to exercise power and to command," "spiritual and ethical imperial power," "spirit of self sacrifice;" "faith," "justice," "acquired facts of history," "the will to live," ইত্যাদি ইত্যাদি। থেকে থেকে যুদ্ধের হুঙ্কার—"War alone brings up to its highest tension all human energy and puts the stamp of nobility upon the peoples who have the courage to meet it"। উৎপাদন সঙ্কোচের দরুণ যাদের ভাল করে' মাহিনা দেওয়ার ক্ষমতা, নেই, যাদের শুকিয়ে মরতে হবে, তাদের শিক্ষা দেওয়া, "well-being = happiness"—এই মারাত্মক ফরমূলায় খবরদার বাপু ভুলোনা। খালি দেশের "ethical and spiritual" উন্নতির জন্য অল্প খেয়ে পরে, কষ্টসহিষ্ণুতা রোজ অভ্যাস কর, তা হলেই তোমরা "heroes and martyrs" হবে। এই হল ফাশিজ্‌ম্‌—একেবারে ষোল আনা আইডিয়ালিজ্‌ম্‌, যার অন্য নাম ষোল আনা ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্‌। কিন্তু আসল জায়গায় মুসোলিনি ঠিক আছেন—"Guild or comparative economy respects the principle of private property. Private property completes human personality"। যতক্ষণ এই বিশ্বাসটা ঠিক থাকবে ততদিন ফাইনান্স-ক্যাপিটাল টাকা দিয়ে একে সাহায্য করবে না কেন?

মোটের উপর ফাশিজ্‌ম্‌ বড় মজার জিনিস এবং যাঁরা চোখ খুলে বই দুটি পাশাপাশি রেখে পড়বেন তাঁদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হলেও হতে পারে।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

লীলায়িতা, প্রাক্তনী—শ্রীসুশীলকুমার দে প্রণীত। (শ্রীগুরুদাস লাইব্রেরি) ।•

প্রেম ও বিরহ—শ্রীশিবচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। (বেঙ্গল পাবলিশিং হোম)।

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে'র মতন সুশ্রাব্য, সুখপাঠ্য, স্বচ্ছন্দ, কবিতা উত্তর-রবীন্দ্র যুগের কম কবিই লিখিতে পারেন। কোথাও ছন্দ পতন নাই, অর্থের জটিলতা প্রকাশভঙ্গীকে কোথায়ও আড়ষ্ট করে নাই, সাবলীল গতিতে পংক্তির পর পংক্তি ছত্র হইতে ছত্রে স্ফীত হইয়াছে, কবির নিপুণ লেখনী সকল বাধাবিঘ্নকে অতি সহজে অতিক্রম করিয়াছে। মনে হয় যেন কবি স্বয়ং ভুলিয়া গিয়াছেন তিনি কবিতা লিখিতেছেন—এবং কি লিখিতেছেন, এত সহজ তাঁহার লিখনভঙ্গী। কিন্তু এই লিখনভঙ্গী অতি সহজ হইলেও সহজাত নহে, ইহা যে প্রভূত আয়াসের এবং পাণ্ডিত্যের ফল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বহু অধ্যবসায়ের ফলে দে মহাশয় যে শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা এতই প্রচুর যে নিতান্ত সুলভ হইয়া উঠিয়াছে। মনে হয় যেন মধুর ভাষার ও নিখুঁৎ ছন্দের মৃদুবাহী স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিয়াছি, কখন যে একটি কবিতা শেষ হইয়া আর একটি কবিতা আরম্ভ হইল তাহা পর্য্যন্ত নজরে পড়ে না, শুধু যখন বই শেষ হয় তখন চমক ভাঙ্গে, মনে হয় কিছু একটা পড়িতেছিলাম—বা শুনিতেছিলাম।

বিশেষ করিয়া 'প্রাক্তনী' বই'র কবিতা সম্বন্ধই এই কথাগুলি প্রযোজ্য। 'লীলায়িতা' বইটির কবিতাগুলি সংস্কৃত কবিতার অনুবাদ। চার লাইন আট লাইনের এই কবিতাগুলি আকারে যেরূপ ক্ষুদ্র ভাবেও প্রায় সেইরূপ অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু অকিঞ্চিৎকর হইলেও কবিতাগুলি বৈদগ্ধ্যবর্জ্জিত নহে, রসের প্রাচুর্য্যে তাহারা ভরপুর, এবং এই রস অধিকাংশ স্থলেই আদিরস, সুতরাং বিশেষ উপভোগ্য। সুশীলকুমারের বৈদগ্ধ্য, পাণ্ডিত্য ও ছন্দনৈপুণ্য এই অনুবাদে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। 'লীলায়িতার আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্য অলঙ্কৃত হইল। নিতান্ত তুচ্ছ এই অলঙ্কার কিন্তু অত্যন্ত মধুর তাহার রচনা।

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের 'প্রেম ও বিরহ' বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত কবিতা-পুস্তক। দোষ বা গুণ এমন কিছুই এই বইটির নাই যাহার উপর মন্তব্য করা চলে।

শ্রীস্বর্ণনন্দন শর্ম্মা

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ২০।১এ কলেজ স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্ত্তৃক
শ্রীসরস্বতী প্রেস লি° ১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।